Vol 55 Complete 12 issues

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫৫শ বর্ষ (ফাল্গুন, ১৪০৯) ১ম সংখ্যা

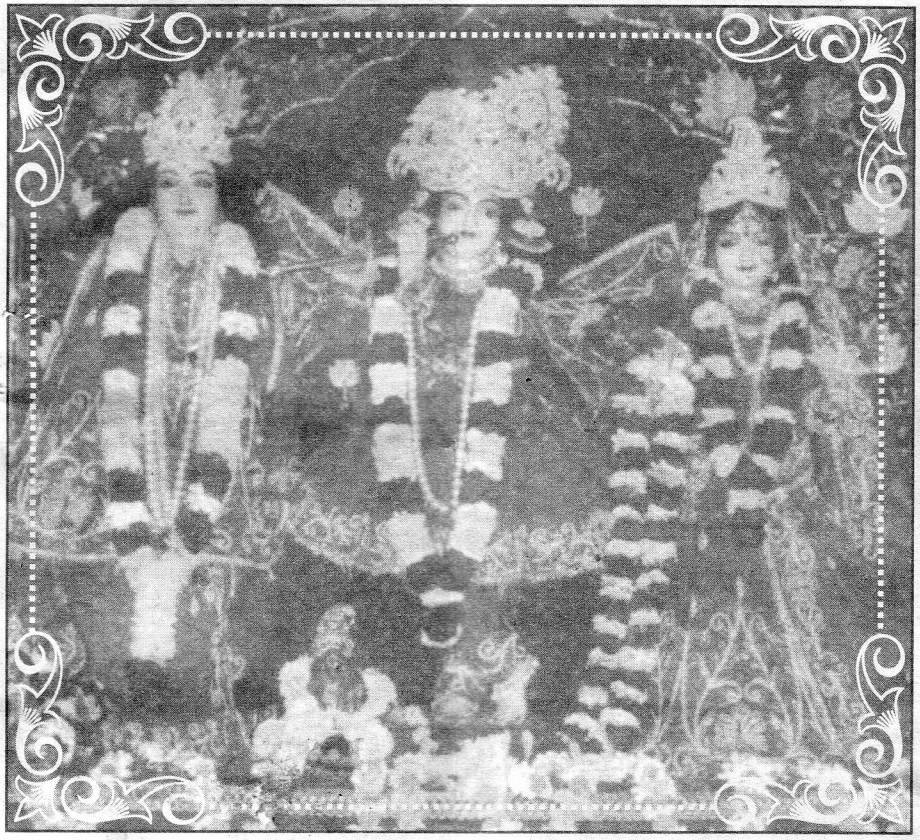

শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী জীউ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

যুগ্ম-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

কার্য্যালয়

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ✆ ২৫৫৫-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪
E-Mail : vedantasamiti@vsnl.net

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

পঞ্চপঞ্চাশৎ-বর্ষ (১ম- ১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাঙ্গ ৫১৬ গোবিন্দ হইতে ৫১৭ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৪০৯ ফাল্গুন হইতে ১৪১০ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ২০০৩ মার্চ্চ হইতে ২০০৪ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

পঞ্চপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অভাব ও স্বভাব [কবিতা]	৯।৩৫৪
অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৪
অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৪৩
অভিধেয়-বিচার—ভক্তি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৫
অলৌকিক	২।৫৬, ৩।৯৬, ৪।১৪২, ৫।১৭২, ৬।২১৫, ৭।২৫৬, ৮।২৯৮, ৯।৩৩৬, ১০।৩৭৭
অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত নহে	৫।১৯৯
আক্ষেপ-গীতিকা [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে প্রদত্ত	১০।৩৮৯
ইন্দ্র-সুরভি-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-ত্রয়োদশকম্"—শ্রী	৯।৩২১
উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা	৩।৯২
একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য—শ্রী	৪।১৩৩
ঔদার্য্যধাম শ্রীগৌরবন	৭।২৬৯
কবন্ধ	১১।৪১৮
কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য	৯।৩৩১
কলিকাল	১১।৪২২
কামভোগ ভক্তির অন্তরায় [কবিতা]	১২।৪৬০
কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৪।১৫৯
কৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবন—শ্রী [কবিতা]	৮।৩১৯
খাল কেটে কুমীর আনা	১০।৩৭৩
গুর্ব্বজ্ঞা	৭।২৬১
গুরু-পরম্পরা—শ্রী	১।১
'গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন' [কবিতা]	৭।২৬৪
গুরু-মহারাজের হরিকথা—শ্রীল [শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠে]	১।২৬, ২।৭১, ৩।১০৬
গুরু-মহারাজের হরিকথা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে]	৪।১৫৬, ৫।১৮৩, ৬।২৩০
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে প্রদত্ত]	৭।২৭৩, ৮।৩১০, ৯।৩৪৯
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	১০।৩৯২, ১১।৪২৬, ১২।৪৭১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ—শ্রীশ্রী	৯।৩৪৫
গৌড়ীয়ের পঞ্চপঞ্চাশৎ-বর্ষ—শ্রী	১।৩৭
চরণামৃত-মাহাত্ম্য—শ্রী	২।৫৩
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জম্মু-কাশ্মীর ও জয়পুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৯।৩৫৫
জ্ঞাতব্য	১১।৪৩১
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৫।১৯৫
দয়িতদাসদশকম্—শ্রীশ্রী	৮।২৮১
দক্ষিণা কি?	৮।২৯৪
দেবদেবীকে ভগবান্-বুদ্ধি—অপরাধ ও পাষণ্ডতা	৫।১৭৫, ৬।২১৮, ৮।৩০১, ৯।৩৪০
দ্রষ্টা [কবিতা]	৮।৩০৬
দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য [শ্রীল কেশব গোস্বামী]	১।১১
নলকূবর-মণিগ্রীব-কৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রদশকম্"—শ্রী	২।৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার উদ্বোধন—শ্রী [কবিতা]	১।২৫
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী	১।৩১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
নবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৩।৮১
নাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য প্রথমাষ্টকম্"	১০।৩৬১
নাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-ত্রয়োদশকম্"	১১।৪০৫
নামের অর্থ—শ্রী	২।৬৯
নিন্দা	২।৭৬
পরলোকে শ্রীপাদ কালাচাঁদ ব্রহ্মচারী প্রভু	৯।৩৬০
পরিক্রমা-যাত্রীর বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	২।৬৭
প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু	১।১৯
প্রয়োজন-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৪
প্রকৃত শিষ্য	১২।৪৬২
প্রভুপাদের উপদেশামৃত—শ্রীশ্রীল	১।৭, ২।৪৮, ৩।৮৬, ৪।১২৬, ৫।১৬৮, ৬।২০৯, ৭।২৪৭, ৮।২৮৯, ৯।৩২৬, ১০।৩৭০, ১১।৪১৫, ১২।৪৫৬
প্রত্নতাত্ত্বিক-তথ্য-বিশ্লেষণ	১১।৪৩২
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৩।১১১, ৫।১৮৭, ৬।২৩৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রীতি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৩
বন্ধু কে?	৮।৩০৮
বিরহ মহা-মহোৎসবে [কবিতা]	৪।১৪৬
বিশেষ নিবেদন	৮।৩১৯, ১২।৪৬১
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	১১।৪৪৩
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে	৫।১৯৭
বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২৫
বৈষ্ণব-নিন্দা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৮
বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৪
ব্যাসপূজা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৩৯৯
ব্যাসপূজা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১২।৪৭৭
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৪৪
ব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম-দশকম্"—শ্রী	৪।১২১
ব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-দশকম্"—শ্রী	৫।১৬১
ব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য তৃতীয়-দশকম্"—শ্রী	৬।২০১
ব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য চতুর্থ-দশকম্"—শ্রী	৭।২৪১
ভগবান্ আচার্য্য—শ্রী	৬।২২৪
ভক্তিপথে পতন নাই	১।৩৩, ২।৫৯
ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের 'যুগাচার্য্য'-উপাধি প্রাপ্তি—শ্রীমদ্	১০।৩৯৬
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে প্রদত্ত	১১।৪২৪
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
ভাগবতাচার্য্য—শ্রীমদ্ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৫১
ভ্রম-সংশোধন	৯।৩৫৯
মহামায়ার সংসর্গে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি	১।২২, ২।৬১, ৩।১০০
মহাপ্রভুর দয়া	৪।১৪৭, ৫।১৭৯, ৬।২২১, ৭।২৬৬
মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের	১১।৪৩৮
মর্য্যাদা রক্ষণ সাধুর ভূষণ	৭।২৫২
যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ-কৃতং "অনুতাপ-লক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশকম্"	১২।৪৪৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
রথযাত্রা-সঙ্গীত [কবিতা]	৫।১৯৮
রসরাজ মহাভাব	১০।৩৮২
শিলচর গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৭।২৭৮
শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে প্রদত্ত	১১।৪৩১
সময়োপযোগী নিবেদন	৫।২০০
সত্যং পরং ধীমহি	১।১৬
সন্দর্ভ-সার	১।১৩, ২।৫০, ৩।৮৯, ৪।১৩০
সম্বন্ধ-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪, ২।৪৩, ৩।৮৪
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত তীর্থাদি দর্শন	৮।৩২০
সুখ কি?	৪।১৫১
স্বতন্ত্রতা	১২।৪৬৬
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ	১।৩৬
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ	৮।৩১৫
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ	১১।৪৪১
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা (২০০৩-২০০৪)

১। শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী
শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫।

২। শ্রীমতী সাধনা লায়েক
C/O–শ্রীমহাদেব কুণ্ডু
দঙ্গলপাড়া, হাতিয়া রোড, দুমকা (ঝাড়খণ্ড)।

৩। শ্রীবাঁশরী মোহন পাইক
এন-৬, পঞ্চসায়ের, কলকাতা-৯৪।

৪। শ্রীযুক্তা সাবিত্রী ভট্টাচার্য্য
১৯ এফ, ফরেস্ট কলোনী, শিলং (মেঘালয়)।

৫। কুমারী সুষুপ্তি সাধু
C/O–শ্রীতুলসী সাধু
রবীন্দ্রনগর, বার্নপুর রোড, আসানসোল-৪।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ২৭ গোবিন্দ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, শনিবার, ১৪০৯, ইং ১৫/৩/২০০৩ { ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগুরু-পরম্পরা

[**শ্রীল কবিকর্ণপূরানুমোদিতা ; শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামিনা, শ্রীল-বলদেব-বিদ্যাভূষণেন চোদ্ধৃতা**]

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥১॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্-ক্রমাদ্বয়ম্ ॥২॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীমধ্ব, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনৃহরি, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ্য, শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীদয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, শ্রীরাজেন্দ্র, শ্রীজয়ধর্ম্ম

শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীব্রহ্মণ্য, শ্রীব্যাসতীর্থ, অনন্তর শ্রীলক্ষ্মীপতি এবং শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-প্রভুকে আমরা ক্রমান্বয়ে ভক্তির সহিত সম্যক্‌রূপে স্তুতি করি ॥১॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্ ।
দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥৪॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলি-কলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥৫॥

তচ্ছিষ্যগণ অর্থাৎ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্য জগদ্‌গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে এবং শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ-লীলাপ্রদর্শনকারী যিনি স্বয়ং করুণাসিন্ধু-বিস্তারপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া কলি-পাপসন্তপ্ত-জগৎ নিস্তার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমরা ভজনা করি ॥৪-৫॥

মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামি-প্রবরৌ প্রভূ ॥৬॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপ-প্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রভুর্মতঃ ॥৭॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীল সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগত-ভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥৮॥

শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-সংস্থাপক। গোস্বামিপ্রবর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-প্রভুদ্বয়ও তদ্রূপ মহাপ্রভুর মনোভিলাষ-সম্পূরক। মহামতি শ্রীজীব-গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীল রূপপাদের অত্যন্ত প্রিয়জন। শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রিয়রূপে সম্মত। শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রভুর সেবাপরায়ণ ও পরমপ্রিয়জন শ্রীল নরোত্তম প্রভু। তাঁহার অনুগত ভক্ত রসিকশেখর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ॥৬-৮॥

তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদ-শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥৯॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রভুর শ্রীচরণানুরক্ত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বেদান্তের গৌড়ীয়-আচার্য্যভূষণ এবং বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্বরূপ ॥৯॥

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ-প্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ ॥১০॥

বৈষ্ণবসম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীমায়াপুরধামের নির্দ্দেশকারী ও সজ্জনপ্রিয় ॥১০॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

শুদ্ধভক্তি-প্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥১১॥

তাঁহার প্রিয়রূপে বিখ্যাত বৈষ্ণবোত্তম শ্রীভক্তিবিনোদদেব ভূলোকে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ॥১১॥

তদভিন্ন-সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥১২॥

তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ মহাভাগবতবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু বৈরাগ্যের আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎ বিগ্রহ ॥১২॥

মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্ম-বিকাশকঃ ॥১৩॥
দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে ।
প্রচারচার-কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥১৪॥
হরিপ্রিয়-জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদ-পূর্ব্বকঃ ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-মহোদয়ঃ ॥১৫॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয় বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-রশ্মি বিস্তারদ্বারা মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকার নাশকারী এবং ভক্তের হৃদয়পদ্ম-বিকাশক। হরিভক্তবৃন্দ-পূজ্য সেই পরমহংস-ঠাকুর সদা শ্রীগৌরকীর্ত্তন-মত্ত ও প্রচারাচার কার্য্যাদিতে নিরন্তর মহা-উদ্যোগযুক্ত ॥১৩-১৫॥

তদন্তরঙ্গবর্য্যঃ শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবঃ ।
গৌরবাণী-বিনোদে যঃ কৃতিরত্নেতি সংজ্ঞকঃ ॥১৬॥

তাঁহার অন্তরঙ্গ-প্রধান শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী ধারায় 'কৃতিরত্ন'-নামে খ্যাত ॥১৬॥

সর্ব্বে তে গৌর-বংশ্যাশ্চ পরমহংস-বিগ্রহাঃ ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহাগ্রহাঃ ॥১৭॥

তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরপরিবার-অন্তর্ভুক্ত পরমহংসস্বরূপ। আমরাও সেই শ্রীগুরুবর্গের উচ্ছিষ্টগ্রহণে আগ্রহান্বিত প্রণত-ভৃত্যবৃন্দ ॥১৭॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

সম্বন্ধ-বিচার

(জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ)

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিত্য সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সমভাব

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়-নিষ্ঠ নহে—কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বদ্ধ জীবের পক্ষে তিনটী বিষয় বিচার প্রয়োজন

সারগ্রাহী চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, ঞ্চ'সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধ-ভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সম্বন্ধ-বিচারে আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থিতি বোধ

প্রথমে সম্বন্ধ-বিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই ; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করত প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আত্মবোধের অভাবে জীবের জড়াত্মক জ্ঞান, ও ইহা জীবকে 'জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি' মনে করায়

অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়-জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য ; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যতিক্রম-যোগে উৎপন্ন-চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত।

আত্মা যুক্তিবর্হির্ভূত—জড়-জগৎ যুক্তির অধীন

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিৎবৃত্তির পীড়া-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি। তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোনক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রোফোন যন্ত্রদ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তি-যন্ত্রদ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়-জগতের বিষয়সকল যুক্তি-বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তিদ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক ; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড় সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্ম-দর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-যন্ত্র-যোগে জড়জগতের তত্ত্ব সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই বিষয়ত্রয়ের বিচার

আত্মা, পরমাত্মা ও জড় এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রি-তত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রি-তত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন।

জড়সম্বন্ধে বিচার ঃ—সাংখ্য-মতের আলোচনা ও অনুমোদন

সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্ব-সংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসকলদ্বারা মূল-ভূত সকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত-জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সকল

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাঁহার অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম গতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল-ভূত ৬০, ৬৫ বা ৭০ হউক, সংখ্যা-নির্ণীত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল-ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়াস্থির করা যায়।

গীতায় উল্লিখিত জড়-তত্ত্বের সংখ্যা

বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। যথা,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ও প্রকৃতি-বিচারে, সাংখ্য ও বেদান্ত ঐক্য আছেন বলিতে হইবে।

মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি এক নহে

এস্থলে বিচার্য্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ দেশীয় অল্পসংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডীয় বহুতর বিজ্ঞ লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন ; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে আত্মা-শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'-শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্‌গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৫)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পরমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। সে প্রকৃতি জীব-স্বরূপা ; যাহার সহিত এই জড় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়ের ধর্ম্ম ও পার্থক্য

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব-জনকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্ত্বার ও জীবসত্ত্বার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্ত্বা চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়াবিশিষ্ট। জড়সত্ত্বা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্ত্বার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে, সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—সাধু কি করেন?

উঃ—সাধুগণের কর্ত্তব্য হচ্ছে—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া। সাধু মানেই হচ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান রয়েছেন, মানুষের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য বাক্যাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু কা'রও তোষামোদ করেন না। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু।

বৈষ্ণবগণের অসৎসঙ্গ কর্‌বার প্রবৃত্তি নাই, তবে অসৎসঙ্গিগণের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ বাক্যাস্ত্রদ্বারা অসৎসঙ্গীদিগের অসৎপ্রবৃত্তি পরিহার করাইয়া তা'দিগকে সৎসঙ্গে আনয়ন করেন।

আমরা যদি নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তা' হ'লে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার একজন্মেই হ'বে।

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ কি বস্তু?

উঃ—শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চাবতার। প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌বেন, পুতুল দেখ্‌বেন না। বদ্ধ-জীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দকার পরমকৃপাময় ভগবদবতার।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা কি?

উঃ—মধুররসে নন্দনন্দনের সেবাই সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ ও সাধ্য-শ্রেষ্ঠ। নন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্য্যে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কান্তরূপে বরণ করেন নাই, কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য ব্রজরামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য, সেই অহৈতুকী মহতী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ করিয়াছে।

প্রঃ—চিত্ত স্থির কর্‌বার সহজ উপায় কি?

উঃ—একমাত্র কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে—অধিকতর চাঞ্চল্যসাগরে পাতিত করে।

প্রঃ—আমাদের কি শিষ্য করা উচিত?

উঃ—শিষ্য কর্‌তে হ'বে না, শিষ্য হ'তে হ'বে অর্থাৎ নিরন্তর গুরু-কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে হবে। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। বৈষ্ণব-অভিমান এসে গেলে আর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হ'ল নর। আমি নিজে কিছু করি না বা কর্‌ব না, ভগবান্ যা করাবেন তাই করব—এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত, অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত ব্যক্তিই জীবের মঙ্গল কর্‌তে পারেন—জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ কর্‌তে পারেন। মুখে কপটতা ক'রে বল্‌লে হ'বে না যে আমি কিছু করি না। বাস্তবিক আমি ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত—এই অনুভূতি থাকা চাই।

প্রঃ—আপনি ত' বহু শিষ্য ক'রেছেন?

উঃ—আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই। অপরে যাঁহাদিগকে আমার শিষ্য ব'লে মনে করেন, তাঁহারা আমার গুরুবর্গ।

অপরের সঙ্গ করা মানে তাহা হ'তে কিছু গ্রহণ করা । আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ ব্যতীত অপর কাহারও কথা অনুসারে আমি কোন কার্য্য করি না।

নিজের জন্য কাহারও নিকট হ'তে কিছু গ্রহণ কর্‌তে নাই। গুরুকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত কেহ কিছু দিলে তাহা সাদরে গ্রহণ ক'রে তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবা করলেই মঙ্গল হয়।

কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত কর্‌বার রহস্য অবগত হ'লেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়।

প্রঃ—প্রকৃত সেব্য কে?

উঃ—কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য—সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু। কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সখা, সকল মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, সকল যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। 'যোষয়তি মোহয়তি ইতি যোষা।' কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

সকল কারণের কারণ—কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ।

প্রঃ—আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্যটা কি?

উঃ—এই মনুষ্য-জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্ল্লভ। কাজেই পাষাণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত।

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্য-জন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্ল্লভ—শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ । ইহা অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। বুদ্ধিমান্ যিনি, চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা থাক্‌তে থাক্‌তে অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা কর্‌বেন।

চরম কল্যাণ লাভ কর্‌তে হ'লে সদ্‌গুরুপদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে। সদ্‌গুরু আমার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে কথা বলেন না, আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য—একমাত্র কর্ত্তব্য—নিত্য কর্ত্তব্য যে কৃষ্ণভজন, সেই ভগবদ্ভজনের কথাই বলেন। জগতের লোক আমার রুচির অনুকূলে কথা ব'লে আমাকে আকৃষ্ট কর্‌ছে—আমার প্রিয় হ'তে চাচ্ছে। কিন্তুযিনি আমাকে ঐভাবে হিংসা কর্‌তে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথিত যিনি, সেই দরদী পরম-বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত হ'তে উপদেশ দিয়াছেন—আমার যা' কিছু আছে সব ছেড়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আশ্রয় নিতে ব'লেছেন।

প্রঃ—স্বাধীনতালাভের উপায় কি?

উঃ—ভগবানের চরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা-লাভের—শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা—জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম।

প্রঃ—কি ক'রে নিজেকে জান্‌তে পার্‌ব?

উঃ—আমি কৃষ্ণদাস, কিন্তু কৃষ্ণদাস্যে আমার বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার হচ্ছে না। বর্ত্তমানে আমি কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে অসমর্থ, ভগবজ্জ্ঞানের কথা জান্‌তে অক্ষম। সুতরাং আমার আবশ্যক হ'চ্ছে—আমি যে কৃষ্ণদাস, এটা জান্‌বার জন্য ষোল আনা যত্ন করা। সাধুসঙ্গ না হ'লে—কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হ'লে কেহ নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জান্‌তে পারে না।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কি ক'রেছেন?

উঃ—মানুষের সর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকের সর্ব্বস্ব যা'তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেই উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

হ'য়েও ভক্তের ভাব নিয়ে কৃষ্ণকে জানিয়েছেন—নিজে আচরণ ক'রে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত শ্রীরূপ প্রভু মহাপ্রভুকে এইভাবে স্তব ক'রেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি মহাবদান্য। তুমি তথাকথিত শিক্ষা-মন্দির স্থাপন কর্‌ছ না, তথাকথিত অনাথ-আশ্রম স্থাপন কর্‌ছ না, তুমি পূর্ত্তকার্য্য কূপ-খননাদি কর্‌ছ না, হাসপাতাল কর্‌ছ না, কিন্তু তুমিই জগতে প্রকৃত পরমার্থিক শিক্ষামন্দির স্থাপন ক'রেছ, তুমিই প্রকৃত অনাথগণের আশ্রয়স্থল, তুমিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কার ক'রেছ, তুমি গৌড়ীয়-হাসপাতাল অর্থাৎ ভবরোগ-চিকিৎসাগার স্থাপন ক'রেছ, তোমার দয়া অমন্দোদয়া দয়া। জগতের দয়া মন্দ উদয় করায় কিন্তু তোমার দয়া জীবের সমস্ত শুভ এনে দেয়, তাই তুমি মহাবদান্য। তুমি কৃষ্ণপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রদানকারী, আত্মায় যে সহজ সেবা-বৃত্তি আছে, তা'র সেব্য তুমি। আকর্ষক তুমি চেতনের উন্মেষের জন্য মহাবদান্য-লীলা প্রকাশ কর্‌তে এসেছ।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সবিশেষ পূর্ণ চিদানন্দ-বিগ্রহ। তোমার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা রয়েছে। তুমি শক্তিমদ্বিগ্রহ কৃষ্ণ। তোমার যে শক্তিদ্বারা জগদ্‌বাসী সকলে মোহিত হচ্ছে, সেই শক্তির নাম ভুবনমোহিনী মহামায়া, সেই শক্তির শক্তিমদ্বস্তু কৃষ্ণ—ভুবনমোহন। সেই ভুবনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, তিনি ভুবন-মোহনমোহিনী শ্রীরাধিকাসুন্দরী। তুমি শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত। তোমার এই ঔদার্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিতে যে রাধারমণভাব সেই ভাব নাই। কৃষ্ণের পূর্ণ-সেবাময়ী মূর্ত্তি যে রাধা, তাঁর চিত্তবৃত্তিতে, তাঁর ভাবেই তোমার চিত্ত বিভাবিত।

তুমি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী ব'লে মহাবদান্য। তুমি প্রেমময়-বিগ্রহ প্রকৃষ্ট প্রেম প্রদান কর্‌তে এসেছ। তুমি কৃষ্ণই।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি ক'রে হ'বে?

উঃ—মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণদ্বারাই সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা কর্‌তে কর্‌তে কৃষ্ণ-সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ কর্‌তে পারি। কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণে প্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন। **(ক্রমশঃ)**

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয় বলিতেছেন,—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি, তনো ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি, সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

প্রবন্ধের শিরোনামটী দেখিয়া এই শ্লোকটীর উল্লেখ করায় অনেকে হয়ত' প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা আমাদের বান্ধববর্গের নিকট দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে নিবেদন করিতেছি যে, শাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা বাহ্যতঃ যাহা বলিয়া মনে করি, শাস্ত্রের প্রকাশ-বিগ্রহ—মূর্ত্তিমৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের মনন-ধর্ম্ম—শাস্ত্র যাহাকে নিরাস করিয়াছে, তাহাকেই হয়ত' শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট-বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি। উক্ত শ্লোকটীতে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন ভাগবতের দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দভরে বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তাঁহার গাত্রস্পর্শ-লাভই শরীরের ফল, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল। কারণ, জগতে ভাগবতগণ সুদুর্ল্লভ।

বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া সেবক তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে ঐ উক্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব যখন কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানান, তখন জীব স্বভাবতঃই তাঁহার পূর্ব্ব প্রাকৃত ভোগপর দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ-সেবাপর রূপটী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, প্রাকৃত দর্শনের স্মরণপথে উদিত হইলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ যে বলা হইয়াছে,—"অক্ষ্ণো ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি", এই দর্শনে বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিবার ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। আবার বৈষ্ণব-সেবকও বৈষ্ণবের আদেশানুসারে সেবা করা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

এই সেবন-ধর্ম্মে দর্শন-স্পর্শনাদিদ্বারা আত্মসুখ-তৎপরতা নাই। ভগবান্ ও ভাগবতগণ আমার সেবাপর স্বরূপকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন,—সেবাবিহীন প্রাকৃত স্বরূপ কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ভগবান্ প্রাকৃত বস্তু নহে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা স্বভাবতঃই ভগবানের আনন্দবিধানে যত্নপর হন। সেই সময় ভগবানের দর্শনের জন্য যে প্রবলা উৎকণ্ঠা, তাহা সেবার জন্যই। সেবক যে ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহার পাদ-পদ্মদ্বয়ের সার্থকতা করেন, তাহা ভগবানের সেবা লাভের জন্য। হস্তদ্বারা বিষ্ণু-মন্দির মার্জ্জনা করিয়া বিষ্ণুর আনন্দই বর্দ্ধন করেন। চক্ষুর্দ্বয় যাবতীয়

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

সুদৃশ্যবস্তু ভগবানের সেবন-উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হয়। নাসার সাহায্যে যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য আহরণ করিয়া সেবক সেব্যের প্রীতিবিধান করেন। জিহ্বা ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করেন। এতদ্ব্যতীত সেবক জিহ্বার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সুস্বাদু দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া থাকেন। সেব্য যাহাতে স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারেন, তজ্জন্যই সেবকের অপ্রাকৃত কলেবর। বিধিমার্গের বিচারপর 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সকল কথায় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ না হইলেও, রাগমার্গীয় গৌড়ীয়গণের উন্নতাধিকারে যে সেবা রহিয়াছে, তাহাতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঐ ভাবেই হইয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের শিরোনামায় বলিয়াছি,—**'দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য'**। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, নিজেকে ভগবানের দ্রষ্টা জ্ঞান করিতে হইবে না অর্থাৎ ভোগ-তৎপর হইয়া ভগবদ্দর্শনে প্রধাবিত হইতে হইবে না। যে-স্থানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা, সেইস্থানে ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের দ্বার রুদ্ধ। যে-স্থানে ভোগ ও ত্যাগ উভয়প্রকার প্রাকৃত চেষ্টা বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণৈকশরণতা সেবকের হৃদয়কে আলোকিত করে, তথায় নিজের সেবাপরতার দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধানই সেবকের কার্য্য। ব্রজের অপ্রাকৃত গোপীগণের যে বেশভূষা ধারণ, তাহা কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্যই। কৃষ্ণ যাহাতে আনন্দিত হইবেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার ফল্গুত্ব কখনই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহারা যে কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী, তাহা কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্যই। তাঁহারা যে নির্নিমেষ-নেত্রে কৃষ্ণের মুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাও কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্যই। গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ আহ্লাদিত হন, ইহা জানিয়াই গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য একান্ত তৎপরা। এখানেও বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের কার্য্যটী দ্রষ্টার ভোগপর কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণের 'দৃশ্য' হওয়া বা কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য নিজের সেবাপর স্বরূপটী দেখান। এইস্থানে 'দেখান' কথাটী অহঙ্কার-ব্যঞ্জক নহে, পক্ষান্তরে সেবার ঔজ্জ্বল্যেরই নিদর্শন-স্বরূপ।

তীর্থস্থানে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ভগবদ্দর্শনে যান, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি 'ভগবদ্দর্শন করিয়াছে' মনে করিয়াও ভগবদ্দর্শন হইতে অনন্ত-যোজন দূরে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন হইলে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুর', 'পাথরের ঠাকুর', 'হস্ত-পদ-হীন জগন্নাথ',—এইপ্রকার উক্তি প্রকাশিত হইত না। এইস্থানে ভোগ-তৎপরতা-ক্রমে 'দেখা'-কার্য্যটী—ভগবৎসেবকের নহে। ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-রূপে উক্ত 'দেখা' কার্য্য। অমানিশায় আচ্ছন্ন পথভ্রান্ত পথিককে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সতর্ক-বাণী—"জগতের বহির্ম্মুখ বৃত্তি-জাত ভোগ-তৎপরতা লইয়া জগন্নাথকে দেখিতে যাইও

না, জগন্নাথ যাহাতে আনন্দিত হন, সেইপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীজগদীশের মন্দিরে যাইও। মনে রাখিও, প্রাকৃত নয়নদ্বারা জগন্নাথকে দেখা-কার্য্যটী সেবকের নহে। সেবাবৃত্তির স্বরূপ দেখানই—সেব্যের আনন্দ-বিধায়ক দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য। ভগবান্‌কে দেখিয়া নিজের আনন্দ লাভ করা—সেবকের কার্য্য নহে। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবেন, এই বিচারই সেবকের হৃদয়ে শোভা পাইয়া থাকে।"

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

[কৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮]

শ্রীবৃন্দাবনাদি-ধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট, অপ্রকট উভয় লীলাই বিদ্যমান। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার নিমিত্ত বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন, ধামেরও তদ্রূপ লীলা-অধিষ্ঠানহেতু প্রকাশ-ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে এক লীলাস্থানদ্বারা অন্য লীলা-স্থানসকল আক্রান্ত হয় না। প্রকট-লীলাতেও না মিশিয়া লীলাসকল সমাহিত হইতে পারে ; ধামসমূহে এরূপ বিচিত্র অবকাশ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দ্বাদশ যোজন পরিমিত দ্বারকাপুরীতে ক্রোশদ্বয় পরিমিত কোটিগৃহের সমাবেশ। আবার অল্প পরিমাণ গোবর্দ্ধন-গর্ত্তে (শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায়) ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ, তৃণ, পক্ষী প্রভৃতির যথাযোগ্য অবকাশ থাকাসত্ত্বেও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডাদি অনন্ত বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত—শ্রীনারদদৃষ্ট বৈভবে একই সময়ে প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন লীলার সমাবেশ।

সকল ধামেরই এই প্রকার বিচিত্র লীলাসমাধানের জন্য প্রকাশভেদ ঘটিয়া থাকে। অপ্রকটলীলাগত প্রকাশভেদ সম্বন্ধে যামলে রুদ্রগৌরী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, —হে গৌরি! শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি বীথিতে (পথে) রত্নময়-অঙ্গ কল্পবৃক্ষসকল অবস্থিত। তন্মধ্যে কতিপয় বৃক্ষ কোটি পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-সমুজ্জ্বল। কতিপয় বৃক্ষ নিশাবসানে সমুদিত সূর্য্যদ্যুতিতুল্য দ্যুতিমান্ হইয়া বিরাজিত। কতিপয় বৃক্ষ এসকল ইহতেও দীপ্তিশালী। সে-সকল বৃক্ষের কান্তি সুবর্ণরচিত মুকুলের মত। যে ফুল, যে ফল, যখন অনুসন্ধান করা যায়, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষসকল সেই ফুল-ফল তখনই প্রসব করে।

ব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়,—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি-গণময়ী তোয়মমৃতম্।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।"

অর্থাৎ যেখানে লক্ষ্মীগণ কান্তা, পরমপুরুষ কান্ত, বৃক্ষগণ কল্পতরু ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিও আস্বাদ্য, অপ্রাকৃত চিদানন্দ সুরভিগণ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয়, যথায় নিমেষার্দ্ধকালও বৃথা অতীত হয় না—সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজন করি, যাহাকে এ জগতে অতি অল্পসংখ্যক সাধুপুরুষ 'গোলোক' বলিয়া জানেন।

সে ধাম যদিও স্বপ্রকাশ, তথাপি তথায় লৌকিক লীলামাধুর্য্য নির্ব্বাহ-জন্য মহাপ্রলয়ে অবিনশ্বর সূর্য্যাদি জ্যোতি বিদ্যমান। সেই জ্যোতি এবং গোলোকবাসিগণের আস্বাদ্য যত বস্তু সবই চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্ববস্তু, প্রাকৃত নহে ; তথায় চন্দ্রসূর্য্যের বিলক্ষণরূপে স্থিতি। গৌতমীয় তন্ত্রে 'সমানোদিত চন্দ্রার্ক' বলিয়া উক্তি আছে। প্রতি রাশিতে পূর্ণচন্দ্র বলিয়া 'সমানোদিত চন্দ্র' বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্য প্রতিদিন সমানভাবে উদিত হয়, তথায় যদি কালের পরিবর্ত্তন না ঘটে, তবে পূর্ব্বাপর লীলার স্বরূপ-হানি হয়। যেমন—প্রাতে জাগরণ, মুখপ্রক্ষালনাদি প্রতি লীলা, আসঙ্গব সময়ে গোষ্ঠে গমন ইত্যাদি। সুতরাং সময়ের আবর্ত্তন না থাকিলে বিভিন্ন কালোচিত লীলা নির্ব্বাহ হয় না। তবে সেই আবর্ত্তনকালের অনুসারে না হইয়া লীলানুসারে হয়।

ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি, পরে বলিলেন,—শ্বেতদ্বীপেরও ভজন করি। শ্বেত—শুভ্র, দোষরহিত দ্বীপ। দ্বীপ যেমন সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্যস্থানের সঙ্গশূন্য থাকে, তদ্রূপ ইহা অন্যসঙ্গশূন্য অর্থাৎ সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। সরোবরে যেমন পঙ্ক জলসম্পর্কশূন্য হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ গোলোক পার্থিব-সম্পর্কশূন্য হইয়া বর্ত্তমান।

নারদপঞ্চরাত্রে 'শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে' শ্বেতদ্বীপের শোভা এইভাবে বর্ণিত—তাহার চতুর্দ্দিক, কোণসকল, ঊর্দ্ধ, অধঃ—দশদিকে দশদিক্‌পাল অবস্থিত। জল সেখানে ক্ষীরামৃত। বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিময়ী, লক্ষ ক্রীড়াবিহঙ্গ, বহু প্রকার সুরভি, নানাচিত্রিত রাসমণ্ডল ভূমি, কেলিকুঞ্জাদি তথায় শোভা পাইতেছে। প্রাচীর-ছত্রের রত্নসকল শেষের ফণার ন্যায় বিরাজিত। বৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশই গোলোক।

প্রকটলীলানুগত প্রকাশে যে প্রাকৃত প্রদেশের মত দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবানের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

মত স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলাবিশেষবশতঃ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবান্ যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক-লীলা অঙ্গীকার করিয়া কোন কোন লোকচেষ্টা প্রকাশ করেন, শ্রীধামও তদ্রূপ নরলোকে প্রাকট্যহেতু লৌকিক লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করিয়া জাগতিক প্রদেশ-বিশেষের, রীতি-বিশেষের ন্যায় রীতি প্রকাশ করেন। যেমন, বৃন্দাবনের কোন স্থান যমুনা প্রবাহে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোথাও নূতন চড়া পড়িতেছে, কোন স্থানে বন সৃষ্টি হইতেছে, কোন বন প্রান্তরে পরিণত হইতেছে ইত্যাদি। এ সকল কালকৃত পরিণাম নহে, কিন্তু লীলাগত জানিতে হইবে ; কারণ দৃশ্যমান ধামসকলের এ প্রপঞ্চাতীতত্ব শ্রুতি-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

বসন্তি যে মথুরায়াং বিষ্ণুরূপা হি তে খলু।
অজ্ঞানাস্তান্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।। (আদিবারাহ)

মথুরায় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরূপধারী। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, তাঁহারা কেবল জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির দৃশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃ-ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্।।
(ভাঃ ১০।১৫।৫)

হে দেববর! যাঁহারা তমোনাশের জন্য তরুজন্ম প্রকট করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসকল ফলফুল উপহার দিয়া শিখাসমূহদ্বারা অমরার্চ্চিত আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে ; অর্থাৎ বৃন্দাবনের বৃক্ষসকল দর্শন করিলে বা তাহাদের কথা শ্রবণ করিলে সংসারী জীবের তমোনাশ হইবে। এজন্য তাহারা বৃন্দাবনে বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্।।
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্।। (ভাঃ ১০।১৩।৫৯-৬০)

ব্রহ্মা সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, জনগণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী বহু বৃক্ষাকীর্ণ সমাপ্রিয় বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে, যাহাতে স্বভাবতঃ দুর্নিবার শত্রুতাবিশিষ্ট মনুষ্য, পশু প্রভৃতি প্রাণীসকল মিত্রের ন্যায় বাস করিতেছে ; আর সেই ভগবন্নিবাসস্থলী হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে। সমাপ্রিয় অর্থাৎ সম—আত্মারামগণের সম শ্রীভগবানেরও, আ—সর্ব্বতোভাবে, প্রিয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

সত্যং পরং ধীমহি

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম" অর্থাৎ সত্য ব্যতীত ধর্ম্ম নাই। বস্তুতঃ সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই সিদ্ধি, সত্যই মুক্তির পথ। আবার সত্যই মঙ্গল, সত্যই সুন্দর। 'সত্যং শিবং সুন্দরম্।" সত্যের জয় সর্ব্বত্র। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।" (মুণ্ডক উপনিষদ্)। যখন সত্যব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কর্ম্ম না করিয়াও ফললাভ হইয়া থাকে।

'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।১১।১ উপদেশ করিয়াছেন,—"সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর" অর্থাৎ সত্য বলিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অসত্যপ্রিয় জনগণ ব্যতীত সকলেই সত্য প্রচারের পক্ষপাতী।

ইহ জগতে সাধারণতঃ যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহা তাৎকালিক সত্য। নিত্যসত্য ও তাৎকালিক সত্যের মধ্যে বিরাট ভেদ রহিয়াছে। বাস্তব সত্যেরই অপর নাম নিত্যসত্য। বাস্তব সত্য মানেই প্রকৃত সত্য। তাৎকালিক সত্যের ব্যাপারে মানবের বিচারে ভুল আছে, কিন্তু বাস্তব সত্যে (Absolute Truth) কোন ভুল নাই। তাৎকালিক সত্য জড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব পরিবর্ত্তনশীল। বাস্তব সত্য চেতন, তাই তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। বাস্তব সত্য কখনও ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় না। তাৎকালিক সত্য যেহেতু নিত্য নয়, তাই ধ্বংসশীল—খণ্ডকালের মধ্যে রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য প্রকাশমান হয়। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১।১) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল জ্ঞাতৃভেদে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহাই অবিনশ্বর সত্য। নশ্বর সত্য, সত্যের ভাণ বা তাৎকালিক প্রতীতিগত সত্যাধিষ্ঠানকে কেহ কেহ 'মিথ্যা' সংজ্ঞা দেন। সত্যবস্তু পরমেশ্বরে কপটতা নাই। পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণেই সত্য অবস্থিত।" যে জ্ঞানদ্বারা মিথ্যা নিরস্ত হয়, তাহাই সত্যজ্ঞান।

এই দেবীধামে কামক্রোধসম্পন্ন মানব বাস্তব সত্যানুভবের অভাবে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া তাৎকালিক সত্যবস্তু অর্থাৎ নশ্বরবস্তুতে নিযুক্ত করেন। তাৎকালিক প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত যে সত্যানুভব, তাহা তাৎকালিক সত্য, নিত্য বা প্রকৃত সত্য নহে। যে-সকল স্ত্রৈণ পুরুষ বাহিরে সর্ব্বসময়ই মিথ্যাকথা, ছলনা বা প্রতারণাকে দুর্নীতিপুষ্ট বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারাই আবার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা স্ত্রীর সুখের নিমিত্ত মিথ্যা কথা, ছলনা বা প্রতারণা করিতে আদৌ দ্বিধাবোধ করেন না, পরন্তু তাহা ভাল বলিয়া তারস্বরে সমর্থন পর্য্যন্ত করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রুচি—সকলই বহির্ম্মুখী। মানুষ এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

বা রুচিদ্বারা কখনও প্রকৃত সত্যকে বরণ করিতে পারেন না। অসদ্বস্তুকে সত্যবস্তু জ্ঞান করিয়া—দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে করিয়া মানুষ যে তাহার পিছনে দৌড়াইতেছে, তাহা তাহার দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। বাস্তব সত্য যাহা, তাহা না অবগত হইবার ফলে যত অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষসমূহ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণা করায়। আবার দোষসমূহের অপগমে অসত্য অন্তর্হিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞান তমের নাশ করে। মাৎসর্য্য-পরবশ হইয়া জেদপূর্ব্বক যাহারা বাস্তব সত্যের অবমাননা করিতে চাহেন, তাহাদের 'নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবার' চেষ্টা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, যশ অনুসন্ধানকারী কর্ম্মনিপুণ পুণ্যবানগণের অথবা মুমুক্ষুকামী অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদিগণের সত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, হেয় ও তাৎকালিক।

স্বতঃকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট, সর্ব্বকারণকারণ সবিশেষ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বাস্তব সত্য। কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম—ইহাই নিত্যসত্য। নিত্যসত্য—বাস্তবসত্য—পরমসত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যে আবদ্ধ। "নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—ইহাই মহাজনগণের বিচার। পরমেশ্বরই সত্য বা নিত্য, ইহাই তাঁহার স্বরূপ ও মুখ্য লক্ষণ। 'সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরব্রহ্ম।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। গোপালতাপনীতে উক্ত হইয়াছে,—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।" পরমসত্য শ্রীকৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ও আনন্দস্বরূপ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যে সত্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—'সত্যং—নিত্য-নির্দুঃখ—নিরতিশয়ানন্দানুভবরূপম্।" শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"পর-ব্রহ্ম নরতনু কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কৃষ্ণে সত্যের স্বরূপলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। যিনি সত্য হইতে পরমসত্য, সত্যগোবিন্দ সংজ্ঞায় যাহার পরিচয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।" শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্‌কে স্তব করিয়াছেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।। (ভাঃ ১০।২।২৬)

"আপনি সত্যব্রত, সত্যপর, ত্রিকাল সত্য, সত্যের উৎপত্তি কারণ, সত্যে অবস্থিত, সত্যের সত্য, সুসত্য বচন ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।" মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়,—

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ।।

সত্যমূর্ত্তি ভগবান্‌ই সত্যধর্ম্মের বক্তা।

বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ।। (ভাঃ ১১।১৭।৫)

"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯) শ্লোকে দ্বাদশ মহারাজের অন্যতম যম মহারাজ নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন,—"সত্যধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত, ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না। দেবতাগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর ও চারণগণের কথা আর কি বলিব?" বাস্তবসত্য তৃতীয়-মানের (Third dimension) অন্তর্গত বস্তু নহেন। তৃতীয়-মানের অন্তর্গত বস্তুমাত্রেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু। নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য বাস্তব সত্যেরই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সত্য হইতে বিচ্যুত ব্যক্তিমাত্রেই অসাধু বা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের ২৬টী গুণের মধ্যে অন্যতম একটী গুণ সত্যসার। বৈষ্ণব অসত্যকে অসার জানিয়া বাস্তব সত্যকেই একমাত্র সাররূপে আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই সত্য হইতে বিচ্যুত হন না, তিনি শ্রীহরিকেই পরমসত্য বলিয়া জানেন। সত্যকথা অসাধুগণের কর্ণে মধু বর্ষণ না করিয়া শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে। কলিকালে মানবগণ তর্কহত হইয়া নানাপ্রকার বিবাদে প্রমত্ত হন। তাঁহাদের চরমকল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য নিরস্তকুহক পরমসত্য সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ণ মতবাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিত্য মঙ্গলের জন্য বাস্তব সত্যের যথার্থ স্বরূপটী তাঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যবস্তু যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবে জীবমাত্রেরই মঙ্গল। যাঁহাদের ভক্তিশক্তি ও দৃঢ়তা যতই বেশী, ততই তাঁহারা নির্ভীকভাবে সত্যকথা প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করেন। শ্রীহরির সেবাই যে সর্ব্বজীবের সর্ব্বসময়ে একমাত্র কৃত্য—এই পরমসত্যের বিস্মৃতিফলেই নানাপ্রকার জড়সেবা-প্রবৃত্তিমূলা বিষয়ভোগস্পৃহা জন্মে। একমাত্র বাস্তব নিত্যসত্যবস্তু মায়াধীশ বিষ্ণুর প্রতীতি ব্যতীত তদিতর প্রাকৃত দর্শনমূলক যাবতীয় সঙ্গ ও পথই অসৎসঙ্গ ও অসৎপথ। বাস্তবসত্য কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানা যায় না। মায়াবৃত অবস্থায় বাস্তব সত্যের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আদৌ প্রপন্ন ব্যতীত বাস্তব সত্য জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। বাস্তব সত্য গুরুকৃপায় লভ্য।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।। (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

"যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচল শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়।"

সত্য জানিবামাত্রই তাহাতে আমাদের নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যাহার যতটুকু আছে, উহা একমুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। সত্যবাণী কর্কশ হউক, মর্ম্মন্তুদ হউক, তথাকথিত আসুর বর্ণাশ্রমের ধ্বংসকারী হউক অথবা ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর নিকট ভয়ঙ্করী হউক, তাহাই আমাদের অমিতবিক্রমে প্রচার্য্য বিষয়। বাস্তবসত্য চিরকালই তাৎকালিক সত্য তথা মিথ্যার উন্ন মস্তক পদদলিত নিষ্পেষিত করিয়া সগর্ব্বে জগতের বক্ষে বিচরণ করিতে থাকিবে—জগতের সমুদয় শক্তি একত্রিত হইয়াও তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া সর্ব্বশেষে অক্রূরঘাটে আসেন। সঙ্গী শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য। অক্রূরঘাটে মহাপ্রভু স্নান করিতে নামিয়া প্রেমবিকারে জলের মধ্যে বহুক্ষণ ডুবিয়া রহিলেন। তাঁহার ত' বাহ্যজ্ঞান নাই। বলভদ্র ভট্টচার্য্য চিন্তা করিলেন,—প্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইয়া লইয়া যাইতেই হইবে। তাই তিনি তাঁহাকে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। মহাপ্রভু পথিমধ্যে পাঠান বিজলী খাঁন ও তাঁহার অনুগতগণকে এবং তদ্দেশবাসী সকলকেই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব করিয়া মথুরার সন্নিকটবর্ত্তী সোরোক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া তথা হইতে প্রভু প্রয়াগে পৌঁছাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন অবস্থানপূর্ব্বক ত্রিবেণীতে মকরস্নান করিয়াছিলেন। প্রয়াগে শ্রীবিষ্ণুমাধব দর্শনে চলিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাহারা প্রভু-সন্দর্শনে প্রেমে পাগল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, হাসিতে লাগিল, নাচিতে লাগিল—এমনই প্রভুর মহিমা। এই প্রয়াগের বিশেষ মাহাত্ম্য হইল,—

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৯।৪০)

মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় প্রয়াগ ডুবিয়া গেল। এই প্রয়াগেই শ্রীরূপ ও তাঁহার ভাই বল্লভ দাক্ষিণাত্য বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন পাইয়া নানাবিধ শ্লোক কীর্ত্তনমুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। শ্রীরূপ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগৌরহরিকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিলেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৫৩)

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

ত্রিবেণীর উপরই মহাপ্রভুর বাসস্থান। ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট যমুনার অপরপারে একমাইল দূরবর্ত্তী আড়াইল গ্রামের শ্রীবল্লভভট্ট (যিনি বল্লভাচার্য্য-নামে খ্যাত) প্রভুর দর্শনে আসিলেন এবং প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপূর্ব্বক নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট প্রভুকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে নিজগৃহে লইয়া যাইতেছেন—যমুনার নীলজল দর্শনে কৃষ্ণ উদ্দীপনহেতু মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গী সকলেই আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে জল হইতে নৌকার উপর উঠাইয়া কোনক্রমে বল্লভভট্টের গৃহে আনয়ন করিলেন। বল্লভভট্ট মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং প্রভুপদে তাঁহার সুদৃঢ়া ভক্তির উদয় হইল। তিনি স্বহস্তে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই পদধৌত জল সবংশে মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপদ্বারা প্রভুর পূজা করিলেন এবং প্রভুর প্রসাদ সম্মানের পর সকলে প্রভুর অবশেষ গ্রহণ করিলেন। বল্লভভট্ট নিজে ভক্তিভরে প্রভুসেবায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেছেন, এমন সময় ত্রিহুত-পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুপতি মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণনে আদেশ করিলেন। রঘুপতি যামুন কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণবর্ণনার শ্লোক কীর্ত্তন করিলে তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে উপাধ্যায় প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু উপাধ্যায়কে কিছু প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে উপাধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্লোকটী হইল,—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।।

অর্থাৎ শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয় এবং আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস।

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু রঘুপতি উপাধ্যায়কে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিলে উপাধ্যায় প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আড়াইল গ্রামবাসী মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলেন। বল্লভভট্ট নৌকায় প্রভুকে পরপারে প্রয়াগে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে নিভৃতে শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব,

ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এখানে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিরসের লক্ষণ, জীবস্বরূপ পরিমাণ, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তের তারতম্য, কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ প্রভৃতি বর্ণনমুখে কৃষ্ণানুরাগই যে ভক্তি তাহা বুঝাইলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রীতি সেবালাভের ক্রমপন্থা, কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতিফলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং গুরুকৃপাতেই সম্বন্ধ উপলব্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়—এইসকল বিষয় বিশদ-ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—প্রেমাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য। প্রেমা শুদ্ধাভক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। শুদ্ধাভক্তিরূপ অভিধেয় হইতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ ঘটিয়া থাকে।

ভক্তির তিন অবস্থা—সাধন-অবস্থা, ভাব-অবস্থা ও প্রেম-অবস্থা। প্রেম বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। পাঁচটী মুখ্য রস যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তহৃদয়ে ইহা স্থায়ীভাবেই থাকে। প্রভু শ্রীরূপের নিকট প্রত্যেকটী রসের গুণ ও স্বরূপ বর্ণন করিয়া পদ্মপুরাণের দামোদরাষ্টকের নিম্নোক্ত শ্লোকটী কীর্ত্তন করিলেন,—

ইতীদৃক স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্ত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

অর্থাৎ হে ভগবান্! আমি তোমাকে শতশত বার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি। যেহেতু এইপ্রকার স্বীয় লীলার দ্বারা তুমি গোপীদিগকে আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন কর এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদিগের নিকট তুমি যে ভক্ত-পরাজিত, তাহা জানাও।

প্রভু বলিলেন,—মধুররসে সমস্ত ভাবই বর্ত্তমান।

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক হয়।।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ।। (চৈঃ চঃ মঃ)

এই মধুররসে অবশিষ্ট চারিটী রস অনুস্যূতভাবে রহিয়াছে।

এইভাবে ভক্তিরসের দিগ্‌দর্শনপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রয়াগ হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রয়াগ শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী হওয়ার জন্য রূপানুগ বৈষ্ণবগণের পরম আদরের স্থান হইয়াছে।

—**শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী**

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

মহামায়ার সংসর্গে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি

সর্ব্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসারূপ শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়সখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছেন,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।। (গীতা ৩।৩৬)

অর্থাৎ—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন,—হে বার্ষ্ণেয়! এই পুরুষ (জীব) পাপে প্রবৃত্ত হ'তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কা'র দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ করে? এস্থলে অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিকট সুস্পষ্টভাবে জান্‌তে আগ্রহী যে, জীবের পাপ করার ইচ্ছা না থাকলেও কে তা'কে পাপে রত করে?

তদুত্তরে শ্রীভগবানের মন্তব্য অনুসন্ধানার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের উক্ত প্রশ্নের সরাসরিভাবে সরল উত্তর না দিয়া তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে একটু দুর্ব্বোধ্যভাবে উত্তর প্রদান করেছেন ; যথা—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। (গীতা ৩।৩৭)

শ্রীভগবান্ বল্‌লেন,—রজোগুণ হ'তে সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র এই কাম ও ক্রোধ—ইহাকে মোক্ষপথে জীবের প্রধান শত্রু ব'লে জান্‌বে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন,—'এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি ; তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথক্‌ত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধো ভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণামতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ।" উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ, যথা—"এই বিষয়াভিলাষাত্মক কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি করে। তদ্দ্বারা প্রযুক্ত পুরুষ পাপ আচরণ করে, এই অর্থ। এই কামই পৃথক্‌ভাবে দৃষ্ট হ'য়ে প্রত্যক্ষ ক্রোধ হ'য়ে দাঁড়ায়। কামই কোন কিছুর দ্বারা প্রতিহত হ'য়ে ক্রোধাকারে পরিণত হয়, এই অর্থ। কাম রজোগুণসমুদ্ভব, এই রাজস কাম হ'তে তামস ক্রোধ জন্মে, এই অর্থ।" অতএব, কাম হ'তেই ক্রোধ জাত হয় এবং রাজস কাম ও তামস ক্রোধই জীবকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত করে।

কামের পাপাচার তথা দুরাচার ও দুর্ব্বৃত্ততার বিষয় বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে ভগবান্ যা ব'লেছেন তার কিয়দংশ উল্লেখ কর্‌ছি, যথা,—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।। (গীতা ৩।৩৯)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

"হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অনলের ন্যায় কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত হয়।" উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানিয়েছেন,—"কামই জীবের অবিদ্যা। * * যেমন অনলকে ঘৃতদ্বারা পূর্ণ বা তৃপ্ত কর্‌তে পারা যায় না, সেইরূপ কামও ভোগদ্বারা তৃপ্ত হয় না।" উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়, মহাযোগী সৌভরির বিষয়ভোগ করেও ঘৃতবিন্দুসহযোগে অনলের ন্যায় তাঁর ভোগ-পিপাসা বর্দ্ধিতই হ'য়েছিল, আদৌ শান্তিলাভ কর্‌তে পারেন নি। "ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভীর্যথা।' (ভাঃ ১১।২৬।১৪)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনীতে পাওয়া যায়,—"যে-সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা ভগবানের দাস্য অঙ্গীকার না করে, তাহারা সুতরাং সেই পবিত্র তত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকেই বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হ'তে হ'তে আচ্ছাদিত-চেতনস্বরূপ জড়বৎ হ'য়ে পড়ে। ইহারই নাম জীবের 'কর্ম্মবন্ধ' বা 'সংসার-যাতনা'।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। (গীতা ১৬।৭)

অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হ'তে নিবৃত্তি জানে না; তা'দের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যপরায়ণতা বিদ্যমান নাই।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।।
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।।
(গীতা ১৬।১০-১২, ১৮)

সেই অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করে, দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হ'য়ে মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বনপূর্ব্বক মদ্য-মাংসাদি গ্রহণরূপ কদাচার ব্রতপরায়ণ হ'য়ে, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

আমৃত্যু, অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামের উপভোগকে চরম—এইরূপ নিশ্চয় করে শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ কামভোগের জন্য অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করে, পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করে।

এইভাবে কাম-ক্রোধাদির আশ্রিত ব্যক্তিগণ ভগবদবজ্ঞার ফলে অনবরত অসুরযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ পায় না ও ভগবান্‌কে লাভ না করে আরও নিকৃষ্টতর গতি প্রাপ্ত হয়।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।। (গীতা ১৬।২০)

সুতরাং কামের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও কামের প্রভাবে জীব অসুর-স্বভাববিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাহাদের বেদবাক্যে আস্থা থাকে না।

ঐ কাম জীবদেহের কোথায় অবস্থান করে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বল্‌লেন,—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।। (গীতা ৩।৪০)

ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় ব'লে কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে বিমোহিত করে। ইহাতে প্রশ্ন জাগে,—জীব-দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে জাত হ'য়েছে? শ্রীভগবান্ গীতার ১৩।২০ শ্লোকে ইহার উত্তর প্রদান করেছেন ; যথা,—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।

প্রকৃতি (মায়া) ও পুরুষ (জীব) উভয়কেই অনাদি ব'লে জান। বিকার তথা দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং গুণসকল তথা গুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহাদিকে প্রকৃতি হ'তে উৎপন্ন জান্‌বে।

উক্ত শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্যে পাই,—"প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই অনাদি, জড়ীয়-কালের পূর্ব্ব হ'তে আছে ; জড়ীয় কালের মধ্যে তা'দের জন্ম নয়। আমারই শক্তি হ'তে আমার পরম অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময়কালে উহাদের উদয় হ'য়েছে। জড়া প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করত প্রকাশিত হ'য়েছে। জীব—আমার নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট ; বাস্তবিক জীব—শুদ্ধচিত্তত্ত্ব, মদীয় পরাশক্তিক্রমে তাহাতে একটু তটস্থধর্ম্ম নিহিত হওয়ায় তাহা জড়া-প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করেছে। চিৎ কিরূপে জড়ে বদ্ধ হ'য়েছে, তাহা তুমি বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানদ্বারা নির্ণয় কর্‌তে পারবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়া-প্রকৃতি-সম্ভূত, জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নন।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

জড়া-প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৬।৪ শ্লোকে জানিয়েছেন,—

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া।।

"শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁর সমীপবর্ত্তিণী হ'লে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁকে বহিরঙ্গারূপে গ্রহণ ক'রে থাকেন অর্থাৎ দূর হ'তে তাহাতে ঈক্ষণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন।" শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদে জানা যায়,—'স এষঃ'—সেই এই পরমাত্মা (কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার), 'যদৃচ্ছয়া এব'—ভগবানের নিজের (বহিরঙ্গা) শক্তিবলে স্বেচ্ছায়, 'উপগতাম্'—কর্ম্মবন্ধ জগতের সৃষ্টির ইচ্ছার সময়েই লীলার্থ সমীপবর্ত্তিণী প্রকৃতিকে 'অভ্যপদ্যত'—স্বীকার কর্‌লেন অর্থাৎ তাঁ'তে জীবশক্তিরূপ বীর্য্য আধান কর্‌লেন অর্থাৎ ঈক্ষণ কর্‌লেন, এই অর্থ।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জীব স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপচয় কর্‌লে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন-সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন। এইভাবে তটস্থাশক্তি-প্রকটিত যে জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষে ঐ জড়া প্রকৃতি অর্থাৎ মহামায়া দুর্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রকৃতির তথা মহামায়ার রজস্তমগুণসমূহ সেই অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে তথা জীবাত্মাকে প্রকৃতিজাত বা মায়াজাত দেহে অধ্যাস উৎপাদনপূর্ব্বক বন্ধন করে। জীবগণের এবম্বিধ অপরাধক্রমেই মায়া-প্রকৃতি জীবকে সংসার-দুঃখ দিয়া দণ্ডপ্রদান করেন। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার উদ্বোধন

কে কোথায় আছ　　গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ।
হের সমাগত　　পরিক্রমাহব ॥
গৌরজন ডাকে　　"আয় আয় আয়" ।
অমূল্য সময়　　বৃথা বয়ে যায় ॥
সময় থাকিতে　　এসো নবদ্বীপে ।
অনিত্য জানিয়া　　জীবনপ্রদীপে ॥
সে দীপ নিভিলে　　আঁধার হেরিবে ।
ধাম-সেবা আর　　কভু না মিলিবে ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

এসো এসো সবে এসো ত্বরা করি' ।
সেবহ আনন্দে ধামে প্রাণ ভরি' ॥
গৌরজন্ম-তিথি অই সমাগত ।
তাহার সম্মানে সবে হও রত ॥
গৃহব্রাত্য আর মায়ামোহ ছেড়ে ।
দ্রুত চলে এস নবদ্বীপপুরে ॥
করিয়া সম্মান শ্রীগুরু-আহ্বান ।
স্থাপ' দ্বীপে দ্বীপে সেবা প্রতিষ্ঠান ॥
গুরু-অভিপ্রায় বুঝিয়া সকলে ।
ধামের ঔজ্জ্বল্য কর সবে মিলে ॥
তবে ত' মিলিবে ভক্তিযোগ-ফল ।
বিনাশ পাইবে বিষয় গরল ॥
ভক্তিফল-প্রেম পা'বে অনায়াসে ।
রহিবে সতত গৌরাঙ্গের পাশে ॥
এ হেন সুযোগ ছেড়ো না কখন ।
চলে এস সবে করি' সুযতন ॥
বিষয় মিলিবে যথা যবে রবে ।
তার তরে কেহ কভু না ভাবিবে ॥
এসো এসো ভাই বিলম্ব না করি' ।
ভজ নাম, কাম, ধাম, গৌরহরি ॥

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম), তাং—৭।১।২০০১

আজ শ্রীহরিবাসর-তিথি। এই তিথি পালন করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুরকম উপদেশ-নির্দ্দেশ আছে। ভগবানকে ডাক্‌তে গেলে, তাঁর সাধন-ভজন করতে গেলে কিছু শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আছে। সেই শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করলে পর আমাদের সবটাই কল্যাণের কথা, মঙ্গলের কথা। ভক্ত্যঙ্গ—ভক্তির অঙ্গ যেটা, সেটা বর্ণিত হয়েছে শাস্ত্রে ৬৪ রকমের। তার মধ্যে হরিবাসর-তিথি পালন একটা। সাধারণতঃ মানুষ ভাল-মন্দ বিচার নিয়ে চলতে পারে না। কতকগুলো (বিচার) আছে ইহ সংসারে, সেটা তাৎকালিক, নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। শাস্ত্র যে বিচার

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

দিয়েছেন, সেই বিচার গ্রহণ করে সেই অনুসারে যদি আমরা আমাদের জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের কল্যাণ আছে। নতুবা খেয়ালখুশীর বশবর্ত্তী হয়ে যেগুলো আমরা এ সংসারে আচরণ করি, সেগুলোতে কোন লাভ হবে না। অর্থাৎ সাংসারিক, জাগতিক লাভ কিছু হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক লাভ হতে পারে না। পারমার্থিক লাভ করতে গেলে শাস্ত্রের কথা মেনে চলতে হবে আমাদের। শাস্ত্র কি? শাস্ ধাতুর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করে শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ; শাস্ত্র অর্থাৎ শাসনবাণী—ভগবানের শাসনবাণী। যাঁর শাসনবাণী ত্রিভুবন মান্য করে, সেই শাসনবাণী ; তার মধ্যেই উপদেশ-নির্দ্দেশ অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে সব শিক্ষার কথা রয়েছে। সুতরাং ওটা আমাদের মানতেই হবে। গীতার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।"

যখন আমাদের মধ্যে কোন বিচার-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন বলছেন তোমরা শাস্ত্রের শরণাপন্ন হবে। শাস্ত্রের যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত আছে, সেইটা মেনে তোমরা চলবে—এই কথা বলা আছে। তাহলে সর্ব্বত্র দেখা যাচ্ছে, সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম যাঁরা যাজন করবেন, তাঁদের কাছে শাস্ত্রবিচার খুব বড় বিচার, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচার। সেই বিচার নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

একাদশী-তিথি আজ। একাদশী-তিথি পালন করা, তার থেকে কিছু কল্যাণ লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। জগতে যে ভাবধারা বর্ত্তমানে চলেছে, ঠিক সেই ভাবধারা নিয়ে চললে পরে ধর্ম্মযাজন করা যায় না। ধর্ম্মযাজন বলতে গেলে পাঁচমিশালী ধর্ম্ম নয়—যেটা মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যেটা তৈরী করেছে, সেই বিচার নিয়ে চললে আমাদের কোনই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বিচার, ভগবান্ শাস্ত্রে যে-সব উপদেশ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেই বিচার, সেই তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত নিয়েই আমাদের জীবন যাপন করা দরকার। বাচ্চা বয়স থেকেই আমরা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, সেই পরিবেশে ধর্ম্মকথা আলোচনার কোন ব্যবস্থা রাখে নাই বর্ত্তমান সমাজ-কর্ত্তারা। শাস্ত্রেই বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু সেই বিধান পালন করা হচ্ছে না ঠিক ঠিক। তজ্জন্য শাস্ত্রবাক্যের পরে জোর দেওয়া হয়েছে। আর্ষবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, ভগবদ্বাক্য—নিত্য, সনাতন বস্তু। ভগবান্ সনাতন, তাঁর বাণীও সনাতন, তাঁর ভক্তও সনাতন, ভক্তিমহাদেবীও সনাতনী—এই কথাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

আমরা আজ একাদশীর দিনে হাজির হয়েছি এখানে সব। একাদশী করলে কি হবে, যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তার উত্তর হল—ভগবৎসেবা লাভ হবে। ভগবানকে যেভাবে সেবা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তার ভিতরে একাদশী-তিথি পালনেরও

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

বিধান আছে। সেই বিধান-অনুসারে আমাদের একাদশী-তিথি পালন করার কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে খুব সুন্দরভাবে এই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয়ে আলোচনা আছে ও উন্নত ধরণের বিচার আছে। সে-সব জিনিষকে আমরা আজকাল অতি সাধারণ বলে মনে করছি, এটা আমাদের খুব বুদ্ধিমত্তা নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বিচারের কথা, তত্ত্বসিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, সেইটা আমাদের বিচার্য্য বিষয়। ভাগবত যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখব ভাগবতের যে বিচার, তা সর্ব্বোপরি। গীতায় যে উপদেশ আছে, সেই উপদেশের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—ভগবান্‌কে ডাকতে হবে, তাঁর উপাসনা করতে হবে, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পরমারাধ্য তত্ত্ব তিনি, পরম ভজনীয় বস্তু তিনি। সেই ভগবানকে ডাকতে যে নিয়ম-কানুনগুলো আছে, সেগুলো ঠিক ঠিকভাবে পালন করার দরকার আছে। গীতার বিচার শেষ হচ্ছে,—হে অর্জ্জুন! তুমি জগতে যত কথা চলছে ধর্ম্মের নামে, সে-সবগুলো আচরণ করো না। এতে তোমার কোন লাভ হবে, বৃথা সময় নষ্ট হবে।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে ।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥"

কৌশল করে শ্রীমদ্ভাগবত জানিয়ে দিচ্ছেন সেই সব মতবাদ—যেগুলো নিয়ে আজ দুনিয়া চলছে। শাস্ত্র আলোচনা করে শাস্ত্রের সার উপদেশ-নির্দ্দেশ আমরা গ্রহণ করতে চাচ্ছি না। বরং বলে দিচ্ছি—ওটা কঠিন জিনিষ, মাথায় ঢোকে না, সেজন্য আলোচনা করি না। এ সব সুবিধাবাদ—এতে আমাদের কোন কল্যাণ নাই। যে জিনিষ যত কঠিন হোক, শক্তই হোক, আমাদের অভ্যাস করা দরকার, অনুশীলন করা দরকার। তবেই ত' আমাদের কল্যাণ হবে। 'কষ্ট করলে কেষ্ট পায়'—কথা আছে। সাধন-ভজনে একটা ক্লেশ আছে, কষ্ট আছে। সে কষ্ট স্বীকার ত' করতেই হবে। সে কষ্ট যদি আমরা না করি, তাহলে কি করে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করব? ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করব? সে কষ্টটা আমাদের করতেই হবে। তবে সেই কষ্টটাকে কষ্ট মনে করলে হবে না—এটা মহাজন-বাণীর মধ্যে পাই আমরা। একজন ভক্ত তিনি বলছেন,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,সেও ত' পরম সুখ ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥"

তাহলে সেবাসুখ যেটা, তাতে কিছু ক্লেশ আছে, পরিশ্রম আছে। সেটা ত' ভক্ত মেনে নেবেন। ওটা না মেনে নিলে তার কল্যাণ কিসে হবে? শাস্ত্রে যত উপদেশ আছে, সবই আমাদের কল্যাণের জন্য ; কিন্তু সে কল্যাণকর বিষয় আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। বাচ্চা বয়স থেকে যা দেখে আসছি, যা শুনে আসছি,

তাই আমরা করে যাচ্ছি। তাতে কি হবে, না হবে, সে-সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা আমরা মোটেই রাখি না, মোটেই করি না—এটাই হল দুঃখের কথা! শাস্ত্র-অনুসারে যদি আমরা কিছু করি, তার মূল্যায়ন আছে, তাতে মঙ্গল আছে, তাতে উপকার আছে।

একাদশী-তিথি পালন করবার যে নিয়ম আছে শাস্ত্রে, তদনুসারে একাদশী বল্‌তে বুঝায়, (দৈনন্দিন) নিয়ম লঙ্ঘন দেওয়া অর্থাৎ একেবারে উপবাস। একেবারে উপবাসের কথা শুনলে আমাদের ভয় হয়। একেবারে নিয়ম লঙ্ঘন কি করে দেওয়া যাবে? যাকে বলে নিরম্বু উপবাস, যে উপবাসে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায় না, তাকে বলে একাদশীর উপবাস। তাহলে কি করা হবে? ভগবানকে ডাকতে গেলে কিছু কষ্ট আছে, সেটা মেনে নিতে হবে। ভগবানকে যদি পেতে হয় আমাদের, কিছু ক্লেশ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। এটাকে ছেড়ে মানুষ ভাল কিছু লাভ করতে পারে না। নিরম্বু উপবাসের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় বলা আছে যে, জল পর্য্যন্ত খাওয়া যাবে না। তাহলে কি করা হবে? তাহলে আমাদের দ্বারা কিছু হল না। যদি এমন অবস্থা কারও হয়—উপবাস করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন কি করা হবে? শাস্ত্র সেখানে বলছেন, তখন একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কি ব্যবস্থা? কিছু গ্রহণ করবেন তিনি। কি গ্রহণ করবেন? দুগ্ধ-জাতীয় এবং ফলমূল জাতীয় কিছু গ্রহণ করতে পারেন—এ বিধান শাস্ত্রে দেওয়া আছে। কিন্তু কার পক্ষে সেটা? যারা অপারগ, অসমর্থ, তাদের জন্য ব্যবস্থা দেওয়া আছে। এখন শাস্ত্রের ঐ ব্যবস্থা দেখে আমরা কিন্তু সবাই অসমর্থ হয়ে গেছি, সবাই অপারগ হয়ে গেছি। কেন? ঐ আইনের সুযোগটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। ইচ্ছা করলে হয়ত' পারি আমরা। বহু বিষয়ে রাগ, ঝগড়া করে অনেক সময় অনেক লোক একদিন, দুদিন ত' খায় না। সেই রাগটা ভগবানের পরে করলে তাহলে ত' উপবাস হয়ে যাবে, আমার লাভ হয়ে যাবে। উপবাসের দিনে যদি আমরা ঝগড়া করি, আর উপবাস করি, তাহলে নিরম্বু উপবাস হয়ে যাবে।

প্রহ্লাদ মহারাজের ইতিহাসে আছে—তিনি ঝগড়া করেছিলেন। ঝগড়া করে নৃসিংহদেবের উপবাস হয়ে গেছে সেইদিনে। তাতে তাঁর বহু লাভ হয়েছে। এরকম ধরণের লাভের কথা আছে। আমরা কিছু জানি না, বুঝি না, তা বললে হবে না। বুঝতে হবে, ওরকম হয়ে যাবে, তাতে খারাপ কিছু হবে না। তাহলে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য দরকার, সহ্যগুণ, সহনশীলতা দরকার। আমাদের এ সব প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রানুসারে আমাদের উপবাস করতে হবে। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি, তাহলে কিছু গ্রহণ করা দরকার। সেটা কি জাতীয়? গব্য জাতীয়, ফলমূল জাতীয় জিনিষ কিছু গ্রহণ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

করা যাবে। এই ভাগবতে আছে—"ন উপবাসস্তু লঙ্ঘনে", আবার উল্টো করে বলছেন—উপবাস করলেই কি সব হয়ে যাবে? না, তা হবে না। তাহলে যার জন্য উপবাস করছি, তাঁর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে—সেই ভগবানের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আবার ভগবান্ কি একা? ভক্ত বাদ গেলেন তাহলে? না, ভক্তকে বাদ দিলে হবে না, ভক্তকে নিয়েই ভগবান্। আবার ভক্তি-মহাদেবীকে বাদ দিলে চলবে? তাও ত' হবে না। ভক্তি-মহাদেবীকে নিয়েই চলতে হবে। তাহলে কাকে ছাড়ব, কাকে রাখব? সকলকে নিয়েই চলতে হচ্ছে। ভক্তকে বাদ দিতে পারি না, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকে বাদ দিতে পারি না, ভগবানকে বাদ দিতে পারি না, ভক্তি-মহাদেবীকে বাদ দিতে পারি না। শাস্ত্রানুসারে আমাদের চলতে হবে—এটাই হল প্রধান কথা। তারপরে নির্ভর করছে সব কিছু, আর আমাদের আন্তরিকতা। সহজ-সরল ভাব। যেটা দেখে ভগবান্ খুশী হন, আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে সবই হয়—আমরা বুঝি, আর না বুঝি।

যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর মঙ্গলচিন্তা সবসময়ই করতে হয়। গুরু-বৈষ্ণবগণ সেটা করেন, ভগবান্ও করেন। শাসনবাণী হল শাস্ত্র, পালন করলে আমাদের নিশ্চয়ই কল্যাণ আছে। কিন্তু সেই শাসনবাণীর পিছনে যে স্নেহ-মমতা, বাৎসল্য আছে ভগবানের, এটা আমাদের বুঝতে লাগে। আমরা ওটা বুঝতে চেষ্টা করি না। ভগবান্ আমাদের কেমন ভালবাসেন, ভগবান্ আমাদের জন্য কেমন কষ্ট করেন, তাঁর কেমন চিন্তা-ভাবনা আছে আমাদের জন্য, এসব বিষয় চিন্তা করি না আমরা। এসব বিষয় চিন্তা করবার কথাও শাস্ত্রে লেখা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীতে যত অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম আছে, সব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেইজন্য কথাটা এসেছে,—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে ।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥"

কৌশল করে সব জানিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমরা যে কষ্ট করব, তার ভিতরে কষ্টই সার হবে যদি আমরা মূল বস্তুকে বাদ দিয়ে দেই। ভগবান্ কে? সংক্ষেপভাবে বুঝা দরকার, ভগবান্ আমাদের পরম সুহৃৎ, পরম মিত্র। তিনি আমাদের সবকিছু। এ বিচার যতদিন আমাদের না আসবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি,জ্ব আলোর সন্ধান পাই নাই—এই কথাই শাস্ত্র বলছেন। কি করব তাহলে? আলো খুঁজতে হবে, অন্ধকারে থাকা চলবে না। আলোটা জ্বলছে, যেই আলোটা নিভে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা চিৎকার আরম্ভ করে। যেই আবার আলোটা ফিরে আসে, তখন হাসতে থাকে। বিচারটা কি? এ জগতে আমরা কেউই

অন্ধকার চাই না। আলোরই উপাসক আমরা। সেই আলোটা কি? শাস্ত্র বলছেন—জ্ঞানালোক। আর অন্ধকারটা কি? অজ্ঞান অন্ধকার। যদি আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা আলো পাওয়া, তাহলে সেই আলোটা হল জ্ঞানালোক। ভক্তি+আলোক = ভক্ত্যালোক। এটার দরকার আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা মাদৃশ দেহ-গেহাসক্ত পতিত জীবকে দেহ-গেহ-পরিক্রমারূপ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই গৌরজন শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রকট করিয়াছেন। এই অমন্দোদয়-দয়াবতার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সেবা গৃহাসক্ত, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই কৃত্য। এই সেবায় সকলেরই শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তিরূপ আত্মমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে ; ইহাই শ্রীধাম-পরিক্রমার ঔদার্য্য ও রহস্য। ইহা গৃহাসক্তের গৃহাসক্তি নষ্ট করিয়া গৃহ-পরিক্রমা, সংসার-পরিক্রমা, ভোগ্যবস্তুর পরিক্রমা হইতে বিরত করাইয়া কৃষ্ণ-গৃহ-পরিক্রমা, কৃষ্ণসংসার-পরিক্রমা, কৃষ্ণধাম-পরিক্রমা ও কৃষ্ণভক্ত-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিচারে সকলেই একসঙ্গে এই সেবায় অধিকারী। সকলেই এই পরম কৃপাবতার শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন। শ্রীধাম-শশধর—শ্রীধাম-সুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান করিবার সুযোগ এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি গৌরপ্রণয়ী জনগণ গৌরাভিন্ন এই শ্রীগৌরধামের পরিক্রমা করিয়া জীব-সকলকে তদনুসরণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই শ্রীনবদ্বীপধামে নিত্য পরিভ্রমণ করিবার কথা ও শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগললীলা-স্মরণ-লালসা করিয়াছেন,—

"স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌর-করুণয়া
মহাপ্রেমোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥"

—গলিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররসবিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই শ্রীনবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে।

"নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত-যুগললীলা ব্রজবনে ।
স্মরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥"

—কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে বাস করিয়া শ্রীশচীনন্দনের ভাবোত্থিত (বিপ্রলম্ভভাবোত্থিত) যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আত্মোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব?

শ্রীনবদ্বীপধাম ঔদার্য্যবিগ্রহ, কি সাধক, কি সিদ্ধ—সকলেরই আরাধ্যক্ষেত্র। এই শ্রীনবদ্বীপধাম যুগপৎ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবারস-রসিকগণের শ্রীগৌরধামে যুগপৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তবে এই গৌরধামের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরস্বরূপের ঔদার্য্য বা কারুণ্য যেরূপ অধিক, তদ্রূপ শ্রীগৌরধাম শ্রীব্রজধাম অপেক্ষা অধিক উদার।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুভেচ্ছায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববাসীর প্রতি অনর্পিতচরী কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক এই তর্কহত যুগে দেহ-গেহাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য সেই ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব প্রকট করিয়াছেন। শ্রীগৌরধাম নিত্যকালই নিত্যানন্দপুর—প্রেমানন্দপুর। শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসবের সেবা করিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? এই সময় অত্যন্ত দেহ-গেহারামী গৃহব্রত ব্যক্তির হৃদয়েও গৃহারামাতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীগৌরজন ও শ্রীগৌরজনানুগ বৈষ্ণববৃন্দের পদধূলিতে ও শ্রীধামরজে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে কর্ণে তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিবার জন্য আর্ত্তি ও উৎসাহ উদিত হয়। পরিক্রমার সেবা করিলে একাধারে শ্রীগৌরধামের সেবা, শ্রীনামশ্রেষ্ঠের সেবা, শ্রীগৌরজনগণের সেবা, শ্রীগৌরজনশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা, শ্রীমন্ত্রের সেবা, শ্রীশচীনন্দনের সেবা, শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি গৌরপার্ষদবৃন্দের সেবা, শ্রীমায়াপুরাভিন্ন শ্রীমথুরাদির সেবা, গোষ্ঠবাটিকার সেবা, শ্রীরাধাসরসীর সেবা, শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের সেবা, শ্রীরাধামাধব-যুগলবিগ্রহের সেবা লাভ হইবে। শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেবার দ্বারাই শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবা—শ্রীব্রজধামে বাস লাভের সৌভাগ্য হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি,　　যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস।"

যেমন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকার আছে, সেরূপ শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকারের সৌভাগ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কেশবপ্রমুখ গুরুবর্গ কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। অনধিকারী ও অধিকারী—সর্ব্বপ্রকার জীবগণের জন্য শ্রীগুরুবর্গ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমারূপ শ্রীগৌর-ধামার্চ্চন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্চ্চনে সকলের অধিকার নাই ; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরধামের এই অর্চ্চনে সকলেই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাই আজ আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে সকলকে এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান ও ইহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

ভক্তিপথে পতন নাই

হরিভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। 'স্ব'-অর্থে আত্মা। 'স্বধর্ম্ম' অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম। যাহার যাহা স্বভাব বা বৃত্তি, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। জীব আত্মবস্তু। আত্মার স্বভাবই পরমাত্মার সেবা করা। আত্মার পরমাত্মার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বরূপে প্রীতির যোগসূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত আত্মধর্ম্মে প্রীতি আছে। প্রীতিই প্রিয়ের সর্ব্বতোমুখী সেবা করায়। ভক্তিধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম—প্রীতিময়। আত্মা—প্রিয়, প্রিয় যাঁহাতে প্রীতি করে, তিনি—পরমাত্মা। প্রিয়ের (আত্মার) যে পরমপ্রিয়ের (পরমাত্মা ভগবানের) সেব্য, তাহা পরম মধুর। প্রিয় যে প্রেষ্ঠের প্রীতিবিধান করেন, তাহাতে প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া থাকে। 'প্রিয়স্য চ সেবা-সুখরূপৈব।" (ভঃ সঃ ২ অনু)। প্রিয়ের সেবায় সুখ আছে। প্রিয় প্রিয়ের প্রীতিবিধান করিয়া সুখ না চাহিলেও স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবৎসেবায় স্বাভাবিক আনন্দ বর্ত্তমান। উদ্বুদ্ধস্বরূপ জীব প্রীতির সহিত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের সেবা করেন। সেবায় এত আনন্দ আছে যে, তিনি সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না ; না করিলে প্রাণে কষ্ট হয়, করিলে আনন্দ। এই আনন্দ দেহের সুখ বা মনের শান্তিজনিত আনন্দ নহে, প্রভুর সুখ হইতেছে বলিয়া আনন্দ। জীবসত্তার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নির্ম্মল জীবসত্তা—কৃষ্ণানন্দময়। জীব অণু হইলেও পূর্ণসেবানন্দের অধিকারী। জীব কোনরকমে একবার ভগবৎ-সেবানন্দরস পাইলে আর ছাড়িতে পারে না। সেবারস, প্রীতিরস এত মধুর, এত আনন্দদায়ক! প্রিয়বস্তুর প্রীতিতেই আনন্দ, সুখেই সুখ। ভৃত্যের প্রভুসুখেই

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

আনন্দ। নির্ম্মল, শুদ্ধজীব শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসূত্রে চির আবদ্ধ। প্রভুর সহিত প্রীতির শৃঙ্খলে সর্ব্বদা শৃঙ্খলিত থাকাই স্বরূপাবস্থিতি।

দুর্ভাগা জীবের এই প্রীতিধর্ম্মের বিপর্য্যয় যখন হয়, তখনই দেহের প্রতি প্রীতি হয়। তখন দেহ-মনোধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম হইয়া পড়ে। দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যই স্ব-দেহ ও স্বদেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে প্রীতি হয়। এইজন্যই বদ্ধজীব নিজের ও আত্মীয়-স্বজনাদির সুখে-দুঃখে সুখী-দুঃখী হয়। এইরূপ দেহ-মনোধর্ম্মাসক্ত জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিধর্ম্মোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় সকলকে উপদেশ করিতেছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥' (গীতা ১৮।৬৬)

"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব। 'আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা সকলই সম্পন্ন হইবে'—এই দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। এইরূপে থাকিলে তোমার কর্ম্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। যেহেতু একমাত্র আমাকেই আশ্রয়কারী তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে আমিই মুক্ত করিব।"

শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিই ভক্তির মূল। শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাসই শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি। এই শরণাগতি হইতেই প্রীতিধর্ম্মের উল্লাস হয়, ভক্তি বাড়ে। জীবের বদ্ধাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন হয় না ও আশ্রয়ের সৌভাগ্য হয় না। এইরূপ জীবের জন্যই কৃষ্ণ সাধুগুরুরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাঠাইয়া দেন। ভগবানের কৃপা এজগতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন সাধুগুরুরূপে। যদি কোনপ্রকারে এই সাধুগুরুর অভিনিবেশসহ কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসা যায়, তবেই মঙ্গল। এই সাধুর প্রতি অভিনিবেশ—সাধুর আচরণ বা তাঁহার ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিত হইতে পারিলে পূর্ণতম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। সাধু ব্যতীত ভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। বর্ত্তমানে যে বিমুখতাকে সর্ব্বস্বজ্ঞান হইয়াছে, সাধুগুরুর সঙ্গকৃপাফলে সেই বিমুখতার সর্ব্বনাশ হয়। সাধুসঙ্গফলে যখন দীনতা হইবে, তখন চিত্ত দ্রবীভূত হইবে। দ্রবীভূত চিত্ত হইতে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া অনুভূতি হইলেই প্রাপ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই তিনি গুরু। তিনি কৃষ্ণ দিবার জন্য, কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। কৃপা করাই তাঁহার স্বভাব। এইজন্যই সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণ আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহা শ্রীগুরুবর্গই পূরণ করেন। গুরুদেবতাত্মকেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

ভগবদ্ভজনোন্মুখ সাধক জীব সমস্ত ধর্ম্ম (দেহ-মনোধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভক্ত্যনুশীলন করিলে সাধনপথে কোন বিপত্তি হয় না। অনন্য শরণাগতকে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণই রক্ষা করেন। একান্ত শরণাগত-জনকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হাতে ধরিয়া লইয়া যান, পথে কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে, তাহা দেখাইয়া সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহার মন যদি সাময়িকভাবে এদিক-ওদিকও যায়, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার রক্ষক। প্রাক্তন কর্ম্মফলে চিত্তের অস্থিরতা থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই তাহা ঘুচিয়া যায়। শ্রীগুরুদেবই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতজনকে নানা উপায়ে সংশোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী করেন। অসংযত মনকে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সংযত, শান্ত করেন।

সেই—ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ।
সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে ।
সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে ॥ (চৈঃ চঃ)

ভক্তিপথে পতনের কোন আশঙ্কা নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি নির্ভরতা থাকিলে তাঁহারাই সাধককে পদস্খলন হইতে রক্ষা করেন। ভক্তিপথে চলিতে চলিতে প্রাক্তন কর্ম্মফলে পদস্খলন হইতে পারে, কিন্তু পতন হয় না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৫)

—হে রাজন্! ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মানব কোনকালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধাবমান হইলেও কখনও স্খলন বা পতন হয় না।

সাধুগুরু সহায় থাকিলে ভক্তিপথে কোন চিন্তা নাই। ভক্তিসাধকের যদি শ্রুতি-স্মৃতি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকে এবং তিনি যদি নিষ্কপট সেবক হন, তাহা হইলেও তাঁহার কোন বাধা হয় না। ভক্তিতে বিদ্যা-বুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না। ভক্তিতে অকপট ইচ্ছা, সর্ব্বতোমুখী যত্ন ও ঐকান্তিক প্রীতি থাকিলে আর কোন কিছুর দরকার হয় না। এইরূপ ভক্তিসাধকের ভক্তিপথে চলিতে চলিতে যদি সিদ্ধির পূর্ব্বেই দেহপাত হয়, তাহাতেও তাঁহার ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না। এ জন্মে যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, পরজন্মে আবার সেখান হইতেই আরম্ভ হইবে।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজনপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

তত্র ক বাভদ্রমভুদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ (ভাঃ ১।৫।১৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন আরম্ভ করিয়া অপক্ব-দশায়ই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু অমঙ্গল হয় না। পক্ষান্তরে শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন ব্যতীত কেবল স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারাও কোন ব্যক্তির প্রয়োজন লাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৯শে পৌষ, ১৪০৯ (ইং ১৪।১।২০০৩), মঙ্গলবার পুত্রদা-একাদশী-তিথি ও মকর সংক্রান্তি-তিথিতে

রাত্রি ১১ টায় **শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ** নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আমাদিগকে অকূল বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করত প্রয়াণকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। অপ্রকট-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১১৪ বৎসর। তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়া-কলাপ আমরা আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

১লা মাঘ, বুধবার বেলা ১২ ঘটিকায় যথারীতি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর প্রসাদী-মাল্য শ্রীমৎ রাদ্ধান্তী মহারাজকে অর্পণ ও আরতি করিয়া শয়নদোলাসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রাসহ জাহ্নবী-পুলিনে "শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে" লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

সমাধির স্থান যথারীতি প্রস্তুত হইলে আশ্রমবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে সাত্বত-বিধানানুযায়ী সৎক্রিয়াসার-দীপিকাবলম্বনে বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে সমাধিকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে তিনি শ্রীনামদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক **শ্রীভাগবতপ্রসাদ ব্রজবাসী**-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৬৯ (ইং ১১।৩।১৯৬৩), সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-বাসরে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ গ্রহণপূর্ব্বক **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ**-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেকালে বয়সে প্রবীণ হইলেও সেবায় তিনি তারুণ্যোচিত উৎসাহশীল ছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর তিনি শ্রীসমিতির শাখামঠ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুঁড়ায় বহুদিন যাবৎ ভাণ্ডারী হিসাবে সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীসমিতির শাখামঠ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে বহুদিন যাবৎ মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহিত তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যেও যাইতেন। তাঁহার সহিত কখনও কাহারও মনোমালিন্য হইতে দেখা যায় নাই। তিনি সৎ, সরল ও আদর্শপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্তিমকালে প্রায় ১০ বৎসর তিনি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানপূর্ব্বক সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সেবাপ্রচেষ্টা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে মুগ্ধ করিয়াছে।

গৌড়ীয়ের পঞ্চপঞ্চাশৎ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঞ্চপঞ্চাশৎ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের অন্তর্দ্ধানে আমরা আজ বড় অসহায় বোধ করিতেছি। জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অভাব ও অবদান অতুলনীয়। দেশের চতুর্দ্দিকেই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবে মানুষ আজ বিভ্রান্ত ; প্রতিনিয়ত হিংসা, লুণ্ঠন ও ঠাণ্ডামস্তিকে নরহত্যাদি আজ মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়াছে। দেশের কল্যাণকামী মনীষিগণ তজ্জন্য নানারূপ প্রতিকারের সন্ধান করিয়াও বিফলমনোরথ হইতেছেন। এই অশান্ত পরিবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই যেন তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। কিন্তু হায়! "ঔষধের ঔষধ কোথা পাই?"

দেশের এই অশান্ত পরিবেশে পারমার্থিকগণ ব্যতিরেকভাবে ধর্ম্ম, নীতি ও আদর্শের অধিক উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা জড়বাদের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাস্তব-সত্যের প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। 'সজ্জনা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

গুণমিচ্ছন্তি", "পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদাঃ"—বাক্যানুসারে সজ্জনগণ বিবিধ জাগতিক অমঙ্গলের মধ্যে থাকিয়াও পরম-মঙ্গলের সন্ধান লাভ করেন ; ইহাই তাঁহাদের সাধু-বৃত্তি। তত্ত্বদর্শী মহাভাগবতগণের ইহাই সমদর্শন বা সু-দর্শন। জড়দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি ত্রিতাপকে তাঁহারা ভগবদ্ভজনানুকূল বলিয়াই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। জড়ীয় ভাল-মন্দের অতীত হওয়ায় তাঁহারা নির্গুণ—প্রকৃতির পরপারে তুরীয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

শব্দব্রহ্মের জয়-গানকারী শ্রীপত্রিকা বৈকুণ্ঠবার্ত্তাই জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবসত্যের নির্ভীক প্রচারক হওয়ায় ইহাতে দেহ-মনোধর্ম্মের কথা না পাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ইহার প্রতি হয়ত' বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি।।"—মহাজনগণের বিচারাবলম্বনে শ্রীপত্রিকার সেক্ষেত্রে উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নাই। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।" গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের সঙ্গ যতই প্রীতি-প্রদ হউক না কেন, উহা পরিত্যাগ করাই গুরুসেবৈকনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ।

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রাকৃত সংবাদপত্রের ন্যায় পাঠক-পাঠিকাগণকে জড়বিষয়ে ভোগোন্মুখ করিবার পরিবর্ত্তে হরিকথা পরিবেশনদ্বারা নিবৃত্তিমার্গে ও ভগবদ্ভজনে প্রেরণা দান করেন। ইহা নবনবায়মানরূপে সকলের নিকট প্রকটিত, কারণ অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীগোপীনাথ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধারাণীসহ পরিকরাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই শ্রীপত্রিকার নিষ্ঠা। অপ্রাকৃত কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আলোচনায় হরিভক্তি লাভ হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব-মহাজনগণের রচনাদির অনুশীলনদ্বারা শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূতা হয়। জীবের নিত্যধর্ম্ম আলোচনাই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত।

ভগবৎস্মরণই প্রেমিকভক্তের আচার ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই তাঁহার প্রচার। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে শ্রীনামপ্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে প্রচারক্ষেত্রেও কি একই নির্দ্দেশ পালনীয়? অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া শ্রীনাম-উপদেশ কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। নিঃস্বার্থ আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তিগণই শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের উপযুক্ত পাত্র। ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ, পদাবলী রচনা, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিও ধর্ম্মপ্রচারের অন্তর্গত। ভক্তি-সদাচার প্রবর্ত্তনও প্রচারের অঙ্গবিশেষ। বাস্তবসত্য-প্রচারক নির্ভীক, নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ নীতির পরিপোষক। শ্রীশ্রীগুরু-নিত্যানন্দপ্রভুর উপদিষ্ট মতবাদ যাহাতে দুষ্ট কপটীগণের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তাহার প্রতিরোধ চেষ্টাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ। ভাল-মানুষ সাজিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম্মপ্রচার হয় না। তাহাতে নিরন্তকুহক নিত্যমঙ্গলকর বাস্তবসত্য প্রচারের সম্ভাবনা কোথায়? শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীনাম-মহিমাই জগতে

বিঘোষিত করেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞানুসারে জীবকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক নবধাভক্তির যাজনদ্বারা স্বীয় অধিকারভেদে প্রথমে বিধিমার্গে, পরে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ করেন। দশ অপরাধশূন্য হইয়া এবং লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটী অনাচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-গ্রহণ করিলে শ্রীনামপ্রভুই সাধকের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধস্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীপত্রিকার ইহাই আদর্শ, আচার-প্রচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"—বিশ্বের সর্ব্বত্র যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া জানাইয়াছেন,—"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতিশীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।**"

তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমঙ্গল কামনা করিয়া বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে **তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন।** * * সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোত প্রবাহিত হউক্, **পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক্, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক্, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, সমস্ত জগৎ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক্।**"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর জয়গানদ্বারা শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভযাত্রা সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ও কৃপাশীষে সাধন-ভজন-বিষয়ে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হউক্ ও উৎসাহের সহিত রূপানুগ গুরুবর্গের আদেশ-নির্দ্দেশ প্রতিপালনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি—ইহাই একমাত্র সকাকু প্রার্থনা। নির্ভীককণ্ঠে ও নিরপেক্ষভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার ও রূপানুগ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি—ইহাই আজিকার দিনে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়—

"যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবদ্ধো,
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।
ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা,
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।।"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ ফাল্গুন, ১৪০৯ ; ১৫ মার্চ্চ, ২০০৩

FORM–IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication–Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

2. Periodicity of its Publication–Last day of every Bengali month, i.e. once in a month.

3. Printer's name–Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

4. Publisher's name–Do
   Nationality–Do
   Address–Do

5. Editor's name–Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj
   Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
   Address–Shri Devananda Goudiya Math,
   Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the capital,– Tridandi Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Swami Bhakti Vedanta Acharyya hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ *Swami B. V. Acharyya*

Dated 28.2.2003 _____ Signature of Publisher

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ২৭ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, সোমবার, ১৪০৯, ইং ১৪/৪/২০০৩ { ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীব-কৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রদশকম্‌"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমেঽধ্যায়ে—২৯-৩৮]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণা বিদুঃ ॥১॥

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরম-পুরুষ এবং জগতের মূলনিমিত্ত ও উপাদান-কারণ । ব্রহ্মবিদ্‌গণ ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্‌" প্রভৃতি বেদ-বাক্যাবলম্বনে) এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন ॥১॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ ।
ত্বমেব কালো ভগবান্‌ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥২॥

(হে ভগবন্‌,) সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি । আপনিই বিষ্ণু, অব্যয়, ঈশ্বর ও কাল-স্বরূপ (নিমিত্ত-কারণ) ॥২॥

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজসত্ত্বতমোময়ী ।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥৩॥

(হে ভগবন্,) আপনিই ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্ম প্রকৃতি ; আপনিই মহত্তত্ত্ব (কার্য্য-স্বরূপ), আপনি অন্তর্যামী ; সুতরাং সর্ব্বভূতের চিত্ত-জ্ঞাতা এবং পুরুষস্বরূপ (তাৎপর্য্য) এই যে, বস্তু—ভগবান্, বস্তুশক্তি—প্রকৃতি, বস্তু-অংশ—পুরুষ, বস্তুকার্য্য—মহান্ সকলই শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে বাস্তববস্তু, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব-বিচারে ঐগুলি অভিন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—পরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে) ॥৩॥

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥৪॥

(যদি আমিই সর্ব্ব, তাহা হইলে ঘটাদি প্রাকৃত বস্তু-জ্ঞানে মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হয় না কি?) যদি হয়, তাহা হইলে সকলেই ত' ব্রহ্মবিৎ—এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা)—দ্রষ্টৃস্বরূপ আপন দৃশ্যরূপে বর্ত্তমান প্রকৃতিজাত বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির গ্রাহ্য নহেন। (তবে কি জীবাত্মা আপনাকে জানিতে সমর্থ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) গুণময় দেহে আবদ্ধ (কোন্ জীব তদীয় কারণরূপে তদুৎপত্তির পূর্ব্বে স্বতঃপ্রকাশ স্বরূপে বর্ত্তমান আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে)? ॥৪॥

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥৫॥

(হে ভগবন্,) স্বতঃপ্রকাশ গুণের দ্বারা আপনার মহিমা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আপনি প্রাকৃত সৃষ্টির কর্ত্তা সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্, বাসুদেব (চতুর্ব্যূহের আদি) এবং সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥৫॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৬॥
স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥৭॥

প্রাকৃত শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেইসকল অনুপম-গুণযুক্ত বীর্য্য দর্শনে লোকসকল তাহাদের মধ্যে যে প্রাকৃত শরীররহিত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করিতে পারেন, আপনিই সেই সর্ব্ব-কল্যাণদাতা মহাপুরুষ, সম্প্রতি সমস্ত জীবের সম্পদ্ এবং মোক্ষ প্রদানের জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥৭॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

নমঃ পরম-কল্যাণ নমঃ পরম-মঙ্গল ।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥৮॥

হে পরমকল্যাণ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে পরমমঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৮॥

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচর-কিঙ্করৌ ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥৯॥

হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর মহাদেবের ভৃত্য। সম্প্রতি আমাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। মহর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমাদের আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হইল ॥৯॥

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস-জগৎ-প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥১০॥

অতঃপর আমাদের বাক্য আপনার গুণ-কীর্ত্তনে, শ্রবণযুগল আপনার গুণ-শ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার প্রীতিজনক কার্য্যে, মন আপনার পাদপদ্ম-স্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে এবং চক্ষু আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক ॥১০॥

সম্বন্ধ-বিচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠার পর]

নর-সত্ত্বায় অবস্থিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-সমূহের স্বরূপ ও তত্ত্ব-বিচার

সপ্তধাতুনির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব ও চৈতন্য—এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্ত্বায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক।

জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্ত্বায় শরীর-গত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়—তাহার নাম ইন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-

প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা মন বলি। ঐ মনের চিত্ত-বৃত্তি-ক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তি-ক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তিদ্বারা বিষয় জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি-ক্রমে লাঘব-করণ এবং গৌরব-করণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয় সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নর-সত্ত্বায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহং ভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্ত্বার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং এ মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নরসত্ত্বার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম **অহঙ্কার**।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়-জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্ত্বা ভূতমূলক হয় না। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়-জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়া-পরিচয়। এই চৈতন্য ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়?

চেতন আত্মার জড়ানুগত্যই দণ্ড-স্বরূপ

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যসত্ত্বা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ-অবস্থাকে চৈতন্য-সত্ত্বার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

মুক্ত আত্মা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি চিদাভাস-সঙ্গশূন্য

এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়—এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ-বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা-বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য—যে শুদ্ধ আত্মার জড় সন্নিকর্ষে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস, আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না।

আত্মা, মন ও শরীর লইয়াই মনুষ্য-তত্ত্ব

অতএব নরসত্ত্বায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ 'আত্মা', 'আত্মা ও জড়ের

সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র' ও 'শরীর'। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ শরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরাণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব চিদানন্দ-স্বরূপ। 'অহঙ্কার' হইতে 'শরীর' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সত্ত্বা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা ভিন্ন।

প্রাকৃতচিন্তা দূরীভূত হইলে শুদ্ধ-আত্মোপলব্ধি হয়

শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ শুদ্ধজীবের সত্ত্বা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

আত্মার দ্বাদশ লক্ষণ

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।।
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ।।

(ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। **অব্যয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। **শুদ্ধ** অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব-রহিত। এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব-রহিত। **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা। **আশ্রয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্ত্বা বিস্তার করে। **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার-রহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক্** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে ; প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয় নয়। **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্ত্বা,

ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলক নয়। **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্ত্বা নাই। **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণ-সঙ্গী নয়। **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহজনিত অহং-মম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

আত্মতত্ত্ব-বিচারে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত ও তাহা প্রাকৃত চিদাভাস-নিষ্ঠ

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিক সত্ত্বা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই সদাভাসনিষ্ঠ, চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত, তন্মাত্র, চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত দেশ-কাল-তত্ত্বের বিচার

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্ত্বা-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে-সকল সত্ত্বা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্ত্বাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্ত্বা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ ও কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশ-কাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে ; ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার।

বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব ও আত্মার আবরণ

শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **সূক্ষ্ম অস্তিত্ব**, চিদাভাসিক অসিত্ব অর্থাৎ **লৈঙ্গিক অস্তিত্ব** এবং ভৌতিক অর্থাৎ **স্থূল অস্তিত্ব**। স্থূলবস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব (সূক্ষ্মাস্তিত্ব হইতে) কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

শুদ্ধ আত্মার কলেবর ও ক্রিয়া-পরিচয়

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ দেশকাল-নিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্ত্বা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মিক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস-কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেন না উহা প্রকৃতি অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণসমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, কিন্তু সূক্ষ্ম-দেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থদ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্ত্বা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন, ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্ত্বায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা—তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাববিশেষ। যেমন জীব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সে সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তি-রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধচিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১০ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—শ্রেয়ঃপথে কি বিঘ্ন থাকেই?

উঃ—প্রেয়ঃকামী বর্ত্তমানে সদ্য সদ্য কোন অসুবিধায় পড়েন না ব'লে মনে হয়। কিন্তু শ্রেয়ঃকামীর বর্ত্তমানে কিছু অসুবিধা দেখা যায়, সেই অসুবিধাটুকু স্বীকার কর্‌তে হবে। ঐরূপ অসুবিধা স্বীকার করাকে সহ্যগুণ বলা হয়।

প্রঃ—বিবর্ত্ত কাহাকে বলে?

উঃ—যে বস্তু যাহা নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে ধারণা করার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম।

শরীরটাই আমি—একথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন না। তিনি বলেন—দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।

দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহী Proprietor (মালিক) আর দেহ হ'ল property (সম্পত্তি)। দেহ দুই প্রকার—Subtle and Gross (সূক্ষ্ম ও স্থূল)। এই দুই দেহের Ownership (মালিকানা-স্বত্ব) আত্মার। মন চেতনাভাস, দেহ চেতনবিহীন। এই দুই প্রকার দেহে আমরা 'আমি-বুদ্ধি করি—ইহাই বিবর্ত্ত বা misconception।

প্রঃ—চেতন ও অচেতনে ভেদ কি?

উঃ—অচিদ্ বস্তু—অচেতন বস্তু—জড় বস্তু initiative নিতে পারে না। তা'র knowing (জ্ঞানশক্তি), willing (ইচ্ছাশক্তি) এবং feeling (অনুভব-শক্তি) নাই। জড় বস্তু respond কর্‌তে পারে না, কিন্তু চেতন তা' পারে। আমাদের ভিতর, পশুর ভিতর চেতন আছে, বৃক্ষের ভিতর অল্পমাত্রায়।

প্রঃ—মানুষ কি পর-জগতের কথা বল্‌তে পারে?

উঃ—পরজগৎ হ'তে আগত ব্যক্তিই পরজগতের কথা বল্‌তে পারেন। এ জগতের কোন লোক পরজগতের কথা বল্‌তে পারে না। পরজগৎ হ'তে আগত মহাপুরুষের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শুন্‌বার সৌভাগ্য হ'লেই জীব বৈকুণ্ঠের সন্ধান পায়। ইহজগতের বিচার-প্রণালীদ্বারা পরজগতের বস্তু গ্রহণ করা যায় না। Transcendental এর (অধোক্ষজের) সহিত Phenomenal (অক্ষজ) এক করা উচিত নহে। কপাল ভাল হ'লে বৈকুণ্ঠ হ'তে আগত মহাপুরুষের সন্ধান মিলে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে।। (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

প্রঃ—সকলে পরমার্থ-কথা ধর্‌তে পারেন না কেন?

উঃ—ভাগ্য না থাক্‌লে কি ক'রে ধর্‌বে? সংস্কার থাকা চাই ত'? যাঁরা ভাগ্যবান্ তাঁরা প্রণত হ'য়ে এসব কথা শুনেন, তাই তাঁরা ভগবৎ-কৃপায় বুঝ্‌তে পারেন। আর যারা Hasty-conclusion-এ (দ্রুত সিদ্ধান্তে) উপনীত হয়, তা'রা সত্যবস্তু-গ্রহণে অসমর্থ। পূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তারা অল্প সময়ও দিতে পারে না। আমরা বাল্যকাল হ'তে যে সমাজে লালিত-পালিত, তা'তে materialism (জড় ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও দিতে পারি না ব্যবহারিক কার্য্যেই আমাদের ২৪ ঘণ্টা ব্যয় হয়ে যায়। নিজে যে কি বস্তু, তা' জান্‌বার জন্য চেষ্টা করি না। কিন্তু মানবজীবনের ২৪ ঘণ্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে—তিনি তাঁর অমূল্য জীবন নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন।

প্রত্যেক নিজ নিজ মঙ্গল অনুসন্ধান কর্‌বেন—স্বার্থপর হবেন। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোক অপস্বার্থে—ইতর কার্য্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহরক্ষার জন্য যে অনুক্ষণ যত্ন করে, তা'তে নিজের স্বার্থে উদাসীনতা দেখা যায়। জগতের লোক জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহের জন্য নিত্য স্বার্থে উদাসীন, কি দুঃখ!

কেহ কেহ বলেন—বর্ত্তমান স্বার্থের জন্য—আত্মার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা আবশ্যক নহে। ভবিষ্যতের কথা—'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে'; পরন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা না কর্‌লে যৌবনে অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয়।

যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত (মঙ্গলের সহিত) অপরের বাস্তব স্বার্থ বা মঙ্গল চিন্তা কর্‌বেন। চেতনের ধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা যাহাতে ভোগাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বল্‌তে পারেন, পাপকার্য্য ত্যাগ ক'রে পুণ্য করা উচিত ; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ হ'লে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে বিচার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পরাঙ্মুখ হ'লে আমরা অসুবিধায় পড়্‌ব। কালে কার্য্য কর্‌লে ভবিষ্যতে লাভ হয়।

সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না কর্‌লে অসুবিধা হয়। বৃদ্ধকালে পরলোকের আলোচনা কর্‌বার অভিলাষী ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকায় কোন উপকার পায় না।

প্রঃ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি নিত্য?

উঃ—প্রত্যেক জীব-মাত্রে বাহিরের খোলসকে (খামকে) আত্মা ব'লে মনে

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

করেন। আমি নিত্য ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। আমি বর্ণী বা আশ্রমী নহি, সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আমার নিত্যধর্ম্ম কি ক'রে হবে? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হ'লে ইহ ও পরলোক সুবিধা হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী, চতুর্দ্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতিতে ইহার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু নিত্য জগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধ, ভগবান্‌কে না ভুল্‌লে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়।

ভগবান্ চেতন, জীবও চেতন। জীব ভগবানের অংশ, জীব ভগবানের ন্যায় বিভুচেতন নহে, জীব অণুচেতন ; জীব ভগবানের অধীন।

বর্ত্তমানে জীব চেতনের বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে দুর্গতি লাভ ক'রেছে। ভগবৎ-সেবা হ'তে বিচ্যুত হয়েই আমাদের দুর্গতি এবং তাঁহার সেবা হ'তেই সুবিধা। (ক্রমশঃ)

সন্দর্ভ-সার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

[কৃষ্ণসন্দর্ভ—২৯]

দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। এ সকল তাঁহার আধারশক্তি-লক্ষণ বিভূতি-স্বরূপ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"স ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী" ইত্যাদি ; অর্থাৎ "হে ভগবন্, সেই ভূমান্য শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত? তিনি নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। গোপালপুরী সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম"—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবিচ্ছেদে লীলা করেন। প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে তাঁহার স্পর্শ-সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং তাহারা তাঁহাকে ধারা করিতে পারে না। প্রকট-লীলায় কখনও কখনও যে অন্যত্র গমনাগমন শুনা যায়, সেই সেই স্থানে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ স্থানসমূহের আবেশ হেতু তাহা সম্ভব হয় ; অর্থাৎ দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মিথিলায় গমন করেন, তখন দ্বারকা ধাম মিথিলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন—সর্ব্বত্রই এই প্রকার জানিতে হইবে।

যদিও তাঁহার অপ্রকটলীলায় বাল্যাদিভাবও আছে, তথাপি কিশোর আকারেরই মুখ্যত্বহেতু সেই আকার আশ্রয় করিয়াই সমস্ত লীলা প্রবর্ত্তিত হয় ; আর প্রকট-

লীলাও অপ্রকট-প্রকাশস্থিত কিশোর আকার আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন—এই তিন স্থানেই যুগপৎ একই কিশোরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের অগোচরে নিত্যলীলামনন ভূভার-হরণাদি আনুসঙ্গিক কার্য্য করিলেও পরিকরগণের আনন্দ-চমৎকারিতা পোষণার্থ এই জগতে লৌকিক রীতি-সংযোগে অপূর্ব্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ডাদি লৌকিক লীলা প্রকট করেন। তথায় দ্বারকাদি ধামে নিজ নিত্যাবস্থিত কৈশোরাদি বিলাস সম্পাদনের জন্য যাদবাদি পরিকরগণের সহিত প্রকাশান্তরদ্বারা বিহার করেন ; অতঃপর বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বসুদেবের মত প্রকাশান্তরে অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করত ব্রজের সহিত ব্রজরাজ গৃহেও আগমন করেন। ব্রজরাজের হৃদয়ে অনাদিকাল সিদ্ধা কৃষ্ণবিষয়িণী বাৎসল্য-মাধুরীকে নবীভূত করিবার জন্যই ব্রজরাজ-গৃহে জন্মগ্রহণ লীলা প্রকাশ করেন। তথায় অবস্থান করিয়া গোকুলজনের অন্তর্বহির্নিশ্রয়কে নিরতিশয় বশীভূত করিয়া তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীবসুদেব প্রভৃতিকে আনন্দিত ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য মথুরায় প্রস্থান করেন। তৎপর দ্বারকাধামকে প্রকাশ করিবার জন্য তথায় লীলামাধুরী পরিবেশন করেন ; অতঃপর প্রসিদ্ধ লীলাসমূহ সিদ্ধ হইলে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রকট লীলাকাল একাদশ বৎসরব্যাপী। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ।। (ভাঃ ৩।২।২৬)

সচরাচর পঞ্চদশবর্ষ বয়সে কৈশোর প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অল্পকালমধ্যেই কৌমার অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৈশোর-কাল গোকুলে স্থিতি ; তৎপর মথুরা ও দ্বারকালীলা। মথুরার প্রকটলীলা দ্বারকায় অনুগমন করে।

কংসবধের পর কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ যাত্রা ; তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে বসুদেব কুন্তীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ।। (ভাঃ ১০।৮২।২১)

অর্থাৎ, "হে ভগিনি, আমরা কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি দৈবকর্ত্তৃক পুনরায় নিজ নিজ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।

তৎপরে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ ; তাহাতে শিশুপাল বধ, তদনন্তর পাশা খেলা, দন্তবক্রবধ, পাণ্ডবদের বনগমন, শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও দুর্য্যোধন-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

বধাদি লীলার ক্রমবর্দ্ধন করিয়াছে। দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন।

দ্বারকার রাজবেশী কৃষ্ণ বৃন্দাবন আসিয়া গোপবেশ ধারণ করেন। এই বেশেই ব্রজবিহার। দন্তবক্র-বধান্তে তিনি যমুনা পার হইয়া ব্রজে আসেন। গোপবেশের বস্ত্রাদি সঙ্গে আনেন নাই ; কিন্তু বৃন্দাবন-ভূমি স্পর্শমাত্রই গোপবেশে তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারাই সজ্জিত হন। বৃন্দাবনে গোপবেশ, পুরীদ্বয়ে রাজবেশ। ব্রজে দুইমাস প্রকটলীলার পরে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ। দুইমাস প্রকট-লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহার্ত্তিভয়ে পীড়িত দেখিয়া যাহাতে পুনরায় বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্য তাঁহাদের নিকট নিজ গোকুলাখ্য পদ আবির্ভাব করাইলেন। প্রকট-লীলাতে ভূভার-হরণাদি প্রয়োজন থাকে ; কিন্তু অপ্রকট-লীলা বহিরঙ্গ জনের জানা অসম্ভব বলিয়া তাহাতে বিরহ-সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহব্যাধি-বিরহিত নিজ নিত্যস্থান প্রদানপূর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অন্যপ্রকাশে দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ ব্রজাগমন স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু পাদ্মোত্তর খণ্ডে তাহার উল্লেখ আছে। তাহার উদ্দেশ্য—শ্রীশুকদেব বহির্ম্মুখ জনগণের নিকট ইহা গোপন করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"পরোক্ষবাদো ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্।" (ভাঃ ১১।২১।৩৫)

অর্থাৎ, "ঋষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষ আমার প্রিয়।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোকুলেই প্রকাশাতিশয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যগত, কারুণ্যগত, মাধুর্য্যগত ও লীলাগত—এই চতুর্ব্বিধ প্রকাশ। ব্রহ্মমোহনলীলায় ঐশ্বর্য্যগত প্রকাশ ; পূতনাকে মাতৃগতিদানে কারুণ্যগত প্রকাশ, অর্থাৎ অশেষ দোষদুষ্টার প্রতিও করুণা করা ; ব্রজস্ত্রীগণে, পুলিন্দগণে, ব্রজের তৃণলতাদিতেও মাধুর্য্যগত প্রকাশ আর লীলাগত প্রকাশ—মথুরায় বসুদেব-দেবকী যে লীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, তাহা ব্রজরাজ দম্পতি আস্বাদন করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীশুকদেবের উক্তি,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।। (ভাঃ ১০।১৪।৩২)
ইত্থং সত্যং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃত পুণ্যপুঞ্জাঃ।।
(ভাঃ ১০।১২।১১)

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথাসারস্য।। (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

অর্থাৎ, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য তাহা বর্ণনাতীত।

যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম-সুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে বর্ত্তমান, গোপবালকগণ তাঁহারই সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে কেবল ব্রজবাসিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণেরই দেহধারণ সার্থক ; যেহেতু নিরুপাধিক প্রেমাস্পদ সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণে ইঁহারা অদ্ভুত রূঢ়ভাবসম্পন্ন অর্থাৎ পরম-প্রেমবতী। সংসারভয়ে ভীত মুনিগণ, মুক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী আমরা (উদ্ধবের উক্তি) পর্য্যন্ত মহিমাদৃষ্টিতে যে ভাব বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাই না, সেই মহাভাব সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজবধূগণ। অপরিসীম মাধুর্য্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ব্যক্তিগণের ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় (ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য) জন্মদ্বারাই বা কি অথবা চতুর্ম্মুখ-জন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচরণামৃত-মাহাত্ম্য

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদজল সামান্য জলমাত্র নহে, উভয়ই অমৃতস্বরূপ, তাই শাস্ত্র উভয়কে 'শ্রীচরণামৃত' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। কলিমলনাশক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে যাহার জলবুদ্ধি বর্ত্তমান, সে নারকী। "বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ যস্য বা নারকী সঃ" (পদ্মপুরাণ)। শ্রীচরণামৃত-মাহাত্ম্য নিখিল শাস্ত্রেই বিদিত। সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করা সম্ভব হইলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্ত মহিমা কেহ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ নহে। এই চরণামৃতরূপ অমূল্য মণির সহিত অন্য কিছুরই কখনও তুলনা হয় না। যিনি বিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি নির্ভয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। কলিকালে শ্রীহরির পাদোদক স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হইয়া থাকেন। অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃত সেবনের দ্বারা সংসারদাবাগ্নি অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হরিভক্তিসুধোদয়ে পাওয়া যায়,—"পবিত্র হরিপদকমলের পাদ্য যুদ্ধাস্ত্রে পক্ষে অভেদ্য কবচস্বরূপ, ইহা সংসারানলের স্তম্ভনকারী ঔষধ বিশেষ।" বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিলে যাবতীয় উৎপাতের শান্তি, সকল পাপ নিবারণ, সকল কামনার ফলপ্রাপ্তি, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ, সকল শত্রু বিনাশ, যশঃপ্রাপ্তি, সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্।।
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"শ্রীচরণামৃত আশুফলপ্রদ, সর্ব্বপুণ্যদায়ক, সর্ব্বপাপবিনাশক, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বদুঃখবিনাশক, দুঃস্বপ্ননাশক, সর্ব্বোপদ্রব-শান্তিকর, শুভদায়ক ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক।"

বিষ্ণুপাদোদক পানই জীবের পরমধর্ম্ম, উহাই শ্রেষ্ঠ তপঃ এবং উহাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই প্রসঙ্গে বৃহন্নারদীয় পুরাণের লুব্ধকোপাখ্যানরম্ভে পাওয়া যায়,—

হরিপাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা।।

"যিনি শ্রীহরির চরণামৃত ক্ষণমাত্র ধারণ করেন, তাহার সকল তীর্থে স্নান করা হয় এবং তিনি বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।" সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রীচরণামৃত সর্ব্বদাই অধিক পবিত্র। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত পান সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

স্কন্দপুরাণে শিব-কার্ত্তিকেয় সংবাদ হইতে পাওয়া যায়,—

প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি।।

,"পবিত্র বিষ্ণুচরণোদক পান করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ দান, উপবাস, চান্দ্রায়ণ কিংবা তীর্থসেবা করিবার কি প্রয়োজন?" পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ।।

"বিষ্ণুর পাদোদক মস্তকে ধারণ ও পান করিলে সর্ব্বদেবতারই প্রীতি হয়, কলিকালে হরির চরণোদক পানেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।" যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, পার্ব্বতী সকলেই প্রসন্ন হন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু এই চরণামৃতের মাহাত্ম্য জানেন। তাই তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। মানব শ্রীচরণামৃত পানে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লুব্ধক-নামক ব্যাধ মুনিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চরণামৃত স্পর্শলাভ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন দেখা যায়। স্কন্দপুরাণে শিব-উমা-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

পীতে পাদোদকে বিষ্ণোর্যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
হত্বা যমভটান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ।।

বিষ্ণু-পাদোদক পানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণের সম্মুখেই বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়।" স্কন্দপুরাণেই যম দূতগণকে বলিয়াছেন,—"যে-সকল ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদকে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে সুদূর হইতেই ত্যাগ করিবে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদের মধ্যে পাওয়া যায়,—"যাঁহারা চরণামৃত মস্তকে ধারণ ও পান করেন, তাঁহাদের কোন জন্মাশৌচ কিংবা মৃতাশৌচ থাকে না। সদাচারবহির্ভূত অর্থাৎ অপেয়পায়ী, অভোজ্যভোজী, অগম্যাগামী ও সর্ব্বদা পাপস্বভাব ব্যক্তিকেও অন্ততঃ মৃত্যুকালে যদি বিষ্ণুপাদোদক পান করান যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও সদ্‌গতি লাভ করেন।"

শত শত পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিও হরির চরণোদক পান করিলে নিস্তার লাভ করে সন্দেহ নাই। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও সংসার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্।। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

"শুভ হরিপাদোদক অকালমৃত্যু, সর্ব্বব্যাধি ও সকলপ্রকার দুঃখ বিনাশ করে।" পদ্মপুরাণে যম মহারাজ ধূম্রকেতুকে বলিয়াছেন,—"যিনি চরণামৃত বিন্দুমাত্র পান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।"

পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে পাওয়া যায়,—"যে গৃহে নিত্য হরিপাদোদক বর্ত্তমান, তাহার অক্ষয় পুণ্য জন্মে এবং পুত্রগণের গয়ায় পিণ্ডদানতুল্য ফললাভ হয়। মৃত্যুকালে মস্তকে, বদনে ও অঙ্গে হরিচরণোদক স্পর্শ করা হইলে কোটীপাপে লিপ্ত পাপীকেও আর যমালয়ে গমন করিতে হয় না।" যিনি প্রত্যহ চরণামৃত পান করেন, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—"যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিন্দুপরিমিত চরণামৃত পান করেন, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। তিনি যাবতীয় নরকক্লেশ ও গর্ভবাসদুঃখ ভস্মীভূত করিয়াছেন।" অগস্ত্যসংহিতা বলিয়াছেন,—"যাহারা শ্রীচরণামৃত পান করেন, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিতে হয় না।"

শ্রীহরির চরণামৃতের ন্যায় ভক্ত-চরণামৃতের মহিমাও অসীম। ভক্ত-চরণামৃত সর্ব্বতীর্থস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার অশুভবিনাশক ও পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ—এই তিনটী সর্ব্বসাধনের বল। ভক্ত ও ভগবানের পরম পবিত্র চরণামৃত পান করিয়া আচমন করিতে নাই, আচমন করিলে অপরাধ হয়। এই সম্বন্ধে গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন,—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।।

"বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পানান্তে অজ্ঞানবশতঃ আচমন করিলে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া পরিগণিত হয়।" স্কন্দপুরাণে শিবের উক্তি,—

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।।

"বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া অশুদ্ধিবিবেচনায় অজ্ঞানবশতঃ মুখ ধৌত করিলে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া নিরূপিত হইতে হয়।" শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ভগবান্ পবিত্রং, ভগবৎ-পাদৌ পবিত্রং, ভগবৎ-পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ম্।" অর্থাৎ 'ভগবান্ পবিত্র, তাঁহার চরণযুগল পবিত্র, তাঁহার পাদোদক পবিত্র, ঐ পাদোদক পান করিয়া আচমন করিতে নাই।" বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুর পাদোদক পানদ্বারা কোটিসংখ্যক হত্যাজনিত পাপ ধ্বংস হয়, ঐ চরণামৃত বিন্দুমাত্র ভূমিতে নিপতিত হইলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়।" চরণামৃত যিনি পান করেন, তিনি সকলেরই প্রণম্য। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—"যিনি শ্রীহরির চরণামৃত পান করিয়াছেন, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করা উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত অগ্রে বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া পরে প্রণামপূর্ব্বক প্রথমতঃ পান ও পরে মস্তকে ধারণ করা—ইহা সকল শাস্ত্রের বিধি। ভক্ত ও ভগবানের চরণামৃত হরিভজনের প্রধান সহায়ক। ইহা শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দুর্ল্লভা ভক্তি লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

অলৌকিক

অনেক সময় কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা এমন যে মানব মেধা ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে না, বিস্ময় লাগে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা সংঘটিত হয়। সেইসকল কিছু অলৌকিক কাহিনী এই প্রবন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

[১]

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবলসখা। অম্বিকা কালনায় ইঁহার শ্রীপাট। ইঁহাদের আসল পদবী ঘোষাল। ইঁহারা ছয় ভাই ছিলেন। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের দুইটী কন্যা—বসুধা ও জাহ্নবা। ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

এই গৌরীদাস পণ্ডিতের অলৌকিক মহিমা। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন হরিনদী গ্রাম হইতে নিজে বৈঠা চালাইয়া গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকা কালনায় গৌরীদাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"গৌরীদাস! আমি এই বৈঠা চালাইয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিলাম। এই বৈঠাটী তোমাকে দিলাম। তুমি জীবকে ভবনদী হইতে পার কর।" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গৌরীদাসের মধ্যে মহাশক্তির উদয় হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে গৌরীদাসের গৃহের সম্মুখে একটী তেঁতুলগাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। গৌরীদাস প্রভুর দর্শনে ভাবে গদগদ হইয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে প্রভুপানে তাকাইয়া কহিলেন,—"প্রভো! আর আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না। তোমাকে এখানে চিরদিনের জন্য থাকিতে হইবে।" তাহার নিকটে একটী নিমগাছ ছিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি সেই নিমগাছের কাঠ হইতে নিজের ও নিত্যানন্দ প্রভুর দুইটী বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। গৌরীদাস বিগ্রহদ্বয়কে ভোগ নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ভক্তবশ। তাঁহার অনন্যাভক্তিতে বশীভূত হইয়া বিগ্রহদ্বয় তৎপ্রদত্ত সমূহ ভোজ্যদ্রব্য খাইয়া ফেলিলেন। ভোজনান্তে গৌর-নিত্যানন্দ বলিলেন,—"গৌরীদাস! এখন আমরা যাই।" ইহা শুনিয়া গৌরীদাস কাঁদিয়া অস্থির। কোনমতেই তাঁহাদিগকে ছাড়িতে চান না। তিনি বলিলেন,—"না, তোমাদিগকে আমি যাইতে দিব না। আমার এখানে থাকিতেই হইবে।" বিগ্রহ প্রকাশকালে নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গৌরহরি বলিলেন,—"গৌরীদাস! স্থির হও, কাঁদিও না। আমি ও নিত্যানন্দ সাক্ষাৎভাবে আছি এবং আমাদের দুই বিগ্রহও আছে। হয় আমরা থাকিব, নচেৎ বিগ্রহ দুইটী থাকিবে। তুমি কি চাও? তুমি যাহা বলিবে তাহা হইবে।" তখন গৌরীদাস বলিলেন,—"প্রভো! আমি সাক্ষাৎভাবে তোমাদের দুইজনকে থাকিতে বলিতেছি। তোমরা আমার এখানেই থাক।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার! এইকথা বলামাত্রই বিগ্রহ দুইটী কোথায় উধাও হইয়া গেলেন অর্থাৎ অন্তর্হিত হইলেন। গৌর-নিতাই মন্দিরে অবস্থান করিলেন।

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌর অম্বিকাতে বিহরে ॥
চারু-অরুণ-গুঞ্জাহার হৃৎকমলে যে ধরে ।
বিরিঞ্চি-সেব্য পাদপদ্ম লক্ষ্মী-সেব্য সাদরে ॥
তপ্তহেম-অঙ্গকান্তি প্রাতঃ-অরুণ-অম্বরে ।
রাধিকানুরাগ প্রেম-ভক্তি বাঞ্ছা যে করে ॥
শচীসুত গৌরচন্দ্র আনন্দিত অন্তরে ।
পাষণ্ড-খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে ।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্বজীব উদ্ধারে ॥

[২]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় **শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর**। ইঁনি কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনে প্রাণসখী 'মধুমতী' ছিলেন। কাটোয়ার নিকটে শ্রীখণ্ডে ইঁহার শ্রীপাট। ইঁহার পিতার নাম—নারায়ণদাস ও মাতার নাম শ্রীগৌরী। ইঁহারা তিনভাই ছিলেন—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইঁহাকে নবদ্বীপে রাখেন। ইঁনি মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং বহু পদাবলী রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে অবস্থানের সৌভাগ্য হয় এবং চামর ব্যজনরূপ অন্তরঙ্গসেবা লাভ ঘটে। "নরহরি আদি করি' চামর ঢুলায়।"

তাঁহার চরিত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ তাঁহারা নরহরি সরকার ঠাকুরকে ডাকিয়া কহিলেন,—"নরহরি! আমাদের খুবই পিপাসা পাইয়াছে, জলের দ্বারা এই পিপাসা নিবারণ হইবে না। আমাদের মধুপান করিবার ইচ্ছা হইতেছে। তুমি মধুপান করাও।" নরহরি মহা সমস্যায় পড়িলেন। গৃহে ত' এক ফোঁটাও মধু নাই। এখন কোথায় মধু পাই। নিকটে একটী পুষ্পরিণী ছিল। তিনি হঠাৎ নিজের অলৌকিক শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই পুষ্করিণীর জল যেন এখনই মধু হইয়া যায়।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তাঁহার ইচ্ছামাত্রই সমগ্র পুষ্করিণীর জল মধুতে পরিণত হইয়া গেল এবং ঐ পুষ্করিণীর মধুরূপী জলের দ্বারা গৌর-নিতাইর পিপাসা মিটাইলেন। সেইসময় হইতেই ঐ পুষ্করিণীটীর নাম হইল—"মধু পুষ্করিণী।"

[৩]

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে চলিয়াছেন। তিনি গঞ্জামের কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কূর্ম্ম-নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার অবস্থান হয়। কূর্ম্মবিপ্র সবংশে প্রভুর পাদোদক পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুকে কোনমতেই ছাড়িতে চান না। তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ ধরিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহে বসিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

সেই গ্রামে **বাসুদেব** বিপ্রের বাস। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছে। ক্ষতস্থান হইতে কুষ্ঠ-কীট মাটীতে পড়িয়া গেলে সেই কীটকে পুনরায় নিজ শরীরে তুলিয়া রাখিয়া বলেন,—"খা, খা।" নিজদেহে বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভাবে বিভোর। তাঁহার দেহস্মৃতি ছিল না। কূর্ম্মবিপ্রের গৃহে মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার দর্শনমানসে তথায় দৌড়াইয়া আসিলেন এবং 'প্রভু কোথায়, প্রভু

কোথায়' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে প্রভু চলিয়া গিয়াছেন —ইহা শুনিয়া বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গার পর বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! আমার জীবনে ধিক্। আমি এতই হতভাগা যে প্রভুর দর্শন পাইলাম না। এই জীবন আর রাখিব না।" মহাপ্রভু অন্তর্যামী। তিনি বাসুদেব বিপ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। প্রভুর আলিঙ্গনে বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। গলিত কুষ্ঠ সারিয়া গেল এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল। তিনি সুন্দর রূপবান্ হইয়া গেলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

ভক্তিপথে পতন নাই

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানমার্গে পরমপদপ্রাপ্তির পরও পতনের কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু ভক্তি-মার্গে সেইপ্রকার পতনাশঙ্কা নাই। ভক্তিতে সিদ্ধ ত' দূরের কথা, সাধকেরও পতন নাই। তবে যে শ্রীচিত্রকেতু, শ্রীভরত মহারাজ, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ প্রভৃতি ভক্তের পতনের কথা শুনা যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাতেই সংঘটিত এবং কেবল তাঁহাদের সৎ-জন্ম হইতে চ্যুতি হইয়া নীচ যোনিতে মাত্র জন্ম হইয়াছিল, ভক্তি হইতে পতন হয় নাই। নতুবা শ্রীচিত্রকেতু অসুর-জন্মে বৃত্রাসুর হইয়া ইন্দ্রকে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দেন কি করিয়া? শ্রীভরত মহারাজ মৃগদেহেও ভগবচ্চিন্তা করিয়াছিলেন এবং শ্রীগজেন্দ্রও নক্রের আক্রমণে পড়িয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।২৬) ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদ-নাদরেণ পরামর্থভ্রংশ উক্তঃ। ভক্তানাং স নাস্তীত্যাহ,—তথেতি। যথা পূর্ব্বে আরূঢ় পরমপদত্বাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি, তথা তাবকা মার্গাৎ, সাধকাবস্থাতোঽপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেঽপি ভক্তিবাসনানুগতিদর্শনাৎ।" (ভঃ সঃ ১২০ অনু)

—"হে পদ্মপলাশলোচন, যাঁহারা তোমার চরণসেবা অনাদর করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তোমার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা নহে বলিয়া তাহারা বহু জন্মের তপস্যার বলে (ফলে) জীবন্মুক্ত-দশা লাভ করিয়াও তোমার শ্রীপাদপদ্ম অনাদরপূর্ব্বক অধঃপতিত হয়।" ইত্যাদি শ্লোকে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

জীবন্মুক্তগণেরও যে ভগবদনাদরহেতুই পরমার্থ হইতে পতন ঘটিয়াছে, তাহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তগণের তাহা অর্থাৎ পতন নাই—ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই এই শ্লোকোক্তি ; কিন্তু প্রাগুক্ত (ভক্তিহীন মুক্তাভিমানী) জনগণ পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতেও যেরূপ ভ্রষ্ট হন, (হে ভগবন্) ত্বদীয় ভক্তগণের (পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতে দূরে যাউক্) সাধনাবস্থা হইতেও সেইরূপ বিচ্যুতি ঘটে না, যেহেতু শ্রীবৃত্র, শ্রীগজেন্দ্র ও শ্রীভরতাদি ভক্তগণের (প্রাক্তন) উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুসরণ (পরজন্মেও) দেখা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কমে না। ভক্তিপ্রবৃত্তি —চেতনের বৃত্তি, প্রাণের টান। ইহা প্রত্যেক চেতনেরই আছে। হ্লাদিনী শক্তির কৃপাবলে সুপ্ত ভক্তিপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। সৎসঙ্গে ভক্তিপ্রবৃত্তি উল্লসিত হয়—ভক্তি বাড়ে। ভক্তি ক্রমবর্দ্ধমানা। ভক্তি নষ্ট হয় না। উদ্বুদ্ধস্বরূপ ভক্ত কালক্রমে স্থূলতঃ অসৎসঙ্গের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িলেও তাঁহার ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয় না। ভক্তিপ্রবৃত্তি জীবের সত্তা। এই সত্তা সৃষ্টিও হয় না, নষ্টও হয় না ; ইহা স্বরূপেই আছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভক্তিপ্রবৃত্তি আবৃত থাকে ; অনুকূল অবস্থা পাইলেই আবার প্রকাশিত হইয়া পড়ে ও ক্রমবর্দ্ধিত হয়।

ভক্তিরাজ্যে এমন অনেক দেখা যায় যে, কোন কোন অতি কমবয়স্ক শিশুর নিকট গুরু-বৈষ্ণবগণ যখন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন তাহারা ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া খুব ভালভাবে বুঝিতে পারে এবং তখন হইতেই তাহাদের জীবনযাত্রা সেই বাণীর অনুসরণে গঠিত হয়। তাহাকে অনেক ঠকিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে হয় না। তাহাকে লাঠি মারিয়া ভক্তিকথা শ্রবণ করাইতে ও সেবা শিখাইতে হয় না। সে একবার শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে পারে। সে যেন প্রস্তুত হইয়া আছে, একটু শুনিলেই করিবে। সে যেন স্বভাবতঃই উন্মুখ হইয়া আছে, তাহার গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি, হরিনামে রুচি, হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ, অসৎসঙ্গে বিতৃষ্ণা আছে, বৃথা সময় নষ্ট করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহার ভক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে ভক্তিসিদ্ধির পূর্ব্বেই তাহার দেহপাত হওয়ায় এ জন্মে পুনরায় সাধুগুরু-সঙ্গলাভ হইয়াছে ও ভক্তি-প্রবৃত্তি উল্লসিত হইতেছে। ঐরূপ ভক্তিসাধকের সাধুগুরুসঙ্গক্রমে ভক্তিতে খুব দ্রুত গতি হয়।

সাধুগুরুকৃপায় ভক্তিতে যতটা অগ্রসর হওয়া যায়, ততটাই মঙ্গল। পরজন্মে আবার সেখান হইতেই আরম্ভ হইবে। উদ্বুদ্ধস্বরূপ জীবের ভক্তি কাহারও সঙ্গফলে নষ্ট হয় না। এক জীব অপর জীবের কিছু করিতে পারে না, তটস্থ শক্তির উপর চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির প্রভাব আছে। চিচ্ছক্তিপ্রভাবে তটস্থশক্তির সুপ্ত চিদ্বৃত্তি

প্রকাশিত হয়, আর মায়াশক্তিপ্রভাবে তাহা আবৃত হয়। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির সঙ্গক্রমে কাহারও ভক্তিবৃত্তি সঙ্কুচিত বা প্রফুল্লিত হয় ; তাহা ঐ তটস্থশক্তিজাত জীবের প্রভাবে নহে। ঐ জীবকে অবলম্বন করিয়া চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিই অপর জীবে প্রভাব বিস্তার করে।

ভক্তিলতিকা ক্রমবর্দ্ধমানা। দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ ব্যতীত ভক্তির উল্লাস বন্ধ হয় না। গুরুবৈষ্ণবই ভক্তিলতিকার আশ্রয়। সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। যে ডালে বসা যায়, সেই ডাল কাটিলে রক্ষা নাই। ভক্তি-লতিকার মূল সাধুগুরুর চরণে দুরন্ত অপরাধবশতঃ আশ্রয় ছাড়িয়া দিলে আর নিস্তার নাই। কিন্তু আশ্রয় থাকিলে কোন ভয় নাই। তাই বলিয়াছেন,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে,　　তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

মহামায়ার সংসর্গে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়,—

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীব-রূপ বীজ তাতে কৈলা সমর্পণ।। (মধ্য ২০।২৭৩)

গীতার ৭।৪ শ্লোক ও ১৩।৬ শ্লোক আলোচনা করলে বহিরঙ্গা অপরা প্রকৃতি তথা মহামায়ার বৈভবরূপে জীবের শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জানা যায়। আর জীবাত্মা পরা প্রকৃতি ও বিভিন্নাংশ সনাতন তত্ত্বরূপে গীতার ৭।৫ শ্লোকে ও ১৫।৭ শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়,—

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁ'র শক্তিতে গণন।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯)

বিভিন্নাংশ জীবগণ স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপহেতু অতিশয় ক্ষুদ্র শক্তিযুক্ত এবং কৃষ্ণতত্ত্ব হতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। উক্ত জীবগণের মায়াপ্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-রূপ অপরাধ ও মায়িক কালের পূর্ব্ব হতে অপরাধ হওয়ায় অনাদি বহির্ম্মুখ বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

জীব যে তটস্থা শক্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ বলেছেন,—"যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্"—অর্থাৎ "চিচ্ছক্তি নির্গত চিৎকণ জীবই তটস্থ।"

কিন্তু জীব মায়ার দ্বারা বশীভূত হওয়ায় মোহপ্রাপ্ত হয়। যথা,—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। (গীতা ৫।১৪)

"জীবের স্বরূপজ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানবশে নিজেকে কর্ম্মকর্ত্তা বলে অভিমান করেন।" মায়াবদ্ধ জীব মায়াশক্তির দ্বারা সংসারে কিরূপ দুর্গতি পাচ্ছে, তার একটী চিত্র জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্‌রচিত 'শ্রীদশমূল শ্লোকে'র ৭ম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন,—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ।।

অর্থাৎ "স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণ-বিমুখ দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাদিগকে নিপতিত করে কখনও স্বর্গে এবং কখনও নরকে নিয়ে বেড়ান।"

অতএব, জীব মায়ামধ্যে অবস্থিত হয়ে মায়ার গুণে আসক্তিবশতঃ মায়া-জাত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। গীতার ৩।৩৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন যে, কাম ও ক্রোধ জীবের পরম শত্রু অর্থাৎ কাম ও ক্রোধের দ্বারাই জীব পাপে প্রবৃত্ত হয়। কামাদি রিপুষটক্ তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এইগুলি রজ-স্তমোগুণ হতে উৎপন্ন বা জাত হয়েছে—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নির্ণয় করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিবৃত্যাত্মক গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখেছেন,—'প্রাকৃত জগতে রজস্তমোগুণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য প্রসব করে ও সকল সদ্‌গুণ নষ্ট করে। এই গুণের দ্বারা চালিত হয়ে ভোগের উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অচঞ্চল সত্ত্বগুণ স্থাপন করে না।" এক্ষণে রজস্তমোগুণ হতে কামাদি রিপুগণ উৎপন্ন হওয়ায় এবং বিশেষতঃ রজোগুণ হতে কামের উদ্ভব হওয়ায় ও তমোগুণ হতে ক্রোধ জাত হওয়ায় উক্ত কাম-ক্রোধের প্রভাবে জীব পাপে রত হয়। রজস্তমোগুণ কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। (গীতা ১৪।৫)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

অর্থাৎ "হে মহাবাহো! জড়া প্রকৃতি হতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্ব্বিকার দেহী জীবকে সুখ-দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে।" উক্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তরূপা ও গুণময়ী। ঐ জড়া প্রকৃতিই 'মহামায়া' বা 'দুর্গা' নামে পরিচিতা। গীতার ১৩।২২ শ্লোকে কথিত হয়েছে—"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।" অর্থাৎ পুরুষ তথা জীব প্রকৃতিতে তথা মায়াতে অবস্থিত হয়েই মায়াজাত গুণসমূহ বা বিষয়সমূহ ভোগ করে। এই সংসাররূপ দুর্গটী বদ্ধজীবের নিমিত্ত কারাগার। সেই কারাগারের মহামায়াই কর্ত্রী। মায়ার কুহকে ও ছলনায় জীব মায়িক বস্তুই কামনা করে। বদ্ধজীব সর্ব্বদা মায়ার সঙ্গ করায় মায়াতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি যাহাকে শ্রদ্ধা করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মতই তার চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়। গীতায় ইহাই সুস্পষ্টভাবে কথিত,—

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। (গীতা ১৭।৩)

"হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা স্ব-স্ব অন্তঃকরণ অনুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় অতএব যে ব্যক্তি যাদৃশ পূজ্যবস্তুতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি তাদৃশ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্টই হয়ে থাকে।"

হরিভক্তিসুধোদয়ে (৮।৫১) উক্ত হয়,—"যস্য যৎসঙ্গতি পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ"—অর্থাৎ "যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণি স্পর্শের ন্যায় গুণ হয়।" বদ্ধজীব মায়ার মধ্যে থেকে সর্ব্বদা মায়ার সঙ্গ করায় মায়ার গুণগুলি তথা রজস্তম মিশ্রিত সত্ত্বগুণ ও রজঃ তমোগুণ প্রাপ্ত হওয়ায় তার হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়,—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভিপদ্যতে।। (ভাঃ ১।৭।৫)

"সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হয়েও আপনাকে জড় দেহ, মন ও বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ হয়।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী স্মরণ করছি,—"স্বরূপশক্তিরই বিপরীত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহা জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিকে আবৃত করে আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তি হতে বিক্ষিপ্ত করে। যেখানে মায়াশক্তি স্বরূপে উদ্ভাসিতা, তথায় তিনি প্রকাশময়ী, আর যেখানে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিচালনা করেন, সেখানে তাঁর রজস্তমোগুণদ্বয় সৃষ্ট হয়। গুণান্তর্গত অণুচেতন অর্থাৎ জীবশক্তিবিশিষ্ট অণুচিদ্বস্তুকে গুণাভিমানিরূপে গেলেই তিনি জীবকে আবৃত করেন

ও ভগবদ্‌সেবাবিমুখ করে বিক্ষিপ্ত করেন। এই কার্য্যদ্বয় ভগবানের প্রীতিপ্রদ না হলেও মায়া বা ভগবদ্-বহিরঙ্গা শক্তি এই সেবা করে থাকেন। ** ভগবানের প্রিয় জীবগণকে ভগবান্ হতে বিক্ষিপ্ত করে আবৃত করেন বলে ভগবান্ বহিরঙ্গা শক্তিকে সর্ব্বপ্রধানা শক্তিপদবীতে স্থান না দিয়া অপকৃষ্ট ভাবে আশ্রয় দিয়া থাকেন। ভগবদাশ্রয়-বিচ্যুতা হবার যোগ্যতা তাঁর নাই। এজন্য তাঁকে অপকৃষ্টভাবে আশ্রিতা থাকতে হয়। ** জীব—জীবন আছে অথচ মায়াদ্বারা অভিভূত হবার যোগ্য। চেতন আছে, কিন্তু পূর্ণ নহে—অপূর্ণ। নতুবা পূর্ণের বিপরীতভাবের Preference সে দেয় কেন? মায়ার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়া বস্তুতঃ তার ভৃত্যত্বই করতে হচ্ছে। 'মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াদ্বারা অভিভাব্য জীবের 'মেপে নেওয়া' ধর্ম্ম Currency লাভ করলেই সে মায়াদ্বারা সম্যগ্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করে। মায়া জীবের চেতনবৃত্তিকে আবৃত করে। আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মনুতে —আত্মাকে জন্মস্থিতিভঙ্গ—রজঃ সত্ত্বতমোগুণের অধীন বলে মনে করে। অবশ্য গুণগুলি Preponderating—একটীর পর একটী প্রভুত্ব করে। আত্মা হয়েও সেইগুণদ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। 'পরোঽপি' অর্থাৎ মায়িক গুণত্রয়াতিরিক্ত হয়েও প্রয়োজনসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়। 'তৎকৃতং অনর্থঞ্চ অভিপদ্যতে'—আত্মার ত্রিগুণত্বাভিমান-কৃত অনর্থ অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসারব্যসন লাভ করে।" জীবাত্মার স্বার্থ একমাত্র বিষ্ণু (স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্)। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া জীব যে-সকল স্বার্থ চরিতার্থ করতে যায়, তার দ্বারা জীব কলুষিত হয়ে পড়ে, সঙ্কীর্ণতায় পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যে স্বার্থ সেটা কামের স্বার্থ। কাম অতি ক্ষুদ্র বস্তু। এরদ্বারা হিংসা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি এসে জীবকে অধঃপাতিত করে। কাম সকল রিপুরই মূল। স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে—"সঙ্কল্পমূলা সর্ব্বে কামাঃ"—'কাম সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তি বিশেষ।' তাই উহা আত্মার ধর্ম্ম নয়, পরন্তু মনের ধর্ম্ম। মনের ধর্ম্মহেতু কামকে পরিত্যাগ করা যায়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁর 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে লিখেছেন,—

কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।।

কৃষ্ণসেবার কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই হল দুষ্টাশয় বা দুর্ব্বাসনা। তৎপরবর্ত্তী ছন্দে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণসেবা প্রার্থনা করে গেয়েছেন,—

মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা।।

কামনার বশীভূত ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্ব জানে না ও জানতে চায় না। শ্রীল প্রহ্লাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

মহারাজ ঐ ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,—"ঈশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ"—ঈশ্বরের ত্রিগুণময়ী বেদবাণীতে ঐ জীবগণ মহাবন্ধনগ্রস্ত। ঐ দুর্ব্বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণ 'বহিরর্থমানিনঃ'—বাস্তব শাস্ত্রার্থ হীন ও বাইরের বস্তুকেই পাবার চেষ্টা করে ; তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের 'অন্ধ' বলেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন,—

অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ। (কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায়,—"কামহতত্বই অপূর্ণ কামত্বের কারণ।" ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে,—জাগতিক কাম জড়ীয় কাম মাত্র। "কামাৎ ক্রোধোঽভি-জায়তে" (গীতা ২।৬২)—কাম কাহারও দ্বারা প্রতিহত হলেই ক্রোধের উদ্ভব। জনৈক প্রাকৃত কবি গেয়েছেন,—"ক্রোধে তাপ, ক্রোধে পাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়, ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়।" এইভাবে কাম-ক্রোধাদির বশীভূত ব্যক্তিগণ মোহাচ্ছন্ন ও পাপাচ্ছন্ন হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই আবাহন করে। এক্ষণে মায়া ও জীবের পরিচয় এবং কাম-ক্রোধাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করত জীবকে কে পাপে প্রলুব্ধ করে এবং জীব কেন ও কাহার সংসর্গবশতঃ পাপে রত হয়—অর্জ্জুনের এবম্বিধ গীতার ৩।৩৬ শ্লোকের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে প্রয়াসী হচ্ছি।

প্রথমতঃ মায়াবদ্ধ জীব মায়ার (প্রকৃতির) গুণজাত স্বভাবের অধীন। যথা—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।। (গীতা ৭।১৩)

"পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত, ঐ সমস্ত গুণ হতে অতীত অব্যয়স্বরূপ আমাকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) লোকে জানতে পারে না।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখলেন,—" ** স্বাভাবীভূতৈর্জ্জগৎ জগজ্জাত-জীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নির্গুণত্বাদেভ্যঃ পরাম্ অব্যয়ং নির্ব্বিকারম্।" "** স্বাভাবীভূত জগৎ অর্থাৎ জগতে উদ্ভূত জীববৃন্দ মোহিত হয়ে আমি নির্গুণ বলে গুণগণ হতে পর অব্যয়, নির্ব্বিকার আমাকে জানতে পারে না।" এক্ষণে জীব যদি (জানতে পারে যে, সে মায়ার (মহামায়া দুর্গাদেবীর) গুণজাত স্বভাবের অধীন নয় অর্থাৎ প্রকৃতি-জাত (মায়াজাত) জড়পদার্থ সে নয়, পরন্তু জীবাত্মা চিৎস্বরূপ মায়াতীত বস্তু ; তাহলে জীব মুক্ত হয়ে আত্মানন্দ ও চিদানন্দ লাভ করবে এবং গুণজাত স্বভাবের অধীন হয়ে সেই জীব আর পাপকার্য্য করবে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন জীবই পাপের অধিকারী। মায়ার তথা দুর্গাদেবীর অবিদ্যা বৃত্তির প্রভাব হতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের প্রবৃত্তি ও পাপবীজ নষ্ট হয় না।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

দ্বিতীয়তঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-মাহাত্ম্যে (১।৪১) কথিত হয়,—"মহামায়া হরেশ্চৈতত্ত্বয়া সম্মোহ্যতে জগৎ"—শ্রীহরির শক্তি মহামায়া, তিনিই জগৎ মোহিত করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায়—"বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি (মহামায়া)।"—জৈবধর্ম্ম

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতায় ৫।৮ শ্লোকে উক্ত হয়,—"যা যোনি সাপরা শক্তিঃ" অর্থাৎ সেই অপ্রকটরূপা যোগমায়ার যিনি যোনিস্থানীয় বা ছায়ারূপা অংশ, তিনিই অপরা বা মায়া-নাম্নী শক্তি। অপরা প্রকৃতির দ্বারা স্থূল জড় শরীর ও সূক্ষ্ম জড় মনের তৃপ্তি ও পুষ্টিসাধন হয় মাত্র এবং তাহাও অণুমাত্র। জীবের শরীর ও মন অপরা প্রকৃতি (মহামায়ার) বৈভব, কিন্তু জীব তথা জীবাত্মা পরাপ্রকৃতিসম্ভূত। চণ্ডীতে উক্ত হয়,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।" অর্থাৎ মহামায়া যোগমায়ার ছায়ামাত্র। ছায়াশক্তি জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবরণ করে ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত করে। গীতর ২।১৬ শ্লোকে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" উক্ত হওয়ায় জানা যায়, জীবাত্মা সৎ অর্থাৎ নিত্য বা নাশহীন, আর স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় তথা দেহ ও মন অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা অচিরস্থায়ী। জীবাত্মা নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দময় এবং অনাসক্ত, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় জড় ও শোকমোহভয়াদিযুক্ত। এক্ষণে জীবগণকে শোকমোহাদিযুক্ত বোধ হওয়ায় তাহা মায়াকল্পিত জানতে হবে। অতএব অপরা প্রকৃতি মহামায়া যোগমায়ার ছায়ারূপা হওয়ায় জড়া এবং জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় তাঁর বৈভব হওয়ায় তিনি অসৎ ও নিরানন্দ অর্থাৎ মহামায়া অচিৎ (জড়া), অসৎ ও নিরানন্দময়। অপরাপ্রকৃতি বা মায়াশক্তি জীবাত্মারা তুষ্টি ও পুষ্টি সাধন করতে পারে না। অপরা প্রকৃতির নিজস্ব কোন ক্রিয়াশীলতা নাই, পরা প্রকৃতির দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই উহা ক্রিয়াবতী হয়। অপরা প্রকৃতি ছায়ার স্বভাব জড় তমোময় ও নিত্য আনন্দের অভাবযুক্ত। তাই অপরা প্রকৃতি তথা অভাবের দ্বারা জীবের অভাব দূর হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। দেহ-মনের প্রয়োজনই প্রকৃত প্রয়োজন—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই মানুষ পাপকার্য্য করে। আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে সংঘর্ষ হচ্ছে ও পাপপ্রবৃত্তি মানুষের মনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহা মূলতঃ জড়বস্তু পাবার ইচ্ছায় মানুষ সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। চেতন আত্মার অভাব কি জড়বস্তুর দ্বারা মিটতে পারে? মায়াতে আসক্ত জীব মায়িক বস্তুই কামনা করে। জীব জড়মায়ার প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকায় ভৌতিক বস্তুতে আসক্তি ও মমত্ব অধিক হয়। তৎফলে স্বরূপবিভ্রান্ত হয়ে ঔপাধিক পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ভগবদ্দাস অভিমান বা সেবক-অভিমান বিবর্জ্জিত হয়। ভগবৎমায়া ঘটন-অঘটন পটীয়সী। মায়ার 'বিক্ষেপাত্মিকা' ও 'আবরণাত্মিকা'—এই

দুষ্ট কর্ম্মদ্বয় আমাদের চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপ্রসঙ্গে লগ্ন হতে দেয় না ; আমরা মায়ার কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মায়াতে মনটা মজিয়ে দিচ্ছি ও আত্মজ্ঞান ভুলে পাপ করতে ধাবিত হই ও পাপ কার্য্য করি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

পরিক্রমা-যাত্রীর বিজ্ঞপ্তি

অধমতারণ,　　দীনের শরণ,
প্রভো! গুরো! দয়াময়!
তব কৃপাহ্বানে,　　মোরা দীনজনে,
আসিয়াছি তবাশ্রয় ॥
কাঙ্গাল আমরা,　　ভক্তিধনহারা,
প্রেম-গন্ধ-লেশ হীন ।
মলিন হৃদয়,　　ভোগাসক্তিময়,
সেবাধর্ম্মে উদাসীন ॥
সেবা অনুকূল,　　ভক্তি-প্রতিকূল,
এ উভয়ে লক্ষ্যহীন ।
তব শ্রীচরণে,　　আত্মনিবেদনে,
যত্ন চেষ্টা মতিহীন ॥
ক্ষান্তি সমাশ্রয়,　　কালের সদ্ব্যয়,
বৈরাগ্য, দীনতা, শুচি ।
আগ্রহ বা আশা,　　নামপানে তৃষ্ণা,
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে রুচি ॥
ধাম প্রতি প্রীতি,　　বিষয়ে বিরতি,
এ সব কিছুই নাই ।
তাই মোরা মূঢ়,　　তব মর্ম্ম গূঢ়,
বিন্দুমাত্র বুঝি নাই ॥
দিবস-রজনী,　　ইন্দ্রিয়তোষণী,
চেষ্টা-চিন্তা-সুবিব্রত ।
নিশা নিদ্রাহীন,　　সদা দৈবাধীন,
অর্থার্জ্জনে প্রতিহত ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

কীর্ত্তনবিমুখ, সেবা-পরাঙ্মুখ,
নাহি বিন্দুমাত্র ভক্তি ।
ত্যজি পরমার্থ, লভি অপস্বার্থ,—
—বিষয়েতে অত্যাসক্তি ॥
গতানুগতিক, —নহি নির্ব্যলীক,
তব পদ সমাশ্রয়ে ।
আশ্রয়ের ভাণ, বিষয়ের ধ্যান,
করি কৈতবতা লয়ে ॥
তোমারে বঞ্চিতে, আত্ম প্রতারিতে,
সদা হ'য়ে দৃঢ়ব্রত ।
আপনার পায়ে, কুঠারের ঘায়ে,
করিতেছি জর্জ্জরিত ॥
বলীবর্দ্দসম, আপনার ভ্রম,
গৃহমেধী অভাজন ।
কিছু না বুঝিয়ে, ঘুরপাক খেয়ে,
লভি মাত্র বন্ধন ॥
অবোধ শিশুরে, কিম্বা উন্মত্তেরে,
শোধিতে তোমার শক্তি ।
তাই কৃপাময়, প্রভো ইচ্ছাময়,
ছাড়াতে বিষয়াসক্তি ॥
—বাঁধন খসাতে, নির্ম্মুক্ত করিতে,
পরিক্রমা আয়োজন ।
ধাম-পরিক্রমা— ধাম চতুঃসীমা,
ভ্রমাইছ মহাজন ॥
ধাম পরিক্রমা, ধামের মহিমা,
করায়ে—জানায়ে সবে ।
বাঁধন খুলিছ, জীব উদ্ধারিছ,
দুঃখময় এই ভবে ॥
তোমার মাহাত্ম্য, তব লীলাতত্ত্ব,
বুঝিবার শক্তি কার ।
তব করুণার, সাগর অপার,
কে পাইবে পার তার ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

হরষে বিস্ময়ে,　　পুলকিত হয়ে,
মোরা শুধু ভাবি এই ।
যে হেন দয়াল,　　তাহার কাঙ্গাল,
জন্মে জন্মে প্রভু সেই ॥

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীনামের অর্থ

শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি একই বস্তু। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্থাৎ অভিন্ন চিদ্বিলাসী বাচক শ্রীকৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি নামী কৃষ্ণবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবানের চিদঙ্গের সাক্ষাৎ সেবা একই কথা। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত সাধুসঙ্গ কৃষ্ণনাম করাই শাস্ত্রীয় বিধি। প্রথমতঃ শ্রীনামে শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করাই গুরূপদেশ বা শাস্ত্রোপদেশ। গুরুকৃপা-লাভের সৌভাগ্য হইলে আমরা জানিতে পারিব যে, কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলে।

এই নাম অক্ষরাত্মক হইলেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-অবতার-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গোলোক-বৃন্দাবন হইতে এখানে শব্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়পূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম করিলে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আব্রহ্মস্তম্ব—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মনুষ্য, দেবতা সকলেরই নিত্যকালের একমাত্র উপাস্য—এই শ্রীকৃষ্ণনাম। এই শ্রীনামের অর্থ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করায় আজ আমরা সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামার্থের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি।।
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রুঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ।।

[তমাল-শ্যামবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী,—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রুঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।]

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার।।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

মহাপ্রভুর অনুগ আমাদের শ্রীনামের আর বেশী কিছু অর্থ প্রকাশ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই। তবে বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বে আজ আমরা শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভুর কথিত শ্রীনামার্থ অনুকীর্ত্তনপূর্ব্বক আত্মশোধনাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক শ্রীনামমালা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। হরি-শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয়। এই হরিনাম চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহরূপে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্যদ্বারা অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় 'হরি' এই নাম হইয়াছে। অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্যদ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। হরি-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'-শব্দের প্রয়োগ। অথবা ব্রহ্মসংহিতা-মতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যদ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'-শব্দবাচ্য বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা নাম সম্বোধনে 'হরে'। 'কৃষ্ণ'-শব্দার্থ আগম-মতে—কৃষ-ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ'-শব্দ হয়, সেই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ'-শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ ; আগমে বলিয়াছেন,—হে দেবি! 'রা'-শব্দের উচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে এইজন্য 'ম'-কার-রূপ কপাটযুক্ত 'রাম' এই নাম। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিলীলাধিদেবতা—যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য রমমান, তিনিই রাম-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই শ্রীরামের মুখ্য অর্থ।

যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সাধক এবং কেহ সিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীবগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। নামনৈরন্তর্য্য বা নামস্মৃতি সতত হৃদয়ে জাগরূক থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণদাস-অভিমানী জাগ্রত জীবগণ সতত প্রভু-সেবায় বিভোর হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। সাধকগণ প্রাথমিক ও প্রাত্যহিকভেদে দ্বিবিধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যার দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হন। প্রথম অবস্থায় সাধকের নামে রুচি থাকে না। শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলেও যত্নের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় শ্রীনামে একটু আদর হয় বলিয়া তখন নামোচ্চারণরহিত হইয়া থাকিতে আর ভাল লাগে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

না। এইরূপে নিরন্তর নাম করিতে করিতে জীবের নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যা, তাহা স্বয়ং দূর হয়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত সাধুর আনুগত্য স্বীকার করিলে—তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা বা হরিনাম করিলে জীবের এই সুফল উদিত হইতে পারে। ভাগ্যক্রমে এই প্রথম অবস্থাটি কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্যক্রমে জীবের শুভোদয় হয়। প্রাথমিক সাধকগণ শুদ্ধসেবা-লাভের আশায় চিত্তশুদ্ধির জন্য এইভাবে ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন,—১। হে হরে! মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনান্মোচয় ; ২। হে কৃষ্ণ! মচ্চিত্তমাকৃষ ; ৩। হে হরে! স্বমাধুর্য্যেন মচ্চিত্তং হর ; ৪। হে কৃষ্ণ! স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয় ; ৫। হে কৃষ্ণ! নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু ; ৬। হে কৃষ্ণ! রুচির্ভবতু মে ; ৭। হে হরে! নিজসেবাযোগ্যং মাং কুরু ; ৮। হে হরে! স্বসেবামাদেশয় ; ৯। হে হরে! স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয় ; ১০। হে রাম! প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয় ; ১১। হে হরে! স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয় ; ১২। হে রাম! প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয় ; ১৩। হে রাম! নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণাদিষু মাং যোজয় ; ১৪। হে রাম! তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু ; ১৫। হে হরে! মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব ; ১৬। হে হরে! ময়া সহ রমস্ব।

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর]

বহু বহু জন্মে আমরা কিছু কিছু সঞ্চয় করি। সে সঞ্চয়ের নাম কি? তাকে কি বলা হয়?—সুকৃতি। যে কোন মানুষ এ সংসারে কাজ করে, তাদের কি সুকৃতি হয়?—হয় না। প্রাকৃত জগতের যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মের ফলটাই তারা পান। সেই কর্ম্ম করলে দুটো জিনিষ হয়—পুণ্য ও পাপ। ভাল কাজ করলে পুণ্য ও খারাপ কাজ করলে পাপ হয়। পুণ্য একাকী কিছু করা যায় না, পাপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আসে। আমরা যদি মনে করি যে, শুধু পুণ্য করব, তা হবে না। শাস্ত্র সেজন্য বললেন, তুমি এই পাপ-পুণ্যের মধ্যে যেও না। এর শেষ নাই। সারা জীবনভর, এক জন্ম নয়, জন্মের পর জন্ম চলতে থাকবে। তাহলে কি করব? সুকৃতি অর্জ্জন করবার চেষ্টা কর।

সুকৃতি কাকে বলা হবে? ভগবান্ যে ব্যবস্থাগুলো দিয়েছেন, তার থেকে সুকৃতি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

হয়। কিরকম ভাবে? একটা কাজ করছি আমি, সেই কাজে ভগবান্ খুশী হবেন, সন্তুষ্ট হবেন—এটা জেনে-বুঝে নিয়ে সেই কাজটা করব। এই হল শাস্ত্রের উপদেশ। যা কিছু করব, তার সবটার পিছনে উদ্দেশ্য থাকবে ভগবান্ খুশী হবেন, সন্তুষ্ট হবেন—এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যদি আমরা কর্ম্মাচরণ করি এ সংসারে, তাহলে আমাদের কর্ম্ম-কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে না, সুকৃতি হবে। এই সুকৃতি দুইভাবে হয়—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে। আমি জানি না, আমার অনেক ভাল হয়ে গেল। আবার আমি জানি না, আমার নিজের কিছু দোষ-ত্রুটী হয়ে গেছে, তার জন্য অনেক খারাপ হয়ে গেলাম। দুরকম হয়।

খারাপ না হয়ে যাতে ভাল হয়, আমাদের বিচারটা সেরকম থাকবে। কিরকম ভাবে? মাছি কি করে? পচা, গলা জিনিষ যেখানে, সেখানে তারা ভন্‌ভন্ করে ঘোরে। আর মধুমক্ষিকা, সে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে। তাহলে আমরা কি হব? মধুমক্ষিকা হব, না মাছি হব? শাস্ত্র বলছেন,—আমাদের মধুমক্ষিকা হতে হবে। "সর্ব্বত্র সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যো ইব ষট্‌পদঃ।" এই 'ষট্‌পদঃ' মানে মধুমক্ষিকা। আমাদের সেই মধুমক্ষিকা হতে হবে। তাহলে আমাদের সঙ্কল্পটা সেরকম থাকবে। সৎসঙ্কল্প থাকলে ভগবান্ তাকে সেরকম সাহায্য করেন। আমরা যদি লোকের ভাল চাই, আমার নিজের ভাল চাই, তাহলে অন্যের ভালও চিন্তা করতে হবে। অন্যের খারাপ চিন্তা করলাম, আর আমি ভাল হলাম, হবে না তা, আইনে তা হয় না। কিন্তু অনেক সময় আমরা বোকামি করে অপরের অপকার, অমঙ্গল চিন্তা করি। এটা মোটেই বুদ্ধিমত্তা নয়। অপরের ভালটা চিন্তা করতে হবে, তবে আমার ভাল হবে। সকলের ভাল নিয়ে আমি ভাল হয়ে চলব। বৃত্তিটা এইরকম থাকা চাই। গীতা-ভাগবতের উপদেশ হচ্ছে এইরকম।

আজ উপবাসের দিন—একাদশী। যদি বলা যায় নিরম্বু উপবাস, তাহলে অনেকে এমনও অর্থ করে ফেলতে পারেন যে, শুধু জল ছাড়া আর সব খাব। ব্যাখ্যা কি? নিঃ নাস্তি জলং যস্মিন্—যে ব্যবস্থার মধ্যে জলটাকে বাদ দিতে হবে। শুধু জলকে বাদ দিয়ে আর সব খেলে কি উপবাস হবে? তা ত' হবে না। তাহলে কি করব? শাস্ত্রানুসারেই ব্যবস্থাটা নেব। আর কি কি খেলে উপবাস নষ্ট হবে? অন্নজাতীয় জিনিষ খেলে। কেউ অন্ন খান না, রুটি খান, লুচি-পুরি খান। তাদের কি হবে? ওটা খেলে হবে না। একাদশীর দিনে রবিশস্য গ্রহণ করা নিষেধ। ওতে পাপ স্পর্শ করবে। সেজন্য একাদশীর দিনে অন্নজাতীয় জিনিষ চলবে না। গব্য, ফলমূল গ্রহণ করতে হবে সাধ্যানুসারে। কথাটা আছে অনুকল্প। অনুকল্প অর্থাৎ অল্পস্বল্প। ঠাট্টা করে বলা হয় বৃহৎকল্প। অর্থাৎ খুব পেট ভরে অনেক কিছু খেলে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

বৃহৎকল্প হয়ে গেল। তা নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্লেবলমাত্র উপবাস করলেই হবে না। "ন উপবাসস্তু লঙ্ঘনে"—এই আইনানুসারে উপবাস দিলাম আমি, কিন্তু পড়ে পড়ে ঘুমালাম, উপবাস নষ্ট হল। ভাগবত বলছেন—"একাদশ্যাং নিরাহারঃ।" এইটা হল সাধারণ আইন। আর যদি তার ভিতরে ঘুমাই আমি, তাহলে উপবাস নষ্ট হল। আর কি? "অসকৃজ্জলপানোচ্চ"—বার বার যদি জল পান করি আমি, তাহলে উপবাস নষ্ট হবে। "সকৃত্তাম্বূলভক্ষণাৎ"—গুয়া-পান খেয়ে ফেললাম, ভুল করেই খেলাম হয়ত', খারাপ হল। আর জেনে-শুনেই খেলাম, তাহলেও খারাপ হল। 'দিবাস্বাপাচ্য"—দিনের বেলায় যদি ঘুমাই, তাহলে উপবাস নষ্ট হল। এই সমস্ত জিনিষগুলো নিষেধ আছে উপবাসে। এগুলো করা চলবে না। অন্য দিন যে পরিমাণ ভগবানের নাম করি আমরা, একাদশীর দিনে তার থেকে বেশী করে নাম করতে হবে। অন্যদিন যতটুকু ঠাকুরের সেবা করি, তার থেকে বেশী করে ঠাকুরের সেবা করতে হবে। অন্যদিনে যতটুকু শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করি, তার থেকে বেশী করে আলোচনা করতে হবে—এইসব নিয়ম আছে শাস্ত্রে। উপবাসের দিনে বেশী বেশী করে করতে হবে সব। সবটার মধ্যেই ভগবানের প্রীতিকামনা। ভগবান্ খুশী হচ্ছেন কিনা আমার কার্য্যেতে, আমার অনুষ্ঠানের মধ্যে—এইটাই হল বড় চিন্তা। এই চিন্তা নিয়ে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা ধন্য ; তাঁদের জীবন সফল, তাঁদের অসুবিধা নাই।

তাঁদের ক্ষেত্রে বলা আছে তোমরা সুকৃতি অর্জ্জন কর। সুকৃতি দুভাবে—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে হয়। কিন্তু সুকৃতি কিভাবে হবে? জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে যেটা হবে, আমি যদি তা জানতে না পারি, অথচ আমার সুকৃতি হল, তার লক্ষণ আছে শাস্ত্রে। সেই লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। আমি ভাল কাজ করছি, না খারাপ কাজ করছি। কতটা ভাল কাজ করলাম, আর কতটা খারাপ কাজ করলাম। সবটা শাস্ত্রের বিচারের মধ্যে আছে। তাহলে কি করব? পুঞ্জীভূত সকৃতি—বহু সুকৃতি যখন একসঙ্গে জমা হয়, তখন আমরা সাধুর কথায় বিশ্বাস করি। তার আগে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হয় না। উনি কি বলছেন, বাদ দাও—এরকম বুদ্ধি হয়। সাধুর কথা শুনতে ইচ্ছা হয় সুকৃতি যদি থাকে, জমার ঘর যদি বেশী থাকে। ওতে টান থাকবে না, ও জিনিষ পালন করতে ইচ্ছা যাবে না যদি সুকৃতি কম থাকে। পুঞ্জীভূত সুকৃতি থাকলে তখন সাধুসঙ্গে স্পৃহা হবে, সাধুর কথা শুনতে ইচ্ছা করবে বার বার। সবসময় শুনব—এমন ধরণের ইচ্ছা করবে। শাস্ত্রগ্রন্থের বিচার শুনতে ইচ্ছা করবে। তাহলে আমরা কি করব? সবগুলো রাখতে হবে আমাদের জীবনে। কোনটাকে বাদ দিলে চলবে না। সাধুর কথায় যদি বিশ্বাস হল, ভগবান্ আমাকে দয়া করবেন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

তখন। সারাজীবন ত' ভগবান্ দয়া করেন না। যদি সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কথায় আমরা বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে আমাদের কিছুই হবে না। আরও উন্নততর অবস্থা লাভ করার পক্ষে খুব অসুবিধা আছে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকে বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে, সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। তবে ভগবান্ খুশী হবেন। গুরু-বৈষ্ণবগণ যদি বলে দেন ভগবান্‌কে—ঠাকুর! একে একটু দেখো। তাড়াতাড়ি দেখবেন ভগবান্—এইকথা বলা আছে শাস্ত্রে। আমি ত' জানি না, বুঝি না, যাঁরা জেনেছেন, বুঝেছেন, তাঁদের শরণাপন্ন হলে কিছু জানা-বুঝার সম্ভব হয়। এই জিনিষটা ত' আমরা বুঝি না ; ভগবান্‌কে ডাকতে গেলে অন্য কারও সাহায্য দরকার। আমি নিজে ত' কিছু জানি না, বুঝি না, সেইজন্য সাহায্য নিতে হচ্ছে গুরু-বৈষ্ণবের কাছে।

গুরু-বৈষ্ণবের কাছে আমরা ঋণী হয়ে যাই। শাস্ত্র বলছেন,—গুরু-বৈষ্ণবের কাছে ঋণী না হয়ে তাঁদের বিচার নিয়ে চললেই ভাল হয়। তাঁদের বিচার নিয়ে যদি চলি, তাহলে ঋণী হব না ; আর যদি বিচার না নিয়ে চলি, তাহলে ঋণী হয়ে যাব।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।।

এ জগতে ঋণ ছয়রকমের। দেবতাগণের কাছে ঋণ আছে। তাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন। ঋষিগণের কাছে, প্রাণীজগতের কাছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে, পিতামাতার কাছে ঋণী আমরা। এই ছয়রকমের ঋণেতে মানুষ জর্জ্জরিত। সে ঋণ কখন কিভাবে হয়েছে জানি না আমি। আমার বাবা, ঠাকুরদাদা পর্য্যন্ত খবর রাখি, কিন্তু ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা কার কাছে কি ঋণ করেছিলেন, তা ত' জানি না আমি। সেটা আমি কি করে জানব? এ সব ঋণ শোধ করার কথা আছে। এ সংসারে থেকে যে কষ্ট পাই আমরা, সে কষ্টটা আমাদের মঙ্গলের জন্য, ওটা আমরা বুঝি না। কিন্তু কেউ মঙ্গল বলে কি ভাবি?—না। দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য বলা আছে। যদি দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে, তাহলে ভগবান্‌কে ডাকতে পারি, ভগবানের চিন্তা-ভাবনা করবার সুযোগ হয়। এইজন্য বলছেন ওটা ভাল জিনিষ। যাঁরা সাধন-ভজনপিপাসু ব্যক্তি, তাঁদের পক্ষে মঙ্গল ; আর যারা সাধন-ভজন করবেন না—কে ভগবান্, কে কি—এ সব বিষয়ে চিন্তা যাদের নাই, তাদের কথা নয় ওটা। যাঁরা হরিভজন করবেন, ভগবান্‌কে ডাকবেন, ভগবানের আরাধনা করবেন, তাঁদের পক্ষে খুবই মঙ্গলকর কথা এটা। শাস্ত্র সেইকথা বলছেন।

তাহলে কি করব আমরা? এ সব বিষয়ে সতর্ক হতে হবে, সাবধান হতে

হবে। ভাগবতের চরম কথা কি? ভগবানে ভক্তি কর, তাহলে তোমার কল্যাণ হবে। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'—কথা আছে। আপনারা জানেন, মুখস্থ আছে। শুধু রমণীর গুণেই সংসার সুখের হয়? তা নয়। ধর্ম্মীয় যে বিচার, তত্ত্বসিদ্ধান্তের যে বিচার, সেই বিচার যতদিন আমরা না শুনি, না বুঝি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গলের কথা নাই। ততদিন পর্য্যন্ত ঐ অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছি। ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি যিনি, তিনি এ জগতে যে কোন অবস্থায় থাকতে পারেন, সম্ভব। কিন্তু আমরা ত' তাঁকে চিনি না, জানি না, বুঝি না, তাঁর সন্ধান জানি না। যখন জানব, তখন কিছু করব। তার আগে পর্য্যন্ত কি করব? সারাজীবন চলে যাচ্ছে এইভাবে আমাদের। তত্ত্বদর্শন লাভ করতে পারছি না আমরা। বৃথা সময় আমাদের চলে যাচ্ছে। শাস্ত্র আলোচনা করলে এসব কথাগুলো বুঝা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সব বিচারের শ্রেষ্ঠ বিচার দেখিয়েছেন। কেমন করে ভগবান্‌কে ভালবাসতে হয়, তার বিচার ভাগবত দেখিয়েছেন। এই ভাগবত আলোচনা করলে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা হয়ে যায়। এই ভাগবত প্রকাশিত হয়েছেন পৃথিবীতে এখন থেকে প্রায় ৫,১০০ বৎসর পূর্ব্বে। বহু টীকা-টীপ্পনী এঁর বিভিন্ন ভাষায়। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলছেন? তোমরা হরিভজন কর, তোমাদের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। এর থেকে মঙ্গলের বিষয় আর কিছু নাই। সেইটাই ভাগবতের বিচার।

এতাবদের জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।

সাতটী শ্লোক নিয়ে প্রথম ভাগবত। ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছেন এই উপদেশ। তারপর তার বিস্তৃতি এসেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি ভাগবত প্রকাশ করেছেন পরে বিস্তৃতভাবে। সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন তিনি। বেদ বিভাগ করেছেন—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব। বেদের ব্যাখ্যা দিলেন, তার নাম উপনিষৎ। ১১৮০ খানা উপনিষৎ হল। কে আলোচনা করবে এত উপনিষৎ। সংক্ষেপ করে দিলেন ১২ খানা।

ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তৈত্তিরী।
ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।।

এর সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ও কৌশিতকী উপনিষৎ। তারপর আবার তার ব্যাখ্যা। এত শাস্ত্র প্রণয়ন করেও জীবকল্যাণের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। খুব দুঃখ-কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা জগতের লোক পাচ্ছে। তিনি তাদের কল্যাণচিন্তা করে এইসব শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন—বিভিন্ন অধিকারীর জন্য উপদেশ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

সব। বিষণ্ণ বদনে তিনি বদরিকাশ্রমে বসে আছেন। এমন সময়ে নারদঋষি হাজির হলেন ব্যাসদেবের কাছে। কি ব্যাস! তুমি মন খারাপ করে বসে আছ কেন? কি হল? কি করব প্রভু, আপনি আমার গুরু, আপনি বলুন আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি। এত কাজ করলাম জগতের জন্য, অথচ আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি, আমার মনে শান্তি নাই। নারদঋষি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি তোমার কষ্টের কথা। তুমি জীবকল্যাণের জন্য বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করেছ, একথা সত্য ; কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণের মহিমা-মাহাত্ম্য তুমি যথেষ্টরূপে বলতে পার নাই। এইটাই তোমার মানসিক অশান্তির কারণ। সেই অনুসারে ঐ ব্রহ্মাজীকে যে উপদেশ করেছেন, সেই উপদেশের Point নিয়েই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করলেন। (ক্রমশঃ)

নিন্দা

'নিন্দা'-শব্দে ব্যাকরণগত অর্থ হইল নিন্দ্ + আপ্, বিণ্ স্ত্রী। নিন্দ-ধাতুর সহিত আপ্ প্রত্যয় করিয়া নিন্দা-শব্দ প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্তে আপ্ প্রত্যয় হয়। নিন্দ্ + আপ্ (প্ ইৎ) হইয়া এবং সন্ধি করিয়া নিন্দা শব্দ প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিন্দা অর্থে বুঝায় কুৎসা, গর্হা, অপবাদ, নিন্দা করা, দোষারোপ করা, তিরস্কার করা, গালি দেওয়া।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী হইতে পাই, আমাদের দেশে একটী কথা প্রচলিত আছে—"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।" তাই আমরা বলি—প্রত্যেকদিন সকাল বেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ ঘা জুতা আর পাঁচশ ঘা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে—"মন, তোমার পরচর্চ্চা করিয়া কি লাভ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?" "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে।" "সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।"

"পরচর্চ্চা-শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বর-বিমুখজনের চর্চ্চা বুঝায়। উহাদ্বারা আত্মার অমঙ্গল হয়। কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চাদ্বারা আত্মমঙ্গল হইয়া থাকে। True sincerity (ঐকান্তিক সরলতা), True punctuality (ঐকান্তিক সময়নিষ্ঠতা), আর Seeming sincerity (কৃত্রিম সরলতা) ও Seeming punctuality (কৃত্রিম সময়নিষ্ঠা) কখনও এক হইতে পারে না। সাধু ও অসাধুর বিচার এক নহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের কথায় না থাকিয়া অন্য কথায় প্রবেশ করিলে হাজারীবাগ-প্রবাসী মিছাবাবাজী হইয়া গেলাম—হরিভজন হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুটি পাইলাম।"

নিন্দা দুই প্রকার হইতে পারে—(১) আত্মনিন্দা ও (২) পরনিন্দা। আত্মনিন্দার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, পরনিন্দাদ্বারা অমঙ্গল ঘটে। আত্মনিন্দাদ্বারা আত্মস্তুতি থেকে বেশী মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু পরনিন্দার দ্বারা নিন্দাকারীর অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। নিন্দাকারীর নিন্দনীয় বিষয় লক্ষ্য করিলে উহাতে পাপ হইতে অপরাধের দিকে গতি করায়। সেইজন্য শাস্ত্রাদিতে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু সবাইকে উদ্ধার করিবেন, পরচর্চ্চক ও দুরাচার ব্যতীত। পরচর্চ্চকের ভগবদভিনিবেশ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। ইহাই তাহার লোকসানের বিষয়। অতএব পরচর্চ্চা হইতে বিরত হইতে পারিলে আমাদের আত্মচর্চ্চা শুরু হইবে। আত্মচর্চ্চা সর্ব্বদা ভক্তগণকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য সাহায্য করে। পরচর্চ্চা ভগবান্ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া দেয়।

শ্রীমন্নারদীয় পুরাণ হইতে পাই,—

প্রকটং পতিতং শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি।।

প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে। কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজকে এবং অপরকে নরকে পাতিত করে। যে-ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পতিত বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, সে বরং ভাল ; কেননা, সে কেবল একাকী নিজেই অধোগামী হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তি সাধুর বেষ অবলম্বনপূর্ব্বক কনক-কামিনী সংগ্রহের আশায় জীবন ধারণ করে, অর্থকেই যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে, এইরূপ মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ (মহাপাপিষ্ঠ) বকধার্ম্মিক ব্যক্তি অপর লোক-গণকেও অধঃপাতিত করিয়া থাকে। সাধারণ লোকও ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া যায়। সেইজন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পতিত বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, সে বরং ভাল ; কিন্তু বকধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বয়ং পতিত হয় এবং অপরকে পাতিত করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
চারিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাদৈরেবং বকব্রতাঃ।।

দস্যুগণ ঘরের বাহিরে নির্জ্জনস্থানে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা বিমোহিত করিয়া লোক-গণের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে। বকধার্ম্মিকগণও তদ্রূপ পবিত্র চরিত্রবিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আচরণরূপ (ধার্ম্মিকদিগের পোষাকাদি ধারণরূপ) অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহদ্বারা মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক লোকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।। (ভাঃ ১২।৩।৩৮)

কলিতে শূদ্রগণ তপস্যার বেষকে উপজীবিকা করিয়া দানাদি গ্রহণ করিবে। ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞগণ আচার্য্যের আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভালমতে।।
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৪৩-১৪৪)

স্বীয় মঙ্গলের জন্য লোক তপস্বী বা সাধুকে দর্শন করিতে আসিয়া ভণ্ড তপস্বীর মুখে সাধুনিন্দা শুনিয়া সংসার-সাগরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধুনিন্দাদ্বারা সুকৃতি ক্ষয় হয়। প্রতিজন্মে অধঃপতিত হইয়া সংসার-সাগরে দুঃখ-কষ্ট পায়। বেদ শাস্ত্র হইতে ইহাই নির্ণয় হয়।

বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৫)

নিন্দাকারী ব্যক্তি অন্য লোককে প্রতি জন্মে এবং প্রতিক্ষণে সংহার করিয়া থাকে। সাধুনিন্দা শ্রবণের ফলে যে-অপরাধ জন্মে, সেই অপরাধের ফলে জন্মে জন্মে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়।

অতএব নিন্দক-তপস্বী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অত্যন্ত দুরাচার।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৬)

অতএব নিন্দক তপস্বী বাটোয়ার (বাটোয়ারের তুল্য, বাস্তবিক তুল্য নহে, নিন্দক তপস্বী) হইতেও অত্যন্ত দুরাচার। অথবা নিন্দক তপস্বী এবং বাটোয়ার—এই দুইজনের মধ্যে নিন্দক তপস্বী বাটোয়ার হইতেও অত্যন্ত দুরাচার।

আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট, কহে শাস্ত্র সব।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৭)

স্তম্ব—ক্ষুদ্র—তৃণ। আব্রহ্মস্তম্বাদি বলিতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণাদি পর্য্যন্ত। নিন্দামাত্র ইত্যাদি আব্রহ্মস্তম্বাদি কৃষ্ণের বৈভব বলিয়া তাহাদের কাহারও নিন্দামাত্রেই যে কৃষ্ণ রুষ্ট হয়েন, এ কথা সমস্ত শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন।

চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৪৯)

চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াও যে নিন্দা করে, জন্মে জন্মে কুম্ভীপাক নরকে ডুবিয়া সে মরে।

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৫০)

ভাগবত পড়িয়াও যে ব্যক্তির বুদ্ধিনাশ হয় এবং নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তার সর্ব্বনাশ হয়।

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব।।
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩১১-৩১২)

যিনি কাহাকেও নিন্দা করেন না এবং সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলেন (কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন), তিনিই হেলে (অনায়াসে) অজয় (যাঁহাকে কেহ জয় বা বশীভূত করিতে পারে না), সেই চৈতন্যকে বশীভূত করিতে পারিবেন।

'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সমান ভাগবত-ধর্ম্ম হয়।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩১৩)

নিন্দায় নাহিক লভ্য—নিন্দায় কিছু লাভ হয় না। কাহারও নিন্দা করিতে গেলে তাহার যে-সকল দোষের উল্লেখ বা চিন্তা করা হয়, সে-সকল দোষেই চিত্তের আবেশ জন্মে ; তাহাতে নিজের ক্ষতি হয়, ভগবানের বা পরমার্থভূত বস্তুর প্রতি মন যাইতে পারে না। জীবমাত্রের প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্মান-প্রদর্শনই হইতেছে ভাগবত-ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম ; ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়রূপ ধর্ম্ম (সাধন-ধর্ম্ম)। শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে কথিত ভাগবত-ধর্ম্ম "সমান" স্থলে "সম্মত"—তাৎপর্য্য-নিন্দায় যে কোন লাভ নাই, তাহা সমস্ত শাস্ত্রই বলেন এবং তাহা সমস্ত মহাজনগণেরও সম্মত। ইহাই নিমি মহারাজের নিকটে ভাগবত-ধর্ম্ম-কথন-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধও "অনিন্দার অর্থাৎ নিন্দাত্যাগের" উপদেশ দিয়াছেন। "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।।" (ভাঃ ১১।৩।২৬) নিন্দাত্যাগও ভাগবত-ধর্ম্মের একটী অঙ্গ।

জীবমাত্রের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়।

"অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বং তদ্বিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ।। (ভাঃ ৬।৪।১৩)

"সকল ভূতের (জীবের) দেহাভ্যন্তরে আত্মারূপে ভগবান্ হরি বিরাজিত ; অতএব সকল জীবকেই ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান বলিয়া অবলোকন করা কর্ত্তব্য। কাহার প্রতি দ্রোহাচরণ কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ করিলেই ভগবান্ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন,—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।। (ভাঃ ১১।২৯।১৬)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

ইনি মহান্ হইয়াও অতি নীচকে প্রণাম করিতেছেন—এইরূপ ভাবিয়া যে-সমস্ত স্বজন তোমাকে উপহাস করে, তাহাদিগকে এবং দৈহিকী দৃষ্টি এবং তজ্জন্য লজ্জা অর্থাৎ আমি উত্তম, আর এইটী অতি নীচ, কিরূপে আমার প্রণম্য হইতে পারে? নিজের দেহসম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টি এবং এইরূপ দৃষ্টির ফলে উদ্ভূতা লজ্জাকে বিসর্জ্জন করিয়া (সকলের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন মনে করিয়া) কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও খর পর্য্যন্ত সকল জীবকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।"

ভক্তিযোগ-কথন-প্রসঙ্গে ভগবান্ কপিলদেবও বলিয়াছেন,—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।" ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া মনের দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সকল প্রাণীকেই প্রণাম করিবে।" এস্থলে "ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টঃ'—এই বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"জীবানাং কলয়া পরিকলনেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২০।২০)
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই অন্ত্যখণ্ডে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিরূপে লিখিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।।
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯)

প্রতি জীবের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ বিরাজিত বলিয়া প্রতি জীবই হইতেছে ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। শ্রীমন্দির সকলের নমস্য।

অনিন্দুক হই' যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪৬)

যিনি নিন্দাবর্জ্জিত হইয়া বা নিন্দাশূন্য হইয়া একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, সত্যস্বরূপ ভগবান্ সত্যসত্যই তাঁহাকে অনায়াসে বা অবলীলাক্রমে তাঁহার শ্রীচরণপদ্মে স্থান প্রদান করেন।

—শ্রীপ্রেমপ্রদীপ ব্রহ্মচারী

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪০৯ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০৩

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ২৯ মধুসূদন, কারণোদশায়ী, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪১০, ইং ১৫/৫/২০০৩ { ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনবাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেয়সীং
স্বীয়-প্রাণপরার্দ্ধ-পুষ্প-পটলী নির্ম্মঞ্ছ্যা তৎপদ্ধতিম্।
প্রেম্না প্রাণ-বয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।১।।

যিনি স্বীয় প্রাণসমূহ-রূপ পুষ্পশ্রেণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ আরতি বা পরিষ্কার করিতেছেন, যিনি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয়তমা, প্রাণবয়স্যা ললিতাকর্ত্তৃক যিনি প্রেমদ্বারা সংলালিতা এবং বিশাখাকর্ত্তৃক যিনি পরিহাস-বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে পরিষিক্তা, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী গোষ্ঠবনেশ্বরী গৌরী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।১।।

স্বীয়-প্রেষ্ঠ-সরোবরান্তিক-বলৎ-কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুব্ধ-মধুপশ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে।
মাদ্যন্মন্মথ-রাজ্য-কার্য্যমসকৃৎ সম্ভালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।২।।

সৌরভশালী পুষ্পের মকরন্দ-পানে অত্যন্ত মুগ্ধ মধুপ-শ্রেণীর মনোহর শব্দে যাহা সুশোভিত—এমত স্বীয় প্রিয়তম রাধাকুণ্ড-সমীপে বিরাজিত কুঞ্জমধ্যে কন্দর্প-রাজমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি উন্মত্ত মন্মথরাজ্যের কার্য্যসকল নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।২।।

কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গা-সুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ।
ফুল্লৎ স্মের-সখীনিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ সুধা-স্বাদন-
লব্ধোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৩।।

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গদ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত কন্দর্পহেতু নৃত্য করিতেছে, যিনি বাক্য-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে কামসমর হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হাস্য-বদনা বয়স্যাগণের প্রদত্ত স্বীয় অভিলাষরূপ অমৃত পান করত অতিশয় উন্মাদে গর্ব্বিতা হইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৩।।

জিত্বা পাশক-কেলি-সঙ্গরতরে নির্ব্বাদ-বিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ-গর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষৎ শোণ-দৃগন্ত-কোণমুদ্রয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৪।।

"পাশ-ক্রীড়ায় জয়ী হইলে তুমি বারদ্বয় মদীয় বিম্বাধর-গ্রহণে অধিকারী"—শ্রীরাধিকার এই পণ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ পাশক্রীড়ারূপ মহাসংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিয়া সানন্দে ও সগর্ব্বে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত তদীয় অধর-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যে শ্রীরাধিকা ঈষৎ কটাক্ষ, রোমাঞ্চ, কম্প ও মধুর হাস্য বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-কমলদ্বারা আঘাত করিতেছেন ; হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৪।।

অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্।

প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদ্রা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৫।।

যিনি বকারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর সমর্পণপূর্ব্বক তদীয় সুসখ্যভাবে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া অভিনব বসন্তসম্ভূত নবকাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতি-সহকারে শীঘ্র প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে সুবিস্তীর্ণ নূতন পল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপ-লক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৫।।

মিথ্যা-স্বাপমনল্প-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিতং-স্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৬।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের গুহামধ্যে বিবিধ পুষ্পরচিত শয্যায় অলীকভাবে নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা অগ্রে মুরলী হরণ করিয়া পশ্চাৎ মালা হরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তদীয় কণ্ঠের অধঃপ্রদেশ স্পর্শ করায় যিনি ভয়প্রযুক্ত পলায়নে উৎসুক হইয়া দুইহস্তে কুচদ্বয়কে দমন অর্থাৎ নিজায়ত্তী-ভূত করিয়াছিলেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৬।।

তূর্ণং গাং পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্যৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্।
শ্যামং শ্যাম-দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মা-ম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৭।।

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গোবৎস-সকল অগ্রে করিয়া শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে চঞ্চল যুবতীবৃন্দের অভিলষিত নেত্র-নটনদ্বারা শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন, যিনি এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বীয় দৃষ্টি-বিলাসদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করিতেছেন এবং যাঁহার আবির্ভাবে স্বীয় সৌভাগ্য প্রকটন-হেতু চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার গ্লানি উপস্থিত হয়, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশলিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৭।।

প্রোদ্যৎ কান্তি-ভরেণ বল্লব-বধূতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বল-রসে রাসে লসন্তীরপি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ।।৮।।

উজ্জ্বল-রসবিশিষ্ট রাসলীলাতেও যাঁহাদিগের শোভা সতত দেদীপ্যমান, তাদৃশ গোপ-বনিতারূপ অসংখ্য তারকাগণকে যিনি প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বলকান্তিদ্বারা মলিন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ উৎকৃষ্ট ও ধন্য গগনপ্রান্তে অনুরাধারূপে বিবিধপ্রকারে সেবিতা হইয়া গোবিন্দ-রূপ চন্দ্র-সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর।।৮।।

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্বা গদ্গাদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধা-বল্লরীং
সেবোদ্রেক-রসেন গোষ্ঠ-বিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি।।৯।।

যে সুকৃতিমান্ ব্যক্তি ভূমি-নিপতিত হইয়া স্থির বুদ্ধিতে প্রীতি, কাকু ও গদ্গাদ-স্বরে স্পষ্ট করিয়া অর্থবোধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করেন, তিনি গোষ্ঠ-বিপিনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর যাঁহাতে মত্ত হইয়া ঘূর্ণন করিতেছেন, সেই বিলাসশালিনী রাধারূপ অমৃত-লতাকে প্রেম-সহকারে সেবারূপ উদ্রিক্ত-রস-দ্বারা সেচন করেন।।৯।।

সম্বন্ধ-বিচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

জীব, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ"-গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু-রূপে জীব-স্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণের ঐ পঞ্চাশটী গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, **এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ-বিচার।** নিম্নলিখিত "ভগবদ্গীতার" শ্লোক চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।
এতদ্‌যোনীনি ভুতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। (গীঃ ৭।৪-৭)

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চ তত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতপ্রোত-ভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ। মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্।

জীব ও জড় জগৎ শক্তি-পরিণত—বিবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-পরিণত নহে

ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাবক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তি-পরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্তদ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণামবাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহারা পরাশক্তির ক্রিয়া-পরিণামদ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্ন তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ-সমুদায় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এবং জীবের বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির উপায়

সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হয় যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্ত্বায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎ সত্ত্বার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য-বিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্যবস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায়, পরমেশ্বরগত প্রীতি-ধর্ম্মের বিকারই বিষয়-রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃতরাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজনা করাই শ্রেয় যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যে-কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবনযাত্রা-রূপ জড়সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে ; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। **ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য।** জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎ-সেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কার গৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারা-রক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ-সেবা ; ইহা "গীতাতে" কথিত হইয়াছে। যথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তি-বিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কে?

উঃ—শ্রীচৈতন্যদেব দু'হাজার না হাজার বৎসরের নহেন। তিনি সনাতন বস্তু। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি অনাদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি কালে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কাল তাঁহা হ'তেই উদ্ভূত। তিনি নিত্য বস্তু—বিভু বস্তু। তিনি হাড়-মাংসের থলে নহেন। তিনি পুরাণ পুরুষ। তিনি পুরুষ—কর্ত্তা, তিনি সমগ্র আত্মজগতের পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তু, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। তিনি অবতারী, তিনি মহা-ভগবান, পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত প্রভূত দয়া বিতরিত হয় নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য, ইহা অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজেকে নিজে দিয়ে দেওয়া। এরূপ দানের কথা কখনও শুনা যায় নাই।

তিনি যে প্রেম দান ক'রেছেন, তার সৌন্দর্য্য দর্শন কর্‌তে কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী অসমর্থ ; কিন্তু ভাগ্যবান্ যে কেহ তা' লাভ কর্‌তে সমর্থ। এইজন্য আমি

বলি—আপনাদের যত রকম ধরণের বিচার আছে, সব ছেড়ে চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ কর্‌বার জন্য সময় দিন। সাধারণ মনুষ্য হ'তে যাঁর বিশেষত্ব, তাঁর কথা শ্রবণে সময় দিলে প্রকৃত শান্তির পথ ভগবদ্-উপাসনা উপস্থিত হবে। তখন ভগবানকে পুত্র-ভাবে পালন কর্‌বার প্রবৃত্তি হবে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বিবাহাদি দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণতা বা শান্তি লাভ কর্‌বার যে বিচার উপস্থিত হয়, সে-স্থানে ভগবান্ উপস্থিত হ'লে অনিত্য জ্ঞানে মাতার পুত্রের প্রতি পুত্রজ্ঞান প্রভৃতি দূর হবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎ-পাদপদ্মে নিযুক্ত কর্‌তে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেইভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত কর্‌বার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্-বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না।

ভগবদ্বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়, তাঁকে জান্‌বার জন্য কত স্থানেই না ছুটছি। কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে গৌরাঙ্গরূপে আমাদের নিকট যে কথা বল্‌তে এসেছিলেন, তা' না শুনে অন্য চেষ্টা করলে আমরা কি ক'রে লাভবান্ হতে পার্‌ব?

প্রঃ—গীতায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এত বড় কথাকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এহো বাহ্য—একথা কেন বল্‌লেন?

উঃ—মহাপ্রভু গীতায় এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর"—এ কথা রায় রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেননা, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা'তে ভগবান্‌কে বলে ক'য়ে প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়ে ভক্ত কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হয় না। ভক্ত প্রীতিবশতঃ স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত কর্‌তে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা কর্‌বে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এ স্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে—নিজের নিত্য স্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এইজন্যই মহাপ্রভু এত বড় কথাকে 'এহো বাহ্য' ব'লে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্ব্বোত্তম ব্রজভজনের কথা জান্‌বার জন্য যত্ন ক'রেছেন।

প্রঃ—পরীক্ষা জিনিষটা কি দয়া?

উঃ—ছাত্রগণকে উন্নত শ্রেণীতে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষকগণ কৃপা ক'রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মনোযোগী, বুদ্ধিমান্ ছাত্রের পক্ষে পরীক্ষা আনন্দপ্রদ। পাঠে অমনোযোগী ছাত্রই পরীক্ষা দেখে ভীত ও দুঃখিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

যাঁরা ভোগের কথা প্রচার করেন, লোকের রুচির অনুকূলে কথা বলেন, তাঁদের কোন বিপদ্, অসুবিধা বা বাধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা বল্‌তে গেলে প্রতি পদে পদে বিপদ্ লাভ হয়—পদে পদে অসুবিধা এসে নিরুৎসাহিত কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁরা ভক্তি-পথাশ্রিত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ্‌বেন—সে বিপদ্, সে অসুবিধা বা সে বাধা আমাদের প্রভুভক্তি বা প্রভুসেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা কর্‌তে এসেছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবা-পথে অগ্রসর হ'বার সহায়তা কর্‌তে এসেছে। এই সময় নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ ক'রে দৃঢ়চিত্ত থাক্‌তে হ'বে। মানুষ অনিত্য বস্তু লাভের জন্য ব্যস্ত হ'তে গিয়ে শত শত জন্ম বঞ্চিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখেও মানুষ যদি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বাধাবিপত্তিতে বিহ্বল না হ'য়ে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তে পারে, তা' হ'লে বুদ্ধিমান্ জনগণ—মহাভাগ্যবান্ ভক্তগণ কি ত্রিকাল-সত্যবস্তুর জন্য—ভগবানের জন্য এই নশ্বর জীবন নিযুক্ত কর্‌তে পার্‌বেন না?

প্রঃ—লোক তীর্থে যায় কেন?

উঃ—ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই তীর্থ। সুকৃতিমন্ত জনগণ ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবা লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পাপী লোকগণ পাপ-প্রবৃত্তি প্রবলা রেখে সাময়িক পাপ-প্রক্ষালন ও জড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থগমন ক'রে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপমলিন তীর্থকে তীর্থীভূত কর্‌বার জন্য তীর্থ-ভ্রমণের লীলা করেন—স্বানুভাবানন্দে প্রভুসেবা-প্রমত্ত হ'য়ে বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান ক'রে থাকেন।

প্রঃ—ভোগ ও ত্যাগ দুইই কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—মহাপ্রভু ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ই বর্জ্জন কর্‌তে ব'লেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারা জড় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাক্‌লেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর। ত্যাগ বা বিরাগ খুব ভাল ; কিন্তু যে বিরাগ বা ত্যাগে 'নেতি নেতি' ক'রে ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছেন, সে ত্যাগ ত' ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁরা মিথ্যা বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁদের বিচার ভ্রান্তিপূর্ণ ; কেন না, তা'তে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব সত্য, কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নশ্বর-ধর্ম্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্‌গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের সম্পর্ক বা অন্তরাবস্থিতি দেখ্‌তে দেয় না, পরন্তু

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবাপকরণ, তা' বুঝ্‌তে অবসর দেয় না এবং ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে।

বিষয়সমূহ বিশ্বের বৈভব। সেই রূপরসাদি বিষয় আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হবে না—বিরতি লাভ কর্‌বে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য-ইন্দ্রিয়সংযম ক'রে বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সেজে থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন তাহার মানস ইন্দ্রিয়দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়-ভোগেই বিভোর হ'য়ে থাকে। আর যদি কেহ বৈরাগ্য-লাভের জন্য বিষয়-গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত হন, তা' হ'লে বৈরাগ্য-লাভের পূর্ব্বেই বিয়োগদুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে।

ভক্ত বিষয়কে ভোগ্য বা ত্যাজ্য না জেনে ভগবৎ-সেবোপকরণজ্ঞানে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত বিষয়ে অনাসক্ত থেকে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সেবকাভিমানে সতত ভগবৎ-সেবাই করেন। ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নহে। সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবায় বিভোর। আর ভাগ্যবান্ বদ্ধ আত্মা বদ্ধাবস্থা হ'তে শুদ্ধ বা মুক্ত হ'বার জন্য ভগবৎ-প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে বা স্বসুখার্থ ব্যবহার করেন না, ত্যাগানুকূলেও ত্যাগ করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। **(ক্রমশঃ)**

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৩০]

শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীভগবান্‌কে পরমতত্ত্বরূপে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার শক্তিদ্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রথমা শক্তি শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম উপাস্যা, শ্রীভগবানের আত্মভূতা ; আর দ্বিতীয় শক্তি জগৎরূপে পরিণতা মায়ালক্ষণা-শক্তি। পূর্ব্বোক্ত স্বরূপভূতা শক্তিতে লক্ষ্মী-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনামে বিখ্যাত, সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তি কি নামে প্রসিদ্ধা তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

মথুরা, দ্বারকাপুরীতে সেই শক্তির 'মহিষী' আখ্যা। তাপনী শ্রুতিতে শ্রীরুক্মিণী-দেবীর স্থিতির উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে শিবগৌরী-সংবাদে প্রভাস-খণ্ডে গোপ্যাদির মাহাত্ম্যে দেখা যায়—পূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ছাপান্ন কোটিসংখ্যক যাদব এবং ষোড়শ সহস্র গোপী সমাগত হইয়াছিলেন। এক লক্ষ ষাট হাজার শ্রীকৃষ্ণপুত্রও আসিয়াছিলেন। হে মহাদেবি! বিদ্যারূপিণী যে ষোড়শ গোপী আছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—

লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণী, নন্দিনী, শোকা, সুবিমলা, ক্ষরা, শুভদা, শোভনা, পুণ্যা, হংসশীতা ও মালিনী। প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র কলাসকলে সঞ্চরণ করে। এই যে গোপীরূপা ষোড়শ কলার কথা বলিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সহস্রসংখ্যক ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমাকে জ্ঞান সম্ভব রহস্য বলিলাম। যিনি ইহা অবগত আছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন।

এস্থলে গোপী অর্থে রাজ্ঞী। নাম-লিঙ্গানুশাসনে গোপ অর্থে ভূপ, গোপের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী বলিয়া ভূপের পত্নী রাজ্ঞী। লম্বিনী অবতার শক্তি। হংসশীতা—হংস এব জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ হংস অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শীতা—শীতলকারিণী, আনন্দদায়িনী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপ, শক্তিসকল কলারূপা। প্রথমে পঞ্চদশ শক্তির কথা বলিয়া অন্তিমে মালিনীর নামোল্লেখ। মালিনী সম্পূর্ণ মণ্ডলা। ইনি কলাশক্তির সমষ্টিরূপা। এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যারূপা।

ক্রূরা, ভীষণী ও শোকা নামের সার্থকতা কিরূপে হয়? তদুত্তর—'মল্লগণের অশনি', 'ভোজপতির মৃত্যুস্বরূপ' এবং 'অসদ্‌গণের শাসনকর্ত্তা' ইত্যাদি বাক্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কংসবিনাশকত্ব ও অসৎ শাসকত্ব বিশেষণ প্রতিপাদিত হয়, তদ্রূপ শক্তিগণের নামেরও নিরুক্তি (অর্থ) উপপন্ন হয়। আনন্দরূপা শক্তি অধিকারিবিশেষে ক্রূরা ইত্যাদিরূপে প্রতীতা হন। যেমন সূর্য্যরশ্মি যাবতীয় প্রকাশক হইলেও পেচকের নিকট অন্ধকার ব্যক্ত করে, সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি যেমন গৃহকর্ম্ম আচরণ করে, নিজ কামসংপ্লুত অচিন্ত্য শক্তিময় শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মহিষীগণের সাম্যাতিশয়রহিত গৃহে অবস্থিত হইয়া রমাগণের সহিত রমণ করেন। (ভাঃ ১০।৫৯।৩২)

রমা—লক্ষ্মীর অংশভূতা, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিরূপা বলিয়াই তাঁহাদের সহিত রমণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরমানন্দ-শক্তিবৃত্তি-বিশেষোদয়রূপ প্রেমবিশেষ-স্বরূপ যে কাম তদ্দ্বারা সংপ্লুত—ব্যাপ্ত ; অর্থাৎ ইহা প্রাকৃত কাম নহে—নিজ কাম, নিজজন বিশেষে যে প্রেমবিশেষ তাহাই কাম। ষোড়শ-সহস্র দ্বারকা মহিষীই যখন স্বরূপশক্তি বলিয়া নিশ্চিত হইলেন তখন অষ্ট পট্টমহিষীর স্বরূপশক্তিত্ব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে সত্যভামার ভূশক্তিত্ব নমুনার কৃপাশক্তিত্ব পাদ্মোত্তর খণ্ডে দেখা যায়। হরিবংশের সত্যভামার সৌভাগ্যাতিশয়ত্ব ও ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিণী দেবীর কুটুম্বাধীশ্বরীত্ব দেখা যায়। স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ রূপহেতু রুক্মিণীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ—

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরুদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে।। (ভাঃ ১০।৫২।১৬)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দ শ্রীর মাত্রা ভীষ্মকরাজতনয়া রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

বিবাহ করিয়াছিলেন। এস্থলে মাত্রাপদটী উনাদি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। তদর্থ অন্তর্ভূত হওয়া। শ্রী—লক্ষ্মী অন্তর্ভুক্ত হন ইঁহাতে, এই অর্থে অধিকরণ বাচ্যে বাহুল্যে ত্রন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ; সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ-প্রেয়সী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীর অন্তর্ভাবাস্পদ অংশিনী বলিয়া এই রুক্মিণীই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণা (লক্ষ্মী)।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য,—

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্ম তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ।। (ভাঃ ১০।৬০।৪৩)

অতএব, হে জগতের অধীশ্বর, ইহ-পরকালের সর্ব্বাভীষ্টপূরক, ভজনযোগ্য আত্মা সেই আপনাকে ভজন করিয়াছি। যে আপনাকে ভজন করে, তাহার সংসার-সন্তাপ দূর করিয়া তাহাকে আপনি আত্মসাৎ করেন। সংসার-পথে ভ্রমণশীলা আমার যেন আপনার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরেও যেন আপনার চরণসেবা করিতে পারি। এই শ্লোকে তিনি নিত্য প্রেয়সী হইয়াও জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রার্থনাদি বাক্য কলিতেছেন। ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি মাত্র।

বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভক্ত ও ভগবানের অপকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। যে বাক্যে অপকর্ষ ব্যক্ত হয়, সেই বাক্যেই অর্থান্তরদ্বারা উৎকর্ষ খ্যাপন করেন; সুতরাং রুক্মিণীর উক্ত 'স্মৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা'—সংসার-পথে ভ্রমণশীলা' এস্থলেও 'আপনার পদবী অনুসরণ করিয়া ভ্রমণশীলা' ইহাই বাস্তব অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিচিত্র লীলাবিনোদার্থে দেব-মনুষ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন, ইনিও তদনুরূপ হইয়াই অবতীর্ণ হন। এ বিষয়ে প্রমাণ,—

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। (বিষ্ণুপুরাণ)

দেবরূপে লীলাকারী বিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবরূপিণী, আর মনুষ্যরূপে লীলাকারী হরির সঙ্গে মনুষ্যরূপিণী।

শ্রীরুক্মিণীরও উক্তি,—

যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা। (ভাঃ ১০।৬০।৪৬)

জগতের বৃদ্ধিনিমিত্ত আপনি অতিমাত্র রজঃ (রজোগুণ) অবলম্বন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করেন। এই বাক্যে রুক্মিণীদেবী নিজেকে গুণময়ী প্রকৃতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; কারণ, জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ বর্দ্ধন জন্য পুরুষ রজোগুণ অঙ্গীকার করিয়া গুণময়ী প্রকৃতিতে নিরীক্ষণ করেন। বাস্তবার্থ—শক্তি-শক্তিমান অভেদ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

তজ্জন্য স্বাভাবিক রতি বিদ্যমান থাকিলেও রত্যাখ্যভাবের বৃদ্ধিনিমিত্ত অঙ্গীকৃত রাগাতিশয্যে (রজোঽতিমাত্রায়) যখন আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন অর্থাৎ ভাবের সহিত অবলোকন করেন, তখন আমাদের প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।

রুক্মিণী-প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীভগবানের উক্তিতেও দেখা যায়,—

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। (ভাঃ ১০।৫৩।২)

আমার চিত্তও রুক্মিণীকে অর্পিত বলিয়া রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। অতএব রুক্মিণীদেবী তাঁহার স্বরূপশক্তি—ইহাই প্রমাণিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা

'উদারতা'র সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ 'সঙ্কীর্ণতা'। যিনি উদারচেতা, তিনি কখনও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইতে পারেন না ; আবার যিনি সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ, তাহার মধ্যে কখনও উদারতা থাকিতে পারে না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই মুড়ি-মিছরির একদরের ন্যায় 'উদারতা' ও 'সঙ্কীর্ণতা'কে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। বরফের ধর্ম্ম কখনও শৈত্য, কখনও উষ্ণ যেরূপ হইতে পারে না, তদ্রূপ একই ব্যক্তির মধ্যে একাধারে উদারতা ও সঙ্কীর্ণতার সহাবস্থান অসম্ভব। ভেরেণ্ডা বনে শৃগাল যেরূপ ব্যাঘ্র বলিয়া গৃহীত হয়, তদ্রূপ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকটই সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণ উদার হৃদয়ের পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেন। ইহজগতে সঠিক-বেঠিক সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া অনেকের শিশুসুলভ ভ্রান্তি অনেক সময় দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা কোন বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করা অসম্ভব। বহির্দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া অন্তর্দর্শনে প্রবেশ করিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারা যায়।

'উদারতা' বলিতে সাধারণতঃ বদান্যতা, মহত্ত্ব, মহানুভবতা, ভদ্রতা, সাধুতা প্রভৃতিকে বুঝায় ; আর ক্ষুদ্রতা, নীচতা, লঘুতা প্রভৃতি অর্থে 'সঙ্কীর্ণতা'-শব্দ ব্যবহার করা হয়। যে নীতির দ্বারা জগতের সকলের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা উদারনীতি। উদারনীতিরই অপর নাম সার্ব্বজনীন নীতি। যে নীতি সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা সঙ্কীর্ণনীতি বা অপ্রশস্তনীতি। সঙ্কীর্ণনীতি কখনও সার্ব্বজনীন নহে। আত্মধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত উদারনীতি ; আর দেহ ও মনোধর্ম্ম হইল সঙ্কীর্ণ-নীতির মূল ভিত্তি। মাতালকে মদের যোগান দেওয়া অথবা খুনীকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা উদারতার লক্ষণ নহে। ভোগীর ভোগে ইন্ধন

দেওয়া অর্থাৎ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধের মধ্যে গণ্য। মাংসখণ্ড দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুর পালন অথবা ছোলা দিয়া খাঁচার মধ্যে ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতির পোষণ কখনও জীবে দয়ার আদর্শস্বরূপ হইতে পারে না। কুকুর পালন অথবা খাঁচার পাখী পোষণ উভয়ই পালনকারীর শখ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি। ইহার সহিত উদারতার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? যাহারা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাকে সার করিয়াও উদারের উপাধি লাভ করিতে চাহেন, তাহারা কপট ও সঙ্কীর্ণচিত্তসম্পন্ন। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখিবার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাহাতে উদারচরিত্র লাভ করা যায় না। জগতের লোক চায়—লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা। ইহ জগতের কোন ব্যক্তিকে অপরে 'উদার' বলিয়া প্রশংসা করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। যেখানে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা নাই, সেখানে উদারতার মুখোশ খুলিয়া পড়িতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। ভগবৎসেবক মাত্রেই রাগ-দ্বেষাদিশূন্য, অতএব 'মহানুভব' এই নামের প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। মহানুভবগণ সর্ব্বদাই স্বরূপভ্রান্ত লোকের নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা নিজের গুণগান সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় অপরের নিকট গাহিয়া বেড়ান না।

মহানুভবের এই সহজ 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৮)

মহানুভবের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু, অন্যে তাঁহার উদারচরিত্রের কথা বুঝিবার যোগ্য হয় না।

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময়।। (চৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২)
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।।
(উত্তর রামচরিতমানস ২।৭)

উদারচেতা ব্যক্তির অদেয় এমন কোন বস্তু নাই। "কিং ন দেয়ং বদান্যানাম্" (ভাঃ ১০।৭২।১৯) এমন কি তাঁহারা অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

সংসারে জীবের দুঃখ-কষ্টগুলির যথার্থ কারণ হইতেছে, ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের চরম বিস্মৃতি। ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে গেলে যেরূপ যে কোন মুহূর্ত্তে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাবিমুখ মায়ার সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। কৃষ্ণবিমুখ

জীবকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করাই প্রকৃত দয়া বা উদারতা। কৃষ্ণকে ভুলিয়াই—কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়াই জীব যেহেতু সংসারে দুঃখ-কষ্ট পাইতেছে, সেইহেতু ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণোন্মুখতা জাগিলেই সে সমস্ত দুঃখের হস্ত হইতে রেহাই পাইয়া সুখী হইতে পারিবে। কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব—এই বুদ্ধিই সর্ব্বোত্তমা।

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৯৬)

কেবলমাত্র আমারই সুখ হউক, বাদবাকী সকলেরই অসুবিধা হউক—ইহা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ নীচ অন্তঃকরণের পরিচায়ক। অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুবিধা আদায় করিয়া লইবার প্রচেষ্টাই অন্যাভিলাষ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা প্রাপ্ত দেহ ও মনের সাময়িক সুখানুভূতি কখনই শান্তি দিতে পারে না।

প্রাকৃত গুণময়রাজ্যে অবস্থিত জনগণ যখন নিজের চেষ্টা অপ্রাকৃত জগতের জনগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে যান, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া প্রলাপোক্তি করিতে বাধ্য হন। আধ্যক্ষিকগণের বিচারে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রতিষ্ঠানসমূহ মন্দোদয়-দয়া বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। আধ্যক্ষিকগণের মায়িক যুক্তিসমূহ কখনও অপ্রাকৃত জগতের বস্তুতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণের অর্থাৎ নিরপেক্ষগণের রুচি, ভাষা আধ্যক্ষিক সঙ্কীর্ণতাকে কোনদিনই পোষণ করেন না। 'গোলেমালে হরিবোল' বলিবার পক্ষপাতী সমন্বয়বাদীর সঙ্গ ও উপদেশ সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। শুদ্ধভক্তগণ কপট উদারতার নামে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেন না, তাঁহারা নিত্যসত্ত্বাবিশিষ্ট অবিচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক ; সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র পরম উদার। জগতে ভগবৎ-সেবকগণ অপেক্ষা উদার আর কেহ থাকিতে পারে না। **জড়ের উদারতা—উদারতা নহে, উহা ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে উদারতার ভাণ বা কপটতা মাত্র।** সমন্বয়বাদিগণ উদারতার ছল করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির যে কোন এক জনের উপাসনা করেন। কিন্তু যাঁহাকে একবার উপাসনা করিলেন, পরে সেই উপাস্যের উপরই খড়্গ নিপতিত করিয়া তাহারা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিষ্ঠুরতার কার্য্য করেন।

সমন্বয়বাদীরা বলেন,—"বৈষ্ণবধর্ম্মে কেবল গোঁড়ামিই আছে, কোন উদারতা নাই ; যেহেতু এই ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকেই সমান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, গণেশ, শনি প্রভৃতি দেবতাগণকে সমান বলিবার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

ব্যাপারেও বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" বাস্তবিকপক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় উদারধর্ম্ম জগতে আর নাই। বৈষ্ণবগণ জগাখিচুড়ি না করিয়া দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা জগতের লোককে জানাইয়া জগতের অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম অনিত্য ও জড়জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর আত্মধর্ম্ম নিত্য এবং কাল ও মায়াতীত। সমন্বয়বাদীদিগের নিত্য ও অনিত্য ধর্ম্মকে একাকার করিবার চেষ্টার মধ্যে উদারতার কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না, বরং তাহাতে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিবার জন্য যুক্তিহীন কিছু কথা রহিয়াছে। সূর্য্যের আলোককে অন্ধকার বলিলে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া লোকে তাহা যেমন উড়াইয়া দিবে, তেমনই দুধ ও চূণগোলা জল এক করার ন্যায় অনিত্যধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্মের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে পারমার্থিকগণ তাহা কখনও মানিয়া লইবেন না। অনিত্যধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলা ঋণরাশিকে ধনরাশি বলিবার ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। সমন্বয়বাদিগণের কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতিকে এক করিবার প্রচেষ্টা শাস্ত্রবিরোধী, কল্পনাপ্রসূত ও ঘোরতম অপরাধ। কালী, শিব প্রভৃতি দেব-দেবী হইলেও কৃষ্ণ হলেন পরমদেবতা। কৃষ্ণই কেবল সেব্য, শিব-কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণই তাঁহার সেবক-সেবিকা। "একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।" প্রভুকে ভৃত্যের আসনে অথবা ভৃত্যকে প্রভুর আসনে বসাইলে প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে সন্তুষ্ট হইবেন কি? মাতাকে স্ত্রী বা স্ত্রীকে মাতা, সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে বারবণিতা বা বারবণিতাকে সতী-সাধ্বী স্ত্রী, আলোককে অন্ধকার বা অন্ধকারকে আলোক এক বলা উদারতা ত' নয়ই, বরং ঘোরতম অন্যায়। কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক যদি উদারতার পরিচয়ে সকল পুরুষকে স্বামীজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করেন, তাহা নীতি-বিগর্হিত হইবে কিনা? যেই বস্তু যাহা, তাহাকে সেই বস্তুর সম্মান দেওয়া প্রকৃত উদারতা, তাহা সঙ্কীর্ণতা নহে।

প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়া আপদ-বিপদের প্রতি উদাসীন হইয়া নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলেই আত্মকল্যাণ সাধিত হয়। প্রকৃত সত্যের সেবক হওয়া সঙ্কীর্ণতা নহে, বরং কোনটিই মানি না অথচ সবটাকেই ভাল বলিয়া চালাইবার তথাকথিত উদারতা প্রকৃত উদারতা নহে—উহা আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতা। এই আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতার হস্ত হইতে মানবজাতি উদ্ধারলাভ না করিলে তাঁহাদের বাস্তবিক মঙ্গল সুদূরপরাহত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

***

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

অলৌকিক

[৪]

শ্রীবাসের স্ত্রী নাম মালিনী। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে বিভোর। মালিনী না খাওয়াইলে তাঁহার খাওয়া পর্য্যন্ত হয় না, এমনই ব্যাপার।

মালিনী একদিন কাঁদিয়া অস্থির। নিত্যানন্দ দৌড়াইয়া আসিয়া কহিলেন,—"মাগো! কাঁদছ কেন?" মালিনী বলিলেন,—"বাবা! আমার কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্রটী কাক চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। কি করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিব?" নিত্যানন্দ বলিলেন,—"এই কথা। ইহার জন্য এত কাঁদিতেছ। মা, তুমি কাঁদিও না। আমি এখনই কাকের নিকট হইতে তোমার বাটী আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া আদেশের স্বরে কাকের উদ্দেশ্যে ডাক ছাড়িয়া বলিলেন,—"রে কাক! কে বাটী লইয়া গিয়াছিস্? শীঘ্র বাটী আনিয়া দে।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার, একটী কাক তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে করিয়া সেই ঘৃতপাত্র বাটীটী আনিয়া উঠানে রাখিয়া দিয়া উড়িয়া গেল।

[৫]

পশ্চিমবঙ্গের চাকদহের নিকটবর্ত্তী যশড়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের আগমন এক অলৌকিক ঘটনা। **শ্রীজগদীশ পণ্ডিত** কৃষ্ণলীলায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী ছিলেন। আবার ব্রজে রসকোবিদ্ চন্দ্রহাস নর্ত্তক ছিলেন বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার আবির্ভাব স্থান গৌহাটী। পিতার নাম কমলাক্ষ ভট্ট। পিতামাতার অপ্রকটের পর পত্নী দুঃখিনী ও ছোট ভাই হিরণ্যপণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাবাসের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে চলিয়া আসেন এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের সন্নিকটেই গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসবাস করেন। মিশ্রের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল। জগন্নাথ মিশ্রনন্দন নিমাইকে দেখিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যভাবের প্রকট হইল। তাঁহারা নিমাইকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এমন কি, নিমাই দুঃখিনীর স্তন্য পান করিতেন।

একদিন শিশু নিমাই কাঁদিয়া অস্থির। কোনমতেই থামান যায় না। সেদিন একাদশী-তিথি। নিমাই জিদ ধরিয়াছেন,—"জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে আজ একাদশীর দিনে বিষ্ণুর ভোগের জন্য অনেক কিছু হইয়াছে, সেই ভোগ আমি খাইব, আনিয়া দাও।"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্র আর কি করেন। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে গেলেন। গিয়া দেখেন—সেখানে একাদশীর দিনে ভগবানের ভোগের বিপুল আয়োজন। তিনি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—শিশু নিমাই কি করিয়া জানিল

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

আজ একাদশী। আবার জগদীশের গৃহে একাদশীতে বিষ্ণুর নৈবেদ্যের বিপুল-আয়োজন—ইহাই বা কি করিয়া জানিল। যাহা হউক, তিনি মনে মনে ভয় পাইলেন। এখনও ভগবানের ভোগ নিবেদন করা হয় নাই। কি করিয়াই বা বলেন, বলাটাও অপরাধ। তথাপি জগদীশকে নিমাইর ক্রন্দনের কথা জানাইলেন। জগদীশ ভাবিলেন, —"ইনি ত' যে সে বালক নন। নিশ্চয়ই নন্দনন্দন—যশোদানন্দন। আমার ভাগ্যের সীমা নাই।" এই চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোগ নিমাইর জন্য দিলেন। আর দিবেনই না কেন। তিনি যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীর অবতার। যাহা হউক, সেই ভোগ পাইয়া নিমাই স্থির হইলেন।

একসময় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীধাম পুরী গিয়াছেন। সেখানে দেখিলেন—দুই জগন্নাথ। মহাপ্রভু ও জগন্নাথদেব। জগন্নাথ দর্শনে জগদীশ প্রেমে পাগল হইয়া গেলেন। তিনি আর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে চান না। ফিরিবার সময় কাঁদিয়া অস্থির। জগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,—"জগদীশ! শান্ত হও। তোমার প্রেমে আমি বশীভূত। চিন্তা নাই। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। দুঃখ করিও না। তুমি আমার নবকলেবরের সমাধিস্থ বিগ্রহ লইয়া যাও।" এবং তদনুসারে মহারাজকে স্বপ্নে বলিয়া দিলেন—"মহারাজ! জগদীশ পণ্ডিতকে আমার সমাধিস্থ বিগ্রহ দাও।" মহারাজ জগদীশকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"জগন্নাথ আমাকে আদেশ দিয়াছেন, আপনাকে তাঁহার বিগ্রহ দেওয়ার জন্য। আপনি এই বিগ্রহ লইয়া যাউন।" এই বলিয়া তাঁহাকে নবকলেবরের সমাধিস্থ বিগ্রহ প্রদান করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার—সেই বিগ্রহ এত ভারী হইলেন যে, কাহারও নাড়িবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই। তিনি কি করিয়া লইয়া যাইবেন। এত ভারী বিগ্রহ কোনমতেই লইয়া আসা সম্ভব নয়। কাঁদিয়া অস্থির। তিনি জগন্নাথকে বলিলেন,— "বাঃ, প্রভু! আপনার আশ্চর্য্য লীলা। আপনি এত ভারী যে আপনাকে আমি কেমন করিয়া লইয়া যাই।" জগন্নাথ স্বপ্নে বলিলেন,—"চিন্তা করিও না। তুমি যখন আমাকে কাঁধে তুলিবে, তখন আমি শোলার ন্যায় হাল্কা হইয়া যাইব। একটী নূতন কাপড়ে আমাকে বাঁধিয়া একটী লাঠির দ্বারা কাঁধে করিয়া লইও। সাবধান! আমাকে যেখানেই নামাইয়া রাখিবে, আমি কিন্তু সেখানেই থাকিব, আর অন্যত্র যাইব না।" জগদীশ আনন্দে আত্মহারা। তিনি ঐ বিগ্রহকে কাপড়ে বাঁধিয়া লাঠির সাহায্যে কাঁধে চাপাইয়া লইয়া চলিলেন। আসিতে আসিতে চাকদহের নিকট যশড়া-নামক স্থানে পৌছাইলেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে সঙ্গী এক ব্রাহ্মণের স্কন্ধে বিগ্রহটী দিয়া স্নানে গেলেন। ইত্যবসরে জগন্নাথদেব এত ভারী হইয়া গিয়াছেন যে, সেই সঙ্গী ব্রাহ্মণটী আর কাঁধে রাখিতে না পারিয়া নামাইয়া রাখিলেন। আর জগন্নাথকে উঠান যায়

না। জগদীশ পণ্ডিত ভাবিলেন—ইহাও প্রভুর এক লীলা। ইনি বোধ হয় এখানেই অবস্থান করিতে চান।

এই চাকদহ কিন্তু পূর্ব্বের "রথধর্ম্ম" নামক স্থান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এই স্থানেই সম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই স্থানের নাম 'প্রদ্যুম্ননগর' হয়। পরে সগর বংশ উদ্ধারের নিমিত্ত ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিবার কালে এই স্থানে তাঁহার রথের চাকা বসিয়া যায়। সেইজন্য এই স্থানের নাম চক্রদহ বা চাকদহ হইয়াছে।

যাহা হউক যশড়ার গঙ্গাতীরে যখন জগন্নাথদেবের অবস্থানের ইচ্ছা তখন জগদীশ পণ্ডিত আর কি করেন। তিনি একটী বটবৃক্ষের নীচে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য দলে দলে ভক্ত আসিতে লাগিলেন। সেখানে সেবা প্রকাশ হইল। জগদীশ পণ্ডিত মায়াপুর হইতে সেখানের বাস উঠাইয়া যশড়ায় বসতবাটী স্থাপন করিলেন এবং জগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

[৬]

নবদ্বীপে **শ্রীগঙ্গাদাস বিপ্রের** বাস। রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি করিয়াছেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, আর নিস্তার নাই। তিনি প্রাণের ভয়ে সপরিবারে নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। অন্ধকার রাত্রে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন—একটীও নৌকা নাই। কি করিয়া প্রাণরক্ষা হয়। প্রভাত হইলে আর বাঁচিবার কোন রাস্তা নাই। রাজার লোক ধরিয়া লইয়া যাইবে। তিনি অসহায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিরাশার আশা, অকূলের কূল বিপদভঞ্জন শ্রীহরিকে আকুলপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"এমনিতেই রাজার হাতে মরিতে হইবে। তাহার চেয়ে আমি এই গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" তিনি জলে নামিতে লাগিলেন। তখন দেখিলেন—দূরে একটী নৌকা আসিতেছে। গঙ্গাদাস ঈশ্বরের করুণার কথা চিন্তা করিয়া প্রাণপণে নৌকার মাঝির উদ্দেশ্যে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মাঝি ভাই, ও মাঝি ভাই! আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি। তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। দয়া করিয়া আমাকে পার করিয়া দাও। সত্য সত্যই নৌকাসহ এক মাঝি আসিয়া উপস্থিত। মাঝি হাসিতে হাসিতে কহিল,—"ঠাকুর মহাশয়! আমি ত' পার করিয়া দিব, কিন্তু তুমি আমাকে কত দিবে? আমাকে ষোল আনা এবং এক জোড়া কাপড় দিতে হইবে।" গঙ্গাদাস সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে মাঝি গঙ্গাদাসকে সপরিবারে পার করিয়া দিল এবং কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল দেখিতে পাওয়া গেল না।

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানের কথা ও

তাঁহার মহাপ্রকাশের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে হে, তুমি কি সেই গঙ্গাদাস?" গঙ্গাদাস তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভাবিতেছেন,—আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ইঁনি কে? মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাঃ! তুমি ভুলিয়া গেলে। সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমি তোমাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিলাম। তুমি কত ডাকিয়াছিলে, কাঁদিয়াছিলে। শেষে যখন তুমি গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তোমার নিকট সেই অসময়ে নৌকা লইয়া হাজির হই এবং তোমাকে পার করিয়া দিই। আমি তোমাকে ষোল আনা পারের কড়ি চাহিয়াছিলাম—কোথায় দাও নাই ত'?"

গঙ্গাদাসের স্মৃতিপটে সবই জাগিয়া উঠিল। তিনি মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া আত্মনিবেদন করিলেন। তিনি সত্য সত্যই ষোল আনা দিলেন অর্থাৎ গৌরপদে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তে পরিগণিত হইলেন।

[৭]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত **শ্রীমুরারি চৈতন্যদাস**। তাঁহার অলৌকিক লীলা। তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় থাকিতেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। তিনি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন করিতেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে পাগলপারা হইয়া বনের মধ্যে মুরারি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাঘের সঙ্গে, সাপের সঙ্গে খেলা করেন। বাঘকে কাছে ডাকেন এবং বাঘও তাঁহার ডাকে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসে। তিনি বাঘের পিঠে চড়িয়া মনের আনন্দে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ান। বিষধর অজগর সাপকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন। মুরারিচৈতন্য নিত্যানন্দের গণ।

তিনদিন ধরিয়া মুরারিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মুরারিকে না পাইয়া সকলেই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল—মুরারি নিশ্চিন্তে চোখ বুজিয়া জলের নীচে বসিয়া রহিয়াছে। সে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর।

'মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা।।'

[৮]

শ্রীখণ্ডের **মুকুন্দদাস**। তিনি রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র দেহরোগের চিকিৎসক ছিলেন না, ভবরোগেরও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার অন্তর কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর। একদিন গৌড়েশ্বর নবাব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা চিকিৎসা-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ভৃত্য নবাবকে পাখার বাতাস করিতেছেন। সেই পাখাটী ময়ূরপুচ্ছ শোভিত। ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দের কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

তিনি প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর শ্বাস-প্রশ্বাসের চিহ্ন নাই। সকলে ভাবিলেন,—মুকুন্দের মৃত্যু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যস্মৃতি আসিল। তিনি নিজেকে গোপন রাখিয়া বলিলেন,—"না, না, কিছু নয়। আমার মৃগী রোগ আছে ত', তাই এইরূপ হইল।" কিন্তু সাধুসঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ফল। নবাব ভাবিলেন,—মুকুন্দ নিজেকে লুকাইতেছেন। তিনি মুকুন্দকে পীরজ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিলেন এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে—ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ।

মুকুন্দের গৃহের নিকট একটী বিরাট পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীর পাড়ে একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল। মুকুন্দের মনে ভাবের উদয় হইল, তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসা'ব দু'জন।।

তাঁহার বাসনা জাগিল—যদি আমার গৃহের এই কদম্ব বৃক্ষটীতে সারা বৎসর কদম্বফুল ফুটিত, একদিনও বাদ না যাইত, তাহা হইলে মনের আনন্দে আমি কদম্ব পুষ্প দিয়া রাধাগোবিন্দকে সাজাইতাম। ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। মুকুন্দের ইচ্ছা-ক্রমে সেই বৃক্ষে বৎসরের প্রতিদিন কদম্বপুষ্প ফুটিতে লাগিল এবং মুকুন্দ ঐ কদম্বপুষ্পের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিতে লাগিলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

মহামায়ার সংসর্গে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৭ পৃষ্ঠার পর]

তৃতীয়তঃ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলেছেন,—'রাজস কাম ও তামস ক্রোধই জীবকে পাপে প্রবৃত্ত করে' (গীতা ৩।৩৭)। রজঃ ও তমোগুণ এবং রজস্তম মিশ্রসত্ত্বগুণ জড়া প্রকৃতি তথা মহামায়া হতে জাত হয়েছে (গীতা ১৪।৫)। রজঃ ও তমোগুণ হতে কামাদি রিপুগণ উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং ত্রিগুণময়ী মহামায়া কাম-ক্রোধের দ্বারা জীবের চিত্তবৃত্তিকে আবৃত করে বলপূর্ব্বক পাপকার্য্যে নিক্ষেপ করে বা নিয়োজিত করে। গীতার শ্লোকেই ইহা প্রমাণিত।

চতুর্থতঃ জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে মায়ার গুণগুলি ভোগ করতে করতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ও নিজ চিদ্‌গুণ ও কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব ধর্ম্ম ভুলে মায়ার অনুগত ও বশ্য হয়ে পড়ে। জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই তাহার মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্তি। মায়ার রজস্তমগুণে আচ্ছন্ন হয়ে পাপে প্রবৃত্ত হয়।

পঞ্চমতঃ পাপপ্রবৃত্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায়,—পাপের কারণ পাপ-বাসনা ; পাপ-বাসনার কারণ স্বরূপভ্রম অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি ; স্বরূপভ্রমের

কারণ অজ্ঞান ; অজ্ঞানের কারণ জ্ঞান-বিমুখতা ; জ্ঞান-বিমুখতার কারণ ভগবদ্বিমুখতা,—যেহেতু অখণ্ড জ্ঞানই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যথা—"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং পাপ-প্রবৃত্তির মূল কারণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষের কারণ মায়ারূপ ভোগবাঞ্ছা।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৩১)

উক্ত শাস্ত্রবাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, মায়া তথা মহামায়া **দুর্গাদেবীই** দেহাভিমানী (বদ্ধ) জীবের **পাপকার্য্যের মূলীভূত কারণ**। জীব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মহামায়ার দ্বারাই পাপকর্ম্মে প্রেরণা পায় ও পাপ করে। আবার কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণোন্মুখতায় মায়া-মুক্তি হয়। মায়ার ত্রিগুণময় বন্ধন উল্লঙ্ঘন করার উপায় সম্বন্ধে উক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাণীর অনুরূপ বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যোনতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।। (ভাঃ ৩।২৯।১৪)

"ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে আমার বিমল প্রেম লাভ করে।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় জানিয়েছেন,—'আত্যন্তিক ভক্তি' অর্থে পরম পুরুষার্থ এবং 'মদ্ভাবায়' অর্থে মদ্বিষয়ক প্রেমলাভে সমর্থ হয়।

ষষ্ঠতঃ দুর্ভাগা জীবের দুর্গত মায়ার দ্বারাই সাধিত হয়। যথা—শ্রীবিদুর বলেছেন,—

সাধ্বেতদ্ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ।
আভাত্যপার্থং নির্ম্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ।। (ভাঃ ৩।৭।১৬)

অর্থাৎ "হে বিজ্ঞবর, আপনি যে জীবের বন্ধনদি শ্রীহরির মায়ারদ্বারা সাধিত হয় বলে কীর্ত্তন করলেন, তাহা অতি ভালই বলেছেন ; কারণ জীবের সংসারের মূল ভগবন্মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই মায়াই জীবকে স্বপ্নাবস্থায় স্বশিরশ্ছেদনের ন্যায় অকারণ সুখ ও দুঃখে লিপ্ত করে।"

শ্রীভগবানের উক্তিতে পাই,—

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্ব্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু।। (ভাঃ ৩।২৭।৩)

"সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানে অবশ হয়ে জীব প্রকৃতির সংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম বহু যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং কর্ম্মায়ত্ত সুখদুঃখোপভোগে নিবৃত্ত হতে না পেরে সংসার-পদবী প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখলেন,—"প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিপ্রসঙ্গভবৈঃ।" উহার বঙ্গানুবাদে উল্লিখিত—"প্রাসঙ্গিকৈঃ—প্রকৃতির সংসর্গ হতে উত্থিত দেহাদি-কৃত (পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মদোষে)।"

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩১।৩১ শ্লোকে কথিত,—

তদর্থং কুরুতে কর্ম্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্।
যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ।।

"যে দেহ অবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধনহেতুভূত হয়ে জীবকে ক্লেশ প্রদান করত জন্ম জন্ম জীবের অনুগমন করে, মূঢ় দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়ে সংসারে ভ্রমণ করে থাকে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ—"অবিদ্যা-কর্ম্মবন্ধনঃ"—"অবিদ্যার দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন হয় যাহা হতে সেই দেহ। যে দেহ জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, সেই দেহকেই পাপ-কর্ম্মের দ্বারাও জীব পোষণ করছে—ইহাই তাহার মূঢ়তা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় (৩।৩১।৩৩-৩৪) এস্থলে বিবৃত করছি,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত উক্ত শ্লোকদ্বয়ের 'বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয় ভাষ্যে'র কিয়দংশ এক্ষণে উল্লেখ্য,—"** মায়া নানাপ্রকারে বিভিন্নরূপ ধারণ করে জীবকে ভগবানের নিকট হতে বিক্ষিপ্ত করে ও তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের আবরণ করে ফেলে। সুতরাং অবিদ্যাগ্রস্ত জীব গৃহকে যোষিজ্জ্ঞানে, গৃহিণীকে আশ্রয়-জ্ঞানে সেবা করতে আরম্ভ করে ইন্দ্রিয়তর্পণপর হন। তখন তাহার যাবতীয় সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়। চেতনের অপব্যবহারে জীব কর্ম্মজ্ঞানদ্বারা আবৃত হয়ে ভগবৎসেবা পরিহারপূর্ব্বক স্ত্রীসেবারূপ অপবিত্রতায় নীত হন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ উদিত হয়। তখন অবিদ্যার অন্তরালে সত্ত্বগুণান্তর্গত সত্য শৌচাদি দ্বাদশপ্রকার কল্যাণসমূহ হতেও তিনি বিচ্যুত হন। আত্মবৃত্তি হতে ভ্রষ্ট হয়ে কামে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। অনিত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগে তিনি মূঢ়চেতা হয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুসরণ করেন। ভগবৎসেবাবিস্মৃত আধিকারিক দেবাভিমানী ব্রহ্মা একদিন স্বীয় দুহিতার রূপে বিমূঢ় হয়ে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন। ব্রহ্মাতনয়া মৃগীরূপ ধারণ করে পলায়মানা হলে ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক যোষিতের ক্রীড়নক

হয়েছিলেন। সেইকালে তাঁহার ভগবৎসম্বন্ধ স্মৃতিপথ হতে বিলুপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি স্ব-স্ব তপস্যায় অকৃতকার্য্য হয়ে নারী-দাস্যে আত্মবিক্রয় করবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ত্রিগুণতাড়িত হয়ে যে-সকল দেবতা, ঋষি ও দুর্ব্বল অসাধুগণ ভগবৎ-সেবারহিত হন, তাদৃশ ব্যক্তিকে নিজাপেক্ষা মহৎজ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করতে নাই। তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে জীবের কখনও মঙ্গল হয় না।"

সুতরাং প্রমদারূপিণী মায়ার প্রভাবে জীবের যে মোহাদি উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব অন্যায় আচরণ ও পাপ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। **মায়ার সংসর্গই জীবকে অধঃপাতিত করে।**

সপ্তমতঃ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-বিরচিত 'প্রার্থনা'-শীর্ষক গ্রন্থে আছে—

"হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয়জনে, লঞা ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।।
হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।।"

জীব স্বভাবতঃই নির্গুণ, কিন্তু জড়-প্রকৃতি তথা মায়ার সংসর্গে সগুণ-প্রায় হয়ে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণে আবদ্ধ হয়ে কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুর বশীভূত হয়ে নানাপ্রকার অসৎ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় ও অসৎ চিন্তায় নিরত থাকে। বিশেষতঃ অহঙ্কারী, বিমূঢ়াত্মাগণ মায়ার রজস্তমোগুণে সর্ব্বদাই আসক্ত থাকে ; যথা—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। (গীতা ৩।২৭)

পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাববশতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের বৈমুখ্য এসেছে। কাম-ক্রোধাদির দ্বারা জীবের ভগবদুন্মুখতা প্রতিহত হয়। তাই ঠাকুর মহাশয় উক্ত প্রার্থনায় জানাচ্ছেন,—কামাদি ছয় রিপুর প্রাবল্যে অসত্তৃষ্ণা মনে জাগ্রত হওয়ায় ভগবানের প্রতি বিমুখতা আসায় সেই বৈমুখ্যরূপ ছিদ্রপথে মায়া জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহার স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করে জড় দেহরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মভাব জাগিয়ে দিয়েছে। জগতের সাথে জীবের সম্বন্ধ মায়ার দ্বারা রচিত হওয়ায় তাহা অস্থায়ী ও জগতের বস্তু জীবের ভজনীয় হয় না। জীব পাপ করতে না চাইলেও মায়ার গুণগুলি ও রিপুসমূহ জীবকে ভগবৎসেবা ভুলিয়ে দেয় ও অনাত্মবস্তুতে প্রীতি করায়। ফলে মায়ার দাসত্ব স্বীকার করে নিজ দেহ-মনের সুখের আশায়

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

পাপ কর্ম্ম করতে প্রলুব্ধ হয় ও শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করেও পাপ করে থাকে। স্বরূপভ্রষ্ট জীব কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলে বা কৃষ্ণসেবা ভুলে মায়ার রাজত্ব এই সংসারে আনন্দ-চর্চ্চা করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে দুঃখ ভোগ করে। জীব মায়ার ত্রিগুণের বশীভূত ও কামাদি রিপুগণের দাসত্ব স্বীকার করে প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়ার দাসই হয়ে পড়েছে। মায়ার অধীনতা স্বীকার করে জীব মায়ার দ্বারাই পরিচালিত হয়। মায়ার দ্বারা বিলুপ্ত জ্ঞানবিশিষ্ট জনগণ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি—"মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ" (গীতা ৭।১৫)। শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের উপদেশামৃতে দেখা যায়,—"শরণাগত ভক্তগণকে ভগবান্ স্বয়ংই চালিত করেন। **বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াশক্তিদ্বারা চালিত হয়।**"

এ জগতে শক্তিশালী জীব দুর্ব্বল জীবের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য করে থাকে। মানুষ বুদ্ধিতে শক্তিমান্ বলে দুর্ব্বল পশুজাতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়। শক্তিশালী মানব দুর্ব্বল মানবের উপর প্রভুত্ব করে। মানবের থেকে উন্নত দেবতাগণ মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করে থাকে। **দেবতার উপরে প্রকৃতি তথা মহামায়া দুর্গাদেবী।** সেই মহামায়ার অধীন সকলে। গীতার ১৮।৪০ শ্লোকে উক্ত হয়,—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ।।

"পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্যাদি মধ্যে অথবা স্বর্গে, এমন কি দেবতাগণেরও মধ্যে তাদৃশ সত্ত্ব অর্থাৎ কোন প্রাণী বা বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ হতে মুক্ত।" কিন্তু **প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর উপরে আর কেহ নাই।** তাই সকলের উপর ভগবানেরই প্রভুত্ব। তিনি ব্যতীত আর সকলের প্রভুত্ব অপরের প্রভুত্বদ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু ভগবানের চেয়ে বড় বা তাঁর সমান শক্তিশালী কেহ নাই বলে তিনি কাহারও দ্বারা পীড়িত হন না। সেই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভুত্ব স্বীকার করে তাঁর অনুগত দাস হলে সেই জীব আর কাহারও দ্বারা ক্লেশ পায় না। কিন্তু মায়ার দাসত্ব করলে মায়ার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মায়া তাঁর দাসদিগকে সর্ব্বদাই নিযুক্ত করে রাখবে। মায়া অর্থে মা—যা, এককথায় যাহা ভগবান্ নহে। মায়ার দাসত্ব করলে ভগবৎস্মৃতি দূরে চলে যাবে। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি জীবের হৃদয়কে কলুষিত করবে। মায়াকে প্রীতি করলে জড়ের বৈচিত্রী বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ; কিন্তু আত্মার চাহিদা বা প্রয়োজন মিটবে না, তথা ভগবৎসেবা বা প্রেম লাভ হবে না। বিমুখমোহিনী জড় মায়ার দাসত্বে তথা ছায়াশক্তিরূপা মহামায়ার দাসত্বে তাঁর কৃপায় ষড়্রিপু ও মায়িক ত্রিগুণের অন্তর্গত বস্তুগুলিই পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও আত্ম-অনাত্ম বিচার ভুলে গিয়ে কপটতা, শঠতা প্রভৃতিকে বরণ করে নেয়। এইভাবে মায়ার দাসত্বের অন্তরালে জীব পাপে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়।

অষ্টমতঃ ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন,—"তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)। রজস্তমাদি গুণগুলি ভগবানের নহে, উহা মায়ার গুণ। মায়া কৃষ্ণের শক্তি হলেও উহা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নহে ; স্বরূপশক্তি সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্তা, কিন্তু জড় মায়াশক্তি কৃষ্ণ-বিমুখকে দণ্ডপ্রদানে ব্যস্ত।

কাম-ক্রোধাদি রজস্তম গুণান্তর্গত হওয়ায় ভগবদ্রাজ্যে তথা অপ্রাকৃত ধামে কাম-ক্রোধাদির স্থান নাই। সেই অপ্রাকৃত ধামে রজস্তম গুণ ত' নাই, এমন কি মায়াও নাই। এখানে রজস্তম গুণদ্বয়দ্বারা আচ্ছন্ন জীবগণ রাজস ও তামস কর্ত্তা মাত্র। রাজস ও তামস কর্ত্তার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি? ভগবান্ স্বয়ং তার উত্তর প্রদান করেছেন,—

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। (গীতা ১৮।২৭)

"আসক্তিযুক্ত, কর্ম্মফলকামী, বিষয়াসক্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, হর্ষ-বিষাদসম্পন্ন কর্ত্তাই 'রাজস' বলে কথিত।"

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।। (গীতা ১৮।২৮)

"অনুচিত কার্য্যপ্রিয়, স্বপ্রকৃত্যানুযায়ী জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামসিক বলে কথিত।"

রজস্তম গুণাসক্ত ব্যক্তিগণ মায়ার ভক্ত,—ভগবানের ভক্ত নহে। জড় মায়ার তথা দুর্গাদেবীর ভজনকারী ও অর্চ্চনকারী ব্যক্তি তাঁকেই প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু সেই ব্যক্তি মায়ার গুণসম্পন্ন হওয়ায় ও মায়াতে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় মায়াতীত নির্গুণ ভগবানকে জানতে পারে না ও দেখতে পায় না। "যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।"—এই শাস্ত্রবাণী অনুসারে কৃষ্ণ যেস্থানে বিরাজ করেন, সেস্থানে মায়াপ্রবেশ করতে পারে না। জড়ীয় কর্ম্মসকল জীবের স্বরূপ-বিরোধী। গীতার ১৬।২১ শ্লোকের ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবনীয়,—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।

"কাম, ক্রোধ ও লোভ—ইহারা ত্রিবিধ আত্মনাশক নরকদ্বার ; অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করবে।" কাম, ক্রোধ ও লোভ—আসুরিক সম্পদ্‌বিধায় আত্মবিনাশী ও নরকদ্বারস্বরূপ। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, কাম-ক্রোধাদির দ্বারা পাপ ও অপরাধ সংঘটিত হয়। জড়মায়াই জীবের পাপ ও অপরাধের উৎপাদক

এবং ঐ মায়ার সংসর্গই দেহাভিমানী বদ্ধ জীবগণকে বলপূর্ব্বক পাপে লিপ্ত করে —ইহাতে সন্দেহ নাই।

জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা ও মায়াবদ্ধতা যতকাল থাকবে, ততকাল জীবের পাপ করার প্রবণতা দূরীভূত হবে না, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। জীবের এই মায়াবদ্ধতা দূরীকরণের উপায় কি? জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীদশমূল-শ্লোকাঃ"-স্তোত্রের ৮ম শ্লোকে ইহার সুস্পষ্ট সুন্দর উত্তর দিয়াছেন,—

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরস-গলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্‌রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূং বিভ্রাণো বিমল রসভোগং স কুরুতে।।

"সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করতে করতে যখন হরিরস-বিগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মে ; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করতে যোগ্য হন।"

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

'গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ'—এই শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশসহস্র অর্থাৎ আঠার হাজার শ্লোক আছে। 'দ্বাদশস্কন্ধসম্বিতঃ'—দ্বাদশ স্কন্ধ আছে। আর ভাগবত আরম্ভ হয়েছে কি দিয়ে? 'গায়ত্র্যা চ সমারম্ভ'—গায়ত্রী দিয়ে।

গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এই ভাগবত। কি গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ হল?—"সত্যং পরং ধীমহি।" তাহলে যাতে ১৮,০০০ শ্লোক আছে, দ্বাদশ স্কন্ধ আছে এবং গায়ত্রী দিয়ে যার শুভারম্ভ হয়েছে, তাকে বলে ভাগবত। আমরা সব জেনে-শুনে নিয়ে ভাগবত আলোচনা করব।

ভাগবত কে আলোচনা করবেন? অধিকারী নির্ণয়। শাস্ত্র বলছেন, ভাগবত হল এম. এ. ক্লাসের পাঠ্য। শুধু Graduation হলে হবে না। ভাগবত আলোচনা

কে করবেন? কারা করবেন?—যাঁরা এম. এ. ক্লাসের পাঠ্য নিয়ে চলছেন, তারা আলোচনা করবেন। অর্থাৎ বিশেষ অধিকারী ব্যক্তি এই ভাগবত আলোচনা করবেন।

এই ভাগবতের অধিবেশন হয়েছে অনেকগুলো। তার মধ্যে তিনটে অধিবেশনের আলোচনা খুব বিশেষভাবে বর্ণনা করা আছে। এই ভাগবত প্রথম রচনা করবার পর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর নিজের ছেলেকে পড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের ছেলেটা কে?—শুকদেব। শুকদেব জন্মগ্রহণ করছেন না, মাতৃগর্ভে আছেন ১৬ বছর। একটা ছেলে মায়ের গর্ভে ১৬ বৎসর থাকতে পারে? পারে না, কিন্তু ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল। সেইজন্য তিনি জন্মগ্রহণ করছেন না ইচ্ছা করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বললেন,—বাবা! তুমি জন্মগ্রহণ কর। তুমি যে ভয় করছ, সে ভয় তোমার নেই। আমি কথা দিচ্ছি, যখন তুমি জন্মগ্রহণ করবে, তখন মায়া সরে যাবে তোমার থেকে, সুতরাং এ ভয় তোমার করবার দরকার নেই। তারপর জন্মগ্রহণ করল ১৬ বছরের ছেলে। আর থাকছে না, সঙ্গে সঙ্গে বনে জঙ্গলে চলে যাচ্ছেন। পিতা বেদব্যাস পিছনে পিছনে ছুটছেন বাচ্চাকে ধরবার জন্য। ধরতে পারলেন না। জঙ্গলে লুকিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উদ্দেশ্য ঠিক সফল হল না। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না।

বনে-জঙ্গলে পাখী ধরতে যায় বহু ব্যাধ, তাদের বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?—বনে যাচ্ছি। আমার কাছে মন্ত্র নিয়ে যাও। এই মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, এই মন্ত্র সেখানে গিয়ে বলবে, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করবে। দেখবে ভাল ভাল শুকপাখী ধরা পড়বে। বহুদিন যায়, ভাল ভাল পাখী আর ধরা পড়ে না। একদিন এসে তারা নালিশ দিল—আপনি কি মন্ত্র দিয়েছেন আমাদের? মন্ত্রে ত' কোন ফল দেখছি না। আপনি বলেছেন যে, ভাল ভাল শুকপাখী ধরা পড়বে ; কিন্তু কোন পাখীই ত' ধরা পড়ছে না। বেদব্যাস বললেন,—তোমরা একটু প্রকৃতিস্থ হও, ধরা পড়বেই।

একদিন ধরা পড়ে গেছে। সে কিন্তু পাখী নয়, নাম তার শুক—মানুষ (রূপী) পাখী। এই ভাগবতের ভগবানের লীলাবর্ণনাসূচক শ্লোক সব শিখিয়ে দিয়েছেন ব্যাধগুলোকে। সেইগুলো তারা বলছে। ঐসব শুনে ছুটে এসেছেন শুকদেব। তোমরা এসব কোথা থেকে পেলে? আমাদের গুরুদেব মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এসব। শুকদেব বললেন,—চল, নিয়ে চল তাঁর কাছে। নিয়ে গেছে তাঁকে তাঁর পিতার কাছেই। তখন তিনি বললেন, আমি অন্যায় করেছি। তোমার কথা না শুনে আমি অন্যায় করেছি। এখন থেকে আমি তোমার কাছে থাকব, তোমার শিক্ষা, তোমার আদর্শ নিয়ে আমি চলব—এই প্রতিজ্ঞা করলেন। আত্মারাম মুনিঋষি

কারও ধার ধারেন না, কিন্তু পিতার কাছে থেকে গেলেন, পিতা পেয়ে গেলেন তাঁকে। তারপর এই ভাগবত পড়িয়েছেন তাঁকে। ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হয় বদরিকাশ্রমে।

এই ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত শূকরতল-নামক স্থানে। গঙ্গাতীরে। সেখানেও মুনি-ঋষিগণকে নিয়ে বসে আছেন রাজা পরীক্ষিৎ। হঠাৎ তাঁর পরে ব্রহ্মশাপ—সাতদিনের ভিতরে তক্ষক সর্পদংশনে তোমার মৃত্যু হবে। এই খবর চলে গেল রাজধানীতে। আপনি প্রস্তুত হন, আপনার সময় মাত্র সাতদিন।

অমাত্যবর্গকে নিয়ে তিনি আলোচনা করতে লাগলেন—কি করা হবে? মুনি-ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—আমি কি করব? আমার ত' পরমায়ু সাতদিন। এর ভিতরেই আমি ভগবানকে পাব, আমার ইচ্ছা। আপনারা ব্যবস্থা দেন। আপনাদের ব্যবস্থা আমি মেনে নেব। ঋষিগণ সকলেই একই রকম ধরণের নয়। ঋষিগণের মধ্যে কেউ কর্ম্মী, কেউ জ্ঞানী, কেউ যোগী, কেউ বা ভক্ত, কেউ বা ভক্তোত্তম। বিভিন্ন Category। খুব বিপদে পড়ে গেলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। সেই সভাতে হাজির ছিলেন বেদব্যাস। বেদব্যাসের পিতা পরাশর ঋষি তিনিও হাজির ছিলেন। পরাশরের পিতা শক্তি ঐ সভায় হাজির ছিলেন। তিনপুরুষ! আলোচনা চলছে, এমন সময় ঐ ছেলেটী ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছে ভগবদিচ্ছাক্রমে। এখানে এই যেমন আসন করেছেন আপনারা, ওখানে ঠিক এইরূপ আসনে বসিয়ে দিলেন তাঁকে। যখন তিনি সভায় ঢুকছেন, তখন মুনি-ঋষিরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন—আসুন, আসুন, আসুন। তিনি সেই সভায় এই ভাগবত-কথা বর্ণনা করেছেন, রাজা পরীক্ষিৎকে শুনিয়েছেন সাতদিন। তাতেই পরীক্ষিৎ মহারাজ ভগবানকে লাভ করেছেন।

সাতদিনের থেকে কম সময়ে কেউ ভগবানকে পেয়েছেন? হ্যাঁ। কে?—খট্বাঙ্গ রাজা। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে তিনি ভগবানকে পেয়েছেন, ইতিহাস আছে। ইতিহাস নেই বললে চলবে না। সেইখানে ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। সভার মাঝখানে বসে আছেন। সাতদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া নেই তাঁর। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসে আছেন, ঐ ভাগবতকথা শুনছেন। আর শুকদেব অনর্গলভাবে ভাগবতের কথা বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

একসময় বলছেন তিনি (পরীক্ষিৎ মহারাজ),—এখন এসে আমাকে তক্ষক দর্শন করুক, আমার মৃত্যুতে কোন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নেই, অর্থাৎ ভগবানে তদ্‌গতচিত্ত। ঐভাবে তিনি ভাগবত শুনেছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ কিরকম ব্যক্তি? মাতৃগর্ভে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

(উত্তরার) ছিলেন যখন তখনই অলৌকিক ব্যাপার হয়েছে সব। সমস্ত পাণ্ডবগণকে নিঃক্ষত্রিয় করবার জন্য অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ দেখলেন, এ ছেলেকে বাঁচাতে হবে, রক্ষা করতে হবে। এ ছেলে হল এ বংশের শেষ প্রদীপ। উত্তরার গর্ভের মধ্যে ঢুকে গেছেন। ভগবান্ ত' ইচ্ছাময়। ইচ্ছা করলেই সব হয়ে যায়। কিন্তু ওখানে বিশেষ চেষ্টা দেখিয়েছেন কৃষ্ণ। উত্তরার গর্ভে ঢুকে তিনি গর্ভ আবৃত করে রেখেছেন। ব্রহ্মাস্ত্র কোন কাজ করতে পারেনি, কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি—ভগবান্ যাঁকে বাঁচাবার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। পরীক্ষিৎ-নামটা কেন হল? ভক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি, পাস করা। আবার Division বিচার করলে first division। সেই ব্যক্তি হচ্ছেন পরীক্ষিৎ রাজা। ভগবানকে লাভ করব আমি সাতদিনের মধ্যে—এই কথা বলা তাঁর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু নয়, স্বাভাবিক। সাধারণ বদ্ধজীবের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক ; কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক। ভগবান্ যাঁর সহায়, তাঁর পক্ষে সব কাজ খুবই সহজ-সরল। সেইরকম জিনিষ হয়েছে। সেই পরীক্ষিৎ মহারাজের ভগবৎপ্রাপ্তি হল ভাগবত শ্রবণ করতে করতে।

এই ভাগবতের আর একটা অধিবেশন হয়েছে। সেটা হল তৃতীয় অধিবেশন—নৈমিষারণ্যে, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত স্থান। সেখানে শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষি শ্রোতা, আর বক্তা আছেন শুকদেব গোস্বামীর শিষ্য সূত গোস্বামী। শৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করছেন, আমরা ত' এখন ভয় পাচ্ছি, আমরা ত' দ্বাপর যুগে এসেছি, এখন কলিকাল আসছে। কলিকালের যা বর্ণনা দেখছি, শুনছি, তাতে আমাদের সব সাধন-ভজন পণ্ড হয়ে যাবে। এই ভয় পাচ্ছেন মুনি-ঋষিরা। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন সূত গোস্বামীকে,—এই যে কলিকাল, এই কলিকালে আমরা সাধন-ভজন রক্ষা করব কিভাবে? সব ব্যবস্থাই আছে, আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? কি ব্যবস্থা আছে? আমি কি বলব, আমার গুরুদেব ত' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি সেটা আলোচনা করি এখানে, তাহলে হয়ে যাবে। পরীক্ষিৎ-সভাতে ওটা আলোচনা হয়েছে। কলিকালের অবস্থা বর্ণনা এবং কলিজীব কি করে উদ্ধারলাভ করবেন—এই প্রশ্ন করেছিলেন পরীক্ষিৎ রাজা। তারউত্তর দিয়েছেন ভাগবতে। কি উত্তর দিয়েছেন?—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।

কলি অশেষ দোষের আকর। কিন্তু এই যে কলি, এই কলি হল ধন্য কলি। এ কলির বৈশিষ্ট্য আছে, বাহাদুরি আছে। কি বাহাদুরি? "কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য

মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ"—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব উদ্ধারলাভ করবেন। এই কলিকালে সাধন-ভজন অন্য কিছু নেই। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হল সাধন-ভজন। এই কথা শাস্ত্রে সব জায়গায় বলা আছে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।

কলি সর্ব্বদোষাকর হলেও কলির মহদ্‌গুণ একটা আছে। কি?—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব উদ্ধার লাভ করবেন। সহজ-সরল ব্যবস্থা। অন্যান্য যুগের তারকব্রহ্ম নামের যে ক্ষমতা, সে ক্ষমতাও এর মধ্যে দেওয়া আছে। এই হরিনাম মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্রের অর্থ কি? এটা শুনতে বাংলার মত, কিন্তু না, সংস্কৃত। কলিসন্তরণোপনিষদের শ্লোক এটা। সবগুলো সম্বোধনের পদ। হে হরে, হে কৃষ্ণ আমায় কৃপা কর। 'হরা', 'হরি' নয়। 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে হরে হয়, আবার 'হরা'-শব্দের সম্বোধনেও 'হরে' হয়। 'রাধা'-শব্দের সম্বোধনে 'রাধে' হয়। 'কৃষ্ণ'-শব্দের সম্বোধনে 'কৃষ্ণ' হয়। তাহলে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' মানে 'রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ'। 'হরে রাম হরে রাম' মানে কি হয়? কোন্ রাম? শ্রীরামচন্দ্র, দাশরথি রাম?—না। তবে কোন রাম?—কৃষ্ণ। রাধারমণ রাম, রাসবিহারী রাম, রাসেশ্বর রাম অর্থাৎ কৃষ্ণ। এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। এই নাম জপ করবার ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে, অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।
এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি ভজে যদি,
তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।

সব ক্লেশের শান্তি হবে যদি আমরা সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হই। খাওয়া-থাকা-পরা আছে—সব জন্মেই আমরা খাওয়া-থাকা-পরা পেয়েছি, অসুবিধা হয় নি ; কিন্তু দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েও যদি আমরা হরিভজন না করি, কৃষ্ণভজন

না করি, ভগবানকে যদি না ডাকি, তাহলে আমাদের পণ্ডশ্রম—এই কথা শাস্ত্র বলছেন। সুতরাং আপনারা সবাই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই নাম করবেন এবং সাধন-ভজনে উন্নত হবেন—এটাই শাস্ত্রের বড় কথা, ভগবানের বিশেষ উপদেশ। গুরু-বৈষ্ণবের এই উপদেশ। গুরু-গোস্বামিগণ এই উপদেশ নিয়েই সাধন-ভজন করে গেছেন, মুনি-ঋষিগণ এই নিয়ে সাধন-ভজন করছেন। সুতরাং আমাদেরও এটা করা দরকার আছে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অস্মদীয় পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিপুল সাফল্যের সহিত শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। বিগত ৯।৪।২০০৩ তারিখে রওনা হইয়া প্রথমে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক ও জাপানের রাজধানী টোকিওতে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলুতে প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। শ্রীল মহারাজ "মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকৃত জীবনচরিত, তাঁহার শিক্ষা, ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, রামভক্ত হনুমানের তৃণাদপি ভাব" প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

বিদেশে প্রচারে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীল মহারাজ মুম্বাই-এ Rotary Club-কর্ত্তৃক আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং মুম্বাই-এর বিখ্যাত প্রেমপুরী আশ্রমে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় তিনদিন ও দিল্লীতে (দক্ষিণ) আয়োজিত ধর্ম্মসভায় একদিন বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯।৩।২০০৩ তারিখে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েকজন সাংবাদিক, রোটারী ক্লাবের সদস্যগণ, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় কিছু গৃহস্থ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। এক সাংবাদিক বর্ত্তমান বিশ্বের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখিয়া শ্রীল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন,—

জনৈক সাংবাদিক—বর্ত্তমান বিশ্বের অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গীতার ভূমিকা কি?

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

শ্রীল মহারাজ—বর্ত্তমান বিশ্বের ভয়াবহ, ভয়ানক উদ্বেগপূর্ণ অবস্থাতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যাহারই যাহা ভূমিকা থাকুক না কেন, তাহা কেবল অন্ধ স্বার্থ ও বাগাড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সর্ব্বজনানুমোদিত, সর্ব্বভাষায় প্রকাশিত, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদেশিক সমাধানে গীতার ভূমিকাই সর্ব্বোপরি।

অপর সাংবাদিক—গীতাতে শান্তির জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি কিছু বলিয়াছেন? আমি গীতা পড়িয়া এর কোন সমাধান খুঁজিয়া পাই নাই।

শ্রীল মহারাজ—আপনি গীতা যথার্থরূপে পড়েন নাই। গীতা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পড়িতে হয়। শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীল মাধব মহারাজ গীতার শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক বলেন,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।। (গীতা ২।৭১)
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। (গীতা ১৮।৬২)

পূর্ব্বোক্ত সাংবাদিক—আমি ত' কোনদিন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই যে গীতাতে সরাসরি শান্তির কথা লেখা আছে।

শ্রীল মহারাজ—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গীতা পাঠ করিতে হয়। গুরু-বৈষ্ণবগণ আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন, দেখাইয়া দিবেন কোথায় কি আছে। দেখুন, প্রথম শ্লোকটীতে ভগবান্ কি বলিতেছেন,—"বিহায় কামান্ **"—কামনা পরিত্যাগ করিয়া, স্পৃহাশূন্য হইয়া, অহঙ্কাররহিত এবং মমতাশূন্য হইয়া যিনি বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। বর্ত্তমান বিশ্বে শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত কে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছে, কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া জগতে আছে। সকলেই ত' প্রাকৃত জড় অহঙ্কার, কামনা নিয়ে মত্ত। এইকারণেই জগতের এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি।

অপর সাংবাদিক—স্বামীজি! দ্বিতীয় শ্লোকটীর অর্থ একটু বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীল মহারাজ—আপনারা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করুন। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপাতেই পরম শান্তি এবং নিত্য অর্থাৎ অক্ষয়, অব্যয় ধাম লাভ করিবে। উক্ত ঈশ্বর বা ভগবান্ কে—যাঁহার শরণ গ্রহণ করার জন্য এই শ্লোকে বলা হইতেছে? তিনি হলেন সকলের অন্তর্যামী, অহৈতুকী কৃপাময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা। যে-সকল জীব ভগবান্‌কে মানে না, ভক্ত, ভক্তিকে মানে না, ভগবান্ সেই সকল জীবের শুভ-অশুভ কর্ম্মকে মায়াদ্বারা ভোগ করাইয়া

থাকেন, উদাসীন থাকেন। আর ভক্তগণের জন্য উদাসীন না থাকিয়া নিজসেবায় নিযুক্ত রাখেন। ভক্তবৎসল ভগবানের ইহাই মহৎ কৃপা।

বেদেও বলা হইয়াছে, ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। হৃদয়ে অবস্থান করেন কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, সকল জীবকে নিজ মায়াশক্তির দ্বারা ভ্রমণ করাইতে থাকেন। এইজন্যই ত' গীতাতে বলা হইয়াছে,—"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ভগবান্ ভক্তি-উন্মুখ সুকৃতিসম্পন্ন জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্য বাহিরে আচার্য্য অর্থাৎ গুরুরূপে এবং অন্তঃকরণে চৈত্ত্যগুরুরূপে নিজ শরণাগত জীবকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শরণাগত না হইলে ভগবানের মায়া কাহাকেও ছাড়িবে না। বর্ত্তমান জগৎ Might is right নীতি লইয়া চলিতেছে। ভগবান্ বা ধর্ম্ম কিছু মানিতেছে না। এর ফল ধ্বংস অনিবার্য্য।

ভগবানের মায়া সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দিতেছি। ভগবান্ নিজ পরিকরদ্বারা, নিজ ভক্তের মাধ্যমে জগৎকে শিক্ষা দেন। দেবর্ষি নারদ ভগবানের পরিকর, ভক্ত, নিজজন। তাঁহাকে কেহ মায়াবিমোহিত সাধারণ জীব মনে করিবেন না। তাহা হইলে অপরাধ হইয়া যাইবে। একদা নারদঋষি বীণাযন্ত্রে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন। কি নাম?—"নারদ ঋষি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে।" হঠাৎ পথিমধ্যে এক অতি মনোরম সুসজ্জিত নগরী দৃষ্টিগোচর হইল। দেবর্ষি একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। অহো! এত সুন্দর নগরী আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখেন মণি-মাণিক্যখচিত বিশাল রাজপ্রাসাদ। কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে রাজমহলে প্রবেশ করিবামাত্রই রাজা স্বয়ং আসিয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক লইয়া গেলেন এবং পাদ্যর্ঘ্যদ্বারা সম্মানান্তে বলিলেন;—হে দেবর্ষে! আগামীকল্য আমার কন্যার স্বয়ম্বর সভা। কৃপাপূর্ব্বক হস্তরেখা বিচার করিয়া আমার কন্যার ভাগ্যের কথা একটু বলিয়া দিবেন। দেবর্ষির সম্মতিতে ষোড়শ শৃঙ্গার, দ্বাদশ আভরণে সুসজ্জিতা কন্যাকে আনয়ন করা হইল। কন্যার অপ্রাকৃত রূপ দেখিয়াই নারদ ঋষি মোহিত হইয়া গেলেন এবং অন্তরে কামনা-বাসনা, স্পৃহার উদয় হইল। এই নগরীতে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারদ ঋষির হৃদয়ে ভগবৎ-সেবাবাসনা, ভগবৎ-সেবাস্পৃহা ব্যতীত কিছুই ছিল না। আর বর্ত্তমানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কামনা-বাসনা, স্পৃহার উদ্রেক হইল। রাজকন্যার হস্তরেখা বিচার করিয়া দেখিলেন,—রাজকন্যার পতি হইবেন ত্রিলোকের অধীশ্বর, জন্ম-মৃত্যুর অতীত, তাঁহাকে কেহ কখনও পরাভূত করিতে পারিবেন না। দেবর্ষি মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো! আমি যদি রাজকন্যাকে বিবাহ করি তাহলে আমি ত্রাধীশ হইয়া যাইব। আমাকে কেহ কখনও পরাভূত করিতে পারিবে না, সকলেই আমার নিত্য বশীভূত থাকিবে। ভগবৎ পরিকর

হইয়াও নারদঋষি ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভুলিয়া গেলেন ইঁনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী এবং ইঁহার পতির যে গুণ, তাহা কেবলমাত্র বিষ্ণুতেই সম্ভব—ইহাও অনুধাবন করিতে পারিলেন না।

নারদঋষি ভাবিলেন, অহো! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার রূপ একদিনের জন্য ধার করিয়া লই। তাঁহার রূপে ত' জগৎ বিমোহিত। তাঁহার রূপ পাইলেই রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভাতে আমাকেই বরণ করিতে বাধ্য হইবে। রাজপ্রাসাদের বাহিরে আসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। কৃপাময় ভগবান্ আবির্ভূত হইবামাত্রই সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেল। বরদ ভগবান্ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"নারদ! বর প্রার্থনা কর।" নারদঋষি বলিলেন,—"প্রভো! আমি এতাবৎকাল আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি। কখনও আপনার নিকট আপনার সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করি নাই। আজ অত্যন্ত আবশ্যকবিধায় আপনার অনুপম রূপ একদিনের জন্য মাত্র প্রার্থনা করিতেছি।" ভগবান্ তথাস্তু না বলিয়া যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দান না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবর্ষি ভাবিলেন, অহো! আগামীকল্য রাজকন্যা আমাকেই বরণ করিবে। ঋষিবরের সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। নিজ কল্যাণের জন্য ভগবান্ কি অপরূপ রূপ প্রদান করিয়াছেন, দর্পণে তাহা একটীবার দেখিবারও প্রয়োজন মনে করিলেন না।

পরদিবস দেবর্ষি সুসজ্জিত হইয়া স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অনেক রাজন্যবর্গ বসিয়া বসিয়া উদগ্রীব হইয়া রাজকন্যার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অনন্যোপায় হইয়া ঋষিবরও প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন মৃদুপদে গজগামিনীর ন্যায় রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, রাজকন্যা কখন আমার নিকট আসিয়া আমাকে বরমাল্য দিয়া বরণ করিবে। রাজকন্যা নিজ পছন্দমত বর খুঁজিতে খুঁজিতে দেবর্ষিকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বিপরীত দিকে গমন করিলেন। নারদ ভাবিলেন, রাজকন্যা বোধ হয় আমাকে দেখিতে পান নাই। নিকটস্থ কোন কুরূপ পুরুষকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়াছেন। রাজকন্যা বৃত্তাকারে ঘুরিয়া পুনরায় ঋষিবরের সন্নিকটস্থ হইবেন —এই সময়টুকুও তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল। যখন কাহারও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় অথবা কেহ সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন সে বেপরোয়া হইয়া যায়। দেবর্ষির ক্ষেত্রেও উক্ত নীতির ব্যতিক্রম ঘটিল না। তিনি ভাবিলেন, আমাকে উঠিয়া রাজকন্যার সন্নিকটে গিয়া

বরমাল্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ চিন্তা করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুতপদে রাজকন্যার সন্নিকটস্থ হইয়া বারম্বার গলা বাড়াইয়া দিতেছেন, আর রাজকন্যা মালাহস্তে নাসিক কুঞ্চন করিয়া বিপরীত দিকে যাইতেছেন। ঋষিবর মৃদুস্বরে বলিতেছেন,—অহো! আমার এত সুন্দর ভুবনমোহন রূপ দেখিতে পাইতেছেন না কেন? শিবের দুইজন গণ দেবর্ষি যেদিকে যাইতেছেন তাঁহারাও সেইদিকে গিয়া তালি বাজাইয়া উপহাস করিয়া বলিতেছেন,—আহা! মরি কি সুন্দর রূপ! যেন কালোমুখো বানর। জলে বা অন্য কোথাও নিজের প্রতিবিম্ব দেখিলেই ত' বুঝা যায়। তথাপি নারদঋষি বুঝিতে পারিতেছেন না কেন তাঁহাকে এত উপহাস করা হইতেছে। ইত্যবসরে গরুড়ারোহী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যাও মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে বরমাল্য প্রদান করিলেন। শ্রীবিষ্ণুও তাঁহাকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া আকাশমার্গে উড়িয়া গেলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া নারদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া আরও অধিক ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—অহো! আমি একদিনের জন্য আপনার রূপ চাহিলাম, আর আপনি রূপ না দিয়া আমাকে বাঁদরের রূপ প্রদান করিলেন। হে বিষ্ণো! হে নারায়ণ! আপনি কি ভাবিয়াছেন? আপনার কোন নিয়ন্ত্রক নাই, আপনি সর্ব্বোপরি নিয়ন্ত্রক। আমি আপনাকে অভিশাপ দিতেছি যে,—যে অঙ্গনার জন্য আমি এত দুঃখী হইয়াছি, ঐ অঙ্গনাকে লইয়া আপনিও সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন না, বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে। পুনরায় মিলনের জন্য এই বাঁদরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা আমাকে উপহাস করিতেছে তাহারাই বাঁদর হইবে এবং আপনাকে সাহায্য করিবে।

ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মায়া সরাইয়া লইলেন। নারদঋষি দেখিলেন, ভগবান্ নিজশক্তি লক্ষ্মীর সহিত প্রসন্নমুদ্রায় বিরাজমান, কোন নগরী নাই, রাজা নাই, স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত কোন একটী রাজাও নাই। দেবর্ষি হাউ হাউ করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনাকে আমি অভিশাপ দিয়া বসিলাম। কেন অভিশাপ দিলাম? কি করিয়া আমার বুদ্ধি বিকৃত হইল? কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন, এর রহস্য বুঝাইয়া দিন। নারদের শরণাগত ভাব দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—নারদ! ইহাতে তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নাই, আমার ইচ্ছায়ই সব ঘটিয়াছে। চিন্তা করিও না। আগামী ত্রেতাযুগে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্ররূপে লীলা করিব। আমার লক্ষ্মী ইঁনি সীতারূপে আবির্ভূত হইবেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের দ্বারা অপহৃতা হইলে উদ্ধারের নিমিত্ত বানরগণের সাহায্য আমাকে লইতে হইবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

জনৈক সাংবাদিক—মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন নারদ আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব নহেন। তাহলে তাঁহার এইরূপ মতিভ্রম হইল কেন?

শ্রীল মহারাজ—ভগবান্ মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্ররূপে ত্রেতাযুগে আসিয়া লীলা করিবেন। জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য কিছু কারণ ত' প্রয়োজন। এটী একটী কারণ। ভগবদিচ্ছায় এ সব ঘটিয়াছে।

অপর সাংবাদিক—এর অন্য কোন কারণ আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—এক সময়ে নারদঋষি ধ্যানস্থ হইয়া ভজন করিতেছিলেন। মায়াদেবী বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করিয়া নারদের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিলেন। সম্মুখস্থিতা মায়াকে দেখিয়া দেবর্ষি হাসিয়াছিলেন। ঋষির শরীরে কোনপ্রকার বিকার না দেখিয়া মায়াদেবী লজ্জিতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। নারদঋষি নিজপিতা ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন,—পিতা ঠাকুর! আমি মায়াকে জয় করিয়া লইয়াছি। মায়া আমায় কিছুই করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নারদ আমার কথা শুনিবে না, যে কোনপ্রকারে শিবঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনিই ওঁর কল্যাণ করিবেন। ব্রহ্মাজী বলিলেন,—বৎস! ইহা শিবঠাকুরকে গিয়া বলিবে না। পিতাকে প্রণাম করিয়া নারদঋষি শিবলোকে গিয়া হাজির হইলেন। দেবাদিদেব মহাদেবকেও একই কথা শুনাইলেন। শিবজীও কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—নারদ! দর্পহারী নারায়ণকে যেন এসব বলিও না। সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষি বৈকুণ্ঠে হাজির হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেই দর্পহারী মধুসূদন নারদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন।

দেখুন, নারদঋষি ভগবৎপরিকর। ভগবানের নিত্যধামেই অবস্থান করেন। তাঁহার দ্বারাই ভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দিলেন—প্রাকৃত কামনা-বাসনা, স্পৃহা, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া শরণাগত হইলেই শান্তিলাভ হয় এবং অক্ষয়, অব্যয় ভগবানের ধামে নিত্যকাল বাস করা যায়। বর্ত্তমান জগৎ প্রাকৃত অহঙ্কারে, স্পৃহায়, কামনায় পরিপূর্ণ। শরণাগতের লক্ষণ বিন্দুমাত্রও নাই। এই কারণেই জগতের এই দুরবস্থা। গীতার কথা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিলে কোনপ্রকার দুঃখ, বিপদ, ভয়াবহ পরিস্থিতি থাকিবে না।

শ্রীল মহারাজ ব্যাঙ্ককে দুইদিন ও টোকিওতে একদিন স্থানীয় ভক্তগণের নিকট শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসভাতে বর্ত্তমান বিশ্বশান্তিতে গীতার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার অনুরোধে শ্রীল মহারাজ পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর শ্রীল মহারাজ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচারপূর্ব্বক ৯।৭।২০০৩ তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

প্রকৃতি নিজ নিয়মে দুর্ব্বার গতিতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সময় কাহারও জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। কিন্তু এই কালের গতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে কতই না পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন যখন আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটিয়া চলিতেছে, ঠিক তখনই চিরশাশ্বত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তথা বিশ্ববাসীর সর্ব্ববরেণ্য পরমারাধ্যতত্ত্ব—কলিযুগপাবনাবতারী অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা আমাদের নিকট সমুপস্থিত। এই তিথিকে অবলম্বন করিয়া এই বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কলিকলুষ-কল্মষনাশকারী রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সুবর্ণকান্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।

তাঁরই শুভাবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরের প্রেমধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ভক্তগণকে লইয়া জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের প্রবর্ত্তিত ধারানুযায়ী প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব বিপুল সমারোহে পালন করেন। বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীসমিতির সেবকগণ যথারীতি শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন শ্রীসমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ জগদ্‌গুরু পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে।

পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতে প্রকৃতিদেবী কিছুটা বিরূপ আকার ধারণ করায় সমিতির সদস্যবর্গ কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। পরিক্রমাচলাকালীন দুই-তিনদিন রাত্রিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় যাত্রিসাধারণের থাকিবার অসুবিধা হয় ; কিন্তু রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ দিবসের আবহাওয়া শীতল থাকায় পরিক্রমা করিতে কোনরূপ কষ্ট বোধ হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশ হইতে বহু বিদেশীভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া উৎসবকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

গত ২৭শে ফাল্গুন, ১৪০৯ (ইং ১২।৩।২০০৩), বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে পরিক্রমাসূচী-অনুযায়ী যথাক্রমে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থানসমূহ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য বর্ণনমুখে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি ও যাত্রিগণ ২রা চৈত্র সোমবার পরিক্রমা সমাপ্ত করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ প্রমুখ অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীধাম-মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া যাত্রীবৃন্দের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার শ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। হরিভজনোৎসুক ভক্তগণকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনাম-দীক্ষা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক, সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে যাত্রীদিগকে অনুকল্প প্রসাদ প্রদান করা হয়।

উক্ত দিবসেই চারজন মঠবাসী বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডি যতিবেষ, একজন বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরে ২০।৩।২০০৩ তারিখে তিনজন মঠবাসী বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ঃ—

পূর্ব্বনাম	বর্ত্তমান-নাম
১। শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ**
২। শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অকিঞ্চন মহারাজ**
৩। শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী (শ্রীসুরভিকুঞ্জ মঠ)	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অবধূত মহারাজ**
৪। শ্রীতারকদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীসুরভিকুঞ্জ মঠ)	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তপস্বী মহারাজ**
৫। শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ**
৬। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ**
৭। শ্রীকৃষ্ণভজন ব্রজবাসী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ**
৮। শ্রীসীতানাথ ব্রজবাসী	**শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ**

—নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুকুন্দ-সেবাব্রত সর্ব্বতোভাবে সাফল্যলাভ করুন এবং অশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

সাধারণ-মহোৎসবের দিন অর্থাৎ ৪ঠা চৈত্র, বুধবার পরিক্রমাকারী যাত্রী ব্যতীত সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

২০ বৈশাখ, ১৪১০ (ইং ৪।৫।২০০৩)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিঃসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ১৪ই আষাঢ়, ১৪১০ (ইং ২৯।৬।২০০৩) রবিবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ১৪১০ (ইং ৯।৭।২০০৩) বুধবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১০ ; ১৫ মে, ২০০৩

সেবাপঞ্জী

১। ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।২০০৩), রবিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ১৫ই আষাঢ় (ইং ৩০।৬।২০০৩), সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। ১৬ই আষাঢ় (ইং ১।৭।২০০৩), মঙ্গলবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা;** অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। ১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।২০০৩), বুধবার হইতে ১৮ই আষাঢ় (ইং ৩।৭।২০০৩), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসদ্বয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ১৯শে আষাঢ় (ইং ৪।৭।২০০৩), শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। ২০শে আষাঢ় (ইং ৫।৭।২০০৩), শনিবার হইতে ২৩শে আষাঢ় (ইং ৮।৭।২০০৩), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ২৪শে আষাঢ় (ইং ৯।৭।২০০৩), বুধবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ-মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—*কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ১ বামন, বাসুদেব, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৪১০, ইং ১৫/৬/২০০৩ { ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম-দশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—১-১০]

নৌমীড্য তেঽভ্র-বপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-কিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।।১।।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন ঘনশ্যাম বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীত-বস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র। আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জা-বিরচিত, কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা হস্তে, দধিমিশ্রিত অন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতিদ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি।।১।।

অস্যাপি দেব! বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ।।২।।

আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি, কিম্বা অন্যেও সমর্থ নহে; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্ম-সুখানুভবস্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট বিগ্রহের মহিমা (যোগের দ্বারা) চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্মসুখানুভবস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে জানিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি?২।।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।৩।।

জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ-স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ-উচ্চারিত এবং তৎ-সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাপর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি, তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।।৩।।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্।।৪।।

হে প্রভো! যে-সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।।৪।।

পুরেহ ভূমন্! বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজ-কর্ম্ম-লব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীয়তা
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্।।৫।।

হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ! হে অচ্যুত! পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগমার্গে ফললাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তিদেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্যরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন।।৫।।

তথাপি ভূমন্! মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্য-বোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা।।৬।।

(পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না—কথিত হওয়ায়, ভগবানের নির্গুণ ও স্বগুণ—উভয় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও **নির্গুণ-স্বরূপের উপলব্ধি কোনপ্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্য-গুণসম্পন্ন সগুণ-স্বরূপের অনুভূতি হয় না**।—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা)

আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না, ভগবদ্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃপ্রকাশ-ভাবেই অর্থাৎ তদ্বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্যপ্রকার অর্থাৎ সগুণ স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না।।৬।।

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ।।৭।।

হে দেব! এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে? যে-সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা,

হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন।।৭।।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্-বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।৮।।

অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতিসহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তি-পদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকে।।৮।।

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়ি-মায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্ম-বৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ।।৯।।

হে প্রভু! আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবাদিগণেরও মোহ-জনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা যেরূপ অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আপনা হইতে উদ্ভূত আমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র সমর্থ নহি।।৯।।

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ-পৃথগীশ-মানিনঃ।
অজাবলেপান্ধ-তমোঽন্ধ-চক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি।।১০।।

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র"—এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন।।১০।।

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই

বৈরাগীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—

শুক্লবস্ত্রের মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।। (মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ।। (মঃ ১২।৫৩

গৃহস্থ, সন্ন্যাসী দুই প্রকার বৈষ্ণবই জগদ্‌গুরু

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায়।

মন্ত্রাচার্য্য গৃহস্থ-গোস্বামী-গুরুর প্রতি উপদেশ

বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চ-পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। **গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন।** অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকারদ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী-বৃত্তিদ্বারা মাগিয়া-যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকলপ্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি **ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।** ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোনপ্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

ভেকধারীদের পাতিত্য-দোষে বৈষ্ণবদের নিন্দা

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব-মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেক-ধারীদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

অধিকাংশ ভেকধারীই কলি-দোষ-দুষ্ট

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারীর পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব **ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য ইহাতে আছে।** আজকাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণকালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কে?

উঃ—শ্রীরূপপ্রভু ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তিনি জগদ্‌গুরু—ভক্তসম্রাট্। তিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপমঞ্জরী গোপী। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গভক্ত। তিনি জীবতত্ত্ব ন'ন—জীবের প্রভু— স্বরূপ-শক্তিতত্ত্ব। তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়জন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরূপপ্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতিপ্রিয়। শ্রীরূপপ্রভু গৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত-ভাব যেরূপ জান্‌তেন, গৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যানুষ্ঠানরত অনুগতজনে সেরূপ সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত নিগূঢ়-ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে-পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকট থাকবে, সে-পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্ব দানের কথা কেহ অস্বীকার কর্‌তে পারবে না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেহ শোধ কর্‌তে পারে না।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে, বক্ষে, মস্তকে থাক্‌বার বস্তু, শ্রীকৃষ্ণ যাঁ'কে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন—তিনিই আমাদের নিত্য উপাস্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু। শ্রীরূপের শ্রীচরণধূলিই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। শ্রীরূপের শ্রীচরণকমলই আমাদের আশা-ভরসা।

কৃষ্ণদাস্য কিরূপে লাভ হ'তে পারে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বল্‌ছেন—শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্যদ্বারাই কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়।

আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হ'তে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। শ্রীরূপের অনুগতজনই সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শ। তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁর দাদা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভুও শ্রীরূপের কৃপা যাচ্ঞা করেন। শ্রীসনাতন প্রভু বলেন—যাঁরা শ্রীরূপের কৃপার আশা করেন না, তাঁরা কখনও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাশোভা দর্শন কর্‌তে পারেন না।

কর্ম্মকাণ্ডী ও নির্ভেদ-জ্ঞানী সম্প্রদায় যখন ভক্তির বিলোপ-সাধন কর্‌বার জন্য বল সংগ্রহ ক'রেছিলেন, সেই বলকে হ্রাস ও দমন কর্‌বার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-প্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হ'য়েছিল। শ্রীরূপ-সনাতনই মহাপ্রভুর সেই সেনাপতিদ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি আর রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁর নিকট হ'তে recruit ক'রে সব সেনা হবে—বিরুদ্ধদলকে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী-সম্প্রদায়কে পরাজয় কর্‌বার জন্য।

রূপানুগ সৈন্যের হস্তে অন্য কোন অস্ত্র নাই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র —কীর্ত্তন। কি ক'রে ভক্তিবিদ্বেষী সম্প্রদায়-সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌তে হবে, সেই সকল দুঃসঙ্গ হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা কর্‌তে হবে, তার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগে সেনাপতি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শক্তি সঞ্চার ক'রে। সেনাপতি তাঁর সৈন্যগণের দ্বারা যেভাবে যুদ্ধ করিয়েছিলেন, তা' আলোচনা ক'রে আমরাও

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের প্রতি গুলী কর্‌তে পার্‌বো—অসদ্‌বুদ্ধি, ফলকামনা, কর্ম্মাগ্রহ, অন্যাভিলাষিতা, পাষণ্ডতা নাস্তিকতা, বিদ্ধভাব—এ সকলের প্রতি গুলী ক'রে ধ্বংস কর্‌ব।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী হ'লেন শ্রীরূপানুগ-সৈন্যসিংহ। তিনি অমোঘ বিচার-বাণে সমস্ত অসৎ-মতকে সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন ক'রেছেন। শ্রীরূপ-সেনাপতির অনুগত—শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ।

শ্রীরূপ তাঁর দাসগণের নিকট যে দুর্ল্লভ সম্পদ্ রেখে গিয়েছেন, তা' আমরা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট পেতে পারি।

আমরা যদি সত্যি সত্যি হৃদয় থেকে নিষ্কপটে সেই অমূল্যসম্পদ চাই, তা' হলেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবাসম্পদ্ আমরা পেতে পার্‌ব।

শ্রীরূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অলৌকিকী অসামান্যা অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া—কৃপা-পরাকাষ্ঠা ; তা' পেলে কুরূপ, বিরূপানুগত্য আর থাকে না, সব সুরূপ হয়—সুদর্শন হয়। তখন বিশ্বভরা লোক যে রূপের জন্য পাগল, সেই কুরূপের প্রতি অতি সহজেই থুৎকার কর্‌তে পারা যায়।

যে-রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা বর্ত্তমানে ঢাকা পড়েছে—উপাধিদ্বারা। একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেউ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী সাজ্‌ছি, কেউ জ্ঞানী সাজ্‌ছি, কেউ যোগী সাজ্‌ছি। আবার কখনও মনে কর্‌ছি—আমি মানুষ, আমি দেবতা, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি। অর্থের রূপ, রমণীর রূপ, প্রতিষ্ঠার রূপ আমাদের নিকট বরণীয় ও লোভনীয় হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ যে রূপের কথা জানিয়েছেন, সেই রূপ পা'বার জন্য কি আমাদের একবারও লৌল্য হ'বে না?

সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় প্রীতিচক্ষে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। ভজন, পূজন, সর্ব্বস্ব, ইহ-পরকাল যখন শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম হবে, তখনই শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ণভাবে দেখ্‌তে পাব।

শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, তাঁর কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি।।

প্রঃ—কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—কর্ম্ম ও লীলাতে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ

জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্যা। কর্ম্ম—মায়াবদ্ধ জীবের ত্রিতাপ-ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রসূত আনন্দময়-ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলা-শক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'য়েও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাববশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়দর্শনের কথা।

প্রঃ—প্রকৃতি বা মায়া কি জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ?

উঃ—গুণময়ী মায়া কখনই মুখ্য জগৎ-কারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবৎ-শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ কারণ হয় —অগ্নি প্রবেশ ক'রে লৌহকে যেরূপ দাহন-শক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগল-স্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে মায়াকে নিমিত্ত-কারণ বলা হয়, তা'তেও কৃষ্ণই মূল নিমিত্তকারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ নিমিত্ত-কারণ। যেরূপ কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তাতে দুইপ্রকার কার্য্য হয় অর্থাৎ পুরুষের কিরণকণা-রূপে অনন্ত জীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস অঙ্গমিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃত-প্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা মায়া মিশে এস ভগবান্ প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন, অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।। (চৈঃ চঃ)

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তার বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময়-ধাম—কারণশূন্য, মায়া—কারণময়ী। এই দুই এর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে চিন্ময় জলনিধি কারণসমুদ্র বলা হয়। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তি অবস্থিত। মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না, ভগবদীক্ষণ মায়ামধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী ক'রে থাকে। **(ক্রমশঃ)**

***

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—৩১]

ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা, যাঁহারা নিজরূপতাহেতু তদীয় কলা, তাঁহাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মস্বরূপ যে ভগবান্ গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। 'কলা' অর্থে শক্তি, 'নিজরূপতা'—স্ব-স্বরূপতা। এই শক্তিত্বের উৎকর্ষহেতু পরমপূর্ণ প্রাদুর্ভাববতী তাঁহাদের লক্ষ্মীত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা যে লক্ষ্মী, একথা ব্রহ্মসংহিতায়ই উক্ত হইয়াছে—"লক্ষ্মীসহস্র-শতসম্ভ্রম-সেব্যমানম্" অথাৎ অসংখ্য লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রমসহকারে সতত সেবা করিতেছেন (যে গোবিন্দের)। আবার ঐ গ্রন্থের শেষে "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" অর্থাৎ কান্তাগণ শ্রী, আর পরমপুরুষ কান্ত।

স্বায়ম্ভুবাগমে শ্রী, ভূ ও লীলা-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্রয়ের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। পরব্যোমস্থিতা এই শক্তিত্রয় হইতে দ্বারকাস্থ শ্রী, ভূ ও লীলাস্বরূপা শক্তিত্রয় শ্রেষ্ঠা ; তথা হইতে আবার বৃন্দাবনস্থ প্রেয়সীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীগণই লক্ষ্মী, ইঁহাদিগকেই শ্রীশুকদেব 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী যেরূপা শ্রীনারায়ণের নিত্য-স্বরূপশক্তি, ব্রজদেবীগণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহাদের নিত্যদাম্পত্য বর্ত্তমান। তাঁহারা লক্ষ্মীগণের ন্যায় পরম-পতিব্রতা।

দশাক্ষরমন্ত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"গোপীজনাবিদ্যাকলা" অর্থাৎ গোপীজন আ— সম্যক্ প্রেমরূপা যে বিদ্যা তাহার কলা—বৃত্তিরূপা। গোপীজনের অর্থ করিয়া 'বল্লভ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রেরক। বিবিধ ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন—এইহেতু প্রেরক-শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থবাচক। শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের বল্লভ, ইহা গোপালতাপনীতে দুর্ব্বাসা-বাক্যে জানা যায়—"তিনি তোমাদের স্বামী।"

তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হন, তবে তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মে সাধনানুষ্ঠান করিয়াছেন, শুনা যায়। তাহার হেতু—সাধকচরী গোপীজনই সাধুনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বরূপশক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা।

ইঁহারা স্বরূপশক্তি বলিয়াই শ্রীশুকদেব রাসপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা।। (ভাঃ ১০।৩২।১০)

অর্থাৎ হে বৎস! পুরুষ (পরমাত্মা) শক্তিগণ-পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভমান হন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বিধূতশোকা গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সেইরূপ অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণে প্রেমরস-নির্য্যাসের প্রচুর প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা জন্মে। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—

ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।

ভগবান্‌ও শরৎকালীন প্রফুল্ল মল্লিকায় সুশোভিত সেইসকল রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয়পূর্ব্বক রমণ করিতে মনন করিলেন।

যোগমায়া দুর্ঘট-সম্পাদিকা স্বরূপ-শক্তি। সেই সেই লীলা-সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ব্রজরামাগণের সহিত তাঁহার রমণকার্য্য সুষ্ঠু-রূপে সম্পন্ন করাইবার জন্য তিনি যোগমায়াকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শক্তি অঘটন ঘটাইতে পারেন বলিয়া ঈপ্সিত কার্য্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিবে না—এই উদ্দেশ্য।

ব্রজ-গোপীগণমধ্যে পরম-মধুর প্রেমবৃত্তিময়ী শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তিনি পরম প্রেমোৎকর্ষরূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগ্লতা। তিনি সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপা। এইজন্য তিনিই স্বয়ং লক্ষ্মী। আর তাঁহাতে প্রেমাধিক্যহেতু নিখিল ব্রজসুন্দরী হইতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে,—

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রত্যুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।।

অচ্যুত কৃষ্ণ তাঁহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য দান করিয়াছেন। অন্যত্র দেবী, বৃন্দাবন-বনে রাধিকা অর্থাৎ অন্য সাধারণ দেশে দেবীই অধিকারিণী, আর 'বৃন্দাবন'-নামক বনে শ্রীরাধাই অধীশ্বরী।

বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
রুক্মিণী দ্বারাবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে।। (স্কান্দে)

বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরষোত্তমে বিমলা, দ্বারকাতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধা। এই শ্লোকে মায়াধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর সহিত শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতির তুল্যত্ব সঙ্গত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

নহে। শক্তিমাত্রত্বের সাধারণ্যহেতু অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভগবচ্ছক্তি—এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীসীতা, লক্ষ্মী, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতিকে দুর্গার সহিত গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব যামলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা।।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি এক গোপী (শ্রীরাধা) সহ মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।

শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।"

শ্রীরাধা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সর্ব্বসম্মোহিনী ও পরা (শ্রেষ্ঠা)। ঋক্-পরিশিষ্টেও—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা।" অর্থাৎ নিজজনসমূহে রাধাদ্বারা মাধবদেব (ক্রীড়াশীল)। মাধবদ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

"জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে যে-সকল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীরাধাপক্ষেও তাহা যোজনা করা যায়। যথা,—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ"—নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা রাধিকার সর্ব্বদা অনুগমন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ইতরা—দ্বিতীয়া শ্রীরাধিকা। যে অন্বয় ও ইতর হইতে আদ্য—আদিরসের জন্ম, সেই দুইজনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) অদ্ভুত বিলাস-মাধুরী আবিষ্কার করিতেছেন যিনি—সেই সেই বিলাসে অভিজ্ঞ—বিদগ্ধ আর যে রমণীরত্ন (স্বেন রাজতে ইতি স্বরাট্) তথাবিধ বিলাসস্বরূপে বিরাজ করেন, বিলাস করেন বলিয়া স্বরাট্। এইজন্য সর্ব্বতোভাবে সেই দু'য়ের কৃপাই আমার অবলম্বন। এইজন্য বলিলেন,—আদিকবি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলা-বর্ণন আরম্ভকারী (শ্রীব্যাসদেব আমাকে) অন্তঃকরণদ্বারাই ব্রহ্ম—লীলাপ্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম যাঁহারা বিস্তার করিয়াছেন—সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তদুভয়কে ধ্যান করি। 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—যে রাধা-বিষয়ে সুর শেষাদি মোহ-প্রাপ্ত হন, এবম্ভূতা তিনি যদি কৃপা না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত আমার পক্ষে (শ্রীরাধার) যৎকিঞ্চিৎ লীলাবর্ণন-সাহসসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তদুভয়ের আশ্চর্য্যরূপত্ব বলিতেছেন,—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ"—তেজ, বারি, মৃত্তিকা এ সকল বস্তুর যে-প্রকার বিনিময়—পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে,

তেজপদার্থ চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার নখকান্তিদ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিস্তেজত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ; বারি নদ্যাদি সংসর্গ-সম্পর্কিত বংশীবাদ্যাদিরদ্বারা তেজপদার্থের মত ঊর্দ্ধ-গমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয় ; পাষাণাদি যাঁহার বিচ্ছুরিত কান্তিদ্বারা তেজপদার্থের উজ্জ্বলতা এবং বংশীবাদ্যাদিদ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়—এ সকল কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর শ্রীরাধার আশ্চর্য্যরূপতা বলিতেছেন,—

"যত্র ত্রিসর্গো মৃষা"—যাহাতে শ্রী, ভূ, লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনগত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা বৃন্দাবনে রস-ব্যবহারে সুহৃৎ, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ভেদপ্রাপ্ত সমস্ত ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব 'মৃষা' —মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদিদ্বারা উক্ত শক্তিবর্গ—প্রেয়সীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনে লাগে না, একমাত্র শ্রীরাধাদ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়, তাঁহাকে ধ্যান করি।

একবচনান্ত ক্লীবলিঙ্গ 'তদ্'-শব্দদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কে কিরূপে বুঝায়? তদুত্তর—পরমশক্তি ও শক্তিমানরূপে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া একত্ব-বিবক্ষায় তদ্-শব্দ। অতএব সাধারণভাবে নির্দ্দেশহেতু ক্লীবলিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষভাবে নহে)।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্"—নিজপ্রভাবে লীলা-প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ নায়িকাগণের কুহক—মায়া সর্ব্বদা যে দুইজন কর্ত্তৃক নিরস্ত।

"সত্যং পরং ধীমহি"—তাদৃশরূপে নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর বিলাসাদিদ্বারা যাঁহারা আনন্দদানে কৃতপ্রতিজ্ঞ। অতএব 'পর'—অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না এরূপ গুণ-লীলাদিদ্বারা বিশ্ববিস্মাপকহেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধামাধবকে ধ্যান করি।

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ সমাপ্ত)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীএকাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য

শ্রীএকাদশী-তিথির অপর নাম শ্রীহরিবাসর-তিথি বা মাধব-তিথি। সকল শাস্ত্রে এই তিথি 'ভক্তিজননী'রূপে সম্মানীয়া হইয়াছেন। ভগবৎপ্রীতি লাভই এই তিথি পালনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শিশুদিগের রক্ষণার্থ মাতার ন্যায় ও রোগীদিগের পরিত্রাণার্থ ঔষধের ন্যায় সর্ব্বজনরক্ষার্থ একাদশী তিথির উৎপত্তি। মনুষ্যসকলের পক্ষে পাতকনাশন এই তিথির তুল্য পবিত্র অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। একাদশীর সমতুল্য পাপোদ্ধারক অন্য কিছু লক্ষিত হয় না। এই তিথি স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদা এবং রাজ্য ও পুত্রদায়িনী। মহারোগবশতঃ দুঃখগ্রস্ত শরীরিদিগের দুঃখনাশের নিমিত্ত পরম

মহৌষধরূপ এই একাদশী-উপবাসের সৃষ্টি হইয়াছে। বিবিধ দুঃখসমাকীর্ণ সংসারে মনুষ্যজন্ম ধারণপূর্ব্বক যিনি একাদশী উপবাসে রত থাকেন, তিনি ধন্য, তিনি বুদ্ধিমান্। সংসাররূপ সর্পদ্রষ্ট পাপী মনুষ্যসকল একাদশী উপবাসদ্বারাই সদ্য সুখী হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে জলদ্বারাও পূজা করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞও একাদশী উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্য নহে। হরিবাসর-তিথি চিন্তামণিতুল্য কিম্বা কল্পতরুস্বরূপ। যেরূপ দাবানল উত্থিত হইয়া গহ্বরস্থ শুষ্ক ও আর্দ্রকাষ্ঠ সকলকে ভস্মীভূত করে, তাহার ন্যায় শ্রীহরির দিন অখিল পাতক বিনাশ করেন। ছলপূর্ব্বকও হরিবাসর-তিথি পালন করিলে সকল পাতক ধ্বংস হইয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠধাম লাভ হয়।

সকলশাস্ত্র সকলকে শ্রীএকাদশী-তিথিতে অন্নভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। একাদশীতে উপবাস করাই সকল শাস্ত্রের বিধি। ধান, গম, যব, তিল, সরিষা প্রভৃতি পঞ্চশস্য জাতীয় পদার্থ একাদশীতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। বিষ্ণুস্মৃতিতে উল্লেখ রহিয়াছে,—"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ" অর্থাৎ মানব কখনও একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না।" এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদীয় পুরাণ ও পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ড বলিয়াছেন,—

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।।

"হরিবাসর-তিথি সমাগত হইলে অন্নভোজন করা উচিত নহে, অন্নভোজন করা উচিত নহে, ইহা পুরাণসমূহে ভূয়োভূয়ঃ ঘোষিত হইয়াছে।" অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়,—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্।
উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ু-প্রবৃত্তিভিঃ।।

"বিষ্ণুপ্রিয়তম একাদশী-ব্রতে অবশ্যই অন্নভোজন নিষিদ্ধ। যাবজ্জীবন একাদশীর উপবাস করা উচিত।" পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শিবঠাকুর বলিয়াছেন,—

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ।।

"সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ব আশ্রম ও স্ত্রীজাতির পক্ষে একাদশীর উপবাস করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।" বৃহন্নারদীয় পুরাণে পাওয়া যায়,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নারী—এ সকলের মধ্যে যে কেহই ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়া একাদশী-ব্রত পালন করিলে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুতোষণের জন্য এই ব্রতের সম্মান

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" অনেকে 'নারী' বলিতে বিধবা নারীকেই বুঝিয়া থাকেন। স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে সধবা নারীদের একাদশী-ব্রত করিতে নাই, এই ব্রত কেবল-মাত্র বিধবাদের জন্য—এই শাস্ত্রবিরোধী চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সধবাগণ ব্রতপালনে বিরতা থাকেন। তাহাদের ভুল-সংশোধনার্থ শৃঙ্গী-ঋষি বলিয়াছেন,—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি" অর্থাৎ ঋতুমতী অবস্থায়ও একাদশীতে অন্নভোজন করা নারীজাতির (শুধুমাত্র বিধবা নহে) উচিত নহে।"

একাদশীতে অন্নভোজনকারীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না

যাহাদের বয়ঃক্রম অষ্টমবর্ষের অধিক হইয়াছে ও অশীতিবর্ষ পূরণ হয় নাই, তাহারা একাদশীতে অন্নভোজন করিলে অনন্তকোটী পাপের ভাগী হয়। রাজা রুক্মাঙ্গদের রাজ্যে আট হইতে আশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিত না, কেহ ভোজন করিলে রাজা তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। স্কন্দপুরাণে মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে।।

"হে মহাদেবি! হরিবাসরে অন্নভোজন করিলে যমদূতগণ সেই পাপীর বদন-বিবরে তীক্ষ্ণ অগ্নিবর্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে।" হরিবাসরে অন্নভোজন করিলে পৃথিবীস্থ নিখিলপাপ ভোজন হয়। "মোহশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদীয় পুরাণে পাওয়া যায়,—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।।

"হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাপ অন্নমধ্যে অধিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য হরিবাসরে অন্নভোজন করিলে সকলপ্রকার পাপকেই গ্রহণ করা হয়।"

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোঽশ্নাতি ন স পাপৈর্বিমুচ্যতে।।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

"যে ব্যক্তি হরিবাসরে অন্নভোজন করে, সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে, যেহেতু এই দিনে সকলপ্রকার পাপ অন্নস্থিত হয়, সুতরাং মোহবশতঃ যে অন্নভোজন করে, সে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় না।" স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।।

"একাদশীতে অন্নভোজন করিলে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরু-হত্যার পাপ হয়। অন্নভোজনকারী কখনও বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় না।" পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লেখ রহিয়াছে,—"হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অন্নভোজন কর, অন্নভোজন কর—এইরূপ বলে, সেই ব্যক্তি গোবধ কর, স্ত্রী-বধ কর, ব্রাহ্মণ হত্যা কর—এইরূপ উচ্চারণ করে।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের ১৮০ শ্লোকে পাওয়া যায়,—

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংস-ভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানমেকাদশ্যন্নভক্ষণাৎ।।

"স্বমাতৃগমন, গোমাংস-ভক্ষণ, প্রাণিহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশীতে অন্নভোজন অধিক পাপজনক।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর উল্লেখ করিয়াছেন,—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বাণপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি।।

"ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ বা যতির যে কেহই একাদশীতে অন্নভোজন করিলে তাহার গোমাংস ভক্ষণ করা হয়।"

একাদশীং বিনা রন্তা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ।
পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহূতসংপ্লবম্।। (নারদীয়পুরাণ)

"একাদশীতে অন্নভোজন করিলে বিধবা ও মহাতপস্যান্বিত যতিকেও আপ্রলয় অন্ধতামিস্র নরকে গিয়া পচিতে হয়।"

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জিতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নাশাদ্‌ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে।। (কাত্যায়নস্মৃতি)

"যে বিধবা নারী একাদশীতে অন্নভোজন করে, তাহাকে ভ্রূণহত্যার পাপভোগ করিতে হয়।" গৌতমীয়-তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ।।

"বৈষ্ণব যদি ভ্রমবশতঃ একাদশীতে অন্নভোজন করে, তাহার বিষ্ণুর অর্চ্চন বৃথাই হয়, তাহাকে ঘোর নরকে যাইতে হয়।" পাপীজন একাকী নরকে যায়, কিন্তু একাদশীতে অন্নভোজনকারী পিতৃগণসহ নরকে যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী, সুরা-পায়ী, তস্কর ও গুরুপত্নীগামীরও নিষ্কৃতির বিধান বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু একাদশীতে অন্নভোজনকারীর পরিত্রাণার্থ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

শুক্লপক্ষ হউক বা কৃষ্ণপক্ষ হউক—উভয় পক্ষেরই একাদশীর গুরুত্ব ও মহিমা সমান

আজকাল জগতে অনেককেই বাছাই করিয়া একাদশীর উপবাস করিতে দেখা যায়। অনেকে ভৈমী, শয়ন, পার্শ্ব ও উত্থান—এই চারিটী মাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কেবলমাত্র শুক্লপক্ষের একাদশী-ব্রতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণপক্ষের সমস্ত একাদশীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। শাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূরীভূত হইবে।

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাসের কথা সকল শাস্ত্রে পাওয়া যায়। "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।" যেমন শুক্লা একাদশী, তদ্রূপ কৃষ্ণা একাদশী—উভয়ে কোন ভেদ নাই—ইহা বিষ্ণুরহস্য, কূর্ম্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায়। শুক্লবর্ণা গাভী ও কৃষ্ণবর্ণা গাভী উভয়ের দুগ্ধ যেমন সমান পুষ্টিকারক, তেমনই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয় একাদশীর ফল সমান। "কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি" অর্থাৎ উভয়পক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করা নরনারী সকলের কর্ত্তব্য। "একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি" (বরাহপুরাণ) অর্থাৎ উভয়পক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিবে। কাত্যায়নস্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।।

"অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমের পর অপূর্ণ অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয়পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করা মানবের কর্ত্তব্য।" মৎস্যপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।।

"শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস থাকিয়া দ্বাদশীতে ভোজন করিলে ঐ ব্রত হরির প্রিয়তম হইয়া থাকে।" কালিকাপুরাণ হইতে পাওয়া যায়,—"মোহবশতঃ শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর বিচার করিলে ইহলোকে পাতকপুঞ্জের ভাগী হইতে হয়।" শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশী উভয়ের ভেদবিচার করিলে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। (গরুড়পুরাণ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

"শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর ভেদ বিচার করিলে পিতৃঘাতী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে হয়।" কূর্ম্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে পাওয়া যায়,—

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়েতি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে।।

"মোহগ্রস্ত হইয়া শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর ভেদ বিচার করিলে ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, কৃতঘ্ন ও গুরুদারগামীসদৃশ পাপী বলিয়া নির্ণীত হইতে হয়।"

শুদ্ধা একাদশীতে শ্রাদ্ধাদি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ

ঘোর আপদ অবস্থায় বা আনন্দ সমাগত হইলে কিংবা জনমাশৌচ বা মরণাশৌচেও কখনও একাদশী-ব্রত ত্যাগ করিতে নাই। "মৃতকে তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদা নরঃ" (বরাহপুরাণ) অর্থাৎ মরণাশৌচে একাদশীতে অন্নভোজন করা কখনও মনুষ্যের উচিত নহে। পদ্মপুরাণ পুষ্করখণ্ডে পাওয়া যায়,—"একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐদিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।" স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—"নিত্যস্বরূপিণী একাদশীতে শ্রাদ্ধ সমাগত হইলে ঐ দিনে ব্রতের সম্মান করিয়া অর্থাৎ উপবাসী থাকিয়া পরদিবস অর্থাৎ দ্বাদশীদিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—"একাদশী-দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও যাঁহার শ্রাদ্ধ করা হয়, ইঁহারা তিনজনেই নিরয়ে গমন করেন।" এতৎপ্রসঙ্গে সনৎকুমার সংহিতা হইতে পাওয়া যায়,—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিন্ময়ম্।।

"মনুষ্য যদি একাদশীতে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে অন্নভোজন করে, তাহা হইলে সে প্রতি গ্রাসে মূত্রবিষ্ঠার পাপ ভোজন করে।"

দশমীবিদ্ধা একাদশী শুদ্ধা একাদশী নহে, তজ্জন্য উহা বিশেষভাবে পরিত্যজ্য

একাদশী সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা—এই দুইপ্রকার। বিদ্ধাও—পূর্ব্ববিদ্ধা ও পরবিদ্ধা এই দুইপ্রকার, তন্মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। "নোপোষ্যো দশমী-বিদ্ধা সদৈবৈকাদশী তিথিঃ" অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে কখনও উপবাস করিতে নাই। "দশম্যৈকাদশী-বিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বুধঃ।" দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"যেমন সুরাবিন্দু-স্পর্শে গঙ্গোদকপূর্ণ কলস নষ্ট হয়, তদ্রূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী সমস্ত সুকৃতিই নষ্ট করে। কুক্কুরচর্ম্মসংস্থিত পঞ্চগব্য যদ্রূপ দূষিত, তদ্রূপ দশমীযুক্ত একাদশীও বর্জ্জনীয়।" মূঢ়ব্যক্তি ব্যতীত যেরূপ কেহই ভয়ঙ্কর হলাহল বিষ পান করেন না, তদ্রূপ কোন সদ্‌ব্রতীই দশমীসংযুক্ত একাদশীতে উপবাস করেন না।

এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কলা কাষ্ঠাপি যা চৈব দৃশ্যতে দশমী বিভো।
একাদশ্যান্তু সেনানি কর্ত্তব্যা ন কথঞ্চন।।

"যে একাদশী কলা কিংবা কাষ্ঠাপরিমিত দশমীদ্বারা বিদ্ধা হইবে, কখনও সেই একাদশীতে উপবাস করিবে না।" **দশমীবিদ্ধা একাদশীকে হরিবাসর বলিয়া গণ্য করা যায় না।** দশমীবিদ্ধা একাদশী-তিথির নিকট অসুরগণ অবস্থান করেন এবং তাহাদেরই উপবাসের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা হরিবাসরে নিজে উপবাস করে কিম্বা অপরকে উপবাস করিতে উপদেশ করে, সেই পাপী শুক্র-মায়ায় বিমোহিত হইয়া পিতৃগণের ও দেবগণের সহিত বৈরতা স্থাপন করিয়া থাকে। পদ্মপুরাণে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

শুক্রেণ মোহিতো বিপ্রা দৈত্যানাং কারণেন তু।
পুষ্টর্থং দশমীবিদ্ধং কুর্ব্বন্তি মম বাসরম্।।

"বিপ্রগণ শুক্রমায়ায় মোহিত হইয়া দৈত্যদিগের পুষ্টির জন্য দশমীবিদ্ধা হরিবাসর পালন করিয়া থাকেন।"

দশমীবিদ্ধা একাদশী ধন, সম্মান, সর্ব্ববিধ পুণ্য ও কৃষ্ণভক্তি-বিনাশিনী। যেমন কৃতঘ্ন ব্যক্তির কার্য্যসমূহ বিফল হয়, সেইরূপ দশমীবিদ্ধা হরিবাসরে জাগরণ, হরিপূজা ও দানাদি যাবতীয় কার্য্য বিফল হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই বিদ্ধা একাদশীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, যেহেতু উহাতে উপবাস করিলে দুঃখ ও দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে পরমায়ু ক্ষয় ও সন্ততি বিনষ্ট হয়। দ্বাপরযুগান্তে কুরুবংশবর্দ্ধিনী গান্ধারী মোহবশতঃ দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করেন, তজ্জন্য তাঁহার একশত পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হন। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"মুহূর্ত্তপরিমাণ দশমীসংযুক্তা একাদশীতে মোহবশতঃ উপবাস করিলে সুখ ও ধর্ম্ম ক্ষয় হয়।"

ব্রহ্মপুরাণ ব্রতখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—

উপোষ্যৈকাদশীং মোহাদ্দশমীশেষসংযুতাম্।
ন নরঃ সুখমাধত্তে ইহলোকে পরাত্র চ।।

"মোহবশতঃ দশমীশেষ-সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিলে মানব ইহলোক কিংবা পরলোক কোথাও সুখলাভ করিতে পারে না।"

ব্রহ্মঘাতক, স্ত্রী, বালক, গুরুঘাতকের যে পাপ হয়, দশমীসংযুক্ত একাদশীতে উপবাসকারী সেই পাপ প্রাপ্ত হয়। শ্বপচীগমনে যে পাপ হয়, বিদ্ধা হরিবাসরকারীর সেই একই পাপ জন্মে। যে ব্যক্তি দশমীবেধসংযুক্ত একাদশীব্রত করে, তাহাকে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

ভগবদ্ভক্ত বলা হইবে না, যেহেতু সর্ব্বদা পাপের মূল দশমীসংযুক্তা একাদশীকে সে সম্মান করিয়াছে। মনুষ্যসকল যদি বিদ্ধা একাদশীতে ব্রতাচরণ করে, তবে তাহারা পিতৃগণের সহিত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে পাওয়া যায়,—

বর্জ্জনীয় প্রযত্নেন বেধো দশমি-সম্ভবঃ।
নোচেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেমযোনিমবাপ্স্যসি।।

"যত্নসহকারে দশমীবিদ্ধা একাদশী বর্জ্জন না করিলে অবশ্যই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

কূর্ম্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ ও বিষ্ণুরহস্যে পাওয়া যায়,—

যৈঃ কৃতা দশমীবিদ্ধা বিদ্যা-মোহেন মানবৈঃ।
তে গতা নরকং ঘোরং যুগানামেকসপ্ততিম্।।

"যে-সকল মানব বিদ্যামদে মোহিত হইয়া দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস থাকে, তাহাদিগকে একসপ্ততিযুগ দারুণ নরকে বাস করিতে হয়।"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নহে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে।" শ্রীনারদীয়পুরাণ হইতে পাওয়া যায়,—"দশমীসংযুক্তা একাদশীর পরদিবস একাদশী না থাকিলেও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি দ্বাদশীতেই উপবাস করিবেন এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিবেন।" সুতরাং দশমীপলমিশ্রিত একাদশী বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করা আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী সকলেরই কর্ত্তব্য।

অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাসও নিষিদ্ধ

অনেকের ধারণা, "সূর্য্যোদয়ের পরে দশমী-তিথি একাদশীকে স্পর্শ করিলে তাহাই কেবল দশমীবিদ্ধা একাদশী এবং তাহাকেই বর্জ্জন করিতে সকল শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়কালেও যদি দশমী থাকে, সেইদিন একাদশীর উপবাস করিলে কোন ক্ষতি নাই ; যেহেতু তাহা দশমীবিদ্ধা একাদশী নহে।" বিভিন্ন শাস্ত্র তাহাদের ভুল ধারণার নিরসন করিয়াছেন। রাত্রির শেষভাগে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কালকে অরুণোদয় কাল বলা হয়। গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ বলিয়াছেন,—"সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত একাদশী থাকিলেই তাহাকে সম্পূর্ণা বলা হয়, ঐ একাদশীতে উপবাস করা উচিত। তদ্ব্যতীত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্তের ন্যূন থাকিলে দশমীবিদ্ধা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা।" ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায়,—"অরুণোদয়-সময়ে যদি দশমীর গন্ধমাত্রও থাকে, তাহা হইলে সেইদিন একাদশীর

উপবাস করা উচিত নহে। ঐদিন একাদশীর অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সবই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"অরুণোদয়কালে যদি দশমীর শেষ সংযোগ হয়, তবে ঐদিন একাদশী ব্রতাচরণ করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে।" পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে পাওয়া যায়,—"অরুণোদয়কালে দশমী থাকিলে সেইদিনের একাদশী বর্জ্জন করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা উচিত, ইহাতে কোনরূপ বিচার করিবে না।" কণ্ব-মুনি বলিয়াছেন,—"অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে।"

সর্ব্বমঙ্গলময়ী একাদশীতে উপবাস করা সকল জীবেরই কর্ত্তব্য

বাল্যে, যৌবনে বা বৃদ্ধাবস্থায় যখনই হউক না কেন, একাদশীতে উপবাস করিলে কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। একাদশীতে অন্নভোজনকারী চতুর্ব্বেদী বিপ্র অপেক্ষা একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। একাদশী-ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য। রোহ, দাহ, গ্লানি ও কাতরতা প্রভৃতি হইতে তাহার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই এবং সর্ব্বদা তচ্চিত্তে হরিস্মৃতি বিরাজমান থাকে। শিবপুরাণে পাওয়া যায়,—"যে নর ভক্তিপূর্ব্বক একাদশীতে উপবাসী থাকেন, তিনি বিষ্ণুসারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।" একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ব্রতান্তরের অনুষ্ঠান করিলে করস্থ মহারত্ন বর্জ্জন করিয়া ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করা হয়।

একাদশী উপবাসই সার, তত্ত্ব, সত্য, ব্রত ও সম্যক্ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। জল, ফল, মূল, পয়ঃ, ঘৃত, ব্রাহ্মণকাম্য, গুরুবাক্য ও ঔষধ—এই আটটীতে ব্রত নষ্ট হয় না।

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হরির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্।।

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

একাদশীর কথা শ্রবণ করিলে, ইহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহার অনুষ্ঠানে অনুমতি দিলে এবং এই ব্রতাচরণার্থ মনুষ্যগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিলে সকল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভপূর্ব্বক গরুড়ধ্বজের অত্যুত্তম পদ বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইয়া থাকে। কলিকালে যাহারা উচ্ছিন্নপথাবলম্বী ও নিষ্ঠুরতাবশতঃ যাহাদের আত্মা কলুষিত হইয়াছে, একাদশীর উপবাস ব্যতীত তাহাদের সংসার হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

অলৌকিক

[৯]

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন দেহ বলিয়া বলা হয়। ইঁনি কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে শ্রীবিগ্রহসেবার অধিকার দিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার পুত্র কি রঘুনন্দন? না তুমি রঘুনন্দনের পুত্র?" আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি স্থির করিয়া বল। তখন মুকুন্দ বলিয়াছিলেন,—

"মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তার 'পুত্র'—এই আমার নিশ্চয়।।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে।।
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১৫-১১৭)

মুকুন্দের কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথ। প্রত্যহ মুকুন্দই গোপীনাথের অর্চ্চনাদি করেন। একদিন তিনি কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে যাইবেন। পুত্র বালক রঘুনন্দনকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বাবা রঘুনন্দন! আমি বিশেষ জরুরী কার্য্যে বাহিরে যাইতেছি। তুমি গোপীনাথের সেবা করিও। দেখ, সেবায় যেন কোন ত্রুটী না হয়, যত্ন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিও।" রঘুনাথের আনন্দ ধরে না। সেবার সামগ্রী লইয়া পূজা করিতে বসিয়া গেলেন। গোপীনাথের লাড্ডু ভোগ হয়। শিশু রঘুনন্দন লাড্ডু ভোগ নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"গোপীনাথ! খাও, খাও।" গোপীনাথ ত' আর খান না। তখন বালক কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাঃ, বেশ ত'! তুমি বাবার হাতে খাও। আর আমি কি দোষ করিলাম যে খাইতেছ না।" এই বলিয়া প্রেমভরে খাও খাও বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রেমবশ। শিশু বালকের প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের কাছে গোপীনাথ হার মানিলেন। তিনি সব লাড্ডুগুলি খাইয়া ফেলিলেন। রঘুনাথের আর আনন্দ ধরে না। যাক্ তিনি বাবার আদেশমত ঠাকুরসেবা করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীমুকুন্দ গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুত্রকে সস্নেহে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,

—"বাবা রঘুনন্দন! ঠাকুরসেবা ঠিকমত করিয়াছ ত'? দাও, আমাকে একটু প্রসাদ দাও।" রঘুনন্দন ত' মহাফাঁপরে পড়িলেন। বলিলেন,—"বাবা! প্রসাদ ত' নাই। আমি লাড্ডু ভোগ দিয়াছিলাম। প্রথমে গোপীনাথ খাইতেই চায় নাই। আমি খুব জিদ্ ধরিলাম। তখন অগত্যা গোপীনাথ সব লাড্ডুগুলিই খাইয়া ফেলিল। একটুও অবশেষ রাখেন নাই।" মুকুন্দ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ছেলে বলে কি! কি ব্যাপার! তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না! তিনি পরদিবস রঘুনন্দনকে বলিলেন,—"আমি বাহিরে যাইতেছি, তুমি ঠাকুরসেবা করিও।" এই বলিয়া বাহিরে কোথাও না গিয়া গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। পিতার নির্দ্দেশে রঘুনন্দন খুবই আনন্দ-হৃদয়ে গোপীনাথের সেবায় মগ্ন হইলেন। আজ আর তাঁহার কোন সংশয় নাই। তিনি "ঠাকুর খাও, খাও" বলিয়া গোপীনাথের হাতে লাড্ডু দিয়াছেন। গোপীনাথ অর্দ্ধেকটী লাড্ডু খাইয়াছেন—এমন সময় মুকুন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আর গোপীনাথের খাওয়া হইল না। অর্দ্ধেকটী লাড্ডু হাতে রহিয়া গেল। ইহা দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে পাগল। তিনি রঘুনন্দনকে কোলে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে,　　অর্দ্ধলাড্ডু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।"

রঘুনন্দন নিজহস্তে গোপীনাথকে লাড্ডু খাওয়াইয়াছিলেন—ইহা এক অলৌকিক ঘটনা।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়াছেন। তিনি রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন। রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। তিনি বড়ডাঙ্গায় উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। নাচিতে নাচিতে প্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহার চরণের নূপুর খসিয়া সেখান হইতে ৪ মাইল দূরে আকাইহাটে শিষ্য কৃষ্ণদাসের গৃহে গিয়া পড়িয়াছিল। সেই স্মৃতিরক্ষার জন্য পরে সেখানে একটী কুণ্ড নির্ম্মিত হয়। সেই কুণ্ডটী 'নূপুর কুণ্ড"-নামে অভিহিত।

[১০]

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী। তিনি কৃষ্ণলীলায় অনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন। দক্ষিণভারতে শ্রীরঙ্গমের নিকট বেলগুণ্ডি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট। তাঁহার জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা।—

গোপাল একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, কৃষ্ণ গৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্পূর্ণ নবদ্বীপ-লীলা দেখাইলেন। তিনি দেখিলেন—গৌরহরি তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাতে গোপালের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি মহাপ্রভুর দর্শন কবে পাইবেন, তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে আসিয়া

ভক্তবাঞ্ছা-পূরণকারী প্রভু শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে অতিথি হইলেন। তখন চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকাল। ব্যেঙ্কটভট্টের আনন্দের সীমা নাই। গোপালভট্টের তখন অতি অল্প বয়স। মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার শিহরণ জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। ব্যেঙ্কটভট্ট রামানুজীয় বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গক্রমে ও অনুকম্পায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ও পুত্র গোপাল-ভট্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। গোপালভট্ট তাঁহার খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল।

একসময় গোপালভট্ট হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর-নামক স্থানে শুভবিজয় করেন। সেখানে এক সরল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রচুর সেবা করেন। ব্রাহ্মণের মনে দুঃখ —তাঁহার কোন পুত্র নাই। গোপালভট্ট তাঁহার মনের বাসনা বুঝিয়া ফেলিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"দুঃখ করিও না, তোমার হরিভক্তি-পরায়ণ পুত্র হইবে।" ব্রাহ্মণটী কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"প্রভো! যদি পুত্র হয়, তবে আমার প্রথম পুত্রকে আমি আপনার শ্রীচরণসেবায় অবশ্যই সমর্পণ করিয়া দিব।" পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার প্রথম পুত্রকে শ্রীগোপালভট্টের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। সেই ব্রাহ্মণপুত্র হইল শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য শ্রীগোপীনাথ পূজারী।

বৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রত্যহ ১২ টী শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেন। একজন শেঠ ঠাকুরের নানাপ্রকার সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কারাদি লইয়া আসিলেন। ভট্টের মনে দুঃখের সীমা নাই, তিনি ভাবিলেন,—"হায়! হায়! আমার সবই ত' শালগ্রাম। বিগ্রহ ত' নাই। এইসব বস্ত্র ও অলঙ্কার কি করিয়াই বা ঠাকুরকে পরাইব? এই বলিয়া মনের দুঃখে শালগ্রামগুলিকে শয়ন দিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার—পরদিন প্রাতে পূজা করিতে গিয়া দেখেন—বারটী শালগ্রামের মধ্যে একটী শাল-গ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। গোপালের আনন্দের আর সীমা নাই। এইরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা ব্রজের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তথায় আগমন করিলেন এবং শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া গেলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীও মনের আনন্দে শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহকে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি পরাইয়া সুসজ্জিত করিলেন এবং সেবানন্দে মগ্ন হইলেন।

"জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে,
গোপালভট্টের প্রাণধন হে।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

[১১]

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ব্রজে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম "মহাবল" ছিলেন। সুন্দরবনের অন্তর্গত 'খালিজুলি'-গ্রামে ধনাঢ্য জমিদার বংশে তাঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁনি খালিজুলি হইতে চলিয়া আসিয়া হুগলী জেলার মাহেশে অবস্থান করেন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই বহু অনুসন্ধানের পর মাহেশে আসিয়া দাদার সাক্ষাৎ পান। তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তিনি মাহেশ ছাড়িয়া কোনমতেই যাইতে রাজী না হওয়ায় অবশেষে নিজেই সপরিবারে মাহেশে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

ধ্রুবানন্দ-নামে একজন বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া শ্রীধাম পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"আহা! আমি যদি নিজহস্তে রন্ধন করিয়া জগন্নাথদেবকে খাওয়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে কতই না আনন্দ হইত। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"ধ্রুবানন্দ! আমি তোমার হস্তের ভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিব। তুমি গঙ্গাতীরে মাহেশে চলিয়া যাও। সেখানে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং নিজহস্তে রান্না করিয়া আমাকে ভোগ নিবেদন করিবে। আমি গ্রহণ করিব।"

ধ্রুবানন্দ জগন্নাথের আদেশ পাইয়া শ্রীরামপুরের আড়াই মাইল দূরে মাহেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। দেখিলেন—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার শ্রীবিগ্রহ জলে ভাসিতেছেন। তিনি পুলকিত হইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে উঠাইলেন এবং মাহেশে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বিগ্রহগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রত্যহ রন্ধন করিয়া ভোগ নিবেদন করেন এবং বাঞ্ছাকল্প-তরু জগন্নাথের সেবায় ও নাম-কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। এইভাবে সেবাকার্য্যে তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল—'আমি ত' আর বেশীদিন থাকিব না। আমার মৃত্যুর পর কি করিয়া ঠাকুরের সেবা চলিবে? কে-ই বা সেবা করিবে?" ইহা ভাবিয়া তিনি খুবই অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"ধ্রুবানন্দ! ভাবিও না। সুন্দরবনের অন্তর্গত খালিজুলি-গ্রামে কমলাকর পিপ্পলাই-নামে আমার একজন ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাকে আমি এখানে আসিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ করিতেছি। তিনি শীঘ্রই এখানে আসিবেন। তাঁহার হস্তে তুমি আমার সেবা সমর্পণ করিবে।"

আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তৎপরদিবসেই শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই মাহেশে আসিয়া উপস্থিত হন। জগন্নাথের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার হস্তে ধ্রুবানন্দ সেবাভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

---

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

বিরহ মহা-মহোৎসবে

(১)

মরম মথিয়া
ভুবন ভরিয়া
উঠে কি আবার গভীর তান,
বিগলিত হিয়া
নয়নে ঢালিয়া,
গাহে সবে কা'র বিরহ-গান!

(২)

উথলে সাগর
বহিয়া সে স্বর,
মুখর নগর—'পুরুষ-উত্তম' ;
কি করুণা গীতি!
কোন্ মহা স্মৃতি
অশোক কি ভাবে ভরে ভুবন!

(৩)

মনে কি রে হয়,
এমনি সময়,
এই দিনে সেই, লীলা পরিহরি,
গেলেন স্বধাম
ভকত-প্রধান
'ভকতি-বিনোদ' গাহি গৌরহরি!

(৪)

কি নব শোভায়
পূর্ণ-শশি-প্রায়
করিয়া উজ্জ্বল ভারতাকাশ,
কি সুধা ঢালিয়া
ক্ষণে লুকাইয়া
গেল আজি ওরে, করি নিরাশ!

(৫)

পূর্ণ প্রস্রবণ
কি রস পরম
ঢালিয়া অজস্র হইল শেষ,
অতৃপ্ত-পিয়াস
তবু কি হতাশ
করি সবে, গত আপন দেশ!

(৬)

হায়, হায়, হায়,
পাব রে কোথায়
হেন নিধি আর এ মর ধামে,
বহাইবে ঘন
সে প্রেম-প্লাবন
কে আর তেমন গৌরাঙ্গ-নামে!

(৭)

নব নব তান
তুলিয়া সে গান
কে গাহিবে আর গভীর স্বরে,
প্রাণ-ভরা তানে
কাহার সে গানে
প্রেমের অঙ্কুর উঠিবে পাথরে!

(৮)

হা হা প্রভু মোর,
গোরা-প্রেমে ভোর,
রূপানুগবর,—বিদরে হিয়া
বিরহে তোমার,—
চাহ একবার
কর কৃপা সেবা-অধিকার দিয়া।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

(৯)

এই পুণ্যধামে
তব প্রিয়-স্থানে
পূজা-অর্ঘ্য আজি সাজাইয়ে শত,
সেবি তব পদ,
স্বগুণে বরদ,
লহ পূজা, পূর্ণ কর মনোরথ।

(১০)

কর আশীর্ব্বাদ,
যেন নির্ব্বিবাদ
অনুসরি, পূত পদাঙ্ক তব,
প্রিয় আচরণে
তোমার ভুবনে,
সেবি সদা গোরা-চরণ-পল্লব।।

হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীশ্যামসেবক ব্রহ্মচারী

মহাপ্রভুর দয়া

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যলীলাময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি আনন্দস্বরূপ। সেইকারণে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ আনন্দেরই ঘনীভূত অবস্থা। লীলায় সতত চঞ্চল বলিয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লীলাময়। তাঁহার কান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মহাপ্রেমরস প্রদান করিতেছেন। সেইকারণে তিনি উন্নত উজ্জ্বলরসপ্রদাতা।

"চন্দ্র রূপকত্বেন প্রেমামৃতং ধ্বনিতম্" (উক্ত শ্লোকের টীকাংশ)। চন্দ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যের তুলনা করা হইয়াছে। এই তুলনায় প্রেমের অমৃতত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ অমৃতময় এবং জীবের বিষয়বাসনাদি তমঃ নাশ করিয়া থাকেন। (তমঃ = তম্ (গ্লানি) + অস্ = তমস্, প্রথমার একবচন। জীবের চিত্তে যে গুণের আধিক্যহেতু গ্লানি জন্মে)।

চন্দ (দীপ্তি পাওয়া) + র = চন্দ্র। চন্দ্র নিশাকালীন তম (অন্ধকার) দূরীভূত করিয়া পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল শোভায় বিমণ্ডিত করে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কি করেন? শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সকল চিৎসত্তার মূলরূপে দীপ্তিমান। তিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনদ্বারা জীবের হৃদয়াকাশ হইতে সকল প্রকার কলুষ (আবিলতা, মলিনতা) নির্ম্মুক্ত করিয়া সকলের চৈতন্য সম্পাদন করেন।

তম নাশ করিয়া চৈতন্যের আলোকে জীবের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলেন। সুতরাং সুবর্ণকান্তি-সমন্বিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কলিহত জীবের হৃদয়ের ভোগ-তিমির বিনাশ করিতে কিরণ বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদের ২৮৬ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বস্তুতঃ উভয়েই (গৌর ও কৃষ্ণ) স্বয়ংরূপ বিগ্রহ অর্থাৎ গৌরই 'কৃষ্ণস্বরূপে' সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয়-বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই 'গৌর-স্বরূপে' বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" সম্ভোগ-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভ লীলাই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলা। এই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই মহাপ্রভু। এই কারণেই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"মহান্ প্রভুর্বৈ সঃ।"

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

(চৈঃ চঃ ধৃত শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য (সুদুর্ল্লভ) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা ; কৃষ্ণস্বরূপ (গোপীজনবল্লভ গোবিন্দ), কৃষ্ণচৈতন্য-নামা গৌরাঙ্গরূপধারী (শ্রীরাধাদ্যুতিসুবলিত গৌরকান্তিময়) প্রভুকে নমস্কার করি।

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে। নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রূপ—গৌরবর্ণধারী শ্রীগৌরাঙ্গ, গুণ—মহাবদান্যতা ও লীলা—কৃষ্ণপ্রেম দান।

মহাপ্রভু মহাবদান্য। তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা। তিনি দয়ানিধি—তিনিই নিখিল মঙ্গলনিলয়। 'বদান্য'-শব্দের অর্থ—দানশীল, দাতা ইত্যাদি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে দয়ার কথা বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। অনাহারীকে অন্ন দিয়া, ভিক্ষুককে অর্থ দিয়া, নির্ব্বুদ্ধিকে বুদ্ধি দিয়া দয়া প্রদর্শন করি। কিন্তু এরূপ দয়া আশানুরূপ হয় না। তাহা ছাড়া এরূপ দয়ার ক্ষেত্রে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশা থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বিষয়বাসনা নাই। তাঁহার দানের অন্ত নাই। তিনি দয়ার সমুদ্র। দয়ার সমুদ্র বলিবার কারণ এই যে, অনন্ত বাসনাসিক্ত কৃষ্ণবিমুখ কলিক্লিষ্ট জীবকে অনর্পিত ব্রজপ্রেম দানরূপ দয়া তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা যথার্থরূপে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর 'অনর্পিত ব্রজপ্রেম দানরূপ দয়া' লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবৎপ্রেম দানই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অপূর্ব্ব দান। 'অপূর্ব্ব দান' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্বে জগজ্জীব এরূপ দানের কথা কখনও ভাবিতে পারেন নাই, আশাও করিতে পারেন নাই। যাহা কোনকালে জগজ্জীবকে দান করা হয় নাই, তাহা কলিজীব মহান দানরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দানের দাতা শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।। (বিদগ্ধমাধব ১।২)

পূর্ব্বে যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই, এমন উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী স্বীয় ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত করুণাবশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান্ ; সেই শচীনন্দন গৌরহরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

ভক্তের সম্পদ্ ভগবান্। আবার ভগবান্ ভক্তাধীন। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভক্ত বা গুরুর আসনে নামিয়া আসিয়া করুণাবশতঃ জগজ্জীবকে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' অর্থাৎ স্বীয় ভক্তিসম্পদ্ দান করিলেন।

ভক্তি কাহাকে বলে? ভজ্ + তি = ভক্তি। ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা করা। পূজার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা প্রেমই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর যে বৃত্তি সেই বৃত্তিটিই ভক্তি।

সম্পদ্ কাহাকে বলে? যে বস্তুর দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, সেই বস্তুকে সম্পদ্ বলা হয়। ভক্তিকে সম্পদ্ বলা হইয়াছে কেন? ভক্তির দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয় বলিয়া ভক্তিকে সম্পদ্ বলা হয়। ভক্তির দ্বারা কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধি হয়? মানবজীবনের চরম ও পরম অভীষ্ট বস্তু হইল—ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করা। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করা সম্ভব।

সূর্য্য সর্ব্বত্র কিরণপাত করিতেছে ঠিকই, কিন্তু স্বচ্ছবস্তুর উপর কিরণ পতিত হইলে সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ শ্রীগৌরহরি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া কৃপা বিতরণ করিয়াছেন সত্য, তবুও ভক্তের স্থানে তাঁহার করুণা অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইয়াছে।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।

সুতরাং শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের স্থান অতি উচ্চে। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরের অতি আপনজন। কিন্তু ভক্তের মূলধন কি? ভক্তের মূলধন হল ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন। আশ্রয়রূপে—গৌরহরিরূপে আপামর জনসাধারণকে ভক্তি-সম্পদ্ দান করিয়াছেন। পরম দুর্ল্লভ ভক্তিসম্পদ্ দানেই শ্রীগৌরসুন্দরের করুণার পরমোৎকর্ষ।

ভক্তি রসস্বরূপ। রসটি কেমন? উন্নত ও উজ্জ্বল রসস্বরূপ। উন্নত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস হইল মধুর রস। মধুর রসই উজ্জ্বলতম রস। গোপী-

প্রেম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে শ্রীরাধারাণীতে। এই গোপীপ্রেমই উন্নতোজ্জ্বল রস। এমত উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী ভক্তিসম্পদ্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে কাহাকেও দান করেন নাই; কিন্তু কলিহত জীবকে এই সুদুর্ল্লভ সম্পদ্ দান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত—অন্যের কা কথা।। (চৈঃ চঃ আঃ ৮।২০)

ইহা উদারবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আপামরে প্রেমভক্তি প্রদান-লীলার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জগাই-মাধাই-এর ন্যায় পাপিষ্ঠ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করত পাপ বা দুর্নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসম্পদ্ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তিসম্পদ্ বিতরণের ক্ষেত্রে পরম-করুণ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।

কালবশে নিজভক্তিযোগ আবৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক যে পুরুষ তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর গর্গমুনি শ্রীনন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।। (ভাঃ ১০।৮।১৩)

অন্য তিন যুগে আপনার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্বে পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। লুপ্তপ্রায় বলিবার তাৎপর্য্য এই নয় যে, ভক্তি নশ্বর পদার্থ। ইহা আত্মার বৃত্তি। কিন্তু কালের প্রভাবে জীবের চিত্তবৃত্তির স্বরূপ এমন অবস্থায় পৌঁছাইয়াছিল যেখানে ভক্তি প্রাধান্য লাভ করিত না। ভক্তিযোগকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-সম্পদ্ দান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী, বসিরহাট

সুখ কি?

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, কি পশ্বাদি—সকলেই সুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধপরিকর। যদি কেহ সুষ্ঠু-ভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাঁহাকে যাবতীয় কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও নিখিল জীবের চিত্তাকর্ষক-রূপ পরম কমনীয় ও সুমহান্ সুখনামক সম্রাটের প্রকৃত স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর অকস্মাৎ প্রবল বেগে ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং ক্রন্দনকালে সান্ত্বনা করিবার জন্য উহাদিগকে অভিভাবকগণ যে-সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা উহারা শুনিতে চাহে না, বরং ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে চীৎকার করিতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে সুখের প্রকৃত স্বরূপ কি ও কি-প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত হন না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও পূর্ব্বোক্ত ক্রন্দনশীল শিশুগণের ন্যায় অত্যন্ত মূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন সুখের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত সাধনে বিরত না থাকেন, ইহাই প্রবন্ধ-লেখকের সানুনয় প্রার্থনা। শাস্ত্র বলিতেছেন, যথা—

১। "রম্য-চিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।"

২। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

৩। 'আনন্দাৎ খল্বিমানি-ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, তৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

৪। "রসো বৈ সঃ।"

৫। "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি।"

৬। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ।"

৭। "আনন্দময়াচ্চ।"

৮। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

৯। "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

১০। "পরমার্থরসঃ কৃষ্ণঃ।"

১১। "চিদ্বিশেষ-সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্লুয়াৎ।"

১২। "অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্।"

১৩। "সচ্চিদানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ।"

১৪। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।"

ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তমূলক প্রবচনসমূহ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—"শ্রীভগবানই একমাত্র সুখের স্বরূপ ও আলয়।"

অন্ধকার গৃহে যখন দীপ জ্বলিতে থাকে, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখা গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোকরাশিকে যথাস্থানে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, প্রকাশশীল আলোকের 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটী গুণ বা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থরাজিকে নিজ প্রভাদ্বারা ব্যাপিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেরূপ 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটী শক্তি অবস্থিত, সুখস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বেও তদ্রূপ 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটী মহতী শক্তি অন্তর্নিহিতা আছে, যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বরূপকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্ত্বরূপে সংরক্ষণপূর্ব্বক তদিতর প্রত্যেক জীবে নিজ সুখ-রূপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া নিখিল জীবকে নিজ ঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথা—

১। "এষ হ্যেবানন্দয়তি।"

২। "আত্মারামগণাকর্ষী।"

৩। "ব্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিতঃ।"

৪। 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।"

আলোকের প্রকাশ-গুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয় না এবং অন্ধকারের আবরণ গুণ যেরূপ আলোকে দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ সুখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদিতর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।" অর্থাৎ সেই সুবৃহৎ ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া সুখময় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় ; তদিতর পদার্থসমূহ অতি ক্ষুদ্র ও তদাশ্রয়ে সুখলাভের আশা নাই, বরং দুঃখই পুনঃ পুনঃ আস্বাদিত হইয়া থাকে। অতএব সুখান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, সুখলাভার্থে হৃদয়ে অনুভূত

সুখকিরণের সাহায্যে তাহার উৎস-রূপ সুখ-সূর্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা। যাঁহারা সুখ-সূর্য্যের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধন-জনাদির চিন্তায় নিমগ্ন এবং তত্ত্বৎ পদার্থদ্বারা সুখলাভের আশা পোষণ করেন, তাঁহারা বৃথাই শস্যলাভার্থ তুষরাশিকে আঘাত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যকে কখনও 'বুদ্ধিমান্' বলা যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগ্যই যে তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে দূষিত করিয়াছে, তাহা সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুখের স্মৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামাত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভিমুখে ধাবিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারা রজ্জুতে সর্পদংশনের ন্যায় বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন নশ্বর বাহ্য পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের আংশিক বিকাশ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে পুনরায় সেইরূপ পদার্থদ্বারা উহাকে সুস্পষ্টরূপে আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ্যপদার্থের স্মৃতি জাগিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের লক্ষ্য সুখাভাবে সুখের অস্ফুট স্মৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে ; কিন্তু বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে বাহ্য বিষয়ে স্মৃতি জাগিবার পরবর্ত্তিকালে ঐ লক্ষ্য বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে মুখ্য-ভাবে ধাবিত হইতে আরম্ভ করায় উহা সুখ-স্মৃতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর যেমন ঘোর অন্ধকাররাশি দিক্‌সমূহকে ছাইয়া ফেলে, সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ সুখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের হৃদয়-দেশকে অধিকার করে। এই সুখ-স্মরণাত্মক পথের বিপরীত দুঃখ-আবাহনকারী যে বাহ্য বিষয়ের চিন্তা-রূপ পথ, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ 'ভাবনাবর্ত্ম'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সুখের বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুভূত করিতে ও অনুভব-জনিত বিমল রস-আস্বাদনে সমর্থ, যথা শাস্ত্রবাক্য,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি-সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বাদতে স রসো মতঃ।।"

সুবর্ণে তাম্র-'খাদ' মিশাইয়া 'গিনি'-নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয়। 'গিনি' প্রস্তুত হইলে সুবর্ণের সহ তাম্র-অংশ এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু ঐ তাম্র-অংশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 'গিনি'কে সুবর্ণেরই প্রকার-ভেদ বলিয়া দর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত লইয়া বিচারশীল

হইলে বুঝা যায় যে, অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধারণায় বৈষয়িক সুখ-আকারে যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয় ও সুখ-জ্যোতির সংমিশ্রিত ভাবোদ্যোতক। রাসায়ন-ক্রিয়াযোগে 'গিনি' হইতে তাম্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে সুবর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পারা যায়, বহির্ম্মুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্ত-দর্পণ হইতে সুখেতর বাহ্য নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও সুখ-বস্তুকে তদ্রূপ বিশুদ্ধচিদ্‌ঘনানন্দময় ভগবত্তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমরা চন্দ্রকে আলোকময় দেখিতে পাই। যদিও আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোককে স্বতন্ত্র চন্দ্রালোকরূপেই দর্শন করে, তথাপি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা জানাইয়া দেয় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য-বিষয়ের চিন্তাকালে মানব-চিত্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ তন্ময়তা লাভ করে। চিত্ত কোন বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। অন্যান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যেকালে স্তব্ধীভূত থাকে, সে সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করে ও তদ্ধেতু তাহা নিরুপদ্রবে ধ্যেয় বস্তুকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তরঙ্গরাশির কথঞ্চিৎ বিরামকালে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্ত ভূমিকায় সুখময় ভগবত্তত্ত্বের তদ্রূপ ঈষৎ আভাস অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখময় ভগবত্তত্ত্ব হইতেই সুখের 'ঝলক' হৃদ্দেশে অনুভূত হয়, কিন্তু সুখ দিলেন সুখময় ভগবান্, ইহার পরিবর্ত্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ মনে করেন যে, সুখ দিল বাহ্য বিষয় এবং সেইজন্য তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া পড়েন। শুষ্ক অস্থি-চর্ব্বণকারী সারমেয় যেরূপ কঠিন অস্থিদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃসৃত রক্তকে অস্থিগত রুধির বলিয়া মনে করে ও নিজ মুখ-নির্গত রক্তাপানার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উদ্দামের সহিত ঐ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিতে থাকে, অজ্ঞ-মানবগণের সুখাস্বাদনের যত্নও ঠিক সেইরূপ।

মানবগণের বুদ্ধিতে ত্রিবিধ গতি লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) ভোগপরা বা বিষয়াভিমুখিনী, (২) ত্যাগপরা বা ব্যতিরেকমুখিনী ও (৩) সেবাপরা বা ভগবদভিমুখিনী। ভোগপর-বুদ্ধির উদয়কালে মনুষ্যগণ নিজাতিরিক্ত পদার্থসমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে ভোক্তৃভাবে অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্য পদার্থে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় ভোগীদিগের বুদ্ধি বিবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা সুখের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। সুতরাং

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবর্ত্তের জনক এবং সত্য-জ্ঞানের বাধক।

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে-সমুদয় মনুষ্য ভোগ-পর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগ-দ্বারে দুঃখের উচ্ছিত্তিরূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তাঁহারা 'জ্ঞানী'-নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এইপ্রকার ত্যাগনিষ্ঠ জ্ঞানি-গণ শান্তিকে একপ্রকার বাহ্য-বিশেষ-ধর্ম্মরহিত সুখমাত্রাত্মক সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্নশীল হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ'-নামে বর্ণন করা হইয়াছে।

মানবগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে অবগত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 'ভক্ত'-নামে অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা যেরূপ কিরণরাশির আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য কোটীগুণ সমুজ্জ্বল, তদ্রূপ কিরণস্থানীয় ব্রহ্ম হইতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয় চিদ্‌ঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ও পরিপূর্ণ রসময়। সুদূর পর্ব্বতোপরি বিরাজিত ক্ষুদ্র দেবালয়ের শ্রীমূর্ত্তি নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন একটী ক্ষুদ্রবর্ণের সমাবেশ-মাত্র-রূপে দৃষ্ট হয়, সেবা-বুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্‌ঘন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে পরতত্ত্বকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা সুখ-মাত্রাত্মক তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে হয়।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে স্ব-সুখকামী। ভক্তই কেবল শ্রীভগবানের সুখে সুখী ও সেইজন্য নিষ্কাম। পিতা নিজে না খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-তৃপ্তিতে আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পূতি গন্ধশূন্য। এবম্বিধ শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত সুখঘন-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দ সুখ-আস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। স্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবা-বুদ্ধির উদয় সম্ভবপর নহে। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দের আভাসদ্বারা জীবসমূহকে সেবানন্দ-রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—ত্যাগ বা ভোগপর-বুদ্ধিরূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে সরাইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শনযোগ্য উক্ত আকর্ষণরজ্জুকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করা।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং—৩১।১২।২০০০

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।।

সাধন-ভজন করতে গেলে ছয় রকমের শরণাগতির প্রয়োজন। এই হচ্ছে ষড়ঙ্গ শরণাগতি।

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস-পালন।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।

শাস্ত্রে ভক্তির অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করার কথা বলা হয়েছে। অনুকূল গ্রহণ হয় না যদি প্রতিকূল বর্জ্জন না করা যায়। এই কথা ভাগবত পরিষ্কারভাবে বলছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

সাধুর যে শক্তিশালী বাণী, সেইটাই মানুষের সব ভ্রম সংশোধন করতে পারে। তাতে সব অনর্থ দূরীভূত হয়। তাহলে Living source-এর কথা আসে এখানে। Living source মানে জীবন্ত, প্রাণবন্ত উপদেশ। দুঃসঙ্গ অর্থাৎ ভগবানকে ভুলে থাকা যে অবস্থাটা, সেটাই হল দুঃসঙ্গ। আর ভগবান্‌কে স্মৃতিপথে সবসময় রাখা হল সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ। ভগবানকে সবসময় স্মৃতিপথে রাখতে গেলে কতকগুলো নিয়ম আছে। সে নিয়মগুলো ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই আছে। কিরকম ধরণের সেটা? বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান—যখন গ্রন্থ আলোচনা করতে বসি, তখন ঘুম আসে। তাহলে তখন ওটাকে রেখে দিয়ে হাতের কাজ কিছু করতে হবে। সেবা ত' অনেক রকমের আছে। যে সেবা করলে আলস্য আসবে না, নিদ্রা আসবে না, সেইরকম সেবা করতে হবে। গ্রন্থ-আলোচনা করতে গেলে যদি ঘুম আসে তাহলে চলাফেরার কাজ করতে হবে, হাতের কাজ করতে হবে। তাহলে ঘুমটা সরে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকা কাজ করতে হবে, তাহলে ঘুম আসার সম্ভাবনা নেই। বহুরকমের সেবাকাজ আছে। সেই কাজে ব্যাপৃত থাকলে আর ঘুম আসবে না। মনটা কিছুতেই লাগতে চায় না সেবায়—এটা হল তার স্বভাব। সেই মনটাকে জোর করে ধরে এনে লাগাতে হবে সেবায়। ব্যাপারটা হল এইরকম।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০; ১৫ জুন, ২০০৩

যে ছেলেটা কিছুতেই পড়তে চায় না, তাকে কিছু প্রলোভন দেখাতে হবে। তার প্রাপ্তি কি আছে, তা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। তাহলে সে পাঠে মনোনিবেশ করবে। যেহেতু আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সেহেতু চিত্তটা আমাদের ভাল জিনিষ কিছুতেই করতে চায় না, উল্টোপাল্টা করতে চায়। তাকে কাজে লাগাতে গেলে কিছু প্রলোভন দরকার। বদ্ধজীবের কাছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর যে কোন অনুষ্ঠান করতে গেলেই তার ওতে আপত্তি আছে। সে ওদিকে অগ্রসর হতে চায় না। কিন্তু যদি তাকে প্রলোভন কিছু দেখানো যায়, তখন তাতে সে অগ্রসর হয়। ওই প্রলোভনের জন্য যদি সে অভ্যাসটা করতে থাকে, পরে ওটা সংশোধন হয়ে যায়। প্রথমমুখে ত' কোন জিনিষই হয় না। যে জিনিষটা কেউ জানেন না, সেই জিনিষে চিত্ত বসাতে গেলে প্রথম প্রথম ক্লেশ হয়; কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর ওটা কষ্ট বলে মনে হয় না। আর তার ভিতরে যদি কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রলোভন দেখানো যায়, তখন ওটা হতে থাকে একরকম। মনটা যতদিন পর্য্যন্ত চঞ্চল আমাদের আছে, ততদিন পর্য্যন্ত মনটাকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগানো বড় কষ্ট। জোরজুলুম করে কিছু হয় না—কথাটা ঠিক ; কিন্তু আবার কাজে না লাগাতে পারলেও ত' কিছু হয় না। মানুষ যখন বোঝে যে এই কাজটা করেলে এই লাভ হবে, তখন সে তাতে প্রলোভিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সে বুঝতে পারে না এই কাজে কি লাভ আছে আমার, ততদিন পর্য্যন্ত তার ওতে আগ্রহ আসে না। এটা স্বাভাবিক। বদ্ধজীবের এইটাই স্বভাব। তথাপি জোরজুলুম করে ধরে এনে তাকে বসাতে হবে কাজে। এছাড়া ত' উপায় নেই। যখন সে নিজে থেকে বুঝতে শেখে তখন এক-রকম। আর যতদিন পর্য্যন্ত তার সে বুঝ না আসছে অন্তর থেকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাকে চেষ্টা করেই যেতে হবে। সাধন মানে ত' তাই। এটা কষ্টকর ব্যাপার।

এই স্বভাব-বিপর্য্যয় বহুকালের। কাল সৃষ্টির আগে থেকে। কাল যখন সৃষ্টি হয়েছে, কর্ম্মও তখন সৃষ্টি হয়েছে, কর্ম্মফলও তখন সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধজীব কর্ম্ম করবেই, কাজ না করে সে থাকতে পারে না। এই কথা গীতায় বলছেন,—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি যাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

ক্ষণকালও সে চুপ করে থাকতে পারে না। তাকে একটা কিছু করতেই হবে, তা সে ভাল করুক আর খারাপ করুক। যদি তুমি চুপ করে না থাকতে পার, তাহলে ভাল কাজ কর। তাকে ভাল কাজেই লাগাতে হবে। শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। কোন্ কাজ করলে কি ফল—এটা যদি আমরা আগে জেনে নিতে পারি, তাহলে সেই কর্ম্ম সুষ্ঠু হয়, ঠিক ঠিক হয়, তার ফলটা ঠিক পাওয়া যায়। আর আগে কিছুই বুঝলাম না, কাজ করতে আরম্ভ করলাম, তার ফলটা ভাল হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

ভাল হয় না বলেই শ্রীভগবান্ নিজেই দায়িত্বটা নিতে চাচ্ছেন, গীতায় সেই কথা বলা হয়েছে। তুমি যখন কর্ম্মফলটা বুঝতে পার না, তখন আমার পরে ছেড়ে দাও আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমার পরে ছেড়ে দিলে তোমার কোন লোকসান হবে না। সবটাই লাভ হবে। এই ছেড়ে দেওয়াটা বড় ত্যাগস্বীকার। এই ত্যাগস্বীকারে আমাদের আদৌ রুচি নেই, অন্ততঃ বদ্ধজীবের। এই কর্ম্মফলের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের আদৌ নেই। কেন? ভগবানের পরে নির্ভরতা নেই, বিশ্বাস নেই ভগবান্ করবেন কি না?

অজ্ঞতা একটা বড় দোষ বদ্ধজীবের। অশ্রদ্ধালু ভাব আর একটা দোষ। সংশয় আর একটা দোষ। এইসব দোষ নিয়েই ত' বসে আছি আমরা। আমাদের পুঁজিপাটা ত' এইসব। ঠিক ঠিকভাবে জমার ঘর নেই আমাদের। যা আছে তা সবই খারাপ দিকে। ভালদিকে জমার ঘর মোটেই নেই। এইজন্য শাস্ত্র বলছেন,—তোমাকে জমার ঘর কিছু বাড়াতে হবে। তাহলে তোমার সাধুসঙ্গে রুচি আসবে, সাধুর কথা শুনতে ইচ্ছা করবে—দেখি সাধু কি বলছেন শুনি একবার। এই বুদ্ধিটা সহসা আসে না আমাদের, যতদিন আমরা বদ্ধত্ব কাটিয়ে উঠতে না পারছি। মনটাকে জোর করেই লাগাতে হয়। মনটা যতদিন আত্মার অনুগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই ভুলই করে, ভ্রান্তির মধ্যেই থাকে। যে মনটা আত্মার অনুগত, বিবেকের অনুগত, সেই মনটা কখনও উল্টোপাল্টা করে না, করবে না। এটাই আইনের কথা।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলছেন 'আনের হৃদয় মন'—অন্যের হৃদয়টা হচ্ছে অবশীভূত মন, কলুষিত মন। শুদ্ধবুদ্ধি নেই সেখানে। 'মোর মন বৃন্দাবন'—আমার মনটা হল বৃন্দাবন। সেইখানে এই মন আর বৃন্দাবন দুটো একই। সেখানে যদি তুমি তোমাকে উদয় করাও, তবে আমি জানব আমার প্রতি তোমার পূর্ণ কৃপা। কৃষ্ণকে বলছেন এইকথা। বাস্তব ঘটনা। আমাদের এই বিশ্বাসটা নেই। ভগবান্ কি আমাদের দেখবেন, দেখেন? তিনি কি আমাদের খাওয়ান, পরান? তিনি কি আমাদের সব ভাল-মন্দের দায়িত্ব নিয়েছেন, নিয়ে থাকেন?—এইসব সংশয় আমাদের হৃদয়ে। কি করে এ সংসারে আমি থাকব? কি করে আমি বাঁচব? আমাকে কে দেখবে? কে খেতে-পরতে দেবে?—এইসব চিন্তাভাবনাতে আমরা অস্থির সবসময়। যদি ভগবানের পরে নির্ভর করতে পারি, তাহলে এর সবের মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। কিন্তু সে নির্ভরতা ত' আমরা শিখিনি। এই নির্ভরতা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। যতদিন সন্দেহ-দোলায় দুলছি, ততদিন এই ভুলের মধ্যে আমরা আছি। যখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়ে যাবে—ভগবান্ অন্তর্যামী, ভগবান্

ভক্তবৎসল, ভগবান্ আশ্রিতজনপালক, ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু, তখন আমাদের সব পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। এই পরীক্ষা দেবার জন্যই আমরা সংসারে সবসময় প্রস্তুত থাকব—এইকথা শাস্ত্র শিখাচ্ছেন। সংসার হল পরীক্ষাস্থল। এখানে পরীক্ষা আমাদের সবসময় দিতে হবে। আমি পরীক্ষা দেব না, দিতে পারব না, তা বললে হবে না। পরীক্ষা দিতেই হবে। পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ভগবান্ বসে আছেন। তাঁর কাছে পরীক্ষা না দিয়ে আমাদের রেহাই নেই।

"সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে।"—এ চিন্তা-ভাবনা যখন আমাদের এসে যাবে, তখন আর কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই।

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি।।

এ অবস্থা যতদিন না হচ্ছে আমাদের, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখ-কষ্টই পাচ্ছি আমরা। আর যখন ঐ সংশয়-সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারব, তখন আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক-মহোৎসব

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার করণায় ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সেবানুগত্যে দুর্গাপুরস্থ শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের দশম বর্ষপূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৯ই চৈত্র, ১৪০৯ (ইং ২৪।৩।২০০৩), সোমবার হইতে ১১ই চৈত্র, ১৪০৯ (ইং ২৬।৩।২০০৩), বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বাৎসরিক মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অনুষ্ঠানে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ শুভাগমন করেন। সমিতির অন্যতম শাখামঠ শিলিগুড়িস্থিত শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, আসামস্থ গোলোকগঞ্জস্থিত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, বাসুগাঁওস্থিত শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শিলচরস্থ শ্রীগৌর-

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ ; ১৫ জুন, ২০০৩

নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, ধুবড়ীস্থিত শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ শুভ পদার্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান শহরস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীসন্ত গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, কলকাতা বেলগাছিয়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয় ভাগবত সেবাশ্রম হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় ভারতী মহারাজ, বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রম হইতে শ্রীভক্তিশরণ সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীভক্তিহৃদয় মাধব মহারাজ, শীলপাড়াস্থিত শ্রীভজন আশ্রম হইতে শ্রীমৎ প্রেমানন্দ বন মহারাজ, মধ্যমগ্রাম হইতে শ্রীভক্তিসম্বন্ধ যাচক মহারাজ এবং শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান বোধায়ন মহারাজ এই মহোৎসবে শুভবিজয় করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে দিবসত্রয়ব্যাপী আয়োজিত ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে "যুগধর্ম্ম ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন", "সাধুসঙ্গের মহিমা এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে ভাষণ প্রদানপূর্ব্বক ভক্তগণের আনন্দ প্রদান করেন।

৯ই চৈত্র ও ১০ই চৈত্র দিবসদ্বয় যথাক্রমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, চণ্ডীদাস মার্কেট ও বেনাচিতিতে নগর সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্মসভায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তথা অগণিত ভক্তবৃন্দ যোগদান করত উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ধর্ম্মসভার অন্তিম দিবসে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার Managing Director মাননীয় ডাঃ সুরীর কুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয় যোগদানপূর্ব্বক পূজনীয় সন্ন্যাসীবৃন্দের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উল্লসিত হন এবং তিনিও তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, দুর্গাপুর শহরে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত। বর্ত্তমানে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উক্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রায় পনর হাজার ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দুর্গাপুর হরিসভার সভাপতি, Ruma Sweets এর proprietor ভক্তবর শ্রীযুক্ত রামময় রায় মহোদয় এবং Modela Furniture এর proprietor পরম আদরণীয় শ্রীমান প্রদীপ কুমার সাহা, পরম আদরণীয়া শ্রীমতী বন্দিতা দেবীর বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। মঠে বাৎসরিক উৎসব সমাপন হইলে পর পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান্ প্রদীপ কুমার সাহা ও শ্রীমতী বন্দিতা দেবী উৎসবে আগত সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে নিজ বিধাননগর বাসভবনে আহ্বানপূর্ব্বক মধ্যহ্নে মহাপ্রসাদ তথা বৈকালে বিধাননগরে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার আয়োজন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ : ১৫ জুন, ২০০৩

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৪ শ্রীধর, কারণোদশায়ী, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪১০, ইং ১৭/৭/২০০৩ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-দশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—১১-২০]

ক্বাহং তমোমহদহং খ-চরাগ্নি-বার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তি-কায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধা-বিগণিতাণ্ড-পরাণু-চর্য্যা-
বাতাধ্ব-রোম-বিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥১॥

হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট-মধ্যবর্ত্তী, সপ্ত-বিতস্তি পরিমিত শরীরধারী এই ব্রহ্মাই বা কোঁথায়, আর যাঁহার রোম-কূপরূপ গবাক্ষপথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়! (অতএব এই নগণ্যের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য) ॥১॥

উৎক্ষেপণং গর্ভ-গতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে ।
কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশ-ভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥২॥

হে অধোক্ষজ! গর্ভগত সন্তান মাতার উদরে থাকিয়া পাদযুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে কি মাতা তাহাতে অপরাধ মনে করেন? সেইরূপ নিজ-কুক্ষিতে চরাচর ধারণ করায় আপনিও মাতৃ-স্বরূপ বলিয়া সন্তানতুল্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাব-অভাব অথবা স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি শব্দবাচ্য কোন পদার্থ আপনার বাহিরে আছে কি??২॥

জগত্রয়ান্তোদধি-সংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদর-নাভি-নালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্থিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥৩॥

যৎকালে প্রলয়-বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণ-কর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এ-কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর! আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই??৩॥

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্ব-দেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোক-সাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৪ ॥

(বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি।) আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, কেননা আপনি সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ—অর্থাৎ 'নার'-শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি নারায়ণ—আপনিই সেই। হে অধীশ! (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল লোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন, তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন-আশ্রয়, তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাস-মূর্ত্তি। (অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ আপনার আশ্রয় জল কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন) আপনার পরিচ্ছিন্নত্ব সত্য নহে, পরন্তু উহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থান

আপনার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়, কিম্বা উহা পরম সত্য, বিরাট স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণ-রূপ মায়িক নহে ॥ ৪ ॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥৫॥

হে ভগবন্! জগতের আশ্রয়-স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ে জলমধ্যে অবস্থান করে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তৎকালে কমলনালমার্গে মধ্যপ্রবিষ্ট হইয়া আমি যখন অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিতে পাই নাই কেন? যদি বলেন,—উহা অন্তঃকরণের দৃশ্য, তাহা হইলে অন্তরেও আমি দেখি নাই কেন? আবার তপস্যা করায় তৎক্ষণেই উহা সুদৃষ্ট হইয়াছিল । অতএব উহা আপনার মায়াই বলিতে হইবে ॥৫॥

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ-স্ফুটস্য ।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥৬॥

হে মায়া-শমন! এই অবতারে জননী যশোদা দেবীকে নিজ উদরমধ্যে পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ দর্শন করাইয়া উহার মায়াময়ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তিভূতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥৬॥

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা ।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥৭॥

(হে ভগবন্!) আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিনা আর কি হইতে পারে? (উহাকে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না । কেননা প্রতিবিম্ব হইলে বিপরীতভাবে দৃষ্ট হইত এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আদর্শস্থানীয় আপনাতে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য) ॥৭॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজ-সুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি ।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥৮॥

হে ভগবন্! আপনি কি কেবল জননীকেই ঐ রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু আপনা ব্যতীত এই জগতেরও অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ত্ব অদ্য আমাকেও কি প্রদর্শন করেন নাই? যেহেতু প্রথমে আমি একমাত্র আপনাকে দর্শন করিলাম, পরে আপনি ব্রজবালক ও গোবৎস-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর আমার সহিত নিখিল তত্ত্বকর্ত্তৃক উপাসিত তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ গোপ-বালক ও বৎসরূপে এবং তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্ট হইলেন। এখন আবার অপরিচ্ছিন্ন অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥৮॥

অজানতাং ত্বৎ-পদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব
ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥৯॥

(গুণাবতার-মূল শ্রীবিষ্ণু—ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)। যাহারা আপনার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদের মতে আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়াবিস্তারপূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মার ন্যায়, পালনকার্য্যে বিষ্ণুরূপে এবং সংহার-কার্য্যে শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদ-নিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥১০॥

হে ঈশ! হে প্রভো! হে বিধাতঃ! আপনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত, তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে ॥১০॥

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

ভারতবর্ষীয় চাতুবর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জনদ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন ; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা ; 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার

যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না ; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

ভগবদ্দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও কর্ম্মক্ষয়

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের শুদ্ধ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন ; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। **'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না।** ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

বৈষ্ণব জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহেন

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ

সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

(ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময়লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণবিচার আদরণীয় নহে

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র—স্বাধীন নহেন

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয়দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে ; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কাহার সেবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ?

উঃ—পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ব'লেছেন,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।

জগতে যত প্রকার পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্য শ্রীহরির যিনি সেবা-পূজা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের পূজা আরও অধিক বড় বা শ্রেষ্ঠ। সেই ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ও পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্। আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা ক'রে থাকেন, তাঁর সেবা-পূজা যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়, তাহা বলাই বাহুল্য।

মদ্গুরুঃ, শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু ; আমার গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তি জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী—এই বিচারটা না আস্লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত ভৃত্য হতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর্তে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্তে পারি না।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুদেবের আশ্রয় ঠিকমত হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, পালক ও রক্ষক—এ বিচার আসে না। 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না কর্লে—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, মন, বিদ্যা, কায় প্রভৃতি সব দিয়ে প্রীতির সহিত গুরুসেবা না করলে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে—বিষয়াসক্তি বা সংসার হ'তে নিষ্কৃতি হ'বে না—নিষ্কাম হওয়া যাবে না—স্বসুখকামনারূপ ভবরোগ সার্বে না—ভয়, চিন্তা, দুঃখ, মোহ কাট্বে না। সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর্লে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন—তিনি অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য। সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই।

আমরা বশ্যতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর-বস্তু—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়বিগ্রহ আর শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়বিগ্রহ, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আমরা ভগবান্‌কে পেতে পারি। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর বা ভগবান্ হ'য়েও আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা শিক্ষা দেন নিজে আচরণ ক'রে—ভগবানের সেবা ক'রে।

বর্ত্তমানে আমাদের সংসারাসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হ'য়েছে, তাই এত দুঃখ ও উদ্বেগ পাচ্ছি। সেই মারাত্মক কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে শ্রীগুরুদেবই আমাকে রক্ষা করেন। কিন্তু আমি রক্ষা চাই কৈ? আমি ত' সংসারেই আট্‌কে থাক্‌তে চাই। সংসার হ'তে উদ্ধার পাবার ইচ্ছা থাক্‌লে ত' আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের—ভগবদবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের—ভগবানের প্রতিনিধি, প্রেষ্ঠজন বা প্রাণবন্ধু শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য তাঁর সেবা কর্‌তাম্, সব দিয়ে তাঁর সেবা ক'রেও আশা মিট্‌ত না। কিন্তু এরূপ চিত্তবৃত্তি হচ্ছে কি? গুরুকে ষোল আনা দেওয়া দূরের কথা, এক আনা দিবার প্রবৃত্তিও জাগ্‌ছে কি? সারবস্তুকে সার না কর্‌লে সারবস্তু কি ক'রে পাওয়া যাবে? শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়ার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা—এত সংসার-প্রবৃত্তি বা মায়ার প্রতি আসক্তি। এইজন্যই বল্‌ছি—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান বা মানুষ-বুদ্ধি ক'রো না। তিনি তোমার অনন্ত-জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার রক্ষক, পালক, উপকারক ও নিঃস্বার্থ বান্ধব।

আমরা যদি পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে পরিমাণ কপটতা বা অবহেলা কর্‌লাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি। এ সব কথা আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। নতুবা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ক'রেও বিশেষ কিছু লাভ বা মঙ্গল হ'বে না।

সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা ক'রে আমার সকল মঙ্গল যাঁর হাতে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁর নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ না করি, আমার সর্ব্বস্ব তাঁকে না দিয়ে যদি কপটতা করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে কি ক'রে দিবেন? আমি অন্তরে সংসারের জন্য ব্যস্ত থেকে বাহিরে লোকদেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী কর্‌লে সর্ব্বজ্ঞ তিনিও আমাকে বাধ্য হয়ে বঞ্চনা ক'রে থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।* আমি সর্ব্বতোভাবে গুরুকৃষ্ণের সেবা না ক'রে মায়ার সেবায় অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের সেবায় ব্যস্ত থেকে যখন গুরু-কৃষ্ণকে বঞ্চনা করি, তখন অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে বলেন—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না—আমার কথা তুমি শুন্‌বে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে। বিশ্বাসঘাতক মনের কথা এবং জগতের

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

লোকের আদর্শ ও বিচারের কথা শুনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত তোমার কাণ প্রস্তুত হয় নাই ; সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।' তাই আবার বলছি—শ্রীগুরুদেব আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—ইহাই আশ্রিত বা শিষ্যের লক্ষণ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

হে আমার বন্ধুবর্গ, তোমরা ভোগী হ'য়ো না, ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ভোগ কর্‌তে যেও না, কারণ এ জগতের সবই গুরুসেবার উপকরণ—সবই কৃষ্ণসেবার বস্তু ; গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে না—প্রত্যেক বস্তুতে গুরুসম্বন্ধ দর্শন না হ'লে অমঙ্গল অনিবার্য্য।

প্রঃ—গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকের অর্থ কৃপা ক'রে বলুন।

উঃ—গীতায় শ্রীভগবান্ সকলপ্রকার ধর্ম্ম ছে'ড়ে তাঁর চরণে শরণ গ্রহণের কথা ব'লেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছে'ড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম যাজন করা উচিত নহে, সেই ভগবান্ আবার ব'লেছেন—তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে না, ভগবানের কৃপাতেই লোক ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করি—যিনি কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণের কথা বল্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শ্রবণ করি, তবেই এ প্রশ্নের সদুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস কর্‌ছেন। বাঙ্গলার বাদ্‌শাহ হোসেনশাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন,—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু কি বল্‌লেন, শুনুন—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।। (চৈঃ চঃ মঃ)

জীব ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা মুখ্য কৃত্য—একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা দেহ নহি—দেহী—অণুচৈতন্য আত্মা, ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। কিন্তু এসব কথা ভু'লে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' ব'লে মনে করি, তখনই যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে, সেই দেশ ও কুলকে 'আমার' বলি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থা-ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবক বলিয়া মনে করি। সেই দেহকে 'আমি' জেনে আমি ভারতবাসী, আমি বাঙ্গালী, আমি ইংলণ্ডবাসী, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি মাড়োয়ারী, আমি পাঞ্জাবী, আমি বিহারী অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে নিজেকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী ব'লে মনে করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ এবং বহু ধর্ম্মের অবতারণা, কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা—ভগবান্। তিনি ব'লেছেন—আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ; দেহ—অনিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনহীন আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ ; সুতরাং "সর্ব্বধর্ম্ম"-শব্দে জীবের দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি ক'রে যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—বর্ণধর্ম্মসমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী—আশ্রমধর্ম্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম, লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বলিতে গেলে কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণ-সেবাধর্ম্ম ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় ধর্ম্ম বুঝায়।

দেহ-মনের ধর্ম্ম—অনিত্যধর্ম্মকে ত্যগ ক'রে, শুধু ত্যাগ ক'রে নয়—পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—প্রাকৃত অভিমান ছেড়ে নিত্য আত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা কর—'আমার ভজনা কর' এই কথা কৃপা ক'রে করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে ব'লেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্য কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন পরবর্ত্তী বাক্যে ভগবান্ ব'ল্‌ছেন—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।' অনিত্য, জড় দেহ-মনোধর্ম্ম ছেড়ে নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে গিয়ে জীব—যে বস্তু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ছেড়ে যা'বে, চ'লে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হ'বে, পূর্ব্বাসক্তিবশে বা মোহবশে সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগ পাপ হ'বে ব'লে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্ম্মের অপালনই মহাপাপ বা

মহাপরাধ, সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য-ধর্ম্মের অপালনকে পাপ ব'লে বুঝ্ছে। আবার শুধু পাপবুদ্ধি ক'রে উদ্ধার নাই—শোক কর্‌ছে। তাই 'মা শুচঃ' ভগবদুক্তি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে এত ক'রে ভগবদ্-ভজনের কথা ব'লে গেলেন, কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুন্‌ছি কৈ? তাঁর আদেশ ও নির্দ্দেশ পালন কর্‌ছি কৈ? আমরা যদি ভগবানের কথা না শুনি, শাস্ত্রের কথা না শুনি, নিজের নিজের মনঃকল্পিত ধারণা নিয়েই ব'সে থাকি, অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করি, আমরা যদি সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্য অবহেলা ক'রে নিজের খেয়ালে চলি, নিজের কর্ত্তব্য নিজেই কল্পনা ক'রে লই, তা' হ'লে দোষ কাহার? (ক্রমশঃ)

অলৌকিক

[১২]

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। ইঁনি ব্রজে অষ্টসখীর অন্যতমা সুদেবী সখী ছিলেন। শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত। এই হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা ঠাকুরাণী। ইঁহার মাতুলানী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াও হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যা ছিলেন। গঙ্গামাতা ঠাকুরাণীর পূর্ব্বনাম—শচীদেবী। তিনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা শ্রীনরেশ নারায়ণের কন্যা ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতামাতা তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই আর তাঁহার সন্ধান পায় না। তিনি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পুরীতে আসেন এবং তথা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

হঠাৎ একদিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের দর্শন পাইলেন। তিনি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তিনি রাজকন্যা—এই পরিচয় পাওয়ায় হরিদাস পণ্ডিত তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। শচীদেবীও ছাড়িবার পাত্রী নন। অবশেষে তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য এবং ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা দর্শনে তাঁহাকে গোবিন্দজীউর মন্দির দীক্ষা প্রদান করিলেন। শচীদেবী কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কোনরকমে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ এবং গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর তিনি রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন আছেন, তাঁহার ভজনাদর্শ দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী

অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি একদিন শচীদেবীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"মা! তোমার দ্বারা বৈষ্ণব জগতের বহু কার্য্য সাধিত হইবে। তুমি নীলাচল ক্ষেত্র শ্রীধাম পুরী যাও। তোমাকে সেখানে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান উদ্ধার করিতে হইবে।"

গুরুদেবের আদেশে সেবাভার গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীনীলাচল ক্ষেত্র পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুরীধামে ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সরল সুমধুর ব্যাখ্যায় সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পুরীর সর্ব্বত্র তাঁহার যশ এমন ছড়াইয়া পড়িল যে, পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবও তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীদেবীর শ্রীমুখে অমৃতময়ী সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। একদিন রাজা মুকুন্দ স্বপ্ন দেখিলেন, জগন্নাথদেব আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"শ্বেতগঙ্গার নিকটস্থ জমি শচীদেবীকে দাও।" জগন্নাথের এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা শচীদেবীর নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং জগন্নাথের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে উক্ত জমি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শচীদেবী বিষয়-বিরক্ত, বিষয় গ্রহণে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাঁহার গুরুদেবের আদেশের কথা স্মৃতিপটে জাগিল। তাই তিনি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ঠাকুরের সেবায় তাঁহার সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত হয়। এইভাবে ভজনে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল।

মহাবারুণী স্নানের জন্য সকলে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। শচীদেবীকে ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি যে ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, কি করিয়া ক্ষেত্র ছাড়িয়া যান। তজ্জন্য তাঁহার আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। কিন্তু জগন্নাথদেব তাঁহার গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি শচীদেবীকে স্বপ্নে বলিলেন,—"শচী! তুমি মহাবারুণী স্নান করিবে? চিন্তা নাই। তুমি ঐ সময় শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিও। সেখানেই গঙ্গাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" স্বপ্ন পাইয়া শচীদেবীর আর আনন্দ ধরে না। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মহাবারুণী স্নানের সময় মধ্যরাত্রিতে শ্বেতগঙ্গায় আসিয়া যেই ডুব দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? একেবারে জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে। শচীদেবী দেখিলেন,—পুরীর সকল তীর্থযাত্রীই সেই গঙ্গায় স্নান করিতেছেন এবং সকলে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। খুব কোলাহল হইতেছে। মন্দিরের ভিতরে কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্বাররক্ষী দৌড়াইয়া গিয়া পড়িছাকে খবর দিল। পড়িছা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহারাজকে এই সংবাদ দিলে মহারাজ মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখিবার জন্য আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! দরজা খুলিয়া গেল। সেখানে কেহই

নাই। কেবলমাত্র ভিজাকাপড়ে শচীদেবী মন্দিরের ভিতরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—শচীদেবী বোধ হয় জগন্নাথের মহামূল্য অলঙ্কারাদি চুরি করিতে ঢুকিয়াছেন। তাঁহারা শচীদেবীকে নিন্দাসূচক বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা করিলেন। এই দোষে তাঁহাদের ভীষণ অপরাধ হইয়া গেল এবং নানাপ্রকার অমঙ্গল দেখা দিল। জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন,—"আমিই এখানে গঙ্গা প্রকট করিয়া শচীদেবীকে গঙ্গাস্নান করাইয়াছি। তাঁহার শুদ্ধাভক্তিতে আমি বশীভূত। যাও, তোমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর। নচেৎ তোমাদের নিস্তার নাই।" সমস্ত কর্ম্মচারীসহ রাজা নিজে শচীদেবীর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদানের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। অনন্যোপায় হইয়া শচীদেবী রাজা মুকুন্দদেবকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সেইসময় হইতে শচীদেবীর নাম "গঙ্গামাতা ঠাকুরাণী" হইল। সেখানে "গঙ্গামাতা মঠ" স্থাপিত হইয়াছে।

[১৩]

ব্রজের নান্দীমুখী **শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর**রূপে নবদ্বীপ মণ্ডলে আবির্ভূত হন। নবদ্বীপধামান্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে বা মামগাছিতে তাঁহার বাস। তিনি গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে হরিভজনে মগ্ন থাকিতেন। তিনি এমনই ভজনসিদ্ধ ছিলেন যে, নানা অলৌকিক ব্যাপার তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোনদিনই শিষ্য করিবেন না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; কিন্তু একদিন পথিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু তাঁহাকে শিষ্য করিবার জন্য আদেশ করেন। প্রভুর আদেশে তিনি শিষ্য করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে,—"আগামীকল্য প্রাতঃকালে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আমি তাহাকেই শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিব।" পরদিন প্রাতে তিনি গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। গঙ্গায় নামিয়াছেন, হঠাৎ যেন কাহার গাত্রে তাঁহার চরণ স্পর্শ হইয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখেন—সেটী একটী মৃতদেহ। তিনি ভাবিলেন,—"আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, প্রাতে প্রথমেই যাহাকে দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব। সুতরাং এই মৃতদেহটীকেই আমি দীক্ষাদান করিব।" এই বলিয়া যেই মৃতদেহটীকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিলেন, তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। মৃতদেহটী বাঁচিয়া উঠিল এবং গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিল।

ঐ মৃত ছেলেটীর নাম ছিল মুরারি। তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। বালকটীর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন তাহাকে দাহ না করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া যান। সেই বালক গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে যেখানে সারঙ্গ ঠাকুর স্নান করিতে নামিয়াছেন, সেখানে আসে এবং ঠাকুরের পাদস্পর্শে তাহার পুনর্জীবন লাভ হয়। সারঙ্গ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের প্রভাবে বালকটী বাঁচিয়া গেল। তাহার নাম হইল শ্রীসারঙ্গ মুরারি বা শার্ঙ্গ মুরারি।

—**শ্রীহরিদাস রায়**, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

দেবদেবীকে ভগবান্-বুদ্ধি—অপরাধ ও পাষণ্ডতা

ভগবান্-শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে জানা যায়, 'ভগ'-শব্দের অর্থ 'শক্তি' এবং 'বান্'-শব্দের অর্থ 'যুক্ত' ; সুতরাং ভগবান্ শব্দের অর্থ প্রতীয়মান হয়, যিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত বা সর্ব্বশক্তিমান্। যেমন ধন আছে যার—ধনবান্, গুণ আছে যার—গুণবান্ ; সেইরূপ 'ভগ' আছে যাঁর—ভগবান্। ভগবান্ ছয়টী অচিন্ত্যগুণ বা শক্তিবিশিষ্ট এবং ছয়টী অচিন্ত্যগুণ তাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে সুবিন্যস্ত। ঐ ছয়টী গুণ কি কি? শাস্ত্র তদুত্তরে জানিয়েছেন,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য্য), সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণসম্পন্ন তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি বিচার কিরূপ? তাহার সুস্পষ্ট উত্তর শাস্ত্রের নিকট পাওয়া যায়,—ভগবানের বিগ্রহ চিন্ময় এবং সেই চিন্ময় বিগ্রহের শ্রী (সৌন্দর্য্য)-ই—অঙ্গী ; আর অন্য গুণগুলি—অঙ্গ। গুণসমূহ অঙ্গস্বরূপে যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকেই অঙ্গী বলে। এক্ষণে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য ও সমগ্র যশঃ—এই তিনটী 'শ্রী'র তথা অঙ্গীর অঙ্গ। সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য—সমগ্র যশঃ হতে বিস্তৃত তথা যশঃ-স্বরূপ অঙ্গের কিরণরূপে প্রতিভাত। সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য স্বয়ং গুণ নহে, উহা গুণের গুণ মাত্র। নির্ব্বিশেষ ও নির্ব্বিকার জ্ঞান-বৈরাগ্য ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আশ্রিততত্ত্ব বা গুণবিশেষ মাত্র অর্থাৎ অঙ্গকান্তিরূপে প্রতীয়মান।

ভগবানের ঐ ছয়টী গুণ জগতের সকলকে আকর্ষণ করে। এ জগতে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি সকলকে আকর্ষণ করে, মহাবীর্য্যবান্ ব্যক্তি সকলকে আকর্ষণ করে, পরমসুন্দর রূপবান্ বা সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তি সকলকে আকর্ষণ করে, যশবান্ ব্যক্তিও সকল লোককে আকর্ষণ করে, আবার অত্যন্ত জ্ঞানবান্ ও তীব্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির দ্বারাও সকলে আকর্ষিত হয়। ভগবানে ঐ ছয়টী গুণ যুগপৎ অসমোর্দ্ধরূপে বিদ্যমান থাকায় ভগবান্ সকলেরই আকর্ষক। জড় বৈজ্ঞানিকগণ বলে থাকেন,—এ জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ভগবান্ সকলকেই আকর্ষণ করছেন। এই জগৎ যাঁহা হতে সৃষ্টি হয়েছে, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং অন্তিমকালে যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্। তাই এই জগতের প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গেই ভগবানের সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ তত্ত্ববস্তু ও সর্ব্বকারণেরও কারণ তথা মূলস্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ গুণগুলি আদৌ প্রাকৃত নয়, বরং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য, প্রাকৃত বীর্য্য, প্রাকৃত যশঃ, প্রাকৃত রূপ (সৌন্দর্য্য), প্রাকৃত জ্ঞান ও প্রাকৃত বৈরাগ্য—এই প্রাকৃত গুণসমষ্টি কেবলমাত্র প্রাকৃত বস্তু প্রাপ্তির জন্য স্পৃহা বর্দ্ধিত করে। প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল ও হেয়। গীতায়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ" (গীতা ৮।৪) নশ্বর পদার্থসমূহ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল ও তাই 'অধিভূত'-শব্দবাচ্য। সুন্দর রূপবান্ ব্যক্তি যৌবনকালে রূপের সৌন্দর্য্যে সকলকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে রূপের মাধ্যমে কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না। ঐ প্রাকৃত ছয়টী গুণের সঙ্গে জীবের (মানুষের) নিত্যসম্বন্ধ নাই। যে কোনও প্রাকৃত বস্তু মোহগ্রস্ত মানুষকে আকর্ষণ করে থাকে, মোহ কেটে গেলে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী (সৌন্দর্য্য), জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই গুণগুলির আর আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্যগুণরাশি নিত্যকাল অপরিবর্ত্তিতভাবে তাঁর অপ্রাকৃত তনুতে অবস্থিত আছে। ভগবানের রূপ কখনও বিরূপ বা বিকৃত হয় না। তাঁর ঐশ্বর্য্য কখনও নাশ হয় না ; তাঁর বীর্য্য কখনও হ্রাস হয় না ; তাঁর যশঃ কখনও লুপ্ত হয় না ; তাঁর জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও দোষযুক্ত হয় না। তিনি কোনভাবেই তাঁর গুণের থেকে চ্যুত হন না। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থাতে ভক্তহৃদয়ের সহিত যুক্ত থাকেন, তজ্জন্য তাঁর আর একটী নাম 'অচ্যুত'। গীতায় (১৮।৭৩) শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুন ভগবানকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করেছেন। অর্জ্জুন ভগবানকে বলেছেন,—'আমি পূর্ব্বে মোহবশতঃ যে-সকল প্রশ্ন করেছি, তোমার শ্রীমুখে তার উত্তর শ্রবণ করে তোমার অনুগ্রহে আমার সে-সকল মোহ বা অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে ও আমি তোমার নিত্য ভৃত্যস্বরূপ অবগত হয়ে সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাগত হয়ে সর্ব্বদাই তোমার আজ্ঞা পালন করব।' ভগবানের অপ্রাকৃত গুণসমূহে জীব যখন আকৃষ্ট হয়, তখন কোন কারণেই ভগবানের থেকে ভক্ত সেই জীবের আর বিচ্ছেদ হয় না। কারণ ভগবান্ কৃষ্ণের সহিতই জীবের নিত্যসম্বন্ধ। যিনি আকর্ষণ করে আনন্দ দেন ও স্বয়ং আনন্দ পেয়ে থাকেন,—তিনিই কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক ও সর্ব্বানন্দদায়ক। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম বলেই তিনি সর্ব্বাকর্ষক হতে পেরেছেন।

জীবাত্মা দেহ ও মনের মালিক বা সত্ত্বাধিকারী। আত্মা মন ও দেহ হতে পৃথক্। মন—সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন তথা চিদাভাস। মনের কার্য্য —বহির্জগতের স্থূল বস্তু গ্রহণ ও সঙ্কল্প-বিকল্প বিচার করে ; ঐরূপ বিষয় চিন্তা করতে করতে দুরপনেয় কামের দ্বারা অভিভূত হয়। জীবের দেহ স্থূল জড়। জীবাত্মা চেতন হলেও অনুচেতন ; কিন্তু ভগবান্ বিভুচেতন। আত্মা বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানতা-বশতঃ মন ও দেহের সহিত প্রীতিবশে আবদ্ধ থাকে। আত্মার উপর মনরূপ সূক্ষ্ম আবরণ ও দেহরূপ স্থূল আবরণ থাকায় মন ও দেহের উপকারই আত্মা পরম উপকার বলে মান্য করে। জীবাত্মা চেতন, কিন্তু মন ও দেহ যথাক্রমে সূক্ষ্ম জড়

ও স্থূল জড়। তাই জীবাত্মা চেতন জাতীয় এবং মন ও দেহ—জড়জাতীয় হওয়ায় আত্মার বিজাতীয় সম্পত্তি। মন ও দেহ পরিবর্ত্তনশীল ; কিন্তু আত্মা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। মনের কার্য্য—ভোগ বা ত্যাগ ; আত্মার কার্য্য ও কর্ত্তব্য—ভগবানের সেবা। মন বহির্জগতে বিচরণশীল হওয়ায় ঈশ্বরের সন্ধান দিতে বা সন্ধান রাখতে পারে না। যারা মনকে আত্মা ভেবে মনের দ্বারা দেহাদি ইন্দ্রিয়সকলকে চালিত করে অর্থাৎ মনের দ্বারা চালিত হয়, তারাই মায়ার নফর হয়ে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন তৃতীয় মানের বস্তু অপরোক্ষ বিচার,—যাহা এ জগতের ভূমিকা হতে উত্থিত বিচার, সেই অপরোক্ষ বস্তু পর্য্যন্তই জানতে পারে ; কিন্তু চতুর্থ মানের বস্তু অর্থাৎ অপরোক্ষেরও ঊর্দ্ধে অধোক্ষজ বস্তুকে জানার অধিকার মনের নাই। মন জগতের অভিজ্ঞতায় বিচরণ করায় চতুর্থ মানের অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তু ও তদূর্দ্ধে অপ্রাকৃত বস্তু ভগবান্‌কে জানতে পারে না। পূর্ণ চেতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি সকল জীবকেই আকর্ষণ করেন? তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষণে জানা যায়,—"যে জীব বিজাতীয় জিনিষ অনুস্যূত করতে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁর আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়।" ভগবান্ উপাস্য বস্তু হওয়ায় তিনি প্রকৃতি, ক্লীব অথবা পুরুষ—কিভাবে উপাস্যরূপে নির্ণীত হবেন? প্রথমতঃ উপাস্যবস্তু প্রকৃতি এবং উপাসকও যদি প্রকৃতি হয়, তাহলে উপাস্য ও উপাসক উভয়েই স্ত্রী-জাতীয় হওয়ায় আনন্দের আস্বাদন ও সমবায় সম্ভবপর হয় কি? আবার উপাস্যবস্তু প্রকৃতি তথা স্ত্রী-লিঙ্গ জাতীয় এবং উপাসক পুরুষ হয়, তাহলে উপাসকের মন তাহাতে আকৃষ্ট হলেও তাহা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ও সমুচিত হয়? কারণ, প্রকৃতি-শব্দে ভোগ্যা এবং পুরুষ শব্দে ভোক্তা বুঝায়। সেক্ষেত্রে ভোগ্যা প্রকৃতিকে কি ভোক্তা পুরুষ উপাস্য দেবতা বলে স্বীকার করতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ উপাস্যবস্তু ক্লীব ও উপাসক যদি ক্লীব হয়, তাহাতে সমজাতীয়তার কারণে আনন্দের আস্বাদন যে সম্ভব হয় না—তাহাতে সহজেই অনুমেয়। আবার উপাস্যবস্তু ক্লীব হলে এবং উপাসক পুরুষ বা প্রকৃতি হলেও তাহাতে উপাস্যের প্রীতিমূলা সেবা হয় না, কেননা উপাস্যের কোন ইন্দ্রিয় নাই। ইহা কল্পিত বস্তুর উপাসনা মাত্র, ইহাতে উপাসকের ভগবদ্‌কৃপা লাভ হয় না। এইরূপ উপাসকগণই মায়াবাদী।

তৃতীয়তঃ উপাস্যবস্তু পুরুষ ও উপাসকও যদি পুরুষ হয়, তাহলে সমজাতীয় হওয়ায় আনন্দরসের উদয় হয় না। কিন্তু উপাস্যবস্তু পুরুষ ও উপাসক প্রকৃতি হলে সেস্থলে আনন্দরসের চমৎকারিতা প্রকাশ পায়। মহাপুরুষের বাণীতে জানতে পারি,—

"যে-সব জীবের ভোগ বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষভাবেতে তারা জড়ে প্রবেশিল।।"

আবার বলা হয়েছে,—"সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া, পুরুষ অভিমানে মরি।" ভোক্তা অভিমানই হচ্ছে পুরুষভাব। এ জগতে বদ্ধজীবমাত্রেই ভোক্তা অভিমান আছে। ভোগ্যবস্তু দর্শনে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবশতঃ পুরুষাভিমান প্রবল হলে স্ত্রী-দর্শন হয়। যে-বস্তু ইন্দ্রিয়-সুখ দেয়, তাহাই যোষা। স্ত্রীলোকেরও পুরুষাভিমান হতে পারে, তখন পুরুষই যোষা হয়। চিদ্বিলাসের উপাস্য দেবতা—পুরুষ, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় রত থাকলে পুরুষাভিমান থাকে না। জীবাত্মার সহিত ভগবানের জননী বা স্ত্রী সম্বন্ধের কথা শাস্ত্রে কোথাও উল্লিখিত নাই। ভগবানকে জননী বা স্ত্রী-রূপে দেখতে চাইলেই মাহামায়া দুর্গাদেবী সেই উপাসককে মায়ায় মোহিত করে দণ্ড প্রদান করেন। শাস্ত্রে ভগবানের সহিত জীবগণের নিত্যসম্বন্ধ—তাঁর দাস বা ভৃত্যরূপে, শান্তভাবে, সখারূপে, বাৎসল্যভাবে অর্থাৎ ভগবানকে জীবের (ভক্তের) পুত্ররূপে এবং তাঁর পত্নী-সম্বন্ধরূপে। **ভগবান্ ক্লীব নহেন বা স্ত্রী নহেন। ভগবান্ লীলা পুরুষোত্তম এবং জীবমাত্রেই তাঁর প্রকৃতি।** শ্রুতি বলেন,—"রসো বৈ সঃ" (তৈত্তিরীয় ২।৭) অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বই রস। 'তৎ' পদার্থই সঃ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। 'সঃ'-পদটী পুরুষোত্তম বস্তু, 'সা' বললে বশ্য শক্তিপর বা স্ত্রী-বিচার আস্‌ত। তিনি ক্লীব নহেন, তিনি স্বয়ং রস ; সমস্ত রস তাঁহাতে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণের রসের পরিচয় প্রসঙ্গে বললেন,—যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হলেন, তখন যাঁর যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যোগিগণের 'শান্ত', বৃষ্ণিগণের 'দাস্য', হাস্যপ্রিয় গোপবালকগণের 'সখ্য' ও 'হাস্য', নন্দাদি গোপগণের 'বাৎসল্য' ও 'করুণ', স্ত্রীগণের 'মধুর', মল্লগণের 'বীর', নরগণের 'অদ্ভুত', ভয়ার্ত্ত রাজগণের 'রৌদ্র', ভোজপতির 'ভয়ানক', জড়বুদ্ধি জনগণের 'বীভৎস'—রসের উদয় হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ এই পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণরস বিদ্যমান। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতসিন্ধু। (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) **কৃষ্ণই দ্বাদশ রসের একমাত্র আশ্রয়।** অন্য কোন দেবতায় এবং এমনকি অন্য ভগবৎস্বরূপে দ্বাদশ রসের একত্র সমাবেশ স্ফূর্ত্ত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বরসের মূলাধার, আর কেহ নহেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

মহাপ্রভুর দয়া

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভোক্তা অভিমানের লীলা করিয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সেবক অভিমানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। "সেব্য-পরায়ণের সেব্যের নয়ন-মনোভিরাম রূপ-প্রদর্শনকল্পে সেব্যবস্তু আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃভাবের সেবায় ভোগ্যভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ দয়া মানবজাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই।" (শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এরূপ দয়া মানবজাতির পক্ষে সত্যই বড় দয়া। এই কারণে মহাপ্রভু মহাবদান্য।

"তিনি (শ্রীগৌরসুন্দর)—মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরস-বিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণধর। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-মধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ আগমপায়ী বস্তু প্রদান করে। গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।" কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণধনে বঞ্চিত। তাহাদিগকে কৃষ্ণধনে ধনী করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্য্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

(শ্রীচৈতন্যস্তোদয় ৬।৭৪)

বৈরাগ্যবিদ্যা ও স্ববিষয়ক-ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহধারী এক কৃপাসিন্ধু সনাতন পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইতেছি।

শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "একঃ পুরাণঃ পুরুষঃ" বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ।

কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরক্তি উৎপাদন হইলেই যথার্থ বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে যতক্ষণ আসক্তি ততক্ষণ বৈরাগের উদয় হয় না। আর বৈরাগ্যের উদয় না হইলে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ হয় না। কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তির বিলোপ ঘটিলে পরেশানুভূতি লাভ করা যায় এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আস্বাদন সম্ভব।

'নিজভক্তিযোগ' অর্থাৎ স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ। গৌরহরির নিজের অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ-বিষয়ে ভক্তিযোগ মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। জীবের জন্য এতসব করিলেন কেন? কারণ তিনি 'কৃপাম্বুধিঃ' অর্থাৎ

কৃপার সমুদ্র। আর কৃপার সমুদ্র বলিয়াই জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম দানরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র ভক্তিযোগেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করা যায়—এই শিক্ষাপ্রদানই শ্রীগৌরহরির অতুলনীয় দান।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।। (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)

শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অন্যান্য দাতৃবর্গের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গোরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটীর দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না।"

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করিলে চমৎকারিতা লাভ করা যায়। কি সেই চমৎকারিতা? চমৎকারিতা হইল—ভগবদ্ ভজনোন্মুখতা। শারীরিক সুখের জন্য মানুষকে অনেক কিছু দান করা যাইতে পারে ; কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র এরূপ দয়া প্রদর্শন করেন নাই। প্রকৃত দয়া বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই দান করিয়াছেন। ভগবদ্ভজনবিমুখ জীবকে ভজনোন্মুখ করাই প্রকৃত দয়া—যাহা চৈতন্যচন্দ্র করিয়াছেন। "তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত। বদান্যতাগুণে কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্য-বস্তু হইলেও সেবক লইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার লীলা।"

"আমার মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমমূর্ত্তি। দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি-মিনতি করিয়া প্রেম বিতরণ করেন। পণ্ডিতজনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রেম উৎপাদন করেন। বিষয়ীলোককে কৃপা করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিতে করিতে প্রেমলাভ করিতে উপদেশ দেন। বিষয়ত্যাগীকে সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণভজন করান। বৈদ্য-চিকিৎসকদিগকে প্রেমদান করিয়া ভবরোগের ঔষধ দানে যোগ্য করেন।"—(শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য)

শ্রীকৃষ্ণের দয়া সীমাবদ্ধ ; কিন্তু মহাপ্রভুর দয়া সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কোন পাত্র-অপাত্র, দেয়-অদেয়, কালাকাল বিচার না করিয়া আপামর জনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন।

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৯)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! হেলায় অর্থাৎ অনায়াসে যদ্দ্বারা সকল দুঃখের অবসান ঘটে, যদ্দ্বারা সুনির্ম্মল আনন্দের বর্দ্ধন ঘটে, যাহাকর্ত্তৃক শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যাহা ভক্তিরস দাতা, যাহা উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব দান করে, যাহা ভক্তিসুখ দাতা এবং মদ-নামক ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদাবশতঃ তোমার অতি উজ্জ্বল দয়া আমার প্রতি বর্ষিত হউক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে পতিত হইয়া স্বরূপ দামোদর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়ানিধি! আমার শিরে তোমার দয়া বর্ষিত হউক।" কেমন দয়া? 'অমন্দোদয়া'—যাহাতে মন্দের উদয় হয় না। যে দয়া অত্যধিকরূপে উদয় প্রাপ্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত তাহা। "মন্দঃ কুণ্ঠা তদ্রহিতঃ অমন্দঃ নিঃশ্রেয়সং, তস্য উদয়ো যস্যাং সা।" (অনুভাষ্য)। কি কারণে এরূপ দয়ার অত্যধিক প্রকাশ ঘটিয়াছে? মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া হেতু এরূপ দয়ার অত্যধিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। "মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাং সা তয়া।" (অনুভাষ্য)। মাধুর্য্যের যে মর্য্যাদা অর্থাৎ চরমসীমা তদ্দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার মাধুর্য্যমর্য্যাদারূপ চরমতা যেখানে প্রকাশ পায়, সেইখানেই তাঁহার দয়ার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীচৈতন্যের লীলায় মাধুর্য্যের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য অবতারে অসুরদের প্রাণসংহার-নামক লীলাকে অসুরগণ কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, যদিও অসুরদের প্রাণ সংহার করিয়া মুক্তি দান করাতেই করুণার প্রকাশ ঘটিয়াছে। অসুরগণ প্রাণসংহারে আতঙ্কিত। ফলে এই সংহার-লীলাতে মাধুর্য্যের বিকাশ ঘটে নাই। কিন্তু গৌরহরি অসুর-সংহারনিমিত্ত কোন অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া অসুরের আসুরিক প্রবৃত্তিকে সংহার করিয়া তাহাদের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়াছেন। তাহারাও মহাপ্রভুর করুণালাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছে। অসুরগণের হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হইয়া মহাপ্রভুর মাধুর্য্যকে নষ্ট করে নাই। জগাই-মাধাই, চাপাল-গোপাল, কাজী ইত্যাদির দৃষ্টান্তে মহাপ্রভুর সম্যক্ করুণার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, কাহাকেও দর্শন দিয়া, কাহাকেও স্পর্শ করিয়া অসুরত্বকে উৎপাটন করিয়াছেন। অসুরগণ মহাপ্রভুর আচরণকে তাহাদের প্রতি করুণারূপে গ্রহণ করিয়াছে। ফলে গৌরহরির মাধুর্য্য চরম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আটটী বিশেষণ প্রয়োগে মাধুর্য্য-মর্য্যাদার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) হেলোদ্ধূলিত খেদয়া ঃ—মাধুর্য্যমর্য্যাদার সংস্পর্শে আসিলে সমস্ত খেদ (দুঃখ) নিঃশেষিত হইয়া যায়। যাহার দ্বারা হেলায় অর্থাৎ অনায়াসে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ বিদূরিত হয়, তাহাই মাধুর্য্যমর্য্যাদা। ভগবৎকৃপা

প্রাপ্ত হইলেই জীবের চিত্ত হইতে খেদরূপ ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়। তখন পাপ-পুণ্য হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় জীব কৃষ্ণসেবাজনিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়ে।

(২) বিশদয়া ঃ—তাপ দূরীভূত হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। মাধুর্য্যের স্পর্শে চিত্তের পবিত্রতা লাভ হয়। চিত্তের পবিত্রতায় প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয় এবং কৃষ্ণসেবায় একাগ্রনিষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

(৩) প্রোন্মীলদামোদয়া ঃ—যদ্দ্বারা আনন্দ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত। "প্রকৃষ্টেন উন্মীলন প্রকাশমানঃ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাং সা তয়া।" (অনুভাষ্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণানন্দ বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যে পূর্ণতম আনন্দের বিকাশ। সুতরাং তাঁহার মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিতে পারিলে চিত্তে আনন্দ সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয়। পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের অনুভূতি নিত্য আনন্দপ্রদ। শ্রীচৈতন্যের দয়ায় তাহা সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল।

(৪) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া ঃ—বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদ উপস্থিত হয়। সাধারণ জীবের পক্ষে শাস্ত্রের বিবাদ অনুধাবন করা খুবই দুরূহ। কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়াতে এই বিবাদ প্রশমিত হইয়া যায়। যে-পর্য্যন্ত পূর্ণবস্তুকে আস্বাদন না করা যায়, ততক্ষণ বিবাদ উপস্থিত থাকে। পূর্ণবস্তুকে আস্বাদন করিবার পথে অনেক অন্তরায় ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ায় সকল অন্তরায় দূরীভূত হইয়া যায়।

(৫) রসদয়া ঃ—যাহা ভক্তিরস প্রদান করে, তাহাই রসদয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু অখণ্ড-রসবল্লভা। বৃষভানুনন্দিনীর অখণ্ড প্রেমভাণ্ডার লইয়া নবদ্বীপ-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া প্রেমরসসিক্ত। আর সেই কারণেই তিনি যাহার উপর দয়া বর্ষণ করিয়াছেন তাহাকে প্রেমরস আস্বাদনের যোগ্যতা দান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কৃপাবিতরণে কোন অধিকার বিচার বা হেতু নাই। তাঁহার অনুসন্ধান ব্যতিরেকেও তাঁহার দয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়াছে।

এই দেখ—চৈতন্যের কৃপা-মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৪।১৬)

ইহার অর্থ এই—ভগবান্ যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহার করুণাও স্বতন্ত্র। অতএব করুণা যখন তাঁহার স্বতন্ত্রবৃত্তির দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীব কৃতার্থ হয়। এইভাবে যাঁহারা শ্রীগৌরহরির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রেমধর্ম্মের প্রভাবে আনন্দের অধিকারী হন ★★।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ দয়াই আপামর জনসাধারণকে ভক্তিরস দান করিয়াছেন।

(৬) চিত্তার্পিতোন্মদয়া ঃ—চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাবের উদয় ঘটে যাহার

দ্বারা এমন মাধুর্য্যমর্য্যাদা। রসস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রকাশ ঘটিলে চিত্তে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। জাগতিক ভোগোন্মত্ততার যে উন্মাদনা, তাহা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইয়া যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ায়। শ্রীচৈতন্যের দয়ায় জীবের রসপ্রাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা ঘটে।

(৭) শশ্বদভক্তিবিনোদয়া ঃ—শ্রীচৈতন্যের দয়ায় নির্গুণাভক্তির উদয় হয়। নিরন্তর ভক্তিতেই বিনোদ। নিরন্তর ভক্তিতেই মাধুর্য্যের পরম উপলব্ধি ঘটে।

(৮) স-মদয়া ঃ—মদ-নামক সঞ্চারিভাবের সহিত বর্ত্তমান যে মাধুর্য্যমর্য্যাদা। 'মদ'-শব্দের অর্থ 'বিবেকহর উল্লাস'। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৪।৩৫-৩৬)। ইহাতে গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্রালাহিত্য ও নেত্রঘূর্ণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অত্যধিক আহ্লাদহেতু সঞ্চারিভাবের উন্মাদনা।

নির্গুণাভক্তি কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনা দূরীভূত করে। এরূপ অবস্থায় মাধুর্য্যমর্য্যাদা ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের দয়ায় শমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদায় নিরন্তর ভক্তিতে ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি লাভ ঘটে।

'শম'-শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। বিষয় হইতে বুদ্ধির উপরতি ঘটিলে চিত্তের স্থিরতা উপস্থিত হয়। চিত্তের স্থিরতায় মন তখন পরম লক্ষ্য বস্তু শ্রীভগবানে নিয়তভাবে অবস্থান করে। এরূপ অবস্থাকে 'শম' বলা হয়। 'শম' ও 'দম' অর্থাৎ মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিতে পারিলে ক্রমপর্য্যায়ে মাধুর্য্য-গৌরবের উপলব্ধি ঘটে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৯ পৃষ্ঠার পর]

জগতে তিনিই (ভগবান্) একমাত্র আপন, আর জগতে যত আপন বলে পরিচিত, সবই পর, অপর, অন্য। আমার গুরুদেবের ব্যাখ্যা—আমি হলাম উত্তম পুরুষ—First person। আমার পাশে তুমি আছ, তোমাকে একটু সম্মান দিলাম, তুমি হলে Second person ; আর আমার তোমার বাইরে যে আছে, সে হল Third person। ব্যাকরণে এরূপ বলছে—উত্তম, মধ্যম, প্রথম। কিন্তু শাস্ত্রের যে তত্ত্বদর্শন সেটা আলোচনা করলে দেখা যায়, আমি উত্তম—একথা যখন আমি বলি, তখন আমি প্রাকৃত অহঙ্কারে পড়ে যাই। তখন আমার ক্ষতি হয়, লাভ কিছু হয় না। আমাদের নামকরা লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা-নামক প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন,—'তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন।' ওটা

বলা তাঁর ঠিক হয় নি। এই উল্টোপাল্টা শিক্ষা লোককে দেওয়ার থেকে না দেওয়া ভাল। যদি তাঁকে বলতেই হত, তাহলে তাঁর এইটাই বলা দরকার ছিল—আমি অধম বলিয়া আপনি উত্তম হইবেন না কেন? কিন্তু তা না হয়ে ঐখানে উল্টোটা হয়েছে। 'তুমি অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন'—এটা অহঙ্কারব্যঞ্জক কথা। এতে ভাল কি আছে? এতে শিক্ষা কি আছে? সাধন-ভজন করতে গেলে আমার ভিতরে দৈন্য থাকা চাই, দয়াধর্ম্ম থাকা চাই, অন্যকে সম্মান দেওয়ার বৃত্তি থাকা চাই। অমানী মানদ ধর্ম্ম। অমানী মানদ ধর্ম্মে দীক্ষা না হলে হরিনাম হয় না, ঠাকুরের সেবাপূজা হয় না, কোন সেবাকাজ হয় না। আমি নিশ্চিন্তে নামকীর্ত্তন করতে পারি না।

আমি যে নামকীর্ত্তন করব, তার ত' অধিকার লাগবে। সে অধিকার কে পাবে? আমি যদি অমানী মানদ হই, তাহলে আমি অধিকার পাব। "অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।"—এই ত' কীর্ত্তনের মধ্যে রয়েছে। চৈতন্যমহাপ্রভুর যে শিক্ষাষ্টক, জগৎকে তিনি যে শিক্ষা দিলেন, তারই তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

তাহলে কি করে কীর্ত্তন করব আমি? আমাকে যে নাম-কীর্ত্তন করতে বলছেন, কীর্ত্তন করবার অধিকারই আমার আসবে না যদি আমি অমানীমানদ না হই। মানীকে সম্মান দেওয়া, আর নিজের কিছু প্রয়োজন নেই—এই ভাবটা ত' ভিতরে থাকা দরকার।

"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন।।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য, সাধন-ভজনের নিগূঢ় রহস্য। সাধন হবে না যদি আমার বিশেষ সদ্‌গুণ না থাকে। আমি যদি অহঙ্কারী হই, তাহলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে। আগে যেটুকু অর্জ্জন করেছি, সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কি করব? আমার জমার ঘর বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমাকে সেইরকম কাজ করতে হবে। ঐগুলোর নামই হল ভক্ত্যঙ্গ—ভক্তির অঙ্গ। হরিভজন করতে গেলে, ঠাকুরকে ডাকতে গেলে, রাধাগোবিন্দকে ভালবাসতে গেলে কিছু আইন-কানুন ত' আছে। আমাকে সেই আইনকানুনগুলো পালন করতে হবে। ঠিক ঠিক ভাবে, বেগার দেওয়া নয়, কোনমতে নয়, আন্তরিকভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক। এটা আমার পরম কল্যাণ, এটা না হলে চলবে না আমার—এমন ভাবটা থাকা চাই, তবে কিছু আমার হবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

আমার মাননীয় সরকার বেগার দেওয়া কথাটা তুলে দিয়েছেন, আপনারা জানেন বোধ হয়। বেগার দেওয়া কথা ছিল আগে একটা। সেই বেগার দেওয়া কথাটা খুব খারাপ। তার কোন আমল দেওয়া হত না। সরকারও ঐ বেগার-শব্দটা তুলে দিয়েছেন। তুলে দিলেই হয়ে গেল, জিনিষটা ত' বাজারে আছে। খাটিয়ে নেবে, পয়সা দেবে না তাকে ; খাটিয়ে নেবে, খেতে দেবে না থাকে ; খাটিয়ে নেবে তাকে, কিন্তু একটা কাপড়-জামা দেবে না—ক্রীতদাস-প্রথা! বাচ্চাবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম,—

"বাগদাদ-পথে, করেন ভ্রমণ, লোকমান পণ্ডিত।
জীর্ণ বসন, শীর্ণ শরীর, কদাকার কুৎসিত।।"

বাগদাদের নামকরা লোকমান পণ্ডিত, তাঁর কি খাটুনি! তিনি ঐ ক্রীতদাস-প্রথা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিজেই গৃহস্থের বাড়ীতে গেছেন, ক্রীতদাস হয়েছেন। কি রকম খাটুনি, তাঁকে খেতে দিচ্ছে না, মারছে! বেগার দেওয়া আজও আছে এ জগতে। আইনে চলে গেছে বটে, কিন্তু জিনিষটা থেকে গেছে। ভগবৎসেবা, গুরু-বৈষ্ণবসেবা যদি এই বেগারের পর্য্যায়ে যায়, তাহলে কিছু হবে না। ওটা হল অন্তরের ব্যাপার, হৃদয়ের ব্যাপার। হরিনাম করব হৃদয় থেকে, মুখে মুখে নয়।

"হৃদয় হইতে বলে,　　জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাশি' অনুক্ষণ।"

নাম কাকে বলবেন?—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।

নাম চিন্তামণিস্বরূপ। 'চৈতন্য রসবিগ্রহঃ'—মূর্ত্তিমান্। 'পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তঃ-হভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ'—নাম-নামী অভিন্ন। এখানে আমরা একটা লোক এবং তার নাম, জিনিষ দুটো হয়ে যায়। নাম-নামী এখানে ভিন্ন। এখানে বসে যদি আমি ঘোড়া ঘোড়া করি, তাহলে একটা ঘোড়া এসে হাজির হয়ে যাবে না। কিন্তু কৃষ্ণনাম এমনই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আহ্বান করলে, কাঁদলে সান্ত্বনা দেবেন। ক্রন্দনরত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তিনি। সুতরাং ভগবানের ক্ষেত্রে ওটা দুটো জিনিষ হচ্ছে না, একই জিনিষ। 'নাম নামী ভিন্ন নয় রে'—একই তত্ত্ব। নাম এবং নামী দুই একই জিনিষ। আমি কাঁদতে কাঁদতে যদি হৃদয় থেকে সেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করি, তাহলে নামী পরব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ মেলে। এমনই ব্যাপারটা। কিন্তু এ জগতে ওটা তা হয় না, যেহেতু নাম-নামী এখানে তফাৎ। নামের সঙ্গে নামীর কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কৃষ্ণনামের সঙ্গে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কোন তফাৎ নেই। উচ্চৈঃস্বরে হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে শ্যামসুন্দর!—এই বলে যদি কান্নাকাটি করি আমি, তাহলে শ্যামসুন্দর তিনি আশ্বস্ত করেন। তত্ত্বদর্শনগুলো এইরকম।

রাধারাণী খুব কান্নাকাটি করছেন বিপ্রলম্ভভাবে বিরহে। কিছুতেই শান্তি-স্বস্তি পাচ্ছেন না। তখন তাঁর কাছে দৈববাণী হচ্ছে কলিযুগের নাম—যে নাম তারকব্রহ্ম নাম, যে নাম মহামন্ত্র, তুমি সেই নাম কর, শান্তি-স্বস্তি পাবে। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই হরিনাম করতে লাগলেন। তখন তিনি শান্তি পেলেন, স্বস্তি পেলেন। এমন হল নাম। এর ক্ষমতা এইরকম।

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।

পরমমুক্ত যাঁরা, তাঁরা ঐ নামকে আশ্রয় করে আছেন। তাঁদেরও একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু ঐ হরিনাম। তাহলে সাধনার ক্ষেত্রে সাধক-সাধিকা ঐ নাম করছেন, আবার যাঁরা সিদ্ধ মহাত্মা তাঁরাও উচ্চৈঃস্বরে ঐ নাম করছেন।

নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম করতেন। আমরা কত নাম করছি? তিনি ত' তিন লক্ষ নাম করতেন। আমরা অন্ততঃ এক লক্ষ করি। তাও সময় পাই না। সময় পাই না কেন? ইচ্ছা করি না। সময় আমাদের নিশ্চয়ই আছে। সময়টা কেড়ে নেবে কে? আমার সময়, আমি তার সদ্ব্যবহার করব। সে সময় কারও কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই। কার সময় কেড়ে নেয় যম?—যারা হরিনাম করেন না, যারা কৃষ্ণনাম করেন না, কৃষ্ণভজন করেন না, কৃষ্ণসেবা করেন না, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন না, ভগবৎসেবা করেন না, তাদের সময়টা ছিনিয়ে নেয়। কি করব আমরা? সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। আমি যদি ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, তাহলে সময় বের করতে পারি। ওটা আমার হাতে আছে। সময় নেই, সময় নেই—এটা বাজে কথা। শাস্ত্র এটা বিশ্বাস করেন নি অর্থাৎ ভগবান্ বিশ্বাস করেন নি। তোমরা বাজে কথা বলছ, যথেষ্ট সময় আছে। সময় তোমরা নষ্ট কর।

আমি ভগবান্‌কে ভালবাসব, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসব, তত্ত্বসিদ্ধান্ত শুনব, জানব, বুঝব, আমার কি কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হব—এটা ত' প্রয়োজন আমাদের। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আলস্য আছে। এসব বিষয় জানব, বুঝব, শিখব, সে-বিষয়ে যত্ন-আগ্রহ নেই আমাদের, একেবারেই কম। তাহলে কি করে কি হবে আমাদের? সে জিনিষ শিখব, জানব, বুঝব, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমরা। বিজ্ঞতা যদি লাভ করতে হয়, তাহলে ধৈর্য্য চাই, উৎসাহ চাই, তবে ত' কিছু হবে আমাদের। শাস্ত্র এই কথাই বুঝাচ্ছেন আমাদের।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

অন্যান্য জন্মে—পশু-পাখী জন্মে হরিভজন হয় না। মনুষ্য জন্মকে শাস্ত্র দুর্ল্লভ জন্ম বলছেন কেন? এই মনুষ্য জীবনেই সাধন-ভজন হয়, সেজন্যই দুর্ল্লভ। আবার বলছেন—সুলভ। সুলভ মানে হাতের মুঠিতে পেয়েছি এটা, পাওয়ার কথা ছিল না ; কিন্তু পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি যদি, তাহলে তার সদ্ব্যবহার করা হোক। আমি আমার মূল মালিককে ভুলে গেছি বলে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করছি এ সংসারে।

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।

এই ত' অবস্থা এখানে। এই কর্ম্মচক্রে ঘুরে মরছি আমরা। এর শেষ নেই। কান্নাকাটি করি যদি, যদি বলি না আর কর্ম্মফল সহ্য করতে পারছি না, ভোগ করতে পারছি না, আমাকে ক্ষমা করা হোক, আমি এ জগতে আর আসব না, আমি ভগবানের সেবা করব, গুরু-বৈষ্ণবেরই সেবা করব সবসময়, তাহলে এ কান্নাকাটি শুনবে কে? শুন্‌বার লোক ত' দরকার। আমার হৃদয় যদি তৈরী না হয়, তাহলে আমার কথা কে শুনবে? কেউ শুনবে না ত'। কৃষ্ণ বড় দয়ালু, কৃপালু। জীবের জন্য তিনি সবসময় কান্নাকাটি করেন। এইটাই তাঁর দয়ার পরিচয়। কিন্তু তাঁকে শুনাতে গেলে, বুঝাতে গেলেও আমার হৃদয় তৈরী দরকার। ভগবান্ আমার আবেদন-নিবেদন নিশ্চয়ই শোনেন। খুব তাড়াতাড়ি শোনেন, ভাল করে শোনেন। কখন?—

(গুরু)-বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।।

গুরু-বৈষ্ণব যদি আমার জন্য আবেদন জানান ঠাকুরের কাছে, তাহলে আমার জন্য ব্যবস্থা ভগবান্ আগেই নিতে পারেন। নিয়ে থাকেন, নিয়েছেন কত শত লোকের জন্যে। আমি এক অধম, আমাকে টেনে নিজত্বে গ্রহণ করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন—এ বিশ্বাস, এ নির্ভরতা থাকা চাই। (ক্রমশঃ)

সংবাদ-প্রসঙ্গ

প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ Hawaii, Los Angles, Tucson, San Jose, Badger, San Francisco-তে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া Houston-এ প্রচার করিতেছেন। Houston, Austin প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্ব্বক তিনি ইউরোপ মহাদেশে প্রচারের জন্য পদার্পণ করিবেন।

উল্লিখিত স্থানসমূহে তিনি "শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীনিত্যানন্দে নিষ্ঠা ও তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও শিক্ষা, অক্ষয়-তৃতীয়ার মাহাত্ম্য, শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবী ও মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যশক্তি সীতাদেবীর জীবন-চরিত, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-উপলক্ষে জগতে তাঁহার প্রকটের কারণ ও ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীল রায় রামানন্দের শিক্ষা" প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীল মহারাজ ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই যে সহনশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকালের জন্য আলোকস্তম্ভ হইয়া থাকিবে। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অন্তিম উপদেশাবলীতে বলিয়াছেন,—"মঠবাসিগণকে সহ্য করিতে শিক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য।" কেবল মঠবাসীই কেন, জীবের উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই সহ্যগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রীয় অন্যান্য উপাখ্যান অপেক্ষা অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীপ্রহ্লাদ উপাখ্যান কেন অধিক পাঠ করিয়াছেন, তাহার বিশদ বর্ণনা শ্রীল মহারাজ করিয়াছেন।

(১) শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—আমিই যাহাদের পরমগতি, সেই সাধুভক্তগণের অতিরিক্ত আমি আমার নিজ আত্মা তথা আমার অত্যন্ত প্রিয় লক্ষ্মীদেবীকেও স্পৃহা করি না। শ্রীশিব-নারদ-সংবাদে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন,—হে দেবর্ষি নারদ! যে ভক্ত হইতে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তিও আদরণীয় হয় না, সেই মূর্ত্তি আমার বা অপরাপর দেবগণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ এবং নিজভক্ত গরুড়াদিরও পরমানন্দ ক্রীড়াবিশেষ। সেই ভক্তগণের প্রশংসা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? হে নারদ! আমি, তোমার পিতা এবং গরুড়াদি পার্ষদ ও মহালক্ষ্মী হইতেও প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ করুণার পাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের ভাগ্য তর্কের অগোচর। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার অশেষ ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ উপমানস্বরূপ।" সেই প্রহ্লাদ মহারাজের সৌভাগ্য অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি।

পুনঃ পুনর্বরান্‌দিৎসুর্বিষ্ণুমুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্।।

অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ মুক্তিদানে উদ্যত হইলেও তিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; আমি সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

শ্রীপরাশর ঋষি প্রহ্লাদ-কৃত উক্ত শ্লোকের ব্যাখায় বলিয়াছেন,—'হে নাথ! আমি জন্মজন্মান্তরে যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।' শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'প্রহ্লাদের অনুগত যে কোন জন, তাহারা নিশ্চিত আমার ভক্ত। আমার ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা সকলেই তোমার অনুসরণ করিবে। ভবিষ্যতে যাহারা ভক্ত হইবে, তাহারাও সকলেই তোমার অনুসরণ করিবে। কেননা, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্।'

(২) ভক্তরাজ প্রহ্লাদের পৌত্র মহারাজ বলি লোকপিতামহ ব্রহ্মার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মাজী দেবতাগণের জন্য স্বর্গের আধিপত্য, অসুরদিগের জন্য পাতালের আধিপত্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া দৈত্যগণ ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবতাগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেবতাগণের বিভিন্ন পদে দৈত্যগণকে নিযুক্ত করিয়াছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজ বলিকে শ্রীবামনদেবকে দান দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু বলিরাজ গুরুর আজ্ঞা পালন না করায় শুক্রাচার্য্য বলিকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীবামনদেব দেবহিতার্থ বলিরাজের নিকট দান গ্রহণ করিবার জন্য আসিলে বলি মহারাজ বলিয়াছিলেন,—'তুমি অর্থার্থী হইয়া আসিয়াছ, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' শ্রীবামনদেব বলিলেন,—'আমি ব্রহ্মচারী, ভজন করিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছি।' তখন বলি মহারাজ বলিলেন, —'হে বিপ্রেন্দ্রনন্দন! আপনি ত' জ্ঞানবৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছেন, কিন্তু ব্যবহার অজ্ঞ বালকের ন্যায়। বিশেষ করিয়া নিজ স্বার্থবিষয়ে এতটুকুও জ্ঞান নাই।' ত্রিপাদভূমি দানের মাধ্যমে বামনদেব দৈত্যরাজ বলিকেও গ্রহণ করিয়া পাশবদ্ধ করেন। পরে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনায় বলি মহারাজকে মুক্ত করিয়া দেন। বর প্রদান করিবার ছলনায় বিষ্ণু নিজেই বলি মহারাজের দ্বারপাল হন। বলি মহারাজের দ্বারপালরূপে নিযুক্ত হওয়া কি বলিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিলোক দানের ফলস্বরূপ অথবা 'আপনি ঐ তৃতীয়পাদ আমার শিরোদেশে স্থাপন করুন' ইত্যাদিরূপ শ্রীভগবানের প্রতি বলির প্রত্যুত্তরমূলক তুচ্ছ দানের ফল?—না, কখনই নয়, উহা কেবল ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের প্রীতির কারণই জানিতে হইবে। প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। ইহজগতের ক্ষণভঙ্গুর বস্তু দানদ্বারা সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ ভগবানের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ দ্বারপালরূপে। অতএব বলির প্রতি ভগবানের প্রীতির কারণ কেবলমাত্র প্রহ্লাদ মহারাজ, অন্য কারণ নহে।

(৩) অত্যন্ত দুষ্ট বাণাসুরের প্রতি ভগবৎকৃপা কেবলমাত্র প্রহ্লাদ মহারাজের

জন্যই হইয়াছিল। দুষ্ট বাণাসুর নিজপ্রভু দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবকে গর্ব্বপূর্ণ বাক্যদ্বারা বলিয়াছিল—ত্রিলোকে আপনার অতিরিক্ত আমার কোন প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না। নিজ কুলপরম্পরার পরম ইষ্টদেব বিষ্ণুভক্তিও ত্যাগ করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় পৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। দুষ্ট বাণের কন্যা পরমাসুন্দরী ঊষাকে ক্ষত্রিয় রীতি অনুযায়ী অপহরণ করিতে গেলে বাণাসুর সৈন্য-গণের সাহায্যে অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া রাখে। দেবর্ষি নারদের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া বাণাসুরকে আক্রমণ করিলে বাণাসুর অনন্যোপায় হইয়া নিজ প্রভু শিবঠাকুরের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ 'ত্রাহি মাম্' 'ত্রাহি মাম্' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। আশুতোষ শঙ্কর দুষ্ট বাণাসুরের পক্ষ লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমোঘ অস্ত্র সুদর্শন চক্রদ্বারা অসুররাজের সহস্রবাহু ছেদন করিতে থাকেন। অগত্যা পার্ব্বতীদেবী সম্পূর্ণ বিবস্ত্রাবস্থায় যুদ্ধভূমিতে আসিয়া বাণের প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ভগবান্ পার্ব্বতীদেবীর প্রার্থনায় বাণাসুরকে বধ করেন নাই। তাহাকে চতুর্ভুজত্ব, শিবপার্ষদত্ব গতি প্রদান করেন। শ্রীশিবজী নিজমুখে বলিয়াছেন,—'আমাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এর কারণ নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক প্রিয় শ্রীপ্রহ্লাদের প্রীতির জন্যই জানিতে হইবে। ভয়ানক বৈষ্ণব-অপরাধ বৈষ্ণব-কৃপাদ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে—এই ন্যায়ানুসারে বলি এবং বাণাসুর-কৃত বৈষ্ণব-অপরাধ কেবলমাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পুত্র ও পৌত্রাদি সম্বন্ধহেতুই হইয়াছিল।

শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ—শ্রীল গুরুদেব! আপনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন,—হে প্রহ্লাদ! তুমি আমার ভক্ত হওয়ায় যেরূপ প্রিয়, ব্রহ্মা আমার পুত্র, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত, সঙ্কর্ষণ আমার ভাই এবং লক্ষ্মীদেবী আমার ভার্য্যা হইলেও আমার সেরূপ প্রিয় নহে। সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী ভগবানের প্রাচীন ভক্ত, নিত্য পরিকর হওয়া সত্ত্বেও অর্ব্বাচীন ভক্ত প্রহ্লাদ কিভাবে অধিক প্রিয় হইতে পারে?

শ্রীল মহারাজ—নিত্যপার্ষদ সঙ্কর্ষণাদির পরম বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তাঁহাদের প্রেমভক্তি লাভের জন্য বিন্দুমাত্র কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় না বা কোনপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। অপরদিকে আধুনিক ভক্তগণ প্রেমপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠের নিত্যপার্ষদ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন ভক্তের অধিক মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। যে ভক্ত নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের প্রেমভক্তি লাভের জন্য নিজ সর্ব্বস্ব

অর্থাৎ ধন, স্বজন তথা জীবনের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, জীবগণকে ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ঐহিক, পারত্রিক সমস্ত সাধ্য-সাধন বিষয়ে স্পৃহারহিত হইয়াছেন—এইরূপ ভক্তিপ্রবর্ত্তক ভক্তের প্রশংসা ভগবান্ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ অপেক্ষা অধিক করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজ—ভগবান্ নৃসিংহদেব বারম্বার আগ্রহ প্রকাশ করিলেও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ পরমপদকে স্বীকার করিলেন না ; কিন্তু পরে নিজ পিতৃরাজ্যকে স্বীকার করিলেন। রাজ্য পরিচালনার জন্য ত' প্রচুর সময় নষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে কি তাঁহার পারমার্থিক ক্ষতি হইবে না? অথবা ভগবৎ প্রীতিবিধান কিভাবে সম্ভব?

শ্রীল মহারাজ—ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত লোকের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লোকোদ্ধার বাসনাহেতুই প্রহ্লাদ মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেননা, রাজ্যাধিকার হইলে পরমৈশ্বর্য্যসহ ভক্তির প্রচার ও প্রসার সম্ভব। ভক্তির প্রচার ও প্রসার হইলে অনায়াসেই জীবের উদ্ধার হইবে। বিশেষতঃ প্রজাসকল উদ্ধার হইলে ভগবান্ স্বতঃই প্রসন্ন হইবেন। অতএব রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার পারমার্থিক কোনরূপ ক্ষতি হইবে না বা ভগবৎ প্রীতিবিধানে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি হইবে না।

শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ—শ্রীল প্রভুপাদ বহুবার প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন কেন? তাহাতে সবসময় কি নূতনত্ব আস্বাদন করিতেন?

শ্রীল মহারাজ—রহস্যপূর্ব্বক বলেন, এ ত' আর তোমাকৃত দামোদর পুরাণ নহে যে কেবলমাত্র একই কথার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিবে। বর্ণনা আরম্ভ করিলে তুমি সারাজীবনেও শ্রবণ করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিবে না।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য বর্ণন করিলে আমাদের সকলের কল্যাণ হয় এবং আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীল মহারাজ—আমি দু'একটী লীলা বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। একদা প্রহ্লাদ মহারাজ নৈমিষারণ্যে বিরাজমান পরম মনোহর পীত-বসনধারী ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনের জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তপস্বী-বেশধারী অথচ ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক পুরুষকে দেখিলেন। এইরূপ বিরুদ্ধ বেশাচরণ দাম্ভিকতার পরিচায়ক অর্থাৎ অহিংসার প্রতীক তপস্বীবেশ, আর হিংসার প্রতীক ধনুর্ব্বাণ। তাঁহার রাজ্যে এইরূপ বিরুদ্ধবেশ দেখিয়া তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—নিশ্চয়ই প্রতিযোদ্ধাকে জয় করিব। কয়েকদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল কিন্তু যুদ্ধজয়ে অসমর্থ হইলেন। একদিন প্রাতঃকালে প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্তিভরে ইষ্ট-দেবের অর্চ্চনান্তে যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। যুদ্ধভূমিতে দেখিলেন যে, যে মালাটী

তিনি তাঁর ইষ্টদেবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মালাটী তাঁহার প্রতিযোদ্ধার গলায় ঝুলিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই আমার ইষ্টদেব। যুদ্ধ ত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন স্তবস্তুতির দ্বারা তিনি ইষ্টদেবের প্রীতিবিধান করিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌ও প্রসন্ন হইয়া সুকোমল করস্পর্শদ্বারা ভক্তের যুদ্ধশ্রম অপনোদন করিলেন। তদনন্তর প্রহ্লাদ মহারাজ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা নিবেদন করিলে ভগবান্ স্মিতহাস্য-সহকারে বলিলেন,—প্রহ্লাদ! তোমার যুদ্ধকৌতুকে পরম প্রীত হইয়াছি। আনন্দের বিষয় এই যে, তুমি সর্ব্বদাই আমাকে জয় করিয়া থাক।

শ্রীপাদ পদ্মনাভ মহারাজ—গুরুদেব! শ্রীবামনদেব যে সুতলে বলি মহারাজের অসংখ্য দরজায় দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহার আর অন্য কোন রহস্য আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—প্রহ্লাদ সংহিতায় এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে,—কোন একসময় দ্বারকাবাসী কুশ দৈত্যের নিকট পরাজিত হইয়া তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময় দ্বারকাপুরীতে শ্রীশিবাবতার দুর্ব্বাসাঋষি আসিয়াছিলেন। সমস্ত দ্বারকাবাসী ঋষিবরকে নিবেদন করিলেন যে,—'হে ঋষিবর! আপনার গতি সর্ব্বত্র। বিনা বাধায় আপনি সর্ব্বত্র যাইতে পারেন। অতএব কৃপাপূর্ব্বক প্রভুর অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা নিবেদন-পূর্ব্বক আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি দ্বারকাবাসীর কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া তীব্রগতিতে চতুর্দ্দশ ভুবনে ভগবানের অন্বেষণ করিতে করিতে সুতললোকে আগমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি দ্বারকাবাসীর দুর্দ্দশার কথা প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু বলিলেন,—হে ঋষিবর! আমি বর্ত্তমানে ভক্তিদ্বারা ক্রীত হইয়াছি। সর্ব্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র হইয়াও পরাধীন হইয়াছি। এ বিষয়ে আপনি দৈত্যরাজ বলির নিকট প্রার্থনা করুন। আমি তাঁহার আদেশপ্রাপ্ত হইলে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া ঋষি বলিরাজের নিকট দ্বারকাবাসীর দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। দৈত্যরাজ ঋষিবরের প্রার্থনা অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনন্যোপায় হইয়া প্রাণত্যাগের নিমিত্ত বলি মহারাজের সম্মুখেই অনশন ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়াও বলিরাজের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। বলিরাজ বলিলেন,—"হে বিপ্রবর! আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করুন ; কিন্তু ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবগণের প্রণম্য শ্রীভগবানের পাদপদ্ম কখনই ত্যাগ করিতে পারিব না।" দুর্ব্বাসাঋষি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, আপনি ত' ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের পৌত্র। আপনার মধ্যে কৃপালুতা, বদান্যতা, সম, কৃষ্ণৈকশরণ

প্রভৃতি প্রহ্লাদ মহারাজের গুণসমূহ অবশ্যই থাকা উচিত ; কিন্তু তাহা দেখিতেছি না কেন? আপনার কুলগৌরবকে ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে বিভিন্নভাবে বুঝাইলে পর বলিরাজের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। অতঃপর একস্বরূপে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সুতললোকে থাকিয়াও অন্যস্বরূপে দুর্ব্বাসাঋষির সহিত দ্বারকাপুরীতে গমনপূর্ব্বক কুশদৈত্যকে বধ করিয়া দ্বারকাবাসীর দুঃখ অপনোদন করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র বলির ভক্তিতে বশীভূত হইয়াই ভগবান্ সুতল-লোকে তাঁহার রাজমহলের অসংখ্য দরজায় দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—বলির অপরাধের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। বলি যাহাতে ভবিষ্যতে আর উপদ্রব করিতে না পারে—দেবতাগণকে কষ্ট দিতে না পারে, তজ্জন্যই ভগবান্ আমাকে সুতললোকে বলির নিকট সদাসর্ব্বদা অবস্থান করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজ—মহারাজ! আপনি একবার বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী উপলক্ষে রাক্ষসরাজ রাবণের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। পরবর্ত্তিকালে আপনি আর তাহা কখনও বর্ণন করেন নাই।

শ্রীল মহারাজ—শ্রীরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণের পাতালজয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন একসময় রাক্ষসরাজ রাবণ বিশ্বজয়ের মদে মত্ত হইয়া বিভিন্ন লোকে দিগ্বিজয়ের উড্ডীয়মান পতাকা লইয়া সুতললোকে রাত্রির অন্ধকারে প্রবেশ করে। কেননা, সূর্য্যাস্তের পর রাত্রির অন্ধকারে রাক্ষসগণের শক্তি দ্বিগুণ হইয়া যায়। মদমত্ত রাবণ পাতাললোক বিজয় করিবার মানসে সুতললোকে বলির রাজমহলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে ভগবান্ গদাধর রাক্ষসরাজ রাবণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা বহুদূর সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। গদাধরের ভয়ে ভীত রাবণ ভবিষ্যতে আর সুতললোকে প্রবেশ করিবার দুঃসাহস করিতে পারে নাই। গদাধরের ভয়ে রাবণের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—(হাসিতে হাসিতে) মহারাজ! আপনি কখনও বলেন —প্রহ্লাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কখনও বলেন উদ্ধব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কখনও গোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কখনও বলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা। আমি সন্ন্যাসিগণের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ নহি, আপনি যখন যেমন আদেশ করেন, তখন তদনুরূপ কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি। এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীল মহারাজ—(হাসিতে হাসিতে) কৃষ্ণদাস! তুমি ত' মা উত্তরায় ন্যায় প্রশ্ন করিতেছ। তোমাকে তত্ত্বজ্ঞ হইবার প্রয়োজন নাই, কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি যাজন করিলেই

তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া যাইবে। তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহারাই ভগবানের উত্তরোত্তর প্রিয় জানিবে।

শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ—আমার মনেও এইরূপ প্রশ্ন ছিল, আমার প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অনেকবার শুনিয়াছি বা শাস্ত্রে দেখিয়াছি ; কিন্তু গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—শাস্ত্রে বহু প্রমাণ আছে। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ দু'একটী প্রমাণ শ্লোক আবৃত্তি কর।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজ—আমি যে-সকল প্রমাণ-শ্লোক আপনাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই স্মৃতিচারণ করিতেছি,—

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চ আত্মা যথা গোপীজনো মম।।

অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী এমনকি, আমার শ্রীবিগ্রহও আমার অত প্রিয় নয়, গোপীগণ আমার যত প্রিয়। ব্রজদেবীগণ ত' মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তথাপি গোপিকাং পার্থ যত্র রাধাভিধা সম।।

হে পার্থ! ত্রিলোকের মধ্যে কেবলমাত্র পৃথিবীই ধন্য। কেননা, এই পৃথিবীতেই শ্রীধাম বৃন্দাবন কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনে অনেকে বাস করিলেও গোপীগণ বৃন্দাবনধামে থাকায় বৃন্দাবন ধন্য হইয়াছে। সর্ব্বোপরি শ্রীমতী রাধা-নাম্নী গোপী গোপীগণের সঙ্গে থাকায় গোপীগণ ধন্যা। এই শ্লোকে একই সঙ্গে গোপীগণ এবং রাধিকার মাহাত্ম্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল মহারাজ—মাধব মহারাজ! আর অধিক শ্লোক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে এবং আমাদের কাহার ভজন করিতে হইবে? ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। ভজন করিতে করিতে আপনারাও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সাদর আহ্বান

☎২২৩৬৯১

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—তুরা, পিন্ - ৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ২৪০০৬৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য *ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের* আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ২২শে শ্রাবণ, ১৪১০ (ইং ৮।৮।২০০৩), শুক্রবার হইতে ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১২।৮।২০০৩), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।২০০৩), বুধবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষ-ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪১০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—*কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

২রা ভাদ্র (ইং ১৯।৮।২০০৩), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতি-কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।২০০৩), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১।৮।২০০৩), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

☎ ০৩৫৮২-২২৯৪৪১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ২৪০০৬৮

শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, বামনপাড়া
পোঃ গুঞ্জাবাড়ী, কোচবিহার-৭৩৬১০১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য *ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের* আনুগত্যে শ্রীরাধাষ্টমী-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া আগামী ১৮ই ভাদ্র, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ৪/৯/২০০৩), বৃহস্পতিবার নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ-এর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪১০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য *ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজের নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

অনুষ্ঠান-সূচী

১৭ই ভাদ্র (ইং ৩।৯।২০০৩), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।
অপরাহ্ণ—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।
গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।
রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১৮ই ভাদ্র (ইং ৪।৯।২০০৩), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
সকাল—৭টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' ও "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

রথযাত্রা সঙ্গীত

জয় জগন্নাথ জগত জীবন।
জীব নিস্তারিতে, অরোহিয়া রথে,
সর্ব্বসাধারণে দিলে দরশন।। ১।।
দিনেকের তরে, শ্রীলক্ষ্মীরে ছ'লে,
রথযাত্রা করি', চলেছ গোকুলে,
সখা-সখী সঙ্গে, মিলিবেক বলে,
ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়ে মাধুর্য্যে মগন।। ২।।
গুণ্ডিচা মন্দির, নিকুঞ্জ কানন,
বিহারের স্থল, যেন বৃন্দাবন,
এ দাস গোবিন্দ, এ হেন মিলন,
সদাই যাচে হে পতিত পাবন।। ৩।।

—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস

অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত নহে

প্রশান্ত সাউ নামে একজন বিহারী কলকাতায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরি করে। একদিন টেলিগ্রাম আসল যে,—আগামীকাল দুপুর ২টার মধ্যে তার বাড়ী নিলাম হয়ে যাবে। সে খুব কাঁদতে লাগল। বাবু অনেক বোঝালেন,—"তোমার বাড়ী যাতে নিলাম না হয়, তার সব ব্যবস্থা আমিই করব। তুমি কাঁদবে না ও চিন্তা করবে না।" সে কিন্তু বাবুর কোন কথা শুনতে নারাজ। সে শুধুই কাঁদতে লাগল। তার স্ত্রী-পুত্র কি করবে? কোথায় থাকবে? সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে সে শুধুই কাঁদতে লাগল।

বাবু সকাল বেলায় একটী চিঠিসহ টাকা তার হাতে দিয়ে পোষ্টমাস্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল যে, নির্দ্দিষ্ট 'রাজস্ব কর' অফিসে টেলিগ্রাম করে জমা দিয়ে নিলাম হতে রক্ষা করুন। পোষ্টমাস্টার মাহাশয় চিঠি অনুসারে টাকা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে নিলাম বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন চলে যেতে।

কিন্তু সে ফিরে না গিয়ে বাইরে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল। তখন বেলা ১২টা পার হয়ে গেছে। পোষ্টমাস্টার মশাই বাইরে এসে দেখলেন, লোকটি বাড়ীতে না গিয়ে বসে বসে কাঁদছে। মাষ্টার মশাইকে দেখে সে অধিক আর্ত্তনাদের সহিত বলতে লাগল,—"আমার বাড়ী ত' নিলাম হয়ে গেল, আমার স্ত্রী-পুত্র কোথায় থাকবে?" মাষ্টার মশাই বললেন,—"তোমার ভয় নাই তুমি চিন্তা করো না। আমি এখান থেকে সব বন্ধ করে দিয়েছি।" প্রশান্ত সাউ বলল,—"কি করে বন্ধ করলেন, টাকা ত' আপনার বাক্সে রাখলেন। কি করে নিলাম বন্ধ করলেন বাবু?" বাবু তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও কিছুই ফল হয় না। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলেন না।

হিতোপদেশ—গুরু-বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশানুসারে অপ্রাকৃত তুরীয় ভূমিকায় ভগবৎ সেবা করি। তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগবুদ্ধি ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। সেজন্য আমরা তা বুঝতে পারি না। এই জড় সাধনদেহে যে সেবা করব, অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিকায় তাই লাভ হবে। শাস্ত্র বলেন,—

"সাধনে সাধিবে যাহা।
সিদ্ধদেহে পা'বে তাহা।।"

সময়োপযোগী নিবেদন

এতদ্বারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সকল মঠবাসিগণ এবং সমিতির অনুগত সকল ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী এবং সর্ব্বসাধারণবৃন্দকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থান্বেষী হীনমন্য ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মঠবাসী সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীদের নামে কুৎসা প্রচার করিয়া জনসমক্ষে গৌড়ীয় ভাবধারা প্রচারের প্রাণপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আত্মজন পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সকল শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্রসমূহের মহৎ কর্ম্মধারাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন।

এ-ব্যাপারে সকল মঠবাসিগণ এবং সমিতির সকল ভক্ত ও অগণিত শুভানুধ্যায়ীবৃন্দের নিকট আমাদের আবেদন যে, তাঁহারা যেন সম্মিলিত প্রচেষ্টাদ্বারা ঐক্যবদ্ধভাবে উল্লিখিত কুচক্রী ব্যক্তিদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মহৎ ভাবধারাকে অক্ষুন্ন রাখেন। ইতি—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪১০ ; ১৭ জুলাই, ২০০৩

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৫ হৃষীকেশ, বাসুদেব, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ শ্রাবণ, রবিবার, ১৪১০, ইং ১৭/৮/২০০৩ {৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য তৃতীয়-দশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—২১-৩০]

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥১॥

হে ভূমন্! পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন! অহো, আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥১॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ-স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্ত-ধিষণং পুরুদুঃখ-দুঃখম্ ।

ত্বয্যেব নিত্যসুখ-বোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥২॥

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিতা অচিন্ত্য-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে ; তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে ॥২॥

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং-জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র-সুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥৩॥

আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি বিশ্বের জন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ-পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধি-মুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণ-শূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥৩॥

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ-সুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥৪॥

যে-সকল মহাজন গুরুরূপী সূর্য্য হইতে জ্ঞানরূপ সুচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-জীবের আত্মস্বরূপ আপনাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা এই 'অহং-মমাদি' মিথ্যাভিমানরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥৪॥

আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগ-ভবাভবৌ যথা ॥৫॥

যেরূপ অজ্ঞান-জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যাহারা জানে না, তাহাদের অজ্ঞানহেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয় ॥৫॥

অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভব-বন্ধ-মোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।

অজস্র-চিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥৬॥

'ভববন্ধ' ও 'মোক্ষ'—এই দুইটী সংজ্ঞাই অজ্ঞান-কৃত ; সুতরাং সত্য-জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ মায়া-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই ; অর্থাৎ অনাত্ম-ধারণা হইতেই এ দুইটীর উৎপত্তি —আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উহা মিথ্যা ॥৬॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥৭॥

অজ্ঞব্যক্তি আত্মস্বরূপ আপনাকে অনাত্ম অর্থাৎ আপনার শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া ভবদীয় পাদ-পদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মতত্ত্বরূপ আপনাকে অনুসন্ধান করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা (অথবা) অজ্ঞব্যক্তি পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকেই শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করিয়া আবার আত্মতত্ত্ব অন্যত্র অন্বেষণীয় এইরূপ কল্পনা করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা!!৭॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং
গুণং তং কিমু য়ন্তি সন্তঃ ॥৮॥

অসত্যভূত সর্প-বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে কি রজ্জুবুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়? তজ্জন্য, হে অনন্ত! সাধুগণ জড়বিষয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়-মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥৮॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৯॥

হে দেব! হে ভগবন্! যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণাকণা মাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন ; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥১০॥

হে নাথ! অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক্, কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক্, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক্ ॥১০॥

অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রয়োজন-লাভের তিন শ্রেণীর উপায়

কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়-বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থ সিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বিধি ও নিষেধাত্মক কর্ম্মদ্বয়

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা যাত্রা, সংসার যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এইপ্রকার কার্য্য-সকল নিত্য কর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ-বিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎ-পরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদায় কাম্য, যথা সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

বৈধ কর্ম্মসমূহ ও ভারত তাহার আদর্শ

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতি-শাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দয়া বিধি, রাজ্য-শাসন-বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ-বিধি, সন্ধি-বিধি, বিবাহ-বিধি, কাল-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধিসকলকে ঈশ-ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসার বিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারতভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে; যেহেতু এই সমস্ত বিধি অতি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ-ভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারত নিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য-কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির বিচার শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অনেক দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্বভাবানুযায়ী বর্ণ-বিভাগ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। **স্বভাব চারিপ্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বভার, ক্ষত্র-স্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করিলেন।** ভগবদ্‌গীতার শেষে বর্ণিত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।। (গীঃ ১৮।৪১)

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।

স্বভাব-জাত বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম বিভাগ

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম স্বভাবজম্।। (গীঃ ১৮।৪২)

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই **নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।**

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।।
(গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব—এই সাতটী মাত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

(গীঃ ১৮।৪৪-৪৫)

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য—এই **তিন বৈশ্য-স্বভাবজ কর্ম্ম**। নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধি লাভ করেন।

সংসারী ব্যক্তির অবস্থানক্রমে চারিটী আশ্রম নিরূপিত

এইপ্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থানক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে **গৃহস্থ**, ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষগণকে **ব্রহ্মচারী**, অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম গৃহীত পুরুষদিগকে **বানপ্রস্থ** ও সর্ব্বত্যাগীদিগকে **সন্ন্যাসী** বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন।

কোন্ বর্ণের কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকার ও বর্ণাশ্রম-বিধির চমৎকারিতা

বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রমসকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করত তাঁহাদের অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে যত প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ণাশ্রম বিরোধের প্রধান কারণদ্বয়

ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনাপূর্ব্বক ও কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। **স্বদেশ-বিদ্বেষই** তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানে অভাব ও **বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণ-প্রিয়তাও** প্রধান কারণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বংশগত বর্ণবিচার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ

পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দোষ-শূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? **আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।**

গুণগত বর্ণ-নিরূপণের উপায়

প্রাচীন রীতি ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে **কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন।** বর্ণ নিরূপণ-কালে বিচার্য্য ছিল এই যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষ-জনিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার-সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সময় হইতে অন্ধ-পরম্পরা নামমাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্য-যশঃসূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ;—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।। (ভাঃ ৭।১১।১৩৫)

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না।

স্মার্ত্তদিগের হস্ত হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষা করাই স্বদেশ-হিতৈষীতা

সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে-বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

সু-বিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষীতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

স্বদেশ-হিতৈষিগণের প্রতি প্রাচীন শাস্ত্র-মর্য্যাদা স্থাপনের নির্দ্দেশ

অতএব হে স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি-নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! **বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকলপ্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।** ঈশ্বর-ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মিগণ কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় মনে করেন

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয়-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

ঈশ্বরে ফলার্পণদ্বারা কর্ম্ম শুদ্ধতা লাভ করিলে উহা অভিধেয় হয়

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম-সকলে পারমেশ্বরী ভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে,—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্।। (ভাঃ ১।৫।৩২)

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব-বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগদ্বারা ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে

ঈশ্বর-পূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্যকর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাতে ঈশ্বর-ভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।। (ভাঃ ২।৩।১০)

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—অনর্থনিবৃত্তির উপায় কি?

উঃ—হরিভজন না কর্‌লে জীব কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাশী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। যথাসাধ্য সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে অনর্থনিবৃত্তি হয় ; জাড্য, আলস্য প্রভৃতি পলায়ন করে। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

প্রঃ—আমরা কিভাবে থাকিব?

উঃ—গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধা-বিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না, মনে মনে তাহা ত্যাগ করিবেন। শরণাগতি, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। শাস্ত্রীয় সাধু-সঙ্গই ভাল। পরে ভজন-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।

প্রঃ—তৃণাদপি সুনীচতা কা'কে বলে?

উঃ—বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে তৃণ অপেক্ষা অধম মনে করেন। বাস্তবিক তিনি অধম বা নীচ নহেন ; পরন্তু ভগবানের আদরের বস্তু। ভক্ত সকলেরই পূজনীয়—সম্মানার্হ। এজন্য নীচ না বলিয়া সুনীচ শব্দের প্রয়োগ।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি—আমি গুরু-কৃষ্ণের দাস, এই অপ্রাকৃত অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটী মহাপ্রভুর শিক্ষা। তৃণাদপি

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

সুনীচতার অর্থ-- কপটতা নহে, মুখে বা বাহ্য অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে, কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ— সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি— শ্রীনামের সেবক-অভিমান। গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তৃণাদপি সুনীচতা। অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা, দৈন্য-প্রকাশ বা কৃপাভিক্ষা। যার তার নিকট দৈন্য কর্‌তে নাই—ইহাই মহাজনোপদেশ। গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিংবা ঢঙ্গবিপ্রের নিকট নীচতা প্রদর্শন বৈষ্ণব-সেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহাদ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহার দ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। রামভক্ত হনুমানজীর লঙ্কা-দহনই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা।

প্রঃ—জীবে দয়া মানে কি?

উঃ—জীবে দয়া অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অধিক চমৎকারিতা।

প্রঃ—ভগবান্ যা' করেন, তা' সবই কি মঙ্গলকর?

উঃ—নিশ্চয়ই। দয়াময়ের সবই দয়া। মঙ্গলময়ের বিধানে অমঙ্গল থাক্‌তে পারে না। ভগবান্ যখন যা' করেন, সবই মঙ্গলের জন্য করেন। যাঁরা আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকে অমঙ্গল বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা বিচার করেন, সেই সকল বদ্ধজীব-সম্প্রদায় দাবার একচাল মাত্র বুঝেন ; চার, পাঁচ চালের পর কি হ'বে তা' বুঝতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের দয়া অমন্দোদয়-দয়া, তাঁ'দের দয়ায় অমঙ্গল বা মন্দ ব'লে কিছু নাই। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করে, তখন রোগী বৈদ্যকে দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগনির্ম্মুক্ত হ'লে বুঝ্‌তে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ দিয়ে কত দয়ার কার্য্য ক'রেছেন।

প্রঃ—মন্ত্রে যে নমঃ শব্দ আছে, তার অর্থ কি?

উঃ—অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ ক'রে প্রণত বা শরণাগত হওয়াই নমঃ শব্দের অর্থ। হে গুরুদেব, হে কৃষ্ণ, আজ হ'তে আমি তোমার আশ্রিত সেবক, তুমি কৃপা ক'রে আমাকে চালিত কর, সেবায় নিযুক্ত কর ; আজ হ'তে আমি আমার কর্ত্তৃত্ব বা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্‌লাম। এখন তোমার আদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশই আমার জীবনের ধ্রুবতারা বা নিয়ামক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি পালক—এইসব জড় অভিমান পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। আমি কর্ত্তা—এই দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অপসারিত হ'লে তখনই প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব প্রকট থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁর বিশ্রম্ভ-সেবাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করাই বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সেই অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেবে প্রীতিবিশিষ্ট না হওয়ার জন্য যদি সিদ্ধিলাভ করিতে না পারি, তাঁকে হৃদয়-দেবতা জেনে হৃদয় দিয়ে যদি সম্যগ্‌রূপে নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা কর্‌তে না পারি, তা' হ'লে আমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত —নিশ্চয়ই বঞ্চিত। আমার একমাত্র রক্ষক—একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা—একমাত্র নিরুপাধিক বান্ধবকে নিকটে পেয়েও কপাল দোষে হারালাম। এমনই আমার দুর্দ্দৈব! সুরধনীর তীরে এসে পানীয়-সংগ্রহের জন্য আবার মরুভূমির দিকে ছুট্‌লাম— রত্নখনির সন্ধান পেয়েও রত্ন সংগ্রহের জন্য পুনরায় মনোহারী দোকানের কাঁচখণ্ডের চাক্‌চিক্যের অনুসন্ধানে প্রলুব্ধ হ'লাম, কি সর্ব্বনাশ! যাঁরা সুবুদ্ধি হ'বেন, তাঁরা নিষ্কপট ও অন্যাভিলাষ-শূন্য হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ আনুগত্যময় জীবন-যাপনে দৃঢ়সংকল্প হউন, নতুবা বঞ্চিতই হ'বেন।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হ'বে?

উঃ—শ্রীহরি স্বপ্রকাশ-বস্তু। তিনি দয়ার সাগর। আমরা সেবোন্মুখ হ'লে শ্রীহরি কৃপা ক'রে—তিনি কিরূপ আকারের হরি, কিরকম রং-এর হরি—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

ভোক্তা কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে দর্শনের প্রচেষ্টা, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রবণানুগ্রহে শুদ্ধচিত্তেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব। জড়ের কোন অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন কর্‌তে পারে না। চেতনের বৃত্তিদ্বারা, চেতনের চক্ষুদ্বারা চেতনের দর্শন হয়। সেবকই সেব্যের দর্শন পায়। সেব্য সেবককেই কৃপা ক'রে দর্শন দেন। আগে অন্তর্দর্শন, পরে বহির্দর্শন।

প্রঃ—জীবের বদ্ধ-অভিমান কতকাল থাকে?

উঃ—যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে জান্‌তে না পারে, ততদিনই তার বদ্ধজীব অভিমান বা কর্ত্তা-অভিমান থাকে। অপ্রাকৃত অভিমান না হ'লে জড়াভিমান কি ক'রে যাবে?

প্রঃ—আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছি না কেন?

উঃ—অণুচেতন আমাদের একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহৎ চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল করায় আমরা ভগবানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারছি না। যিনি বহির্জগতের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের দৃশ্য বস্তু যাঁর অবলম্বীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারেন —ভগবানে নির্ভর কর্‌তে পারেন। জীবন্ত-শাস্ত্র সাধুর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে আমরা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে পারি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

প্রঃ—কখন আমাদের মঙ্গল হয়?

উঃ—সাধু মহাজনের নিকট ভগবৎকথা শুনে যখন আমরা তাঁর আনুগত্য করি, তখনই আমাদের মঙ্গল বা সুবিধা হয়। Pottery work কর্‌তে হ'লে অভিজ্ঞ কুম্ভকারের নিকট শুনে নিয়ে কার্য্যারম্ভ কর্‌তে হয়। সন্দেশ তৈরী কর্‌তে হ'লে মোদকের নিকট নির্ম্মাণ-প্রণালী জেনে নিতে হয়। সেরূপ শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞের আনুগত্য না ক'রে স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল লাভ কর্‌বার বিচার গ্রহণ কর্‌লে আমাদের সাফল্যলাভে অনেক অসুবিধা হ'য়ে থাকে। তখন আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে পড়ি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আম্নায়-পন্থা গ্রহণ ব্যতীত সত্য উপলব্ধির অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনের শ্রীচরণ-রজে অভিষেক ব্যতীত আমাদের 'দর্শন' ব'লে কোন কথাই হ'তে পারে না। মহাজনগণই আমাদিগকে ভোগ্য-দর্শন বা কুদর্শনের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন। বাস্তব সত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণ-সেবাকে জীবন করি।

প্রঃ—শরণাগতি ব্যতীত কি মঙ্গল হয় না?

উঃ—না। কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, ভ্রমণে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতিপথে না থাকেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হব।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আমি-আমার-ভাব প্রবল থাক্‌লে সুবিধা হবে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ আমাদের ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চ'লে যাব। আমরা চিদ্বস্তু, জড়জগৎ অচিদ্বস্তু। যাকে ভোগ কর্‌তে পারি, তাকে বলে 'জড়'। আমরা নিজ-স্বরূপ ভুলে গিয়ে 'অচিৎ' বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা' এরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হই। অহঙ্কার প্রবল হ'তে হ'তে 'অহং ব্রহ্ম', 'আমি খোদা' এরূপ দুর্ব্বিচার এসে জীবের সর্ব্বনাশ করে। 'আমি বড় হ'ব'—এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হ'লে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়।

প্রঃ—কাহারা মঠে বাস করিবেন?

উঃ—আমাদের মঠে কসরত-ওয়ালাদের বাসের প্রয়োজন নাই, বাবু-ভায়াদের বাসের প্রয়োজন নাই, হরিভক্তেরাই মঠে বাস করিবেন।

যে-সব শিশ্নোদর-পরায়ণ অর্থাৎ লম্পট ও পেটুক ব্যক্তি মঠে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলে মঠের খরচা কমিয়া যাইবে, জগজ্জঞ্জাল কমিবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

যে-সকল ব্যক্তি মঠের আচার-বিচার পালন করে না, যাহাদের গুর্ব্বানুগত্য ও দৈন্য নাই, সেই স্বতন্ত্র দাম্ভিকগণকে ঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায়, সেও ভাল। যাহারা হরিভজন করিবে না, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং কনক-কামিনীই যাহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাদিগকে মঠে রাখা হইবে না ; যেহেতু তাহারা অন্তরে মঠ-বিরোধী। আমি মঠে অনেকদিন আছি, মঠের অনেক কাজ করিয়াছি, তজ্জন্য ভাল খাব, ভাল পর্‌ব, মোড়লি কর্‌ব, প্রচুর সম্মান চাই এবং মঠে প্রভুত্ব-পরিচালনারূপ প্রচুর share পাওয়া আবশ্যক, এরূপ ভক্তিবিরোধী বিচারকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সংশয়, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিতে করিতে জীবের ঐ সব অসুবিধা আসে।

আমি বড় ওস্তাদ, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি ভাল বক্তা, আমি ভাল গায়ক —এসব ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারে প্রমত্ত হইতে হইবে না। আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে বা আমার নিন্দা করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালিগালাজ কর্‌তে থাক্‌বে তখন আমি জান্‌ব— যে-সকল লোক অসুবিধায় পড়্‌বে, ভগবান্ তা'দের দ্বারা আমার মঙ্গল ক'রে দিতেছেন।

প্রঃ—কাহার সহিত মঠের সম্পর্ক নাই?

উঃ—যিনি দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ বা আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

নদী পার হ'বার জন্য যেমন একটা নৌকা, একটা মাঝি রাখ্‌তে হয়, সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার—এরূপভাবেই এ-সকল লোক আমাকে গুরু ক'রেছে। এরা আমাকে কোনদিনই দেখে নাই, আমিও কোনদিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই। জীবনের শেষ ক'টা দিনও এদের আর সঙ্গ কর্‌ব না। এই সব কপট লোক পূর্ব্ব হ'তে কপটতা বিস্তার না কর্‌লেও গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ-ফলে হরিভক্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করে।

যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ আবাহন করি, যখন আমরা নিজেদের অক্ষজজ্ঞানে গুরুকে মাপ্‌তে যাই, শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ না ক'রে অনুকরণ করি, তখনই আমাদের অমঙ্গল বা সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে। এসব দুর্ব্বুদ্ধি ছে'ড়ে দিয়ে যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি, তখনই আমাদের মঙ্গল হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও বাহাদুরির গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কারণ তদ্দ্বারা গুরু-বৈষ্ণব-লঙ্ঘনজনিত অপরাধই হয়। তৎফলে জীব গুরুকৃষ্ণ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকে।

প্রঃ—ভগবান্ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উঃ—নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্। সেই কৃষ্ণবস্তুটী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। বাস্তববস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের স্নেহ, কৃপা ও মাধুর্য্যে সেবোন্মুখ ও সেবক আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তু অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান, মধ্যস্থলে বা পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবান্তর বস্তুদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হ'লে মূল আকর্ষণ হ'তে বিচ্যুত হয়।

একদিকে বন্ধন বা বঞ্চনা-মূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। এজগতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেইজন্য Living source বা বলবান্ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। আমরা যদি সাধু-গুরুর নিকট হরিকথা শুনিতে থাকি, তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হ'তে রক্ষা পাইতে পারি। কৃষ্ণাকর্ষণে না পড়িতে পারিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে।

প্রঃ—তর্কপন্থী কে?

উঃ—মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন লাভ না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এই বাস্তব সত্যের নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাই তর্কপথ। যাঁরা তর্কপন্থী, তাঁরা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে বা বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের প্রদাতাকে আমরা গুরুপাদপদ্ম ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা ও শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। (ক্রমশঃ)

অলৌকিক

[১৪]

ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়ায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তিনি কৃষ্ণলীলায় চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত অনিরুদ্ধ ছিলেন। ইঁনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু যখন সঙ্কীর্ত্তন করিতেন তখন তিনি নৃত্য করিতেন। বক্রেশ্বরের অলৌকিক মহিমা। একসময় তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর অর্থাৎ তিন দিন নৃত্য করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ হয়। এই বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগ্রহেই তাঁহার সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন—শ্রীগোপালগুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে "গুরু" উপাধি দেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল মকরধ্বজ পণ্ডিত। তিনি শ্রীরাধাকান্ত মঠে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজায় ব্যবস্থা করেন এবং ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার পরে ঠাকুরের সেবা কিভাবে চলিবে চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীরাধাকান্তের সেবার দায়িত্ব প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গোপালগুরু অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহাকে দাহ করিবার জন্য পুরীর স্বর্গদ্বার শ্মশানে লইয়া আসা হইল। সেইসময় রাজকর্ম্মচারিগণ রাধাকান্ত মঠ দখল করিতে আসিল। সেবাইত ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী মহা সমস্যায় পড়িলেন। গুরুদেব তাঁহাকে রাধাকান্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেই সেবা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না—এই চিন্তায় অধীর হইয়া তিনি শ্রীগুরুদেবের স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার—গোপালগুরু শ্মশান হইতে উঠিয়া সোজা রাধাকান্ত মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত সমাধান করিয়া দিলেন। রাধাকান্তের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পুনরায় তিনি অপ্রকট লীলাবিষ্কার করিলেন। আরও অলৌকিক ব্যাপার হইল যে, তাঁহার অপ্রকটের পরেও তাঁহাকে সকলে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেখিতে পান। সকলেই দেখিলেন,—শ্রীগোপালগুরু সশরীরে বৃন্দাবনে ভজন করিতেছেন।

[১৫]

শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর। তিনি পূর্ব্বে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুদামসখা ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীরাধারমণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভজনে নিমগ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি। শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন করিবার কালে তাঁহার ইচ্ছা জাগিল—"যদি কদম্বফুল পাইতাম, তাহা হইলে কদম্বফুলদ্বারা ঠাকুরকে সাজাইতাম।" যেমনই ইচ্ছা, তেমনই কাজ। তিনি বাহিরে আসিয়া জম্বীর বৃক্ষের নিকট গিয়া কদম্বফুলের জন্য যেই হাত বাড়াইলেন, তখনই দেখা গেল জম্বীরের (জামীর বা গোঁড়ালেবু) বৃক্ষে সুন্দর কদম্বফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি জামীরের গাছ হইতে কদম্বফুল তুলিয়া আনিয়া মনের হরিষে বিগ্রহকে সাজাইলেন। এমনই তাঁহার অলৌকিক শক্তি যে, তিনি জামীরের গাছে কদম্বফুল ফুটাইয়া দিলেন।

তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। একদিন প্রেমাবেশে তিনি হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তখন একটী কুমীর আসিয়া তাঁহার পায়ে ধরিল। তিনি কুমীরটীকে জোরে ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। এমনই তাঁহার মহিমা।

[১৬]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন—**শ্রীসদাশিব কবিরাজ**। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের আসরে, জগাই-মাধাই উদ্ধারের সময়, গঙ্গাস্নানকালে, চন্দ্রশেখরের গৃহে নৃত্যকালে, পানিহাটীতে রঘুনাথদাসের দধি-চিড়ার উৎসবকালে—সর্ব্বসময়েই সদাশিব প্রভুর সঙ্গী। শুধু সদাশিবই যে মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তাহাই নহে, তাঁহার তিন পুরুষই প্রভুর পার্ষদ। সদাশিবের একমাত্র পুত্র পুরুষোত্তম সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই হরিভক্ত। তিনি হরিনামে পাগল হইয়া যাইতেন। এই পরমভক্ত পুরুষোত্তমের পুত্র কানু ঠাকুর। ইঁহাদের শ্রীপাট ছিল বেলডাঙ্গা। পরে বেলডাঙ্গা হইতে সুখসাগরে আসিয়া তাঁহারা বসবাস করিতে থাকেন।

এই সুখসাগরে একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ ছিলেন। কতকাল ধরিয়া তাঁহার সেখানে অবস্থান তাহা কেহই জানেন না। সেখানে একটী মস্ত বড় মাটীর ঢিপি ছিল। সকলের বিশ্বাস—ঐ মাটীর ঢিপির নীচে যোগী মহাত্মা ধ্যানে মগ্ন আছেন। একদিন এক কুম্ভকার মাটীর জন্য সেখানে আসে। সে ঐ মাটীর উচ্চ ঢিপি দেখিয়া কোদালের আঘাত দেয়। সেই কোদালের কোপ যোগীপুরুষের কাঁধে লাগে। তাহাতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। যোগী সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া সোজা পুরুষোত্তমের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পুরুষোত্তমের গৃহিণী জাহ্নবী দ্বারে যোগীপুরুষ অতিথি দেখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার যথোপযুক্ত সেবা করিলেন। তাঁহার এতাদৃশী সেবায় যোগীপুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন,—"মা! আমি তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সেবায় মুগ্ধ। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। তুমি বর প্রার্থনা কর।" জাহ্নবী বলিলেন,—"বাবা! অতিথি নারায়ণস্বরূপ। অতিথিসেবা

গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি ত' কোন কামনা-বাসনা লইয়া আপনার সেবা করি নাই, সুতরাং আমার কোন প্রার্থনা নাই।" ইহাতে যোগীবর অত্যাশ্চর্য্য হইলেন এবং আরও মুগ্ধ হইয়া কহিলেন,—"মা! তোমার গৃহে কোন সন্তান দেখিতেছি না। আমি বর দিতেছি, তোমার একটী পুত্র হউক।" জাহ্নবীর মনে আর আনন্দ ধরে না। যোগীবর আরও বলিলেন,—"মাগো! আমিই তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। আমার জন্ম হইলে তুমি আমার কাঁধে এইপ্রকার অস্ত্রের আঘাত দেখিতে পাইবে। তবে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি এইকথা কোনওদিন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ইহা প্রকাশ করিলে তোমার মৃত্যু হইবে।"

যাহা হউক, জাহ্নবীর একটী সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মা দেখিলেন,—তাঁহার সন্তানের কাঁধে স্পষ্ট অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। উহা দেখিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া ধাত্রী তাঁহাকে ধরিল,—"মা! তুমি ছেলেকে দেখিয়া এত হাসিলে কেন? নিশ্চয়ই কোন গূঢ় ব্যাপার আছে।" জাহ্নবী যতই গোপন করেন, ততই সে চাপিয়া ধরিল। অগত্যা তিনি যোগীর কথা তাহাকে বলেন। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহাতে জাহ্নবী খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং বারদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ঐ জাহ্নবী ছিলেন নিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবীর বান্ধবী। নিত্যানন্দ ও জাহ্নবাদেবী যখন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং আসিয়া মাতৃহীন বালকটীকে খড়দহে লইয়া যান। জাহ্নবামাতা বালকটীকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু পুরুষোত্তমের ঐ পুত্রটীর নাম রাখিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস।

জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গেলেন। সঙ্গে শিশু কৃষ্ণদাসকেও লইয়া গেলেন। কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবমণ্ডলী খুবই মুগ্ধ হন। তাঁহারা যখন সঙ্কীর্ত্তন করেন, তখন কৃষ্ণদাস এমন সুন্দর নৃত্য করেন, যেন ব্রজের স্বয়ং মদনগোপাল। আবার কৃষ্ণদাস সুন্দর বাঁশি বাজাইতেও জানেন। তিনি ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের খুবই প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কানাই বলিয়া ডাকেন। স্বয়ং জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন,—কানু ঠাকুর। কানু ঠাকুর বাঁশি বাজান পায়ে নুপূর পরিয়া নৃত্য করেন। কৃষ্ণপ্রেমে যেন পাগল। একদিন কানুঠাকুর নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ডান পায়ের নুপূরটী কোথায় পড়িয়া গেল। অনেক খোঁজাখুজি হইল, কিন্তু কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। কানু ঠাকুর বলিলেন,—"যেখানে আমার নুপূর পাইব, সেইখানেই আমি বসবাস করিব।" বৃন্দাবন হইতে নুপূরটী যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেখানেই কানুঠাকুর বসতি স্থাপন করিলেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

দেবদেবীকে ভগবান্-বুদ্ধি—অপরাধ ও পাষণ্ডতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৮ পৃষ্ঠার পর]

সাধারণ জীবগণ, দেব-দেবীগণ, পরব্যোমপতি নারায়ণ ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে গুণ-তারতম্য-বিচারে ভগবানের অনুগৃহীত কোনও কোনও জীবে কৃষ্ণের সাধারণ ৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে অবস্থান করে। দেবদেবীগণ জগদ্ব্যাপারে অধিকার প্রাপ্ত হয়ে আধিকারিক দেবতারূপে কৃষ্ণ-দাসাভিমানে যথাযোগ্য গুণবিশিষ্ট মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের ষষ্টিগুণ—যাহা চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে বিদ্যমান। সেই ষষ্টিগুণযুক্ত আরও অসাধারণ গুণ যথা—লীলা-মাধুর্য্য, প্রেম-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও বেণু-মাধুর্য্য—এই চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণরূপে অদ্ভুতভাবে সর্ব্বদাই অবস্থিত। ভগবান্ সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ঐশ্বর্য্যপর-প্রকাশে পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ এবং মাধুর্য্য-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ। "মাধুর্য্য ভগবত্তা সার" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণই মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কিরণে আচ্ছাদিত অবস্থায় বিরাজমান। কালী, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতাগণ যে কৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন ও কৃষ্ণেরই দাস-দাসী—ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ১ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, আমার বিজাতীয় কোন প্রাকৃত বস্তুই ছিল না, ব্রহ্মা, শঙ্কর কেহই ছিলেন না ; তৎকালে প্রকৃতি আমাতে অন্তর্ম্মুখতারূপে বিলীন ছিল। সৃষ্টির পরেও আমি আছি—এই যে প্রপঞ্চ, তাহা আমিই ; প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাক্‌বে, তাহাও আমি ; আমি অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় ও পূর্ণস্বরূপ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্। অতএব, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নহেন—ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা।। (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮)
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন।। (চৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)
অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস।। (চৈঃ চঃ আ ২।৭০)

ভগবানের বাৎসল্য, তাঁর প্রিয়তাগুণ ভক্তকে আকর্ষণ করে।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্যে স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্ত-বাৎসল্যে আত্ম পর্য্যন্ত বদান্যতা।

ভক্তের প্রতি তাঁর এত বৎসলতা যে, তিনি আত্মদ—নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়ে দেন, এতই তাঁর করুণা। তাঁর এই স্বভাব ব্রহ্মা, পরমাত্মা, শিব, দুর্গা, গণেশ, কালী

প্রভৃতি কাহারও মধ্যে নেই। ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তি-স্বভাবটা ভগবৎ-সম্বন্ধে থাকে। ভগবান্‌কে সুখ দেওয়ার বৃত্তিই ভক্তির স্বভাব। মুক্ত বা ভোগী ভগবানের জন নয়, ভক্তই ভগবানের জন। ভক্ত ভগবানের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দেন, ভগবান্‌ও ভক্তকে নিজের সব কিছু দিয়েও সন্তুষ্ট হতে না পেরে অবশেষে আত্মপর্য্যন্ত দিয়ে দেন। জীব যখন ভগবানের বাৎসল্যের কথা ভুলে ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে নিজেকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হয় ও নিজে সুখী হবার জন্য দুর্গা, কালী, গণেশাদির উপাসনা করে, তখনই জীব বদ্ধ হয়। ভগবানের বাৎসল্য স্বভাবটী যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, বিষয়ী—ইহারা কেহই বুঝতে পারে না।

ভগবান্ অসমোর্দ্ধ, অসীম ও পূর্ণতম ; তাঁর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় হতে পারে না। যদি তাঁকে প্রাপ্তির উপায় তিনি ব্যতীত অন্য উপায় স্বীকার করা হয়, তাহলে সেই উপায়টি তাঁর সমান হবে অথবা তাঁর অপেক্ষা বড় হবে। কিন্তু ভগবানের সমান বা বড় কোন বস্তু আছে কি? 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদে (৬।৮) উক্ত হয়েছে—সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় প্রাকৃতেন্দ্রিয় সাহায্যে কোন কার্য্য হয় না। তাঁর অলৌকিকী শক্তি তাঁর স্বাভাবিক। তাঁর সমান ও অধিক কেহই নাই। তিনিই একমাত্র পরাৎপর বস্তু। তিনি এক হলেও তাঁর স্বাভাবিকী শক্তি বিবিধ ; তন্মধ্যে জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ-শক্তি), বল (সৎ বা সন্ধিনী-শক্তি) এবং ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী-শক্তি)—এই তিন শক্তিই পরা বা প্রধানা। ভগবান্ বা ভগবৎ-ইচ্ছাই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। তাঁর ইচ্ছানুবর্ত্তনের নামই প্রীতি বা ভক্তি।

এক্ষণে কালী, গণেশাদি দেবতাকে ভগবান্ বললে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে তাঁদের সমান কিংবা বড় বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তদনুরূপ স্বীকার করলে স্বয়ং ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা ও অপরাধ হয়ে পড়ে। কতিপয় শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, মহাজন-বাণী ও শাস্ত্রীয় উদাহরণ উল্লেখ করত কালী, গণেশাদি দেবতা যে ভগবান্ নহেন, পরন্তু ভগবদ্দাস,—তাহা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছি ;—

(১) দেবাদিলোক বা দেবগণ নশ্বর হেতু তাঁদের উপাসকগণও নশ্বর ফল লাভ করেন, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ অনশ্বর হওয়ায় তাঁর উপাসক ও ভক্তগণ তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে অনশ্বর ফল লাভ করেন (গীতা ৯।২৫)। এস্থলে দেব-ভক্তগণ ভগবচ্চিন্তা-বৈমুখ্য হেতু অনিত্য দেবলোকে পরিমিত ভোগান্তে বিনাশ লাভরূপ নশ্বর ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নির্গুণ ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ধামে অনন্ত সুখ অনুভব করত ভগবানের সহিত বিলাস করেন ও ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। কালী, গণেশাদি দেব-ভক্তগণের গতি, আর ভগবদ্ভক্তগণের গতি এক নহে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

(২) অর্জ্জুন বলেছেন (গীতা ১০।১৪),—'হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলছ, তৎসমস্তই আমি সত্য মনে করি, যেহেতু হে ভগবন্! দেবগণ কিংবা দানবগণ কেহই তোমার তত্ত্ব বা প্রভব অবগত হতে সমর্থ নহে।' অতএব, যে ভগবানের তত্ত্ব দেবগণেরও অজ্ঞাত, সেই দেবগণকে ভগবান্ বলা মহাপরাধ ও পাষণ্ডতা।

(৩) গীতায় বহু শ্লোকে ভগবান্ কৃষ্ণ ভূতভাবন (সর্ব্বভূতের পিতা), ভূতেশ (ভূতগণের প্রভু), দেবদেব (দেবগণের আরাধ্য), জগৎপতে (জগতের পালক), পুরুষোত্তম, দেবেশ, অনন্ত, আদিদেব ও সনাতন পুরুষ প্রভৃতি নামে উক্ত হয়েছেন। অতএব, ভগবান্ কৃষ্ণই সর্ব্বস্বরূপ, কালী, গণেশাদি দেবতা ভগবান্ কৃষ্ণের সমান বা তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন।

(৪) অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—"হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে ছেদন করতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। তুমি ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের ছেদনকারীরূপে নিশ্চয়ই থাকতে পারে না।" 'ন হি উপপদ্যতে'—নিশ্চয়ই থাক্‌তে পারে না। ইহাতে কোন দেবতা ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নহেন—ইহা প্রমাণিত হল। (গীতা ৬।৩৯)।

(৫) সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিদ্ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মনীষিগণের পরিপ্রশ্নসমূহের যে-সকল সদুত্তর প্রদান করেছেন, তাহাতে জানতে পারা যায়,—"মায়া পূর্ণপুরুষের অপাশ্রিতা অর্থাৎ তাঁর পশ্চাদ্ভাগে নিন্দিত-ভাবে আশ্রিতা। যেমন shadow বা reflection জাতীয় জিনিষ। উহা original জিনিষেরই একটী জিনিষ—বিম্বের প্রতিবিম্ব। মহাশক্তি অপাশ্রিতা, direct potency নহে, ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তিরই ছায়াশক্তি। * * স্বরূপশক্তিরই বিপরীত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহা জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিকে আবৃত করে আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তি হতে বিক্ষিপ্ত করে।"

শ্রীচণ্ডীতেও (৫।৩১ শ্লোকে) উক্ত হয়েছে,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।" অর্থাৎ, মহামায়া দুর্গাদেবী সর্ব্বভূতে বা সকল প্রাণীতে ছায়ারূপে বা প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিতা। অতএব মহামায়া ভগবানের direct potency নহেন, ইহা শ্রীচণ্ডীতেও স্বীকৃত। 'চণ্ডীর' শ্লোকে তাঁকে 'নারায়ণী' বা 'নারায়ণ-শক্তি' বলা হলেও উনি ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি নহেন। নারায়ণের ভার্য্যা 'নারায়ণী লক্ষ্মীদেবী' আছেন ; অন্য কেহ নহেন। মহামায়া 'দুর্গাদেবীকে' শ্রীনারায়ণের বক্ষ-বিলাসিনী 'নারায়ণী লক্ষ্মী' বলা মহাপরাধ ও অজ্ঞানতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যগণকে 'নারায়ণী সেনা' বলা হত। "দ্রাক্ষায়নী" অর্থে দক্ষের কন্যাকে বুঝায়। চণ্ডীতে (৫।১৬) কথিত হয়,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।" 'দুর্গাদেবী'

সকল প্রাণীতে 'বিষ্ণুমায়া' নামে (আগমশাস্ত্রে) অভিহিতা হন। এক্ষণে 'বিষ্ণুমায়া' অর্থে মায়া বিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী ; সংসার-মোচনে বিষ্ণুমায়া দুর্গাদেবীর স্বতন্ত্রতা নাই। সংসার হতে মুক্তি পেতে হলে শ্রীহরি-গুরু-চরণ-প্রপত্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। চিচ্ছক্তির স্বভাব প্রকাশময়, কিন্তু চিচ্ছক্তির ছায়ার স্বভাব তমোময়। মহামায়া ভগবানের ছায়াশক্তি, প্রকৃত স্বরূপশক্তি নহেন ; শক্তি বস্তু নহেন। বস্তুর অভাবে বস্তু-শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। বস্তু-শক্তি হতে বস্তু জাত হয় না। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত বস্তু-শক্তি স্বতন্ত্রভাবে থাক্‌তে পারে না। ভগবান্ মায়ার দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ইহাতে ভগবান্ মায়িক স্বরূপ—এরূপ বলা যায় না। তাঁহার বিশ্বরূপ মায়িক, কিন্তু ভগবত্তা মায়াতীত। মায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ভগবানকে স্পর্শ করতে পারেন না। ভগবানের ছায়াশক্তি দুর্গা, কালী, গণেশাদিকে ভগবান্ বলা অবশ্যই অপরাধ ও পাষণ্ডতা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

মহাপ্রভুর দয়া

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

"জীব—প্রথমতঃ ঈশবিমুখ বিষয়খিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ ঈশানুসন্ধানপর ও অবশেষে ভগবৎ-সেবারত। ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়-নির্ম্মলতার পরিণামে কৃষ্ণমোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে অনুরক্তি ও তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি লাভ এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণকৃপায় নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাবশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ, মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগৌষধি লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদফলে বিষয়ভোগত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্যা।" (অনুভাষ্য)।

সেই কারণে স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! আমার প্রতি তোমার অতি বিস্তারিণী শুভদা দয়া উদিত হউক যাহাতে তোমার অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্যের সম্যক্ অনুভব হইতে পারে।"

শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য

অর্থাৎ ভক্তের নিত্যারাধ্য ধনকে বিলাইবার জন্য আকুল বেদনাভরা আর্ত্তিসহকারে করুণ বিলাপ করিয়াছেন।

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।। (চৈঃ চঃ মঃ ২।১৫-১৬)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য আকুলতা অপরিহার্য্য। কৃষ্ণের জন্য বিরহবোধ জাগ্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। জীবকল্যাণের নিমিত্ত ইহাই মহাপ্রভুর প্রদত্ত পথ-নির্দ্দেশ এই পথ-নির্দ্দেশনায় মহাপ্রভুর দয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

'শক্তি শক্তিমতোরভেদ'—শক্তি ও শক্তিমান্ এক হইয়াও রসাস্বাদনের নিমিত্ত দ্বাপরে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে শ্রীরাধাপ্রেম-মাধুর্য্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে সেবা করিবার জন্য এবং পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪৩)

নামই সাধন, আর প্রেমই সাধ্যসার। কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪৭)

"হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের অনুশীলনদ্বারাই রতি বা ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির উদয় হয়।"

যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।

নাম ও নামী অভিন্ন। ঐকান্তিক ভক্তির সহিত শ্রীনামকীর্ত্তনে নামী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকে লাভ করিবার পথ প্রদর্শনার্থে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পদব্রজে দ্বারে দ্বারে গিয়া দুই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

ইহা মহামন্ত্র-নামে আখ্যায়িত। এই মহামন্ত্র সম্পর্কে মহাপ্রভু কি বলিলেন?—

প্রভু বলে,---কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৭-৭৮)

কলিযুগে একমাত্র হরিনামই সার। নির্ব্বন্ধ করিয়া যেমন মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে, তেমন কীর্ত্তনও করিতে হইবে চরম ও পরমতত্ত্বে পৌঁছাইতে হইলে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

হরির নাম, হরির নাম, একমাত্র হরিরই নাম। কলিযুগে অন্য গতি নাই, নাই, নাই-ই। অর্থাৎ কলিতে হরিনাম ব্যতীত অন্য গত্যন্তর নাই। হরিনামই সার।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার।। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২)

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম-নামী যে অভিন্ন তাহা ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। এই যুগে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই জগজ্জীবকে কৃপা করিতেছেন। শ্রীনামের কৃপা বলিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বসদ্‌গুণাপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১৯)

যে ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি।

এই শ্লোক হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণনামও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একমাত্র এই শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব নিস্তার লাভ করিতে পারে।

মহামন্ত্র কৃপা করি' স্ফুরিবে হৃদয়ে।
স্বরূপ দেখা'বে মোরে আনন্দিত হ'য়ে।।
হরি-আলিঙ্গিত হরা, হরাশ্লিষ্ট হরি।
সেবিব যুগলরূপ প্রতিপদ বরি'।। (প্রেমসম্পুট)　(ক্রমশঃ)

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যলীলা-গ্রন্থ-পাঠকমাত্রেরই গৌরপার্ষদ—শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি হালিসহরবাসী ছিলেন। ইনি স্বয়ং পরমবৈষ্ণব, সুপণ্ডিত, আর্য্য, বৈরাগ্যপ্রধান এবং একান্তভাবে চৈতন্যচরণে শরণাগত থাকিলেও ইঁহার পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী শতানন্দ খাঁন পরম বিষয়ী, ভগবদ্বিমুখ ছিলেন। এদিকে যেমন শতানন্দ খাঁন বিষয়ী ছিলেন, অপরদিকে ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য শঙ্করভাষ্য পড়িয়া একজন মায়াবাদী হইয়াছিলেন। ভগবান্ আচার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে খঞ্জ ছিলেন। তিনি স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মেই অবস্থান করিতেন।

আমরা গৌরভক্তগণের চরিত্র বর্ণনকালে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার এক একটী ভক্তদ্বারা জগতে ভক্তিপথের পথিকগণের জন্য—সমগ্র জীবের কল্যাণের জন্য এক একটী মহান্ আদর্শ ও মহতী শিক্ষা সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ—নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের দ্বারা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকে প্রবঞ্চনাময় বহুরূপী অনর্থের কবল হইতে সতর্ক করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অমন্দোদয়া দয়ার উদাহরণ। তিনি বিষয়ী-জীবকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা প্রথমে তাঁহাদের বিষয়ী থাকিবার লীলা, পরে বিষয় হইতে মুক্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ন্যায় আচরণ করিয়া ভক্তের কৃত্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দয়ালু আর কে?

মহাবদান্য গৌরসুন্দর তৎপার্ষদ শ্রীভগবান্ আচার্য্যদ্বারা আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব। তিনি এই আচার্য্যদ্বারা আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, আচার্য্য নিজে একান্ত শুদ্ধ-ভক্তি-পথাশ্রয়ী ও শ্রীচৈতন্যানুগত কিঙ্কর হইলেও তাঁহার পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী একজন পরম বিষয়ী ও তাঁহার অনুজ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী একজন মায়াবাদী। একজন বুভুক্ষু, আর একজন মুমুক্ষু। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

অর্থাৎ ভুক্তি এবং মুক্তি—এই দুইটীই পিশাচী। এই দুইটীর কোন একটী যাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে কি-প্রকারেই বা ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে।

স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্ত 'নরক' করি' মানে।

কৃষ্ণভক্তের নিকট বিষয়ভোগ বা প্রাপঞ্চিক কৃষ্ণবিষয়-ত্যাগ উভয়ই ঘৃণ্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

কিন্তু ভগবান্ আচার্য্যের পিতা ও অনুজ পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর মধ্যে একজন ভোগ-পিশাচীদ্বারা আক্রান্ত, আর একজন ত্যাগপিশাচীদ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ আচার্য্যের চরিত্রদ্বারা আমাদিগকে দেখাইলেন যে, 'বৈষ্ণবতা' শৌক্র-পারম্পর্য্য বা বংশগত ব্যাপার নহে। তিনি যে কেবল ভগবান্ আচার্য্যের চরিত্রদ্বারা এরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও নহে ; তাঁহার বহু পার্ষদদ্বারা তিনি জগতে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণা,—'বৈষ্ণবতা', 'গোস্বামিত্ব' প্রভৃতি শৌক্র-বংশগত ব্যাপার—তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর পিতৃপরিচয়া-কাঙ্ক্ষী 'বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট' হইলেও শ্রীরঘুনাথ সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মূল আচার্য্য ও গোস্বামি-রূপে শ্রীগৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভগবান্ আচার্য্যের পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী 'পরম বিষয়ী' হইলেও ভগবান্ আচার্য্য—"বিষয়বিমুখ, আচার্য্য, বৈরাগ্যপ্রধান, পরম বৈষ্ণব।" অতএব 'বৈষ্ণবতা' আত্মার বৃত্তি। উহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের হরিবিমুখ চিন্তা-স্রোতোত্থ ধারণানুযায়ী শৌক্রবিচার বা পিতৃত্বের মধ্য দিয়া পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। চিদ্বস্তু কখনও অচিদ্বস্তুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা সম্বর্দ্ধিত হয় না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ঐরূপ হরিবিমুখিনী বুদ্ধিকে শোধন করিবার জন্যই পরম করুণাময় গৌরসুন্দর আমাদিগকে ভগবান্ আচার্য্যদ্বারা দেখাইলেন যে, পিতা 'পরম বিষয়ী' থাকিলেও, ভ্রাতা 'মায়াবাদী' হইলেও সেই কুলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন। কুল বা বংশ বৈষ্ণবতার কারণ নহে। পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যোদয়ের কখনই কারণ নহে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভু আর একটী শিক্ষা দিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীভগবান্ আচার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে খঞ্জ ছিলেন। ভগবানের পার্ষদ—যাঁহার দেহ চিদানন্দময়, যাঁহাতে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান—যিনি সেবা-সৌন্দর্য্য-দ্বারা সর্ব্বদা যুক্ত, তাঁহাতে খঞ্জত্ব প্রভৃতি দোষ কিরূপে থাকিতে পারে? কর্ম্মফল-বাধ্য জীবই পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পীড়া বা বপুগত দোষ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। ভগবানের ভক্ত ত' আর কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জগতে আসেন না। তবে তাঁহাদিগের ঐরূপ বপুগত দোষ উপস্থিত হইল কিরূপে? ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অক্ষজ-জ্ঞান-বিভ্রান্ত আমাদের ন্যায় মূঢ় জীবের ভ্রমাপনোদন করিবার জন্য সর্ব্বশোভাময়, সর্ব্বরূপবিশিষ্ট নিজজনকে কুদর্শন-প্রমত্ত বহির্ম্মুখ লোক-লোচনের নিকট খঞ্জ সাজাইলেন ; ইহার উদ্দেশ্য আছে। তিনি ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচারকারী। পাছে অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তের বপুগত দোষ তাহাদের ভোগময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সাধুতে 'অসাধু' বুদ্ধি করে অথবা পাছে মর্ত্যবুদ্ধিক্রমে তাঁহাদিগকে নিজের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

এবং প্রকৃত ভক্তের কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হয়, তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তের দ্বারা এই লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অসুরবিমোহন ও ভক্তার্ত্তিবর্দ্ধনজন্য সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর অনাদি বস্তু হইয়াও ভয়, ক্লেশ, নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার (যাহা জীবে পরিলক্ষিত হয়) তাহা অঙ্গীকার করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গৌরাবতারে তিনিই নিজ পূজা হইতে ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে আসিয়াছেন। পাছে ভবিষ্যতে অক্ষজ-জ্ঞান-বিভ্রান্ত জীবসমূহ ভগবদ্ভক্তের জাতিগত দোষ, কর্কশতাদি স্বাভাবিক দোষ, কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া-জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ প্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জীব-জ্ঞান বা আপনাদের সহিত সমান বুদ্ধি করে, সেইজন্যই তিনি ঠাকুর হরিদাসকে যবনকুলে, ঝড়ু ঠাকুরকে ভূঁইমালী কুলে, উদ্ধারণ ঠাকুরকে স্বর্ণবণিক কুলে অবতীর্ণ করাইলেন ; সেইজন্যই তিনি ভগবান্ আচার্য্যকে প্রাকৃত লোকলোচনের নিকট খঞ্জরূপে দেখাইলেন ; আমরা তাঁহার শিক্ষাই শ্রীরূপের উপদেশামৃতে পাই,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।। (উপদেশামৃত ৬)

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ অথবা কদর্য্যবর্ণ, পীড়া, কু-গঠন প্রভৃতি বপুদোষ প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই। যেরূপ নীচধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গোদকে বুদ্‌বুদ্ ফেন-পঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কদাপি পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম বা বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। গঙ্গাজল যেরূপ নিত্য পবিত্র অপ্রাকৃতবস্তু, উহাতে ফেন-পঙ্কাদি দৃষ্ট হইলেও কখন নিত্য পবিত্র গঙ্গোদক হইতে পবিত্রতা পরিত্যক্ত হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবও নিত্য পবিত্র, তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। অক্ষজদৃষ্টি সেই অপ্রাকৃত বস্তুতে যে-সকল দোষ দর্শন করে, তাহা দর্শনজনিত দোষ, প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যবস্তুতে বিন্দুমাত্র কোনও দোষ স্পর্শ করে নাই।

অতএব ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি প্রাকৃতদৃষ্টিতে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কোন দোষ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিলে ভজন হইতে অধঃপতিত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুদ্বারা এই উপদেশ জগতে প্রচার করিতে-ছিলেন, আবার তাঁহার নিজ পার্ষদ ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারাও জগতে এই শিক্ষা দিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া আমাদিগকে আরও একটী মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহাতে কোনপ্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই। লোক-শিক্ষাকল্পে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ভগবান্ আচার্য্যের এই লীলা। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভগবান্ আচার্য্যের অনুজ একজন মায়াবাদী ছিলেন। একদা আচার্য্যের অনুজ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে মায়াবাদী গুরুর নিকট হইতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে ভগবান্ আচার্য্যের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ আচার্য্য অনুজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য যেন বিশেষ ব্যগ্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদীকে দেখিয়া অন্তরে সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু ভগবান্ আচার্য্যের সম্বন্ধে বাহ্যে প্রীতির আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলেন,—

আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা।।
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস।।

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৯০-৯১)

আর একদিন ভগবান্ আচার্য্য মূল গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন,—

বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে।
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে।।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর ভগবান্ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের প্রতি প্রেমক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে।।
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর।।

ভগবান্ আচার্য্য স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠার শ্লাঘা জানাইয়া স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,—

"* * * 'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে।।"

কিন্তু শ্রীল স্বরূপ দামোদর শুদ্ধভক্তের হৃদয়-বিদারক মায়াবাদের অর্থ নিরূপণ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—

"* * * তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এইমাত্র শুনে।।
জীবজ্ঞান-কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ।।

শ্রীল স্বরূপের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্য যেন লজ্জা ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি অন্য একদিবস গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

পাঠক! ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা এরূপ লীলা-প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন, আপনারা চিন্তা করিয়াছেন কি? আমরা অনেক সময় হরিভজন করিতে আসিয়াও পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিতে পারি না। কেহ বা পিতা, কেহ বা ছোট ভাই, কেহ বা স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, কেহ বা পাড়াপড়শী বা পূর্ব্বসঙ্গীকে 'আমি যে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিয়াছি, সেই ধর্ম্মপথে তাহারাও আসুক', এইরূপ শুভানুধ্যানের নাম করিয়া তাহাদের প্রতি পূর্ব্বাসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম হইলেও কোমলশ্রদ্ধের ইহাতে অনেক সময়ই অসুবিধা, এমন কি ভজনরাজ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। নিজে দৃঢ়ভিত্তিতে সংস্থাপিত না হইয়া—ছোট ভাই, পিতামাতা, ভাই-বন্ধু বা স্ত্রীকে আমার পথের পথিক করিতে গিয়া আমি যতটুকু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, সেইটুকু হইতে পর্য্যন্ত সরিয়া পড়ি। অপরিপক্কাবস্থায় অপরের মঙ্গল ধ্যান করিতে গিয়া অপরের মঙ্গল করা দূরে থাকুক, নিজেই অমঙ্গলে পতিত হই। তাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের পূর্ব্বসঙ্গিগণের বহির্ম্মুখতা বা ভক্তিবিরোধিনী বিদ্ধা-চেষ্টা দেখিয়া বাহ্যে প্রীত্যাভাস প্রদর্শন করিলেও অন্তরে উল্লসিত হন না। কারণ, তাঁহারা অন্তর্যামী। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, এই সকল আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তি 'হরিকথা' শ্রবণ করিতে আসেন নাই ; পরন্তু তাঁহাদের যে আত্মীয়-স্বজনটী হরি-সেবোন্মুখ হইয়াছেন, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব আমাদের স্বজনাখ্য দস্যুগণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া আমাদিগকে সেই বহির্ম্মুখ সঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পরম কৃপা। মায়ার কবলে কবলিত হইয়া আমরা অনেক সময় এইরূপ প্রকৃত শুভেচ্ছু গুরু-বৈষ্ণবকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রাতিকূল কার্য্য করিতে দেখিয়া অন্তরে অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই সচেষ্ট থাকেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

আবার অনেক সময় আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনগণকে সর্ব্ববিদ্ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট লইয়া আসিয়া তাহাদের (আত্মীয়-স্বজনবর্গের) যে-সকল 'বাহাদুরির কথা' আছে, তাহা সাধুগুরুগণকে শ্রবণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হই। মনে ভাবি, বোধ হয় সাধু-গুরুর জ্ঞানের কিছু লাঘবতা আছে, ইহাদের দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। কোমলশ্রদ্ধ অনেক ব্যক্তির অথবা পরমার্থ-পথে প্রবেশলিপ্সু অনেক ব্যক্তিরই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ বিচার-প্রণালী কৃষ্ণ-সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। অনর্থ থাকাকালে আমরা বুঝিতে পারি না যে, শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব কোন মর্ত্ত্য জীব নহেন। তাঁহাদের প্রাকৃত-অভিজ্ঞতাবাদিজীবের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার নানাস্থান হইতে আহৃত পরিবর্ত্তনশীল খণ্ড-জ্ঞানরাজির দ্বারা পূর্ণ করিতে হয় না। 'গুরু' ও 'বৈষ্ণব' নিত্যকাল অদ্বয়-জ্ঞানের আলিঙ্গিতবিগ্রহ। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের কথাই শ্রুতি। তাঁহাদের কথা অন্যান্য জীবে শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হইবে ; অপরের 'বাহাদুরি' বা পরামর্শ শ্রবণ করিবার আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর মূল গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য। তাঁহার দাসানুদাসের কৃপা লাভ করিলে জগতে অসংখ্য বেদান্তাচার্য্য ও সুদার্শনিকের আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীল স্বরূপদামোদরের কুদার্শনিক মায়াবাদী বা অসুর বিমোহনকারী ভাষ্য শুনিবার আবশ্যক নাই। জগতে জীবকুল যাহারা সেইরূপ কু-দর্শনে নষ্ট-দৃষ্টি হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা সেইসকল বঞ্চিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারকল্পেই শ্রীল স্বরূপ দামোদরের আবির্ভাব। তিনি জগদ্‌গুরু। তিনিই গৌড়ীয়ের অধীশ্বর। তিনি যথার্থই বেদান্তবিৎ। বেদান্তবেদ্য পুরুষ তাঁহারই করতলগত। অতএব সেইরূপ জগদ্‌গুরু আচার্য্য বা বৈষ্ণবগণের জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বা তাঁহাদের কাহারও কোন বাক্য, উপদেশ, মতামত বা মন্তব্য শুনিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন ভক্তিপথের পথিকগণের কখনও উদিত না হয়, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা ঐরূপ লীলা প্রকাশ।

যাহাতে 'ভগবান্', 'ভক্তি' ও 'ভক্তের' নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা'। বৌদ্ধ-চার্ব্বাক আদি সরল-নাস্তিক। লোকে তাহাদিগকে প্রথম মুখেই নাস্তিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বিষ-কুম্ভপয়োমুখ মায়াবাদ-ভাষ্যের পাণ্ডিত্যাদি চাক্‌চিক্যে প্রলুব্ধ হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্য ও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্যাভক্তির উদ্দেশ করেন না—যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্য-ভক্তের নিত্য গুণ-কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত

হয় না, সে পাণ্ডিত্য প্রবল মূর্খতা, অতএব ভক্তগণের কখনও মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করা উচিত নহে। কিন্তু মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করিতে হইবে না বলিয়া যেন আমরা প্রাকৃত-সহজিয়ার বিচারে আবদ্ধ হইয়া আচার্য্য-সর্ব্বজ্ঞ মুনির 'বেদান্ত-ভাষ্য', শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'শ্রী-ভাষ্য', শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন', শ্রীনিম্বার্কের 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ', সূত্রকর্ত্তা শ্রীব্যাসের 'অকৃত্রিমবেদান্তভাষ্য', মূল-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল স্বরূপের অনুগ শ্রীবলদেবের 'গোবিন্দভাষ্য' শ্রবণ হইতে বিরত না হই।

শ্রীল গুরু-মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর]

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছাড়বি মোয়।।

* * * *

তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহাওসি,
জগ-বাহির নহি মুঞি ছার।।

এই ত' বলছেন বিদ্যাপতি। তুমি ত' জগন্নাথ, তুমি ত' বিশ্বম্ভর ভগবান্। জগৎকে খাওয়াও, পরাও। আমি ত' তোমার একজন, আমাকে তুমি নিশ্চয়ই খাওয়াবে, পরাবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। সে তত্ত্বদর্শনটা আমার ভিতরে থাকা চাই। আমি তত্ত্বসিদ্ধান্ত যদি কিছুই না বুঝি, তাহলে ত' ভগবান্ও এগিয়ে আসছেন না। কান্নাকাটি করতে হবে তাঁর জন্য। শাস্ত্র এই কথাটা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন আমাদের।

তত্ত্বসিদ্ধান্ত কঠিন ব্যাপার, মাথায় ঢুকতে চায় না। যদি কিছু খোসগল্প হয়, তাহলে ভাল লাগে। তখন ঝুম আসে না। আর গালগপ্প যদি না থাকে, তখন ঘুম আসে। যে জিনিষে আমার রুচি নেই, সে জিনিষটা যদি আমার সামনে হতে থাকে, তাহলে ঘুম আসবেই। আর যদি যাত্রা-থিয়েটার হয় সারারাত ধরে, তখন কট্‌কট্ করে তাকিয়ে থাকে, ঘুম আসে না। ওর জন্য আলাদা Interest। মনটা যে জিনিষ চায়, সে খাবার দিলে সে আর ঘুমাবে না। আসলে আমরা ত' ভাল খাবার খুঁজি নাই, পাই ও নাই, সেজন্য ঘুম আসে। আর ঘুমের ওষুধ কি জানেন? যাদের রাত্রে ঘুম আসে না, অনিদ্রা রোগ, তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে। ভাগবত পাঠের কাছে বা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের কাছে বসলেই তাদের ঘুম আসবে। এটা

হল ঘুমের ওষুধ। এই ওষুধটা আপনারা জেনে রাখুন। যাদের ঘুম হবে না, তারা গীতা-ভাগবত পাঠ যেখানে হবে, সেখানে গিয়ে বসবেন, দেখবেন তাহলে ঘুম আসবেই। এ হল ঘুমপাড়ানি গান।

এক রাজার কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না। তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। সমস্ত রাজ্যে ঢেড়া পিটিয়ে দিলেন—আমাকে যিনি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবেন, তাঁকে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে দেব। মন্ত্রী খুব সুচতুর। তিনি ব্যবস্থা করলেন, রামায়ণ গান। রামায়ণ গানের আসর করেছেন তিনি। আর সভার মাঝখানেই খাট-পালঙ্ক এনে সেখানে রাজাকে বসিয়ে দিয়েছেন। রামায়ণ গান আরম্ভ হয়েছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। প্রথম কাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ড, তৃতীয় কাণ্ড হয়েছে, তখন রাজামশায়ের হাই উঠছে। মন্ত্রী পাশে বসেছিলেন। রাজা বলছেন, ঘুম আসছে, কি করব? ধার্ম্মিক রাজা। রামায়ণ গান আরম্ভ হয়েছে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠা যাবে না। কি করব? মন্ত্রী বললেন, আপনার জন্যই ত' আসর করা হয়েছে। যদি আপনার হাই উঠছে অর্থাৎ ঘুম আসার আগেকার অবস্থা, তাহলে দেখুন কি হয়। চতুর্থ কাণ্ডের অর্দ্ধেক হয়েছে, তখন আর থাকতে পারছেন না রাজামশাই। তখন মন্ত্রী বলছেন, আপনি শুয়ে পড়ুন। রাজা বলছেন, শেষ হল না যে। মন্ত্রী বললেন,—শেষ করে দিচ্ছি আমি। রামায়ণ গায়ক যারা, তাদের বলে দিলেন সংক্ষেপ কর। চতুর্থ কাণ্ড শেষ হবে, সে-সময় দুই লাইনে শেষ করে দিল।

এত বলি' হনুমান এক লম্ফ দিল।
ওপার হইতে সীতা এপারে আনিল।।

আপনার ঘুম আনাবার জন্য ত' এই আসর। তাহলে যাদের ঘুম হয় না, তারা যদি গীতা-ভাগবত পাঠের আসরে এসে বসেন, তাহলে ঘুম হবেই। ঘুমপাড়ানি গান। চিত্তটা আমাদের ওতে লেগে থাকবে। এই অভ্যাসটা দরকার। সেজন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের কথা লেখা আছে শাস্ত্রে। শ্রবণ যদি হয়, তাহলে আমি কিছু বলতে পারি, কীর্ত্তন করতে পারি। আর কিছু স্মরণ যদি আমার না হয়, তাহলে ত' আমি বলতে পারি না, কীর্ত্তন করতে পারি না। এ তিনটে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ তিনটের কোনটাকে বাদ দেওয়া যাবে না। শ্রবণ যদি আমার না হয়, তাহলে কীর্ত্তন হবে না। আর কীর্ত্তন করতে গেলেই স্মরণ দরকার। কি বলব জানেন, কিছু মনে থাকে না। মনে না থাকাটা ত' একটা রোগ। যদি কিছু মনে না থাকে, তাহলে আমি নাম করব কি করে? নাম যদি আমার মনে না থামে, তাহলে নাম করব কি করে? কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ সময়ে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভগবানের বিশেষ নাম বিশেষ উপকারে আসে। ওর শেষের দিকে বলা আছে, যদি কোন নাম মনে না রাখতে পার, তাহলে 'মাধব' নামটা মনে রেখো।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।।

তাহলে এই মাধব নামটায় সব কাজ মোটামুটি হবে। এটা ত' একটা কথার কথা। 'কৃষ্ণ'নাম মনে থাকবে না, 'গোবিন্দ'নাম মনে থাকবে না, 'মুকুন্দ', 'মুরারি' নাম মনে থাকবে না? থাকবে ত', থাকার কথা ত', না থাকবে কেন? একটা সময় এমন ছিল, যে-সময় কেউ এইসব নাম করত না। শ্রীচতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের ধর্ম্মীয় পরিবেশ এমনই ছিল যে, তারা কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি— এ নাম বলত না। কদাচিৎ কেউ ভাগ্যবন্ত ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের সময় একবার গোবিন্দ গোবিন্দ বলতেন। বর্ণনা আছে প্রাচীন শাস্ত্রে। জগতের দুর্ভাগ্য, জগৎ ভুলে গেছে ভগবানের নাম, ভগবানকে ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়া, অন্যমনস্ক হওয়া একটা ভীষণ দোষ-ত্রুটী, অপরাধ। ভগবানের নাম ভুলে যাওয়া ত' একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সব নাম ভুলে যাই আমরা, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু শাস্ত্র বলছেন, গোবিন্দের নাম যেন না ভুলি, কৃষ্ণনাম যেন না ভুলি। ওটা ভুললে সব সর্ব্বনাশ। ঐ নামটা ভুললে চলবে না। আর সব নাম ভুলে যাই আমরা, তাতে কোন দোষ নেই। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি নাম যেন ভুল না হয়। এ নামটা মনে রাখতে হবে।

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধি! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসঘাতক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ! হে মাধব!
হে রামানুজ! হে জগত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম্!
হে গোপীজননাথপালয়! পরং জানামি ন ত্বং বিনা।।

দুটো ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হঠাৎ ঝগড়া আরম্ভ করেছে। আরও এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। এরা ঝগড়া আরম্ভ করেছে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন বলছে,—দেখ, বেশী যদি চালাকি করবি, তাহলে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। আর একজন বলছে—দেখ, বেশী যদি হুম্বি-তুম্বি করবি, তাহলে তোর মায়ের নাম ভুলিয়ে দেব। তখন ওই ভদ্রলোক গিয়ে ওদেরকে আলাদা করে দিলেন। বললেন,—দেখ, তোদের বাপের নামও ভুলাতে হবে না, মায়ের নামও ভুলাতে হবে না, যে যার ঘরে যা। আমাদের অবস্থা ত' ওই বাচ্চা দুটোর মত হয়েছে। সব ভুলে যাই আমরা, কোন আপত্তি নেই। শাস্ত্র বলছেন, সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বলছেন, তোরা বাপু ভগবানের নামটা ভুলিস্ না, এই নামটা মনে রাখার চেষ্টা করিস্। আমাদের অবস্থা ত' এইরকম হয়েছে।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি, কি করব? সময়ের হিসাব যা দেওয়া আছে,

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

তাতে ভগবানকে যে ডাকব, তার সময় পাচ্ছি না। শাস্ত্র বললেন,—সময় তোমার আছে, তুমি সময় কর, করলেই হবে। আবার শাস্ত্রেতেও বলা আছে,—"অনন্তপারং কিলশব্দশাস্ত্রম্।" শব্দশাস্ত্র অনন্ত, তা আলোচনা করে কে শেষ করবে? কার সাধ্য আছে? 'স্বল্পং তথায়ুঃ'—এর মধ্যে আমাদের আয়ু অত্যন্ত অল্প, বিশেষতঃ 'কলৌ যুগে'—এই কলিযুগে। আয়ু কত? 'আয়ুঃ বর্ষশতম্'—শতবর্ষ পরমায়ু। কিন্তু ভাগবতে দেখছি, প্রহ্লাদ মহারাজের হিসাবে আমাদের আয়ু শতবর্ষ নয়, পঞ্চাশ বৎসর। এখন World statistics যা বলছে, তাতে ভারতবাসী আমরা, আমাদের গড় পরমায়ু এখন ৪০/৪২ বছর। কি করবেন? এর মধ্যে কখন কি করব? কখনই বা লেখাপড়া করি, কখনই বা চাকরি-বাকরি করি, কখনই বা স্বজনপোষণ করি? সব সময় ত' চলে গেল। সময় কই?

দিবা চ অর্থ ইহয়া রাজন্ কুটুম্ব ভরণে ন বা।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বাবয়ঃ।।

'দিবা চ অর্থ ইহয়া রাজন্'—কুটুম্ব ভরণের জন্য অর্থচেষ্টা, অর্থ রোজগার। নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তম্'—পরমায়ুর অর্দ্ধেকটা আমাদের কেটে যায় রাত্রে নিদ্রায়। 'স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্না'—এর মধ্যে আবার বাধাবিঘ্ন অনন্ত। তাহলে কি করব? 'সারং ততো গ্রাহ্যম্'—শাস্ত্র বলছেন, তাহলে সার সঙ্কলন কর। কিরকম ভাবে করব? 'অপাস্য ফল্গু'—অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ কর। কিভাবে করব? 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'—রাজহংসকে দুধ আর জল মিশিয়ে যদি দেওয়া হয়, তাহলে সে দুধটা খেয়ে ফেলে, জলটা পড়ে থাকে। ঠিক সেইভাবে সারসঙ্কলন করতে হবে। এ ত' মহামুস্কিল্! কি করে করে? শিখতে হবে। সে Process, procedure আমাদের শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, আমাদের জীবনে সেটা Adopt করতে হবে। তাহলে আমরা পারব ওটা করতে। অভ্যাসযোগ। গীতা উপদেশ করছেন সখা অর্জ্জুনের কাছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন শুনে যাচ্ছেন, সবই বোঝেন তিনি, ভগবানের সখা তিনি, না বুঝবার কিছু নেই। কিন্তু ইচ্ছা করেই তিনি বুঝতে চাচ্ছেন না। এটা বুঝলাম না, আমাকে আবার বুঝিয়ে দাও, বলে দাও। যখনই অর্জ্জুন চুপ করে যাবেন হ্যাঁ বুঝে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভয়ে অর্জ্জুন তাঁর আলোচনাটা cotinue করে যাচ্ছেন। না, ওটা বন্ধ হলে চলবে না। এই উপদেশ, এই নির্দ্দেশ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক। সেইজন্য তিনি বুঝতে পারছেন না ইচ্ছা করেই। ঠাকুর, অনেক কথা ত' বললেন, বহু তত্ত্বদর্শন তোমার কাছ থেকে শিখলাম আমি। কিন্তু তুমি

যেসব কথাগুলো বললে, কিছুই মনে থাকছে না আমার। কি করব আমি? আমার মনটা এত পাজি, কিছুই মনে নেই।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।

আমার মন এত চঞ্চল, আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না। 'প্রমাথি'—কারও কথা মানে না এ, কারও কথা শোনে না এ। এই চঞ্চল মনকে আমি কি করে নিগ্রহ করব আমাকে দয়া করে বল। কৃষ্ণ কি উত্তর দিচ্ছেন?—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।।

মন চঞ্চল, তা তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু এই চঞ্চল মনকে সংযত করতে হবে অভ্যাসযোগের দ্বারা। তাহলে তোমার সব হয়ে গেল। অভ্যাসযোগ গ্রহণ কর তুমি। এই অভ্যাসযোগ মানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভক্ত্যঙ্গ যাজন। সেই কথাটা বলা আছে। এর ভিতরে আরও একটা কথা বলা আছে। 'বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'। অভ্যাসযোগ একটা, আর একটা বৈরাগ্যযোগ। বৈরাগ্যযোগ মানে খাওয়া-টাওয়া কমিয়ে দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, প্রায় তাই। যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু গ্রহণ করবে। যদি তুমি বেশী খাও, তাহলে High pressure, আর যদি কম খাও তাহলেও Low pressure। দুটোই খারাপ। বুঝে-সুঝে চল।

সংসারে আছি আমরা, মিলে মিশে চলব। Co-existence—সকলকে মিলে-মিশে চলতে হবে আমাদের। Equal distribution। শাস্ত্রে ত' আছে কথা, হচ্ছে কি এগুলো? হয় কি? কেন হয় না? মানুষ নেই বলে হয় না। মনুষ্যরূপধারী কিছু লোক আছে, খাঁটী মানুষ যদি থাকে, তাহলে Equal distribution ত' হবে। বাস্তবে নাই ত' সেটা। পার্টিবাজী এসে গেল। সেখানে সবই Partiality। আমার দল বাঁচুক, আর সব মরে যাক। আত্মধর্ম্মেতে কি এসব কথা আছে? ধর্ম্মজগতে এসব কথা নেই। এগুলো সব Politics—রাজনীতি। রাজনীতি মানে কূটনীতি—কোটনামি। তারদ্বারা ভাল কি পাব আমরা? ধর্ম্মনীতিতে ওসব কথা নেই। যা হবে, ভাগ করে খাও সবাই মিলেমিশে। রাজনীতি এসব কথাগুলো ধার করে বাজারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বলছে। ও কথাগুলো রাজনীতির কথা নয়, ধর্ম্মনীতিরই কথা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৪ পৃষ্ঠার পর]

হুস্টন ও বার্মিংহামের ধর্ম্মসভার একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। হুস্টনের ধর্ম্মসভার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহাম ধর্ম্মসভার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতেছে। ১৪।৬।২০০৩ তারিখে Custard Factory (an Art & Media Centre in Central Birmingham) এ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।—

1. The lord Mayor John Alden & the lady Meyoress of Birmingham,

2. Mr. Sapra—The Consular General of India, Birmingham,

3. Mr. Omprakash Sharma—MBE The President of The Hindu Council of Temples, U.K. & Trustee of the National Interfaith Centre,

4. Md. Imtiaz Ahmed, Md. Tahir Selby, Md. Baseer Rehan—Ahmadiya Muslim Association, Walsall,

5. Dr. Chris Hewer–The Church of England, Birmingham Diocese,

6. Elder & sister Hunter—The Church of Jesus Christ of late day saints (Mormons),

7. Susan Halliday—Interfaith peace Worker.

এতদ্ব্যতীত The Asia Voice এবং Jagatwani Newspaper এর সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল মহারাজ সর্ব্বপ্রথম বার্মিংহামের মেয়র Mr. John Alden-কে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। মেয়র সর্ব্বপ্রথমে বার্মিংহাম মহানগরীতে আসিবার জন্য শ্রীল মহারাজকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বার্মিংহাম ইংল্যাণ্ডের একটী প্রধান মহানগরী। এই মহানগরী শ্রীল গুরুদেবের মহান বিভূতিকে স্বাগত করিয়াছে। অবশেষে তিনি বলেন,—বার্মিংহাম বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়ে এক মহান্ সাংস্কৃতিক মহানগরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া আপনার ন্যায় মহাবিভূতির উপস্থিতিতে আজ এই মহানগরী গর্ব্বিত। হে গুরুদেব! এখানে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাকে আজ এই মহতী সভায় আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় বক্তা Mr. Sapra—The Consular General of India প্রথমেই শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কৃপা ভিক্ষা করেন। তিনি বলেন,—ভারত

সরকারদ্বারা এখানে কর্ম্মরত হইয়া বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমি শ্রীল মহারাজের দর্শন ও হরিকথা শুনিবার জন্য ধর্ম্মসভাতে যোগদান করিয়া থাকি। শ্রীল মহারাজ প্রকৃত সুখ-শান্তির বার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আজ এই জনসমুদ্র দেখিয়া ভারতীয় হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। প্রতি বৎসর বার্মিংহামে আসার জন্য শ্রীল মহারাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা সমাপন করেন।

তৃতীয় বক্তা Mr. Omprakash Sharma শ্রীল মহারাজের চরণস্পর্শ করিয়া বলেন,—শ্রীল মহারাজ বর্ত্তমান বিশ্বে বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুভবী ও অভিজ্ঞ সন্ত মহাপুরুষ। বর্ত্তমান বিশ্বে এইরূপ মহাপুরুষ কমই দেখা যায়। তিনি সংক্ষেপে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন,—সিন্ধুনদের তীরে বসবাসকারিগণকে বিদেশীরা হিন্দু বলিয়া ডাকিত, তাহাদের আচরিত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই লোকে জানিত। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে ধর্ম্ম ত' সমস্ত বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভগবান্‌দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই বিশ্ব ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। সমগ্র বিশ্ববাসী আমরা একই পরিবারভুক্ত। অবশেষে শ্রীল মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা সমাপনান্তে শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণস্পর্শ করিয়া কৃপা ভিক্ষা করেন।

চতুর্থ বক্তা Muslim Community-র Md. Imtiaz Ahmed শ্রীল মহারাজকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ প্রদানান্তে বলেন,—এই বিরাট সভাতে যোগদান করা সৌভাগ্যের বিষয়। এই সভাতে আসিয়া বিভিন্ন লোকের রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যায় এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে Barrier—বাধা, তাহা দূর করা যায়। বাধা একে অপরকে ঘৃণা করিতে শিখায়। একবার Muslim Community-তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়,—"Love for all, hatred for none". এই সভাতে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

পঞ্চম বক্তা Dr. Chris Hewer বলেন, আমি ইংল্যাণ্ডের সমস্ত চার্চ-এর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া শ্রীল মহারাজকে স্বাগত করিতেছি। ইংল্যাণ্ড ও সমস্ত ইউরোপবাসীর জানা প্রয়োজন কিভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভাষাভাষীর সঙ্গে বসবাস করা যায়। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে, আমরা অতীতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভাষাভাষীর কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। শ্রীল মহারাজের নিকট হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভাষাভাষীর সহিত কিভাবে পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া সুখে-শান্তিতে থাকা যায়, তাহা আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিব।

পরবর্ত্তী বক্তা Mr. Elder Hunter বলেন,—আমি পশ্চিম ইউরোপের চার্চের প্রতিনিধি হইয়া শ্রীল মহারাজকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমরা বহুদিন হইতে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত। যদিও সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাঁহাদের আচার-আচরণ আমাদের অধিকারের বাহিরে, তথাপি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত হইতে এইটীই বুঝিয়াছি যে, "Universal language of love is peace devotion and respect." শ্রীল মহারাজের মধ্যে এই গুণগুলি জাজ্বল্যরূপে বিদ্যমান অথবা উনি এই সকল গুণের মূর্ত্ত প্রতীক। তাঁহার ন্যায় অতুলনীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের চরণসান্নিধ্যে বসিয়া নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

সর্ব্বশেষ বক্তা Mr. Susan Halliday বলেন,—অদ্যকার মহতী সভায় আসিয়া নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করি ও শ্রীল মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মসমাবেশে উপস্থিত থাকিতে ভালবাসি, কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কোথাও একত্রিত হইলেই শান্তি-বার্ত্তার সূচনা হইয়া থাকে।

অতিথিগণের ভাষণের পর শ্রীল মহারাজ সকলকে মাল্য প্রদান করেন ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও জৈবধর্ম্ম দিয়া অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল মহারাজ বলেন,—বার্মিংহামের ন্যায় মহানগরীতে এইরূপ বৃহৎ ধর্ম্মসভার আয়োজন করার জন্য আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত এই কারণে যে, এই মহানগরীর মেয়র স্বয়ং এখানে উপস্থিত। মেয়রের উপস্থিতি অর্থাৎ বার্মিংহামের সমস্ত নাগরিকের উপস্থিতি। ভারতের Consulate General-এর উপস্থিতি মানে এই মহানগরীর সকল ভারতীয়গণের উপস্থিতি এবং ওমপ্রকাশ শর্ম্মার উপস্থিতি সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপস্থিতি প্রতিপন্ন করে। এখানে খৃষ্টান, মুসলিম ও শিখ প্রতিনিধির উপস্থিতিও অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

'Universal unity in diversity' শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি বিশেষভাবে সাপরাজী ও শর্ম্মাজীর প্রশংসা করি। আমি নিশ্চিত যে, শর্ম্মাজী ভারতীয় বাঙ্ময় বেদ সম্বন্ধে কিছু অনুশীলন করিয়াছেন। একথা সত্য যে, বেদে কোথাও হিন্দু-শব্দের উল্লেখ নাই। শাশ্বতধর্ম্ম এক, দুই নহে। অনেকে মনে করেন বা আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমরা সঙ্কীর্ণচেতা। কিন্তু বাস্তবে তাহা সত্য নহে। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা সকলেই একই ভগবানের পরিবারভুক্ত। অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র মনুষ্যগণই ভগবানের সন্তান, অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালা নহে। আমরা কেবল মনুষ্যগণকে ভালবাসিব, অন্য কাহাকেও নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পশুপক্ষী আদি সকলেই ভগবানের সন্তান, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। বেদের ন্যায় কোরাণ ও বাইবেলেও বহু সদুপদেশ আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

আমাদের অন্ধ স্বার্থের জন্য সেইসকল সদুপদেশের অবহেলা করিতেছি। পূর্ব্বে কোন বক্তা বলিয়াছেন,—'God is love and love is God'. বেদে বলা হইয়াছে,—'সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু' অর্থাৎ সকলেই সুখী হউক। কেবলমাত্র মনুষ্যই সুখী হউক, তাহা বলা হয় নাই। সৃষ্টির সকল স্থাবর-জঙ্গমের সুখের জন্য বলা হইয়াছে।

আমরা সকলেই একই ভগবানের সন্তান, তথাপি আজ পরস্পরের মধ্যে এত মতানৈক্য কেন? আমরা প্রকৃত Love and affection এর অর্থ না জানায় পরস্পর ঝগড়া-মারামারি করিতেছি। এইজন্যই বেদে কলা হইয়াছে 'সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু।' ভগবান্ এক, দুই নহে। ব্রহ্ম, God, আল্লা একই, কেবল বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষানুসারে বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষানুসারে ভগবান্‌কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইলেও The teachings of all scriptures are basically same, কিন্তু ভজন-বিষয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একমাত্র বেদই পূর্ণ। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমি বেদের কথা উল্লেখ করিয়া সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতেছি। এরূপ যাহারা মনে করেন, তাহারা নিতান্তই সাম্প্রদায়িক, তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিশ্বের সকল ভাষার জননী বা উৎপত্তিস্থল সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষানুসারে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান বা Knowledge। কি জ্ঞান? আমি কে? ভগবান্ কে? ভগবানের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? এই জগতে আমরা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছি কেন? এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এই জড় শরীর কি? আমরা এই জড় শরীর নহি, আত্মা—ভগবানের অংশ। জীবজগৎ ও জড়জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তির পরিণতি। আমরা ভগবানের অংশ হইয়াও নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেছি ভগবানকে ভুলিয়া যাইবার জন্য। ভগবানের ভজন করিলে সকলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে পারিবে। এইসকল জ্ঞান বেদে পাওয়া যায়। অন্য কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল জ্ঞানের কথা বলা হয় নাই বলিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় বাঙ্ময়কেই বেদ বলা হয়।

আমরা সকলেই একই ভগবানের সন্তান, অথাপি আমরা পৃথিবীকে বিভক্ত করিয়া বলিতেছি—এইটী আমার দেশ, ওইটী তোমার দেশ। তুমি আমার দেশে আসিতে পারিবে না। সূর্য্য এক, চন্দ্র এক, বায়ু এক, অতএব আমরা সকলেই একই ভগবানের সন্তান। ইহার নাম 'Unity in diversity, diversity in unity'. জগদ্বাসী অধিকাংশই অর্থলোলুপ ও পদলোলুপ হইয়া দিন কাটাইতেছে। তাহারা মনে করে এই পদ (Position) বা অর্থদ্বারা আমরা সুখী হইব, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজ আমরা যে পদমদে, অর্থমদে, সৌন্দর্য্যের মদে, যৌবনের মদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি, ৫০-৬০ বৎসর পরে এই

সকল মদগর্ব্ব কোথায় থাকিবে? লাঠির সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে পারিবে না, কিছু-দিন পরে মরিতে হইবে। জগতের সকল বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার মিলিয়াও বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে দূর করিতে পারিবে না। এই জগতে সারাজীবন আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, উক্ত বস্তু আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি সত্য সত্যই আমরা ভগবদ্ভজন করি, তাহলে কেবলমাত্র ভগবান্‌ই আমাদের রক্ষা করিতে পারেন। ভগবদ্ভজন ব্যতীত কেবলমাত্র অর্থ সংগ্রহের দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের একটী উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি।—

প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য-নামে এক ঋষি ছিলেন। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী-নামে তাঁহার দুইজন পত্নী ছিলেন। মহারাজ জনকের সভাসদ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া অনেক গোধন ও স্বর্ণ উপার্জ্জন করিয়াছি। তোমাদের দুইজনের পুত্ররত্নও বিদ্যমান। তোমাদের দুইজনকে অর্থসম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতেছি। এখন তোমরা প্রসন্নচিত্তে আমাকে বনে গিয়া ভগবদুপাসনা করিবার অনুমতি দাও। কাত্যায়নী প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন,—আপনি আপনার পত্নীগণের সঙ্গে থাকিয়া যে পুত্ররত্ন, পদমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, যাহার জন্য সমগ্র জগৎ অর্থলোলুপ ও পদলোলুপ হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত হইতেছে, তদ্দ্বারা কি প্রকৃত সুখ লাভ হইবে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছেন কেন? ইহা শুনিয়া ঋষিবর বলিলেন,—অহো মৈত্রেয়ী! তুমিই আমার যথার্থ পত্নী। তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াই যথার্থ আনন্দ প্রদান করিয়াছ। একমাত্র ভগবানই আনন্দময়। তিনিই আনন্দের মূর্ত্তবিগ্রহ ও আনন্দের আশ্রয়। তাঁহার ভজন ব্যতীত কেহই প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—'রসো বৈ সঃ', 'ভূমৈব সুখম্', 'নাল্পে সুখমস্তি'।

এই ভগবানকে অনেকে আবার নিরাকার মনে করেন। তাহাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নিরাকার-শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করিলেই ত' বিষয়বস্তু পরিষ্কার হইয়া যায়। নিঃ + আকার = নিরাকার। 'আকার' মৌলিক শব্দ, 'নিঃ' উপসর্গ মাত্র। নিরাকার অর্থাৎ 'নির্গত প্রাকৃত আকার যস্য সঃ' অর্থাৎ যাহার প্রাকৃত আকার দূর হইয়াছে বা প্রাকৃত আকাররহিত, অপ্রাকৃত আকারযুক্ত। বেদাদি শাস্ত্রে ইহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আমি বাইবেল পড়িয়াছি, কোরাণের অনুবাদ পড়িয়াছি। বাইবেলে দেখিয়াছি —"God created man after his own image". ভগবান্ নিজের রূপ অনুসার মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টান ভাইরা বাইবেলের প্রথম অধ্যায় হইতে এই বাক্যটীকে বাদ দিতে পারিবেন কি? কখনই নয়। কোরাণেও দেখা যায়,—'ইন্নাল্লাহা খালাকা মেন সুরত হি।" আল্লা নিজ রূপ অনুসার বান্দা অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমান ভাইরা কি কোরাণ হইতে এই বাক্যটীকে বাতিল করিতে

পারিবেন? অসম্ভব। ভগবান্ হইতে বিমুখ হওয়ার জন্য আমরা দুঃখ ভোগ করিতেছি, সুখ পাইতেছি না। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে ভগবানের ভজন করিতে হইবে, প্রাণীমাত্রকেই ভালবাসিতে হইবে। অনেকে মনে করেন, জগতের সকল বস্তু মনুষ্য-গণের ভোগের জন্য। সকল বস্তু খাইবার জন্য ভগবান্ সৃষ্টি করেন নাই। গাভীকে গোমাতা বলা হয়। গোমাতা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে দুগ্ধ প্রদান করেন। গাভীকে মারিয়া খাওয়া এবং গর্ভধারিণী মাকে কাটিয়া খাওয়া একই ব্যাপার! শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি।।

অর্থাৎ যাহারা দেবে অর্থাৎ দেবতায়, বেদে, গাভীতে, ব্রাহ্মণে, সাধুকে, ধর্ম্মে ও ময়ি অর্থাৎ ভগবানে বিদ্বেষভাব রাখে, তাহারা অবশ্যই শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

কোরাণে কোথাও গোবধ করিয়া ভক্ষণ করিবার উল্লেখ নাই। বাইবেলের Old Testament-এ এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তিকালে রোমান্ ক্যাথলিকেরা মূল বাইবেলের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। যেমন বাইবেলের Aramaic ভাষায় 'Brosimus' শব্দ বিংশতিবারেরও অধিক ব্যবহার করা হইয়াছে। Brosimus অর্থাৎ food। কিন্তু বর্ত্তমানে Brosimus—Food-এর পরিবর্ত্তে meat অর্থ করিয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কিছু আধুনিক মুসলমানেরাও মনে করেন, মুসলমান ধর্ম্ম বিশ্বাস না করিলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। মুসলমান একমাত্র ধার্ম্মিক, আর বাকী সব 'কাফের'। এইরূপ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এইরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য ভাল-বাসিতে হইবে, তবেই বিশ্বশান্তি সম্ভব।

অবশেষে শ্রীল মহারাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস প্রভুকে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দেন। কৃষ্ণদাস প্রভু নিজ স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কীর্ত্তনের দ্বারা সবাইকে নৃত্য করান। কীর্ত্তনান্তে জয়ধ্বনি প্রদানপূর্ব্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মেয়র মহো-দয়ের অন্য অনুষ্ঠান থাকায় তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যান। অন্যান্য সকল বক্তা মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া শ্রীল মহারাজের ও সভার গুণগান করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করেন।

জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে 'শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ও তাহার রহস্য, শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীহেরাপঞ্চমী' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। স্পেনে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত প্রচারসূচী অনুযায়ী বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ভিয়েনায় প্রচার-পূর্ব্বক ৯।৭।২০০৩ তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪১০ ; ১৭ আগষ্ট, ২০০৩

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৭ পদ্মনাভ, অনিরুদ্ধ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪১০, ইং ১৭/৯/২০০৩ { ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য চতুর্থ-দশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—৩১-৪০]

অহোঽতিধন্যা ব্রজ-গো-রমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যৎ-তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥১॥

হে বিভো, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, অহো! সেই আপনি গো-বৎস এবং গোপ-বালকগণের রূপে আনন্দে যাহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন, সেই ব্রজ-গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য ॥২॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২॥

পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র সেই নন্দগোপ-প্রমুখ ব্রজ-বাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য ॥২॥

এষান্তু ভাগ্য-মহিমাচ্যুত! তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরি-ভাগাঃ ।
এতদ্ধৃষীক-চষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বদয়োঽঙ্ঘ্র্যদজ-মধ্বমৃতাসবং তে ॥৩॥

হে অচ্যুত! এই ব্রজ, গোপ, গোপী এবং গো-সমূহের সৌভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র প্রভৃতি এবং আমি মহাভাগ্যবান্, কেননা, আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধু-স্বরূপ অমৃত-মদ্য পান করিতেছি ॥৩॥

তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি-রজোভিষেকম্ ।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎ-পদরজঃ শ্রুতি-মৃগ্যমেব ॥৪॥

অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব, সেই গোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্ম মহাভাগ্যেই হইয়া থাকে ॥৪॥

এষাং ঘোষ-নিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি ।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্ম-তনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥৫॥

হে দেব, পূতনা সাধু-চরিত্রের অনুকরণ মাত্র করিয়া অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহাদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজপ্রিয়-দ্রব্য, দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির নিমিত্ত, সেই এই ব্রজবাসীদিগকে আপনি কি প্রদান করিবেন? সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কোথায় আছে? ইহা বিচার করিয়া আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে ॥৫॥

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ! ন তে জনাঃ ॥৬॥

হে কৃষ্ণ, যে-পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত রাগাদি তস্কর, গৃহ-কারাগার এবং মোহ পাদ-শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে ॥৬॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥৭॥

হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি বর্দ্ধনকল্পে প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ॥৭॥

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৮॥

হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যে-সকল পণ্ডিতাভিমানি-ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়-মনো-বাক্যের গোচরীভূত নহে ॥৮॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥৯॥

হে কৃষ্ণ, আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন । আপনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং সমস্তই অবগত আছেন । আপনি জগতের ঈশ্বর, অতএব মমতাস্পদ এই বিশ্ব এবং এই নিজ শরীর আপনার নিকট অর্পণ করিলাম ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ! বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-জোষ-দায়িন্
ক্ষ্মা-নির্জ্জর-দ্বিজ পশূদধি-বৃদ্ধিকারিন্ ।
উদ্ধর্ম্ম-শার্ব্বর-হর ক্ষিতি-রাক্ষস-ধ্রুগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥১০॥

হে কৃষ্ণ, আপনি বৃষ্ণিবংশরূপ কমলের আনন্দদায়ক সূর্য্য এবং ভূমি, দেব, দ্বিজ ও পশুগণরূপী সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী চন্দ্রদেব । আপনি পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ নৈশান্ধকার নাশ এবং পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্য জনগণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন । হে ভগবন্, সূর্য্যাদি নিখিল বস্তুর পূজনীয় আপনাকে আকল্প অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি ॥১০॥

অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান

জড়জনিত কর্ম্ম ও প্রাকৃত গুণ শুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না

জ্ঞানও পরমার্থ সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত, জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায় অজড়তা সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত-নিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু

জড়াশ্রিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য-ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টা-দ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা করত প্রকৃতির সমস্ত সত্ত্বা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্ম-সমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পত্তির সাধন করিতে হয়।

ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল দুঃখজনক

যেকাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান থাকে সেকাল পর্য্যন্ত শারীর-কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞান-বাদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞান। ব্রহ্ম-জ্ঞানদ্বারা আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। এই প্রকার সাধনটী ভগবৎ-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ভগবদগীতায় ভক্তির উদ্দেশ্যে ভগবান্ কহিয়াছেন ;—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। (গীতা ১২।৩-৫)

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্‌কেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের 'জ্ঞান-মার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধজীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি গতি দুঃখজনক হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্য—ভগবৎ-জ্ঞানে পর্য্যবসান

এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনদ্বারা জীবের জড়-বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদ্গত বিশেষ নির্দ্দিষ্ট-ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড় জগতের ভাবসকল নর-সমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথম অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়-যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধি-চক্ষে

বৈকুণ্ঠস্থ 'বিশেষ' দেখিতে পান। তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া আধ্যাত্মিক নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞানটী ভগবৎ-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবৎ-জ্ঞানোদয় হইলে, তদ্রহস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। **অতএব পরমার্থ প্রাপ্তির সাধক-রূপ জ্ঞান, অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট আছে।** ভগবৎ-জ্ঞানালোচনা করিলে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতা প্রয়োজন-রূপা বিশুদ্ধা প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞানের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থাদ্বয়

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবৎ-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই **অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান**। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ।

জ্ঞানের অজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা

প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবৎ-জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবৎ-বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাবসকলকে ব্রহ্মবোধ করেন। ইহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে যথা,—

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্।।
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদি-মধ্য-নিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্।।
অমুনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ।। (ভাঃ ২।১০।৩৩-৩৫)

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল-রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্ম রূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিতসকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ উভয়ই অজ্ঞান-জনিত ও পরস্পর বিবদমান।

জ্ঞানের অজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা

যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব

পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই **অতিজ্ঞান-জনিত** চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না ; যথা ভাগবতে দশমস্কন্ধে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞান-জনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরম ফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-মুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞানবশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন।

অতিজ্ঞান-বাদের খণ্ডনে চারিটী সদ্‌যুক্তি

সদ্‌যুক্তি দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মা সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেননা, এমত অসৎ সত্ত্বার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীন-তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধন-রূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্ত্বা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় ; ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ঘটে না।

মায়াবাদ-শতদূষণী গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিচারে ক্রম-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে তত্তৎ সম্প্রদায় বিরোধ থাকে না। আদৌ আত্মার 'বেদন'-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটী ব্যাপ্তি। ১ । বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি। ২। রসানুভবাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান, উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক ও আস্বাদ্যগত যে একটী অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতি-রূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি

হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। জ্ঞান-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করত সম্পূর্ণ আনন্দ-বর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—দূরে থাকিয়া বা গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কি করিয়া সম্ভব হইবে?

উঃ—আমাদের মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবারত। সেই সেবা-প্রাণ ভক্তগণের সঙ্গ আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বতোভাবে করণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সেই স্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সব স্থান বা তাদৃশ সঙ্গ আমার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় মঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা ও হরিসেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথাই চিন্তা করি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবেন। আমাদের যদি হরিকথায় রুচি ও হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হ'লে তাহাই আমাদিগকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিবে। সর্ব্বদা পারমার্থিক পত্রিকা ও মহাজনগণের গ্রন্থাদি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাভিক্ষা করিয়া নিজে নিজে আলোচনা করিলে তদ্দ্বারাই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ হইবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই। আমরা যদি ভগবৎ-কথার মধ্যে এখানে বাস করি, তাহা হ'লে আমাদের মঙ্গল অবশ্যই হ'বে এবং কোন অসুবিধাই আমাদের কিছু করিতে পারিবে না।

ভগবদিচ্ছায় আমরা যেখানেই থাকি, সেখানে যদি আমরা ভগবৎকথা আলোচনা করি, তাহা হইলে সাংসারিক সকল কথা ও সকল কার্য্যের মধ্যেই আমরা ভগবানের কৃপা, ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা অনুভব করিতে পারিব।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

ভগবান্ ভক্তগণকে যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থাতেই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

সাধুসঙ্গ ও হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়ে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে ভগবানের কৃপা লক্ষ্য করিলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল—এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে শুদ্ধভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সব সময় সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ না হ'লেও আমরা যদি গ্রন্থালোচনা মুখে হরিকথা শ্রবণ করি, তা' হ'লে আমরা আর সৎসঙ্গের এত অভাব অনুভব করিব না।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন আর ভগবদ্‌বিদ্বেষী অভক্তগণ ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না।

আমরা মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পর-ক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রমত্ত হইবার ইচ্ছা প্রবল হইলেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখ বর্ত্তমান, কিন্তু হরিসেবা ভগবানের আনন্দবিধান করে। এজন্য আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিব।

প্রঃ—বৈষ্ণবসঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। গুরুর সঙ্গ ও গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিলে অযোগ্য আমরা সদাচার, গুরুসেবা প্রভৃতি শিখিব কি করিয়া? সম্মুখে আদর্শ সবসময় দরকার। গুরুনিষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করলে আমাদের গুরুনিষ্ঠা, গুরুতে আপন-জ্ঞান, গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, গুরুসেবা করার প্রবৃত্তি হইবে না। কিভাবে গুরুসেবা করিতে হয়, কিভাবে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হয়—এসব কথা যদি নিষ্কপট গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব আমাদিগকে জানাইয়া না দেন, তাহা হইলে সদ্‌গুরু পাইয়া প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ফেলিতে হয়, গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

প্রঃ—ভগবানের সকল ব্যবস্থাই কি সানন্দে শিরোধার্য্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। মঙ্গলময়ের সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলময়ী। মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গল নাই বা থাকিতে পারে না। দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

the best. ভগবান্ যাহা করেন তাহা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। এখন ভগবানের দয়া দেখিতে শিখিলেই মঙ্গল।

ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন বা যেভাবে রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি ; আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎ-কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় সংসারের উন্নতি, সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ চিন্তা থাকে না। ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।

প্রাক্তন-কর্ম্মফলে আমরা কখন সুস্থ, কখন অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমরা তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎকালে নিজপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। এইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন ভক্তগণ 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমাদের তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়। 'কৃষ্ণের সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ'—এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের, তাহা অনুসরণ করার জন্য যত্ন করা প্রয়োজন।

প্রঃ—বৈষ্ণবের কি অশৌচ আছে?

উঃ—না। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্তগৃহই হউন, তাঁহার কোন অশৌচ নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণাদি সমাধা হয়। এজন্য ভক্তগণকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ হরিনাম গ্রহণে নিত্য শুচি হইয়া একাদশাহে বা যে কোনও দিন মহা-প্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—ইহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

প্রঃ—শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা কখন বুঝিতে পারিব?

উঃ—নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনারা সুতরাং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি করতলগত হয়।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেহ শ্রীরূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজের অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হইয়া 'নাম' উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান।

নামসেবা বলিলে নমোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাতেই সব হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামে রুচি হয়।

প্রঃ—কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে?

উঃ—ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়, আমি ইহাই জানি। আপনারা তাহাই করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন।

সংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবান্‌ই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা তাহাই নতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—গুরুসেবা ব্যতীত কি মঙ্গলের কোন আশা নাই?

উঃ—না। যিনি মঙ্গল দান কর্‌তে এলেন, যিনি মঙ্গলমূর্ত্তি, মঙ্গলদাতা ও জীবের একমাত্র আশ্রয়, সেই মঙ্গলকে বাদ দিয়া মঙ্গল কি ক'রে হ'বে? শ্রীগুরুদেব ত' বৈকুণ্ঠাগত মহাজন—ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ, তাঁর আশ্রয় ও সেবা ছেড়ে—তাঁর সঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা কি ক'রে বৈকুণ্ঠে যাব? গুরুকৃপাই ত' সকল মঙ্গলের মূল। সেই কৃপা লাভের জন্য কি যন্ত কর্‌লাম যে কৃপা পাব? আমি তাই আমার অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার বিধান করছি। 'আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা'—এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। এইজন্যই মন্ত্রে নমঃ শব্দ আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

আমি কর্ত্তা—এই দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই দূর হয়। আমি ভগবৎ-সেবক—এই অভিমান শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই জাগে। জাগতিক অভিমান, অহঙ্কার, অবিচার, কুবিচার প্রভৃতি তাঁর কৃপাতেই—তাঁর সেবাপ্রভাবেই অপসারিত হয়। আমি বর্ষে বর্ষে গুরুপাদপদ্ম পূজা কর্‌বার বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম না, গুরুপাদ-পদ্ম-সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য—ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদ্বারাই জান্‌তে পার্‌লাম। অন্ধের অনুগমন না ক'রে চক্ষুষ্মান্ গুরুপাদপদ্মের অনুগমন—গুরুপাদ-পদ্মের পূজা করাই কর্ত্তব্য। গুরুই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয় ও একমাত্র রক্ষক, ইহা আমি তাঁর কৃপাতেই জান্‌বার সৌভাগ্য পেলাম। গুরুপাদপদ্ম দর্শন করার পর আমার গুরুপাদপদ্মসেবা ছাড়া অন্য কৃত্য আছে—এ বুদ্ধি আর নাই। ভগবানের প্রিয়তম সেবক, প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে অহঙ্কারের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ কর্‌বার জন্য দয়াপরবশ হ'য়ে যখন নন্দনন্দনের সেবা জানালেন, তখনই জান্‌তে পার্‌লাম যে, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই—জীবের অন্য কোন মঙ্গল নাই। নন্দনন্দনই জীবের একমাত্র উপাস্য, জীবন, ভূষণ ও সর্ব্বস্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই নন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রিয়তম।

সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা আমার ন্যায় অনিপুণ ব্যক্তি কায়, মন বা বাক্য কোন প্রকার উপকরণদ্বারাই কর্‌তে পারে না। কিন্তু তথাপি দয়ার সাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজগুণে আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, আমাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। এত তাঁর দয়া! আমি যদি তাঁর প্রসাদ লাভ কর্‌তে পারি, তিনি ছাড়া এ জগতে আমার আপন বল্‌তে কেহ নাই, এ সুবুদ্ধি যদি আমার হয় তা'হলে তাঁর অহৈতুকী হার্দ্দী দয়ার দ্বারাই তাঁর সেবা করার যোগ্যতা লাভ কর্‌তে পার্‌ব। স্নেহ-সেবার দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন। যেদিন তাঁর হার্দ্দী কৃপা হ'বে—যেদিন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'বেন, সেই দিনই আমি পরমমঙ্গলের কথা ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ব। তখন গুরু-কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আর কিছুই আমার কাছে বড় মনে হ'বে না—আর কিছু ভাল লাগ্‌বে না। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁর যে শক্তি পরিচালনা করেন, সেই শক্তি গ্রহণ করার সামর্থ্য যাতে হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটে আমরা সেই মঙ্গল অভিলাষই কর্‌ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার তুলনা নাই। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁর প্রেমে বশীভূত, সেই গুরুপাদপদ্মকে দুর্ভাগা আমি অত বড় মনে কর্‌তে পারি না। তথাপি তিনি যে দয়া ক'রেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার সামর্থ্য আমার নাই। তাঁর দয়ার প্রত্যর্পণ করা আমাতে সম্ভবপর হয় না।

প্রঃ—নিষ্কপট গুরুসেবকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হবে?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

উঃ—নিষ্কপট শিষ্য গুরু-দেবতাত্মা হবেন। তিনি গুরুকে দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ একমাত্র প্রীতির পাত্র বলিয়াই জানিবেন। শ্রীগুরুদেব আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁর জীবন, ভূষণ ও সত্তা। গুরু ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভজনে সর্ব্বাবস্থায় তাঁর গুরুচিন্তা—গুর্ব্বানুগত্য। তাই তিনি জানেন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঈশ্বরবস্তু—স্বতন্ত্র বস্তু। শ্রীগুরুদেব অযোগ্য আমার সেবা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি কিন্তু নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁর ঐকান্তিকী সেবা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক্‌ব। তিনি যদি পদাঘাত করেন, তবে জান্‌ব—আমার অযোগ্যতা ; কিন্তু গুরুপাদপদ্ম সত্য। ক্ষণভঙ্গুর বিষয় যেন আমাকে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে—বাস্তব সত্য গুরুপাদপদ্ম হ'তে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ কর্‌তে না পারে। গুরুপাদপদ্ম কৃপা ক'রে আমার সেবা গ্রহণ করুন, আমার যেন কোন দুঃসঙ্গ না হয়—আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

আমি অযোগ্য হ'লেও অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন, এই আমার ভরসা। আমি তাঁর অহৈতুকী দয়ার আশাবন্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর লৌল্যযুক্ত হব।

মর্য্যাদা রক্ষণ সাধুর ভূষণ

নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্য বলিয়াছেন,—

"শর্ব্বরীভূষণং চন্দ্রো, নারীণাং ভূষণং পতি,
পৃথিবীভূষণং রাজা, বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্।"

"রাত্রির ভূষণ চন্দ্র, কারণ চন্দ্রই রাত্রিকে মনোরম করিয়া তোলে। নারীর ভূষণ পতি, কারণ পতিহীনা নারীর অন্য কোন অলঙ্কারই ভূষণস্বরূপ গণ্য নয়, পতিব্রতা নারীর পতিই অলঙ্কার। পৃথিবীর ভূষণ রাজা, রাজা বা প্রশাসকহীন দেশ বা পৃথিবীর কথা অকল্পনীয়। বিদ্যা সকলের ভূষণ, যেহেতু বিদ্যা বিনয় দান করে, বিদ্যা মানুষকে জ্যোতির্মণ্ডিত করে, নীচতা দূর করে।" চাণক্য যে বিদ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জড়বিদ্যা। জড়বিদ্যা কখনও বিনয় দান অথবা নীচতা করে না, পরন্তু জীবকে দাম্ভিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করায়। বাস্তবিকপক্ষে যে কোন ব্যক্তির পারমার্থিক বিদ্যাই ভূষণ হইলে তবেই মঙ্গল, অন্যথায় জড়বিদ্যার ভার বহন করিয়া কি লাভ? সাধুগণই পারমার্থিক বিদ্যার ভূষণে নিজেদের অলঙ্কৃত করিয়া জগতে শোভা বিস্তার করেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

সাধুর অনেকপ্রকার ভূষণের মধ্যে অন্যতম ভূষণ হইল 'মর্য্যাদা রক্ষণ'। 'অমানী মানদ' মন্ত্রে দীক্ষিত সাধু বা বৈষ্ণব যাঁহার যাহা মর্য্যাদা বা সম্মান প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিয়া ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। দৈন্য ও ভগবৎসেবাই সাধুর শোভা বা সৌন্দর্য্য। প্রকৃত সাধু কাহারও দোষানুসন্ধান না করিয়া পৃথিবীর সকল জীবকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" (চৈঃ চঃ)। শাস্ত্রের এই বাণী বৈষ্ণবগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। 'জীবে প্রেমে'র নামে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবানের সেবার যে আদর্শ প্রদর্শনের ছলনা দেখা যায়, তাহাতে জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই মর্য্যাদা হানি হয়। জীবকে ঈশ্বরের আসনে এবং ঈশ্বরকে জীবের আসনে বসাইলে কেহই সন্তুষ্ট হন না। জীব ও ঈশ্বরকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করাই ঘোরতর অপরাধ। খাঁচার মধ্যে পাখীর অবস্থান বলিলে যেরূপ খাঁচাটা পাখী হইয়া যায় না ; তদ্রূপ জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান বলিতে মায়াধীশ কৃষ্ণ স্বতন্ত্রতা হারাইয়া মায়াবশ্য জীবের তালিকাভুক্ত হইয়া যান না, ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। যাহারা ভগবৎসেবাবিমুখ তাহারাই জীবসেবাকেই ভগবৎসেবা মনে করিয়া জগতের লোককে বঞ্চনা করেন। ভগবৎসেবা-উন্মুখতা ও বিমুখতা লইয়াই জগতের সদসদ্ বিচার। যাঁহারা সেবোন্মুখ, তাঁহারা সৎ বা সাধু ; আর যাহারা বিমুখ, তাহারা অসৎ বা অসাধু। অসৎগণ ভগবানের নিকট দণ্ডার্হ, সজ্জনগণ প্রশংসার্হ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি সকলের প্রভু, আর সকলেই তাঁর দাস। তাঁহার সেবা করিলে সকলের সেবা করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা করিতে গেলে দেবতাগণের প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। "ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয় কদাচনঃ" অর্থে দেবতাগণকে দাস অর্থাৎ সেবকের দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া।

সকলের মর্য্যাদারক্ষণকারী সাধু বা বৈষ্ণব মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ আসনে অবস্থান করিবার উপযুক্ত পাত্র। সাধুর মর্য্যাদা বা সম্মান চিরকালই সংরক্ষিত থাকে, প্রলয়েও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই প্রসঙ্গে চাণক্য বলিয়াছেন,—

প্রলয়ে ভিন্ন মর্য্যাদা ভবন্তি কিল সাগরাঃ।
সাগরাঃ ভেদমিচ্ছন্তি প্রলয়েঽপি ন সাধবঃ।।

"প্রলয়কালে সমুদ্রের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রলয়কালে সমুদ্র স্বকীয় মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে, কিন্তু প্রলয়কালেও সজ্জন ব্যক্তির মর্য্যাদা অম্লান থাকে।" কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতিকে মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা যায় না, যেহেতু তাঁহারা অভক্তি-পথাবলম্বী অর্থাৎ তাঁহারা সাধু বা বৈষ্ণব নহেন। যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তাঁহারা সকলেই

অসাধু বা অবৈষ্ণব। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির মর্য্যাদা রক্ষণরূপ কোনপ্রকার ভূষণ থাকিতে পারে না। মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী স্বার্থান্ধ অবৈষ্ণব নিজের আত্মবঞ্চনা-রূপ কুৎসিত রূপকে কপটতারূপ কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও ইহলোক ও পরলোক—উভয়-লোকেই সুখলাভে বঞ্চিত হন।

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩০-১৩১)

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণব-সেনাপতি সনাতন গোস্বামীর বৈধ মর্য্যাদা পালনের প্রতি আদর প্রদর্শন এবং তাঁহাকে আচার্য্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—

মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন??

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩২)

অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অধিকারী ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা অন্যায় ও দণ্ডার্হ। মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ প্রদান করিবার কার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনকালেই অনুমোদন করেন নাই। তাই তিনি জগদানন্দসদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের ভজনে প্রবীণ সনাতন গোস্বামীর প্রতি উপদেশ প্রদানকে সহ্য করিলেন না।

জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।। (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৬)

গুরুর প্রত্যেক সেবকই অপরাপর প্রত্যেক শিষ্যেরই মাননীয় অর্থাৎ সম্মানের পাত্র। গুরুর সেবককে নিজসেবায় নিযুক্ত করা অনুচিত হইলেও গুরুর আদেশ পালনের নিমিত্ত তাহা স্বীকার করা উচিত এবং তাহাতে কোন অন্যায় হয় না।

প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার।।
তাঁহারে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু-আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৪২-১৪৩)

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে সম্মানের সহিত ভিক্ষা প্রদান করা গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। অনেক সন্ন্যাসীর একত্র ভিক্ষায় যথাযোগ্য মর্য্যাদা সংরক্ষণের অসম্ভাবনাহেতু অপরাধের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। তাই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একইসঙ্গে অনেক সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণের পক্ষপাতী নহেন।

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

শাস্ত্রের যে বিধি অনুসারে কমলনয়ন ভগবানকে দর্শন করিতে হয়, সেই বিধির নাম 'মর্য্যাদা'। "দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন" (চৈঃ চঃ মঃ ১২।২১০) পয়ারে ভক্তগণ ভগবানের প্রতি অনুরাগবশতঃ মর্য্যাদালঙ্ঘনপূর্ব্বক যে জগন্নাথ-দেবের নবযৌবন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মানের পাত্রকে অসম্মান করিবার কোন প্রশ্ন নাই। অসম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশ্যই তাহা ধিক্কার দিতেন।

সেবা দুই প্রকার,—স্নেহসেবা ও মর্য্যাদাসেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা, সেইস্থানেই কৃষ্ণকৃপা অতি সহজেই লাভ হইয়া থাকে, আর যেস্থলে মর্য্যাদাসেবা, সেইস্থলে কৃষ্ণকৃপা লাভ সহজ নয়। শ্রীকৃষ্ণকৃপা কেবলমাত্র স্নেহসেবাকেই অপেক্ষা করে।

মর্য্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে।। (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৪০)

পরস্পরের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকাই প্রত্যেক মঠবাসীর কর্ত্তব্য। গুরুদেবের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্র অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি কোন মঠবাসীকেই অনাদর, অপ্রীতি, হিংসা, দ্বেষ, উপেক্ষা ও মৎসরতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। মর্য্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা নিম্নগামিনীও। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেমন ব্রহ্মচারী বা কনিষ্ঠকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যানের দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল কামনা-ময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ কনিষ্ঠগণও প্রীতিময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্ব-স্ব অনুরাগ প্রকাশ করিবেন। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—এই বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত গৃহস্থগণকে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মঠবাসীর কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

অলৌকিক

[১৭]

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভরতপুর-নামক স্থানে বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমাধব মিশ্রের বাস। তাঁহার দুইটী পুত্র। একটীর নাম গদাধর এবং অপরটীর নাম কাশীনাথ। এই গদাধরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত। কাশীনাথের দুই পুত্র—নয়নানন্দ ও হৃদয়ানন্দ। ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দকে গদাধর পণ্ডিতই লালন-পালন করেন এবং তাঁহার নিকটেই তাঁহার লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষা। গদাধরের নিকটেই হৃদয়ানন্দের অবস্থান।

অম্বিকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঠাকুর সেবার জন্য একজন উপযুক্ত সৎ, ভক্তিমান্, সেবাপরায়ণ সেবকের প্রয়োজন। গৌরীদাস মনে মনে ভাবিলেন,—"গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দ খুবই ভক্ত ও উপযুক্ত। তাহাকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে খুবই আনন্দের বিষয় হয়।" এই চিন্তা করিয়া সেই আশায় একদিন তিনি গদাধর পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরকে কহিলেন,—"আমাকে একটী ভিক্ষা দিতে হইবে।" গদাধর বলিলেন,—"বলুন, নিশ্চয়ই দিব।" তখন গৌরীদাস বলিলেন,—"আমার ঠাকুরসেবার জন্য একটী সৎ, ভক্তসেবক প্রয়োজন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দকে যদি আমাকে দেন, তাহা হইলে খুবই উপকার হয়। আমার সেবাকার্য্যটী সুষ্ঠুভাবে চলে।" গদাধর হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে দীক্ষা প্রাদন করিলেন এবং বিগ্রহসেবায় নিয়োজিত করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। হৃদয়ানন্দ খুবই নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি শ্রীগৌরপূর্ণিমা আসিল। গৌরীদাস মহোৎসব করিবেন। হৃদয়ানন্দের উপর সেবাপূজার ভার দিয়া তিনি উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য বাহিরে গেলেন। উৎসবের দিন সমাগত-প্রায়। ভক্তদের নিমন্ত্রণাদি করিতে হইবে এবং উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু গৌরীদাস সেই যে গিয়াছেন, আর ফিরিবার নাম নাই। হৃদয়ানন্দ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব উৎসব করিবেন বাসনা করিয়াছেন ; তাই গুরুদেবের ইচ্ছা-পূরণার্থে তিনি গৌরীদাসের ফিরিবার পূর্ব্বেই ভক্তদের নিমন্ত্রণ এবং উৎসবের সমূহ আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। উৎসবের পূর্ব্বদিবই গৌরীদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃদয়ানন্দ আনন্দের সঙ্গে গুরুদেবকে বলিলেন,—"আপনার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমি উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছি।" তিনি মনে করিলেন গুরুদেব বুঝি খুবই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু বিপরীত হইল। গৌরীদাস

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"কি, তোমার এতই আস্পর্দ্ধা যে, তুমি আমার আদেশ না লইয়াই স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিবশে সমস্ত ব্যবস্থা করিলে। যাও, এখনই এখান হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমার যেখানে ইচ্ছা, তুমি চলিয়া যাও।" হৃদয়ানন্দ প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া গুরুর আদেশ প্রতিপালন-জন্য বাহির হইয়া গেলেন এবং গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। গৌরীদাস মন্দিরে নিজে উৎসব আরম্ভ করিলেন।

হৃদয়ানন্দ স্থানীয় সকল ভক্তকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকল ভক্তই নানা-বিধ দ্রব্যসম্ভার সেবানুকূল্য লইয়া গৌরীদাসের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরীদাস তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আমি ত' আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করি নাই। যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহার নিকট আপনারা এই সব দ্রব্য লইয়া যান।" অনন্যোপায় হইয়া ভক্তগণ হৃদয়ানন্দের নিকট বৃক্ষতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৌরীদাসের কথা জানাইলেন। হৃদয়ানন্দ স্থির করিলেন—গুরুর আজ্ঞাই বলবতী এবং তাহা পালন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। তাই তিনি সেই বৃক্ষতলেই উৎসব আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এদিকে গৌরীদাসও নিজে উৎসব করিতেছিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোগের সময় উপস্থিত। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইবে, এমন সময় মন্দির খুলিয়া দেখা গেল—মন্দিরে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ নাই। গৌরীদাস ভাবিলেন,—হৃদয়ানন্দ নিশ্চয়ই বিগ্রহ লইয়া গিয়াছে। তিনি একটী লাঠি হাতে লইয়া সেই বৃক্ষতলে দৌড়াইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন। দেখিলেন—সেখানে কীর্ত্তন হইতেছে এবং কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার গৌর-নিতাই বিগ্রহ নৃত্য করিতেছেন। গৌরীদাসকে লাঠি হাতে দেখিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন এবং মহাপ্রভু হৃদয়া-নন্দের হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। এই দৃশ্য দর্শনে গৌরীদাস বিমোহিত, চমৎকৃত। তাঁহার দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি শিষ্য হৃদয়ানন্দকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"হৃদয়ানন্দ! তুমি আমার প্রকৃত যোগ্য শিষ্য। তুমি ধন্যাতিধন্য। আজ হইতে তোমার নাম হইল—'হৃদয়চৈতন্য'।" গৌরীদাস পণ্ডিত শিষ্য হৃদয়চৈতন্যকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলেন। গিয়া দেখেন, মন্দিরে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ পূর্ব্ববৎ বিরাজমান।

[১৮]

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পিতার নাম শ্রীকুবের পণ্ডিত ও মাতার নাম নাভা দেবী। শ্রীহট্টের নিকট নবগ্রামে তাঁহাদের বাস। কুবের পণ্ডিত লাউর অধিপতি মহারাজ দিব্য সিংহের মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বনাম ছিল 'কমলাক্ষ'।

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

আবার তাঁহার অপর একটী নাম ছিল 'মঙ্গল'। নাভাদেবী একদিন পুত্রকে কোলে লইয়া শুইয়া আছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার শিশুপুত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী মহাবিষ্ণু। তিনি তাঁহাকে করযোড়ে বন্দনা করিতেছেন। ইহাতে তিনি খুবই বিস্ময় বোধ করিলেন। একদিন কমলাক্ষ তাঁহাকে সমস্ত তীর্থের জলে স্নান করাইবেন বলিলেন এবং শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে হরিনাম করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। উহা গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি মহাতীর্থের জল। মাও সেখানে সত্য সত্যই তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—উপলব্ধি করিলেন এবং ভক্তিভরে সেই জলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। সেইসময় হইতে সেই স্থানের নাম "পনাতীর্থ" হইল। লাউর অধিপতি রাজা দিব্য সিংহের পুত্র কমলাক্ষের সমবয়সী বন্ধু। একদিন কমলাক্ষকে সঙ্গে লইয়া রাজপুত্র তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে গেলেন। রাজ-পুত্র দেবীকে প্রণাম করিলেন ; কিন্তু কমলাক্ষ প্রণাম করিলেন না। ইহা দেখিয়া রাজপুত্র দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বারম্বার বলিলেও তিনি প্রণাম না করায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উপহাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে কমলাক্ষ ভীষণ রাগিয়া গিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই হুঙ্কারে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার আর সংজ্ঞা নাই। এই সংবাদ পাইবামাত্রই রাজা মন্দিরে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র মাটীতে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি খুবই বিচলিত হইয়া গিয়া কুবের পণ্ডিতকে তাঁহার পুত্র কমলাক্ষকে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কমলাক্ষকে কেহই কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দেখা গেল তিনি উইঢিপির মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন। তাঁহার মা নাভাদেবী তাঁহাকে কোলে করিয়া সেখানে আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"রাজপুত্র অহঙ্কারী। সে আমাকে যাহা বলে বলুক, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা বা উপহাস করায় তাহার ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছে।" রাজা-রাণী খুবই অধীর হইয়া পড়িলেন এবং কমলাক্ষকে ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করায় কমলাক্ষ বলিলেন,—নারায়ণের চরণামৃত ইহার মুখে ও মস্তকে দিতে হইবে এবং কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করাইলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ঐরূপ করিতেই রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

দীপান্বিতা, অমাবস্যার দিন, কালীমন্দিরে বিরাট উৎসব। বহুলোকের সমাগম। কুবের পণ্ডিত, নাভাদেবী, কমলাক্ষ সকলেই আসিয়াছেন। কমলাক্ষ কালীকে প্রণাম না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বালক কমলাক্ষ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন,—"একমাত্র গোবিন্দই আমার আরাধ্য।

তাঁহার ভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। গঙ্গা, দুর্গা তাঁহার দাসী। সমস্ত দেবদেবী তাঁহার আজ্ঞাধীন।" এইসব সিদ্ধান্তপূর্ণ কথা শুনিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। কুবের পণ্ডিত পুত্রকে একটীবার মাত্র অন্ততঃ প্রণাম করিতে বলিলে, পিতার আজ্ঞায় যেই তিনি দেবীকে প্রণাম করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই দেবীমূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়া গিয়া প্রচণ্ড শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। কমলাক্ষের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

যাহা হউক, কমলাক্ষ আর সেখানে থাকিতে চাহিলেন না। অগত্যা কুবের পণ্ডিত সে-স্থানের বাস উঠাইয়া শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিলেন। শান্তিপুরে কমলাক্ষ অধ্যাপক শান্তাচার্য্যের নিকট সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষশাস্ত্র, ষড়্দর্শন, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। একদিন শান্তাচার্য্য ছাত্রগণসহ গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। দেখিলেন—গঙ্গার মাঝে একটী সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি ছাত্রগণকে ঐ পদ্মফুলটী আনিতে বলিলে কেহই ঐ অগম্যস্থানে গিয়া আনিতে সাহস পাইলেন না। তখন কমলাক্ষ অনায়াসেই পদ্মফুলটী আনিয়া গুরুকে দিলেন।

পরবর্ত্তিকালে কমলাক্ষ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসেন। তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া পথশ্রান্ত হইয়া যমুনার তীরে এক বটবৃক্ষের তলায় শুইয়া আছেন—নিদ্রাকালে রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন —শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছেন,—"আমার নাম মদনমোহন। ম্লেচ্ছ-ভয়ে আমার সেবক আমাকে এখানে যমুনাতীরে দ্বাদশাদিত্য কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তুমি আমার সেবার ব্যবস্থা কর।" তিনি স্বপ্ন দেখিয়া ভাবে অধীর হইয়া পড়িলেন। কোনরকমে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কুঞ্জ মধ্য হইতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ পাইলেন। সেই বটবৃক্ষতলে পাতার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেবাপূজা আরম্ভ করিলেন। এইভাবে সেবা চলিতে লাগিল। তিনি সেবকের উপর সেবাপূজার ভার ন্যস্ত করিয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় গিয়াছেন, সেইসময় একদিন ম্লেচ্ছরা ঐ শ্রীবিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আসিল। তখন মদনমোহন গোপাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফুলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ম্লেচ্ছরা মন্দিরে বিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গেল। এদিকে পূজারী মন্দির খুলিয়া দেখিলেন—বিগ্রহ নাই। তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া আকুল। মদনমোহন তাঁহাকে স্বপ্নে সমূহ বৃত্তান্ত বলিলে, মন্দির খুলিয়া তিনি সেই গোপাল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তদবধি তাঁহার নাম হইল 'মদনগোপাল"।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

[১৯]

গঙ্গাতীরে চাকন্দি-গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বাস, তাঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী-প্রিয়া দেবী। তাঁহাদের কোন সন্তান নাই। একদিন তাঁহারা শ্রীধাম পুরী গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট পুত্র কামনা করেন। জগন্নাথের কৃপায় তাঁহাদের অনিন্দ্যসুন্দর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। এই পুত্ররত্নটীই হইতেছেন শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। শ্রীনিবাস খুবই ভজনপরায়ণ ছিলেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর গোস্বামিগণের গ্রন্থাবলীর প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যুদলপতি বীর হাম্বির ও তাঁহার স্ত্রীকে ভক্তিপথে আনয়ন করেন।

তিনি তখন বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন ঠাকুরের সেবা-সমাপনান্তে লীলাস্মরণ করিতেছেন। এমন গভীরভাবে লীলারাজ্যে প্রবেশ করিলেন যে তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞান নাই। একইভাবে নিশ্চল অবস্থায় তিনি তিনদিন ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন। আসনে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। সকলে ভাবিলেন—তিনি আর ইহজগতে নাই। তাঁহার নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন নিশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ, দেহে প্রাণ নাই। সকলেই কাঁদিয়া অস্থির। তিনদিন একইভাবে কাটিয়া গেল। সকলে ভাবিলেন, এইসময় যদি তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু রামচন্দ্র ত' তখন সেখানে নাই। তাঁহাকে কোথায় বা পাওয়া যায়? হঠাৎ দেখা গেল রামচন্দ্র নিজে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র গুরুগত-প্রাণ, গুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবক। তিনি সকলকে বলিলেন,—"আপনারা আশ্বস্ত হউন। আমি গুরুদেবকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিব।" এই বলিয়া তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন—তাঁহার গুরুদেব মঞ্জরী-গণের সহিত বৃন্দাবনে যমুনার জলে কি যেন খোঁজাখুঁজি করিতেছেন। রামচন্দ্র তন্মুহূর্ত্তে সেখানে পৌঁছিলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ, দেখ, শ্রীমতীর নাকের বেসর পাওয়া যাইতেছে না।। গতরাত্রে মহারাসের পর যমুনায় জলক্রীড়ার সময় শ্রীমতীর নাকের বেসর জলে পড়িয়া গিয়াছে। তিনদিন আমরা খুঁজিতেছি, কোথাও পাইতেছি না।" রামচন্দ্র ভাবিলেন,—"গুরুদেব ত' বেসর না পাওয়া পর্য্যন্ত এখান হইতে যাইবেন না। গুরুকৃপা সম্বল করিয়া তিনি যমুনার জলে নামিয়া ডুব দিলেন। ডুব দিয়া দেখিলেন একটী পদ্মপত্রের তলায়

বেসরটী পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাহা লইয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য উহা তাঁহার গুরুদেব শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে দিলেন। গোপালভট্ট উহা ললিতাসখীকে দিলেন এবং ললিতাসখী তাহা শ্রীমতী রাধারাণীর নাসিকায় পরাইয়া দিলেন। শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্য নিজের চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুও ঐ তাম্বুল নিজের উত্তরীয়তে বাঁধিয়া লইলেন।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুও তখন হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং সমাধি ত্যাগ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উত্তরীয়তে বাঁধা শ্রীমতী রাধারাণী-প্রদত্ত তাম্বুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। কোথা হইতে এই সুন্দর গন্ধ আসিতেছে? হঠাৎ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর রাধারাণী প্রদত্ত তাম্বুলের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি ঐ তাম্বুল-প্রসাদ রামচন্দ্রকে ও উপস্থিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে দিলেন। সকলেই কৃতকৃতার্থ হইলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

গুর্ব্ববজ্ঞা

গুরুজনগণের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা নীতিশাস্ত্র ও পরমার্থশাস্ত্র সমস্বরে গর্হণ করিয়াছেন। সাধারণ নীতিশাস্ত্রকারগণ মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি দৈহিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং উপদেষ্টৃগণকে গুরুজন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত এবং পুত্র-কন্যাগণের মতিও ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট, সেইসকল মাতাপিতাদি গুরুজনের সেবা আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈহিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণ সংসারাসক্ত জীব হইলে ইঁহাদের কার্য্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় থাকিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের আদেশ যে সকল সময়েই মঙ্গলপ্রসু হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক সময় এরূপ উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে পূর্ব্বোক্ত দেহ-সম্পর্কিত জনগণ জানিয়া-শুনিয়াও অন্যায় আচরণের জন্য তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। পুত্র যদি ভগবদ্ভজনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বেশ্যাসক্ত করিবার জঘন্য প্রবৃত্তিও কোন কোন পিশাচবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা নিষেধ করিয়া শাস্ত্র

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

অন্যায় আচরণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের আদেশ নহে। সুতরাং যেস্থলে অন্যায় আচরণের জন্য আদেশ আসে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় নহে। আমরা এইপ্রকার উদাহরণও কয়েকটী দেখিয়াছি, যাহাতে ভগবদ্ভজনে জীবনযাপনের জন্য সাধুগণের পদাশ্রয়কারী সন্তানগণকে তাহাদের অভিভাবকগণ গৃহে ভজনের যাবতীয় সুবিধা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াও গৃহে লইয়া গিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে গৃহমেধীয় কার্য্যের জন্যই উপদেশ দিয়াছেন এবং ভগবদ্ভজন বাদ দিয়া সংসারাসক্ত করিয়া আত্মীয়ের বেশে শত্রুতার চরম নিদর্শনপূর্ব্বক স্বজনাখ্য-দস্যুতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখাইয়াছেন। বলাবাহুল্য, যাহারা অন্যায় আচরণের জন্য প্ররোচিত করে তাহাদের আদেশ পালন করিলেই গুর্ব্বব্জ্ঞা হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত গুরুজন তাঁহারা কখনও অন্যায় আদেশ করিতে পারেন না।

সন্তান-সন্ততিগণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই জনকের তাহাদের প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যবশে পুণ্যভূমি ভারত হইতেও ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের সেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে জনক-জননীগণ ভগবানের আসন গ্রহণপূর্ব্বক নিজসেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অনেকসময় শ্লোক উচ্চারণ করেন,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।।

এই শ্লোকোদ্দিষ্ট পিতা যে জগৎপিতা এবং "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" শ্লোকের শিক্ষানুযায়ী জগৎপিতার সেবা করিলেই যে সকলের সেবা হইয়া থাকে, আধিকারিক দেববৃন্দের বা দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়গণের পৃথক্ সেবা না করিলেও যে কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না, একথা অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞা পাপ ও অপরাধ উভয়ই। গুর্ব্বব্জ্ঞা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবের করুণা বর্ণন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

যাঁহার প্রথিতকৃপায় আমি শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও রাধামাধবের ভজন পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আমি প্রণত হইতেছি।

নিখিলশাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুগণও তাঁহাকে সেই ভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন। এই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবদনুগ্রহলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। এই সারগর্ভ উপদেশ আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট বিশেষরূপে পাইয়া থাকি। এহেন গুরুপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে যে অনন্ত নিরয়ের ভাগী হইতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

গুরুর অসম্মান ভীষণতম অপরাধ এবং নিষ্ঠুরতম কার্য্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ-পালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলেও গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহিরে কপটতা-মূলে শরণাগতির ভাব, অন্তরে গৃহাসক্তির নঙ্গর দৃঢ়বদ্ধ রাখা এবং যথাসাধ্য শ্রীগুরুসেবা হইতে বিরত থাকাও গুর্ব্ববজ্ঞারই অন্তর্গত নহে কি?

অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমা-দিগকে দিব্যজ্ঞান—নিত্যানন্দধামের নিত্যসেবা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দপ্রদ নিত্যসেবাপ্রদানে সচেষ্ট, ব্রজধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সতত যত্নপর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ প্রমুখ আচার্য্যবর্য্য-গণের শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অনন্ত প্রয়াসবিশিষ্ট, এহেন পরমতম আত্মীয়ের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যদি আমরা ত্যক্ত-গৃহ হইয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পশ্চাদ্ধাবন করি অথবা গৃহে থাকিয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মেরই বহুমানন করি, সংসারাসক্তিতে বদ্ধ থাকিবার জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করিতে যত্নবিশিষ্ট হই, এবং আমার অন্যায় কার্য্যাদির জন্যও ভগবান্‌কে ও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দায়ী করিতে যত্নবিশিষ্ট হই তাহা হইলে কি আমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইবে, না নিজের অহিত-সাধনদ্বারা মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করা হইবে মাত্র।

হে বন্ধুগণ! আমরা ত' সকলেই মঙ্গলপ্রার্থী—সকলেই ত' আনন্দপ্রার্থী ; ঐ আনন্দলাভের জন্যই ত' আমরা ইতঃস্তত ছুটাছুটী করি, কিন্তু জগতের প্রাত্যহিক ঘটনা কি আমাদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইতেছে না—এ পথে সুখ-মরীচিকা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখ নাই, সুতরাং এদিকে প্রধাবন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ও শ্রমপর মাত্র। আমরা ত' প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষবাদী ; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ঘটনায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কে—সুখশান্তিপ্রদানে অক্ষজজ্ঞানের নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় কই? হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুবর্গ! আসুন আমরা "আর নারে বাপ" বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক আবেগভরে কীর্ত্তন করি—অভয়, অশোক, নিত্যকল্যাণপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করি,—

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা ।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষু-দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ।
প্রেম-ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যা'তে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥

'গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন'

কেদার ঘোষাল ধনীর দুলাল
অধুনা মায়ের শ্রাদ্ধ ।
পুরোহিত ডাকি' ধরিয়াছে সে
দান সাগরের ফর্দ্দ ॥
ধুরন্ধর লোক পাড়ায় যাহারা
লইল কাজের ভার ।
লোক-লিপিতে হ'ল নিমন্ত্রণ
প্রতিবেশী দশ গাঁর ॥
শুভ অনুষ্ঠানের হল আয়োজন
সুবিশাল এক মাঠে ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

উৎসব লাগি' বহু চালাঘর
উঠিল বিধি ঠাঁটে ॥
দানাদি কার্য্যের ভোজ্য বস্ত্রাদি
সজ্জিত থরে থরে ।
গুরু-তরে আনা ক্ষুদ্র উপায়ন
রহে এককোণে পড়ে' ॥
শিষ্য মনের এই লঘুতায়
গুরু-মনে হ'ল ব্যথা ।
কেদারে ডাকিয়া শুনা'তে লাগিল
হিত-উপদেশ কথা ॥
"দশকর্ম্ম-আদি সব অনুষ্ঠানে
গুরুপূজা হয় আগে ।
অন্তরে পোষে যে শঠতা লঘুতা
তার দান নাহি লাগে ॥
নাম, যশ লাগি' দানের সাগর
গুরু লাগি' রচ কূপ ।
কেদার কহিল—"দেদার পাইবে
রহ গুরুদেব চুপ ॥"
ক্রোধেতে গুরু কহে—"গর্ব্বে চাহিছ
গুরুকে করিবে ধনী ।
গুরুতে তোমার লঘুতা-বুদ্ধি
নিশ্চয় ঘটিবে হানি ॥"
এই কথা বলে গুরু গেলা চলে
শিষ্য গেলা নিজ কাজে ।
যথাকালে তথা নিমন্ত্রিত জন
বসিলা পঙ্‌ক্তি ভোজে ॥
গগনে সহসা ঘনঘটা জাগি'
আইল ভীষণ ঝড় ।
উন্‌মান পারা ছুটিল সকলে
পর বা আপন ঘর ॥
ধ্বংস হইল একচালা যত
অন্নাদি ভাসিল বাণে ।

"হায় কি হইল!" বলিয়া কেদার
মস্তকে কর হানে ॥
বুঝিল আজি সে ঠেকায় পড়িয়া
গুরু-অপরাধ তা'র ।
নিখিলের যত শুভ অনুষ্ঠানে
শ্রীগুরু-সারাৎসার ॥

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায়

মহাপ্রভুর দান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৩ পৃষ্ঠার পর]

পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে উন্নত উজ্জ্বল রসস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজনই করিতে হইবে। একমাত্র মহামন্ত্রেই যুগলভজন সম্ভব। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত শ্রীনাম মহামন্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রকাশিত। এই যুগলভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র ভজনাদর্শ।

পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূরবাতি।
ললিতা-সুন্দরী করে যুগল-আরতি।। (শ্রীযুগল-আরতি)

আবার—

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ।। (শ্রীযুগল-আরতি)

ব্রজললনাগণের প্রদর্শিত পথই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পথ। সুতরাং একমাত্র শ্রীহরিনামকে সম্বল করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে যুগল ভজনে রত থাকিতেই হইবে।

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৬)

শ্রীনামে উন্মত্ত শ্রীগৌরহরি জগৎকে নামে পাগল করিবার নিমিত্ত দুই বাহু তুলিয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তনযোগে পাপী-তাপী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলকেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের ধর্ম্ম বা মাহাত্ম্য কিরূপ?—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য এমনই যে, যে ব্যক্তি এই মহামন্ত্র জপ করিবেন তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে। "কৃষ্ণনাম জপ-প্রভাবে কৃষ্ণবস্তুতে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়—উহাই 'ভাব' নামে কথিত।"—(অনুভাষ্য)। শ্রীগৌরহরি যে মহামন্ত্র দান করিলেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজনস্বরূপ প্রেমেতে পৌঁছান।

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর।।
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৪-৭৫)

পরম করুণ শ্রীগৌরহরি জীবের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কলিহত জীব-চিত্তে কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হউক—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকল প্রকার প্রজল্প নিষেধ করিয়া সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তনের এবং হরষিত-চিত্তে মহামন্ত্র শ্রবণের উপদেশ দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি আশীর্ব্বাদ এবং কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ বাস্তবিকপক্ষে অতুলনীয় দান। "স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র জীবের অবিদ্যা-নাশকল্পে আশ্রয়রসের ঘনবিগ্রহস্বরূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাব ও কান্তি লইয়া 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং' রূপ ধারণ করত জগতে অবতীর্ণ হইয়া যেভাবে আরাধনা করিলে শ্রীভগবান্‌কে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায়, সেই ভাব জগৎকে দান করিয়াছেন।"

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮-৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচারার্থে আদেশ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।২০)

শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস অন্য কিছু ভিক্ষা না করিয়া মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে ঘরে ঘরে গিয়া সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র ভিক্ষা। ভিক্ষার অপর নাম অনুগ্রহ-প্রার্থনা। সুতরাং মহাপ্রভু দান করিতে আসিয়া নিজে ভিক্ষুক সাজিয়াছিলেন এবং অপরকে ভিক্ষুক সাজাইয়াছিলেন। ইহা মহাপ্রভুর দান-বৈশিষ্ট্যের একটী বিশেষ দিক্।

'বল কৃষ্ণ'—কৃষ্ণকীর্ত্তন কীর্ত্তনকারীর ও শ্রবণকারীর উভয়ের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। কারণ, "বল কৃষ্ণ শব্দ জীবোদ্ধারক।"—(চৈঃ ভাঃ গৌড়ীয় ভাষ্য)। 'বল কৃষ্ণ' অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন কর। ইহা মহাপ্রভুর আজ্ঞা। ইহা তাঁহার মহাবদান্যের পরিচয়।

'ভজ কৃষ্ণ'—বিষয়াসক্তি ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। কিন্তু ইহা ভজনের অন্তরায়। যাহাতে জীব কৃষ্ণভজন করে, তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দ্বারে দ্বারে পাঠাইয়াছেন। কারণ, নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করিলে বিষয়বাসনা দূরীভূত হয় এবং নিষ্ঠাসহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয়।

'কর কৃষ্ণ শিক্ষা'—"কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। * * কৃষ্ণ-শিক্ষাপ্রভাবে জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। * * কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়—ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়—পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে—সকল বিদ্যার তাৎপর্য্যই যে কৃষ্ণশিক্ষা—ইহা উপলব্ধ হয়।"—(চৈঃ ভাঃ গৌড়ীয় ভাষ্য)

মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। যে হরিনাম ব্যতীত কলিকালে অন্য কোন গতিই নাই, যে হরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, যে হরিনামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজন হয়, যে হরিনাম মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে গিয়া দান করিয়াছেন, সেই হরিনাম মহামন্ত্র প্রদানই মহাপ্রভুর চরম দয়া বলিয়া আমরা মনে করি।

সুতরাং মহাপ্রভু যে দয়ার সাগর—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং য়াস্যতি পুনঃ।।

(শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্ ৪)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তিনিপুণ মুনিগণ যাঁহার বিষয়ে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই, শ্রুতিতে যাহা অতি নিগূঢ় এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাহার ফল, এমন ভক্তিকল্পলতা যিনি গৌড়দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও নিজেকে নিজে দেওয়ার দৃষ্টান্ত জগতে আর নাই। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া পূর্ণ দয়া, অতুলনীয় দয়া, অপরিসীম দয়া ও অসমোর্দ্ধ দয়া। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম দান অত্যদ্ভুত দান।

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

ঔদার্য্যধাম শ্রীগৌরবন

ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীবাদক সর্ব্বাবতারী শ্রীযশোদানন্দন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন লীলার প্রাকট্যপূত স্থানসমূহ শ্রীধাম বলিয়া শাস্ত্রসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, মথুরা, বৈকুণ্ঠ, নবদ্বীপ প্রভৃতি লীলাপীঠ প্রকটিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পরিকর, রূপ, গুণ, লীলা, লীলাপীঠ শ্রীধাম প্রভৃতি নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যরসময় এবং অবতারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই রাম-নৃসিংহাদি অবতার-সমূহের প্রকাশ। মাধুর্য্যরসময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ঔদার্য্যরসময় বিগ্রহই শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর গৌরসুন্দর। অনেকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর এবং শ্রীকৃষ্ণধাম বৃন্দাবন ও শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপকে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। সাত্বত শাস্ত্রসমূহ তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চনচ্ছটো
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে।। (শ্রীনবদ্বীপশতক)

—আহা, এই গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন, আর শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শচীসুত শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীকৃষ্ণধামে পৃথগ্‌বুদ্ধি মহাপরাধজনক। উহা ভক্তিবিনাশী ধামাপরাধের অন্যতম। গৌরধাম-সেবকের শ্রীশ্রীব্রজধাম সুলভ। অধিকন্তু মাধুর্য্যধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতেও ঔদার্য্যধাম শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়।

[1] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শ্রীনবদ্বীপ-শতকে গীত হইয়াছে,—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটিত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌরং কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত! তনুতে।।

—অহো বৃন্দারণ্যে 'হরি', 'হরি', 'হরি',—এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নামাপরাধাদি-রহিতাবস্থায় জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অবগত হইলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের (চরণসেবা) প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু আহা! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলুষ-রাশি কৃপাবশতঃ অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীভগবদ্ধামসমূহ বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীধাম জড় দেশকালের বহির্ভূত স্বতন্ত্র চিদ্দেশ। আমাদের অক্ষজদৃষ্টিতে প্রকৃত ভগবদ্ধাম দর্শন হয় না বলিয়া আমরা কেহ ঐতিহাসিক চক্ষুতে, কেহ প্রত্নতাত্ত্বিক-দৃষ্টিতে শ্রীধামকে পৌরাণিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান বা ভাল অথবা মন্দ আবহাওয়াযুক্ত স্বাস্থ্যকর অথবা ব্যাধিসঙ্কুল স্থান বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু শ্রীধামে প্রাকৃতত্বের স্থান নাই। শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপার বশে সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনায় দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ, অবলম্বনহীন, কামক্রোধাদি নক্র-মকরের করালকবলে কবলিত জীববৃন্দের দুর্দ্দশাপনোদনকল্পে শ্রীধাম, শ্রীপরিকর প্রভৃতিসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণের ধামও তেমনই পতিতোদ্ধারক। শ্রীধাম কলিস্থানপঞ্চক-বিবর্জ্জিত। সুতরাং কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীধামাশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়? অবশ্য শ্রীধামবাস সকলেরই সহজসাধ্য হয় না, অধিকাংশই ধামবাস করিতে গিয়া ধাম-চরণে অপরাধ করত অনেক সময় বিপরীত গতিই প্রাপ্ত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ধামবাসকালে সযত্নে ধামা-পরাধ হইতে বিমুক্ত থাকিবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস ব্যতীত কলিহত জীবের নিত্যমঙ্গললাভের আর অন্য শ্রেষ্ঠ উপায় দৃষ্ট হয় না। কোটিকণ্টকাকীর্ণ শ্রীভক্তিমার্গানুসরণকারীর পক্ষে শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। শ্রীগৌরধামসেবা ব্যতীত ইতর কোটী সাধনভজনেও সদ্য নিগূঢ় প্রেমসম্পত্তি লাভ অসম্ভব।—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটিরধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ।।

—কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর (?) আশ্রয়গ্রহণই করুক, অথবা আগম-নিগমাদি কোটি কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা

নাই) ; কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবকোৎসুক-ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি ঘটে। সুধীগণ যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তদীয় ধামবাসকেই মানবজন্মের কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের গৌরধাম শ্রীমায়াপুর-সেবাই—তদ্ধামবাসই একমাত্র কৃত্য। তাই জীবের শুভানুধ্যায়ী মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুস্ব।।

অর্থাৎ যদি কাহারও সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি কাহারও গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের স্পৃহা বলবতী হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ কাহারও চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে তিনি শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে বসতি করুন। শ্রীগৌরধাম কেবলমাত্র তাহার দর্শন, স্পর্শন, তদীয় গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, এমন কি দূরস্থিত ব্যক্তিগণের ধামোদ্দেশে নমস্কারবিধান অথবা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে সমর্থ।

গৌরধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী ব্যক্তিগণ অনন্তনিরয়ের প্রধান আসামী। উহাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। উহারা দৈহিক বা যে কোন সম্বন্ধে স্বজন হইলেও উহাদিগকে স্বজনাখ্য-দস্যুজ্ঞানে—পরম দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে উহাদিগের সঙ্গ সত্বর পরিত্যাজ্য। গৌরধাম-সেবায় বিরুদ্ধাচরণকারী পিতা, পিতা নহে, গৌরধামবিমুখ মাতা, মাতা নহে। গৌরধামবাসে বিঘ্নোৎপাদনকারী বন্ধু, বন্ধু নহে—

সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
র্যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।

বহু বহু জন্মের সুকৃতির বলে শ্রীনবদ্বীপধামবাস-সৌভাগ্য জীবের লাভ হয়। যাঁহারা সুকৃতিবলে প্রকৃত ধামের স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ তাঁহারা ধামের যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময় দর্শন করেন এবং উত্তরোত্তর ধামের চরণে আসক্তিবিশিষ্ট হন। কিন্তু আমার ন্যায় ধামাপরাধী জন মায়াঞ্জনাবৃত চক্ষুতে জঙ্গম প্রভৃতি প্রাকৃতবস্তুসমূহের আশ্রয়স্থল মনে করিয়া অপ্রাকৃত চিদ্ধামবাসের অভিনয় করিয়াও ক্রমশঃ ধামা-

পরাধবশে ধাম হইতে চ্যুত হয়। সুতরাং আমার ন্যায় সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপধামের বিরোধী, ধামবাসের অভিনয়কারী, শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের সহিত অন্য তীর্থ-সমূহের সাম্য-বুদ্ধিকারী, ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দজ্ঞানকারী এবং নিরপরাধে ধামা-শ্রিত পুরুষগণের নিন্দাকারী তথা শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের অসম্মান ও অবমাননা-কারী ব্যক্তিগণ মঙ্গলকামী ধামবাস-প্রার্থিগণের অসম্ভাষ্য। তাই ধামবাসনিষ্ঠ কোনও সুজন নৈষ্ঠিকতার দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন,—

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।
যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তেন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ।।

—যাহারা গৌরস্থলবাসিগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে-সকল সুবুদ্ধিজন গোদ্রুমের সহিত অন্য স্থানের তুলনা করে এবং মোদদ্রুমকে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ নরাধমগণের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে।

সুতরাং যিনি ধামবাসলিপ্সু তিনি ঐ সমস্ত ধামবাসবিরোধী ব্যাপারসমূহ হইতে বিমুক্ত থাকিবেন। প্রৌঢ়ামায়া ধামবাসের অভিনয়কারী জড়বদ্ধ জীবগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য জাল পাতিয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধহীন গুর্ব্বাপরাধী ব্যক্তিগণ "আমি ধামে বাস করিতেছি" মনে করিয়া ঐ মায়া-জালের উপরেই বাস করে ; ধামবাস-সৌভাগ্য তাহাদের কোনকালেই লভ্য হয় না। তাই ধামতত্ত্বজ্ঞ মহাজন গাহিয়াছেন,—

ধামের উপরে জড় মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ।।
মনে ভাবে "আমি আছি নবদ্বীপপুরে"।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে দূরে।।

শ্রীধামবাস-অভিনয়কারী আমি আজ ধামাপরাধফলে প্রৌঢ়ামায়াকর্ত্তৃক সুদূরে অপসারিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে পুনঃ ধামবাস-সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদোষদর্শিনী অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি এবং ঔদার্য্যধাম শ্রীনবদ্বীপের পাদপদ্মোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপনমুখে তাঁহার বন্দনা করিতেছি,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম সুখদং তং চিদুদিতম্।।

—ছান্দোগ্য-নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর'-নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করিতেছি।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণাম। বৈষ্ণবগণ, শ্রোতৃমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী! আমার উপর কিছু হরিকথা বলবার জন্য আদেশ-নির্দ্দেশ এসেছে। শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাই, হরিকথা [illegible]র কীর্ত্তন করবার অধিকার তাঁরই—যাঁর শ্রবণ হয়েছে। যাঁর সুষ্ঠু শ্রবণ হয়, তিনিই কীর্ত্তন করবার অধিকারী, হরিকথা পরিবেশন করবার অধিকারী। এককথায় বলতে গেলে আমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের বিষয়াশী ভৃত্য, উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সঙ্গোপন করতে চাচ্ছিলেন, সব কিছু বলে দিয়েছেন তিনি চলে যাবেন বলে এ জড় জগৎ থেকে, তখন তাঁর প্রিয়সখা উদ্ধব কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। উদ্ধব বললেন,—হে ভগবান্! তুমি চলে যাচ্ছ, তাহলে আমি কি করে থাকব? সখাভাব ভগবানের সঙ্গে উদ্ধবের। ভগবান্ তাঁকে বললেন,—আমি যে কথা এখানে বলতে এসেছি, আমার বক্তব্য তুমি সমগ্র জগৎকে জানাবে, এইজন্যই তোমাকে এখানে থাকতে হবে। উপদেশ চাইলেন উদ্ধব। ভগবান্ তাঁকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে চরম তত্ত্ব শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও প্রীতির কথা সব কিছু বর্ণনা করলেন। উদ্ধব তখন প্রকৃতিস্থ। তখন তিনি বললেন,—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।

ভজন-সাধন করতে গিয়ে আমাদের যে-সকল বাধা-বিপত্তি এসে হাজির হয়, সে-সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত না হলে সাধন-ভজন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভবপর নয়। এখানে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে বাণী, তারই সারসঙ্কলন করেছেন মহা-

[ত] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

ভাগবত উদ্ধব। 'ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ'—হে ভগবান্! তোমার উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য হয়ে আমরা এ সংসারে কামনা-বাসনা অন্যাভিলাষ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সবকিছু জয় করব। ভগবানের উচ্ছিষ্ট চাই, সেটাই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আমরা যখন মহাপ্রসাদ পেতে বসি, সে-সময় জয়ধ্বনি দিতে থাকি,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনামব্রহ্ম এবং বৈষ্ণব—এই চার তত্ত্বে অল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির সহজে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। প্রথমেই মহাপ্রসাদের কথা বলেছেন।

(মহা)-প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ-জয়।

কীর্ত্তনের মধ্যে রয়েছে। মহাপ্রসাদ সেবা করলে প্রপঞ্চ জয় হয়, জীবের অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি যে দোষগুলো রয়েছে, সে দোষগুলো অবদমিত হয়। আবার 'প্রপঞ্চ'-শব্দের অর্থ করেছেন—পঞ্চপ্রকার ভেদের রঙ্গস্থল যে এই জগৎ-সংসার, তার হাত থেতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পঞ্চপ্রকার ভেদ হল,—(১) জীবে জীবে ভেদ, (২) জীবে জড়ে ভেদ, (৩) জড়ে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে ভগবানে ভেদ ও (৫) ভগবানে ও জড়ে ভেদ। এই পঞ্চপ্রকার ভেদবিচার নিয়ে এ জগৎ-সংসার—দুনিয়া চলছে। অর্থাৎ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা, কিন্তু আমাদের যে বিচার (পরীক্ষা)-নিরীক্ষা করে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে, সেটা আমরা ভুলে যাই। কতরকম ধরণের দোষত্রুটী আমাদের ঘিরে ধরেছে অক্টোপাসের মত, চিন্তা-ভাবনা করে উঠতে পারা যায় না। নিষ্কৃতি কিসে তার হাত থেকে? প্রথমেই বলছেন,—মহাপ্রসাদে বিশ্বাস থাকা চাই, শ্রদ্ধা থাকা চাই, তা না হলে মহাপ্রসাদ পাওয়া সুষ্ঠু হয় না। মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্তু ; সাধারণ ভাত-ডাল নয়। আমাদের যে চিত্তবৃত্তি, এই ভুল বুঝাবুঝির ভিতরেই সৃষ্টি এর। অর্থাৎ এককথায় ভুলেতেই আমাদের জন্ম, ভুলেতেই আমাদের স্থিতি এবং ভুলেতেই আমাদের ধ্বংস। এখন উপায় কি? মহাপ্রসাদ যদি চিন্ময় বস্তু হন, তাহলে সে চিন্ময়ত্ব উপলব্ধির বিষয়। সে উপলব্ধি যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত' আমরা ভাত-ডালই গ্রহণ করছি। মহাপ্রসাদের মহাপ্রসাদত্ব বহু দূরে। মহাপ্রসাদের মহিমা কীর্ত্তন করবার সময় আমরা বলে থাকি চিন্ময় বস্তু মহাপ্রসাদ।

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ।।
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিচারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।।

কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্তাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।

মহাপ্রসাদের মহিমা বলছেন। নির্গুণ বস্তু মহাপ্রসাদ, গুণাতীত বস্তু। 'নৈবেদ্যং জগদীশস্য'—জগদীশ ভগবানের যে নৈবেদ্য (অন্ন-পানাদি) তা নির্গুণ বস্তু। তাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। যদি আমরা তাতে সেইরকম বিচার আরোপ করি, তাহলে নরকগতি—নারকী হতে হবে আমাদের। 'ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং'—পরব্রহ্ম ভগবান্ যেরূপ নির্গুণ বস্তু, মহাপ্রসাদও তদ্রূপ নির্গুণ বস্তু। 'যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ'—যেমন বিষ্ণু নির্গুণ বস্তু, গুণাতীত বস্তু, মহাপ্রসাদও তদ্রূপ গুণাতীত। সুতরাং এতে কোন বিকারত্বের আরোপ করতে হবে না। তাহলে অপরাধ করা হয়। যদি এরকম প্রাকৃত বুদ্ধি করি, তাহলে 'কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্তাঃ'—কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগতে হয়। 'পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ'—এগুলো আসে এই মহাপ্রসাদের অবহেলার ফলে। 'নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাঃ'—নিরয় গতি হয়। শাস্ত্রে এই সকল নিষেধনামাগুলো করে রেখেছেন এই কারণে যে, এইজাতীয় অপরাধের আবাহন করতে হবে না। যখনই প্রসাদ পাব আমরা, তখনই চিন্তা-ভাবনাটা করতে হবে। মহাপ্রসাদের জয়ধ্বনি দিয়ে, তাকে প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি ত' আমাদের প্রাকৃত চিন্তায় বিভোর।

স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দ তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব, তাঁর শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদি সবই তদ্রূপ। এ চিন্তা কি করে আসবে? শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। আমরা চেষ্টা করছি ঠাকুরকে দেখে নেব। ঠাকুরকে দর্শন করব আমি, আমি তাঁকে দেখে নেব—এটা বিচার নয়। শাস্ত্র বলছেন,—যদি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে হয়, তাহলে কাণ দিয়ে দর্শন করতে হবে। কর্ণ নিযুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের যে স্বরূপ, তত্ত্ব, সেটা জানতে হবে, বুঝতে হবে প্রথমে। তারপরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে। আমি দেখে নেব শ্রীবিগ্রহকে—এ বিচার নয়। শ্রীবিগ্রহ আমার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করুন—এই বিচার নিয়ে শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে হবে, একথা শাস্ত্রে লেখা আছে। ভগবানের যে সেবাময় শ্রীমূর্ত্তি, সেই সেবাময় শ্রীমূর্ত্তি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করে আমার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করুন—যেন আমি ভক্তিলাভ করতে পারি—তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। এই হল বিচার।

শ্রীবিগ্রহের সাধারণ জগতের লোকের মত আবাহন-বিসর্জ্জন নাই। আমরা যেখানে প্রতিমা পূজাদি করে আবাহন করি এবং বিসর্জ্জন করি, শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীবিগ্রহে সে অবস্থা নাই। প্রাকৃত আবাহন নাই সেখানে এবং বিসর্জ্জনেরও কোন কথা নাই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

সেখানে। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এক জায়গায় বলেছেন, —We are nither iconographer nor iconoclast. আমরা প্রাকৃতমূর্ত্তির আবাহনকারীও নই, গঠনকারীও নই ; আর তার বিসর্জ্জনকারীও নই। তাহলে কি আমরা?—We are the permanent servitor of the eternal ever existing Supreme Lord. যে ভগবান্ নিত্য-সত্য, চিরসত্য, চিদানন্দবপু, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, সেই বিগ্রহকে আমরা জানবার, বুঝবার চেষ্টা করব। তত্ত্ব উপলব্ধি না হলে ত' বিগ্রহ দর্শন হয় না, ইঁট, কাঠ, পাথর দর্শন হয়ে যায়। মূর্খের মত, হতভাগার মত প্রশ্ন করে বসি—এ ঠাকুর কি প্রস্তরময়ী? এ ঠাকুর কি মাকরাণা পাথর? কি অষ্টধাতু? কি দারুময়ী? আট-রকম মূর্ত্তির কথা লেখা আছে শাস্ত্রে।—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।

মনোময়ী অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্ব যাঁদের হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্ত, সেই পরমভাগবত, মহাভাগবত, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মা তাঁরা ভাবাবেগে সেই মূর্ত্তি দর্শন করেন। বাহ্যমূর্ত্তি হয়ত' তাঁদের সামনে নাই। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তির যে শ্রীমূর্ত্তিত্ব অপ্রাকৃত তা এখানে আনতে হবে। নামব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ংরূপ ভগবান্ এবং তাঁর শ্রীনাম এক। এই কলিকালে যদি আমরা সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হই, তাহলে নামই হল তার প্রকৃষ্ট মাধ্যম। শ্রীনাম গ্রহণ করতে করতে নামী পরব্রহ্ম তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ হতে পারে। শ্রীনামের দ্বারা এই শ্রীনামীর দর্শনলাভ। নাম-নামী অভিন্ন—এটাও ত' বিশ্বাসের কথা। কেবলমাত্র বিশ্বাস করলে হবে না, অন্তরে সেটা উপলব্ধির বিষয়।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

নামীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এর মধ্যে। নাম-নামী অভিন্ন। জাগতিক যে নাম, সে নাম গ্রহণ করলে আমাদের সাক্ষাৎ ফল মেলে না। জগতে যত প্রাকৃত নাম আছে, সে নাম যদি উচ্চারণ করি, তাতে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটে না। 'জল' 'জল' বলে চিৎকার করছি, জল এসে হাজির হয় না। কিন্তু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' —এই নাম যদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করি, ভাববশে করি, অন্তর থেকে করি, তাহলে ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন দেন। নাম-নামীতে এই পার্থক্য আছে। পার্থক্য অর্থে বৈশিষ্ট্য ; ভেদ নয়, জড়ভেদ নয়। যে ভেদের কথা আগে বলেছি—পাঁচরকমের ভেদের মধ্যে, ভুলের মধ্যে আমরা রয়েছি এ দুনিয়ায়।

মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে বিশ্বাস থাকা চাই। শ্রীনামকে আশ্রয় করে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

আমি পরব্রহ্ম ভগবানের দর্শন, সাক্ষাৎকার লাভ করতে চাই এবং তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে চাই। যদিও শ্রীনাম এবং নামী দুইই অভিন্ন।

চতুর্থ অবস্থায় বলছেন 'বৈষ্ণব'। 'বিষ্ণু' অপত্যার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে বৈষ্ণব-শব্দ। অনেকে প্রশ্ন করেন আমাদের কাছে, আপনারা ত' ভগবানের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর থেকেও চরম তত্ত্ব, পরতত্ত্ব তাঁরই উপাসনা করেন। কৃষ্ণের উপাসনা করেন। তবে বৈষ্ণব-শব্দটা কেন ব্যবহার হচ্ছে? 'কার্ষ্ণ'-শব্দ কেন ব্যবহার হয়নি? কার্ষ্ণ-শব্দ কৃষ্ণ থেকে। এ শব্দের ব্যবহার আছে। তবে সাধারণভাবে বৈষ্ণব-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে শাস্ত্রে। বৈষ্ণব অর্থে সকলকেই লক্ষ্য করছে। বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুতত্ত্বের পরম পরাকাষ্ঠা তাঁকে লক্ষ্য করছে ঐ একই বৈষ্ণব-শব্দের দ্বারা। বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর সন্তান এই অর্থে। শাস্ত্রে দেখতে পাই আমরা—"সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণা ভবন্তি।" ভগবান্ থেকেই যখন আমাদের উৎপত্তি, ভগবান্ থেকেই যখন আমাদের সৃষ্টি, তাহলে সকলেই ত' আমরা ভগবদ্ধর্ম্মী হই, গুণ পাই আমরা। কিন্তু দেখছি গুণ আমাদের নাই। নিখিল দোষের আকর আমরা। আপনারা গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ থেকে সবসময় শুনতে পাচ্ছেন—বদ্ধজীব, বদ্ধজীবাত্মা, মায়াগ্রস্ত জীব প্রভৃতি শব্দগুলো। শাস্ত্রে বদ্ধ ও মুক্ত দুই কথাই রয়েছে। বদ্ধজীবের উন্নতির জন্যই ত' সাধন-ভজনের কথা। তাদের জন্যই ত' সাধন-ভজন। লোকোত্তর মহাপুরুষ, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ, মহাত্মা যাঁরা, তাঁদের জন্য আবার ভজন-সাধনের কি প্রয়োজন আছে? না, তাঁরা ত' ভজন-সাধন করেন দেখি। হ্যাঁ, করেন। কিজন্য? জগতের শিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। কারণ, ওঁরা যদি ওটা না করেন, তাহলে আমাদের সামনে কোন আদর্শ দেখতে পাই না। জীবকল্যাণের জন্য ভজন-সাধন করার প্রয়োজন আছে ওঁদের। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ তিনি আচার্য্য-লীলা প্রদর্শন করছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিখিল লোক-শিক্ষক, ত্রিলোকগুরু, অখিল লোকশিক্ষকরূপে জগতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর যে দয়া, সে দয়ার তুলনা নাই। সে দয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়েই স্বরূপ-দামোদর বলেছেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শ্রীশিলচর গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখামঠ আসাম-প্রদেশের শিলচর-সহরে 'ন্যাশানাল হাইওয়ে'স্থ শ্রীশিলচর গৌড়ীয় মঠে এই বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমারোহে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৪।৬।২০০৩), শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই স্নানযাত্রা উপলক্ষে সকল ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে উপস্থিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞসহকারে অনুষ্ঠিত হইল। তৎপশ্চাৎ উপস্থিত সকল ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

তদনন্তর ১৬ই আষাঢ়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১।৭।২০০৩), মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই প্রবল বর্ষণ হইতে থাকিলে সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নেই আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া সূর্য্যালোক সকল দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সকল শিলচরবাসী পরমানন্দে 'জয় জগন্নাথ' 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া মঠে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত উজ্জ্বল পীতবর্ণের সু-উচ্চ মনোহর শ্রীরথ দর্শন করিয়া সকলেরই হৃদয়ে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয় শ্রীকবীন্দ্র পুরকায়স্থ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শ্রীরথের সম্মুখে ঝাড়ুদ্বারা পথমার্জ্জন করিলে শ্রীজগন্নাথদেব ও উপস্থিত সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। অতঃপর সকলে পরমোৎসাহে হরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে লইয়া সমগ্র শিলচর সহর পরিভ্রমণ করিলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ীরূপে নির্ণীত হাইওয়ে-বাজারের নিকটস্থ শ্রীরণধীর তরাত মহাশয়ের বাড়ীতে সন্ধ্যায় উপনীত হইলে স্থানীয় জনগণ পরমাদরে শ্রীজগন্নাথদেবকে বরণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তরাত-পরিবার বিশেষ যত্নসহকারে নয় দিন যাবৎ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজা-বিধান, সকল দর্শনার্থী-দিগকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ এবং হরিকথা ও সঙ্কীর্ত্তনের অতি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া সকলের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর ২৪।৩।১৪১০ (ইং ৯।৭।২০০৩), বুধবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুন-র্যাত্রা-দিবসে শিলচরবাসিগণ সকলে পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে রথে করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে লইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান স্থানীয় দূরদর্শনে ও পত্রিকায় সম্প্রচারিত হইয়াছিল। মঠের প্রধান-সেবক শ্রীদামপ্রভুর ঐকান্তিক ব্যবস্থাপনায়, সকল মঠবাসিগণের আন্তরিক উদ্যোগে এবং স্থানীয় সকল ভক্ত-গণের বিশেষ উৎসাহেই স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা মহোৎসব পরম সার্থকমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩৫শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

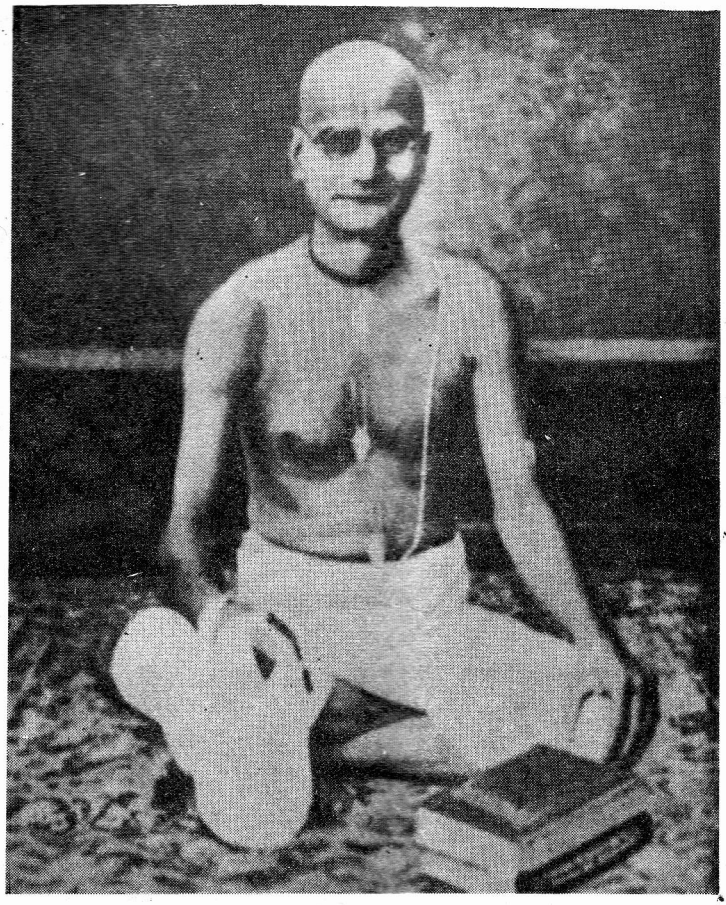

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১০ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।
৭ পদ্মনাভ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২৩শে আশ্বিন, ১৪১০ (ইং ১০/১০/২০০৩) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩৫শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

৩১শে ভাদ্র, ১৪১০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

২৩শে আশ্বিন (ইং ১০/১০/২০০৩), শুক্রবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৮ দামোদর, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ আশ্বিন, শনিবার, ১৪১০, ইং ১৮/১০/২০০৩ { ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্]

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ব্বুদানাং
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্ ।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১॥

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারাসিঞ্চিত-গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাঁহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হৃতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গূঢ় নাম "নয়নমণি") গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত) আমার দীন নয়ন! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে

কৃপণতাপ্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মাচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি ।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥২॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্ম-চ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রম্ভ-রসাশ্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেই-খানে লইয়া চল ॥২॥

বাৎসল্যং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি ।
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৩॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধারূপে) তাহা ছলনামাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ্ অর্জ্জনের উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৩ ॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
কর্ণক্রোড়াজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য ।
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্ব্বদা জনগণের কর্ণক্রোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচল-চন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া "নয়ন-মণি" নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥৪॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহৃজ্জম্বুনদ্যা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্ ।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৫॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্ম্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চন-বর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অস্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদগ্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণদ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন! হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৫॥

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী ।
গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো গরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৬॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং গৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর-নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি দ্রাবিড়-বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মী-নারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজ-ভজনের কথা) কীর্ত্তন করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধর্ব্বার গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ্ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৬॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্‌বিশ্বমেত-
দাম্লেচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্ ।
মুক্তৈঃ সিদ্ধৈরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
র্যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৭॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র, এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৭॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

অপ্যাশা বর্ত্ততে তৎ পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশন্দং
দীর্ঘং নীলাব্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্দ্ধেন্দুভালম্ ।
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৮॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্ত্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই সুদীর্ঘ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিক্কারী ললাট, সেই সৌম্য-বদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমন্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৮॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণান্বিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে ।
দাসো যো রাধিকায়া অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৯॥

চারিশত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাব্দে পৌষমাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী-তিথিতে, মঘা নক্ষত্রে, বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র আমাকে সেইখানে লইয়া চল ॥৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণজুষাং পূরিতাভূর্নভশ্চ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাদ্ধন্ত শূন্যায়িতং মে ।
পাদাব্জে নিত্যভৃত্যঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢুমত্র
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১০॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল । ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে । পাদপদ্মের নিত্য ভৃত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে অসমর্থ । হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১০॥

[শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্ হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

অভিধেয়-বিচার—ভক্তি

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধানা ও তাঁহার স্বরূপলক্ষণ

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তি-মীমাংসা-গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—

"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে"

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপাক হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূল তত্ত্ব ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয় । অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাণ্ডিল্য-সূত্র, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হইবেন।

ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা-ভেদে ভক্তি দুই প্রকার

প্রীতির ন্যায় ভক্তি-প্রবৃত্তি দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরম-পুরুষ, সর্ব্ব-রাজ-রাজেশ্বরভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন ; পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব, তাঁহাতে স্বরূপ-সিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসত্ত্বায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। এশ্বর্য্য-ভাব লীন হইলে সেই ভগবৎসত্ত্বা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ সত্ত্বাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দ-ধাম, সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা

নারায়ণ-সত্ত্বা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্ত্বা উদয় হইয়াছে, এরূপ নয় : কিন্তু উভয় সত্ত্বাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তি-ভেদে প্রকাশ-

ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রসমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তি-তত্ত্বে, প্রীতি-তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-বস্তু তিন প্রকার—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে, যথা ভাগবতে,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্-জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে ।। (ভাঃ ১।২।১১)

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত **ব্রহ্ম** প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটি জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞান-লাভই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদন-অবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না, যেহেতু তত্তত্ত্বে আস্বাদক-আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা-সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথকতার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয় স্বরূপাভাবে পরমাত্মাতত্ত্ব কেবল কূটসমাধি-যোগের বিষয় হন। এস্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না।

অতএব **ভগবান্‌ই** একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ মধ্যে এক-একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপ, জীব-সমাধিতে প্রকাশ হয়। যতপ্রকার ঈশ্বর-নাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য সংহিতার 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই সর্ব্ব গুণাধার।

ভগবৎ-তত্ত্বের মূল ছয়টী গুণ

মূল-গুণ বাস্তবিক ছয়টী ভগ-শব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব এই ছয়টীর নাম গুণ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপবিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত

আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—পরস্পর বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধযুক্ত

ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে আস্বাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদক-প্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে-পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়।

মাধুর্য্যের চমৎকারিতা

মাধুর্য্য-স্বরূপ সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়ঃ এবম্ভূত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরমতত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্যরস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত কেবল মাধুর্য্যেরই অভিধেয়তা সিদ্ধ

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কিনা, এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা বর্ণন-সময়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথা ঃ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।। (ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণরাস-প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ-বিকারময়। মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন ;—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।। (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪)

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্য মঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-সত্ত্বার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-ব্যক্তিত্বই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। **ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব-কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল।** অতএব তদবলম্বী উত্তরাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধা উভয়েরই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কোমলশ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মজ-গুণময় সত্ত্বা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-রাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও নারায়ণের অনুশীলন অপেক্ষা কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।৯)

উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ—'অনুশীলন'। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না—ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সাকল্য-প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না।

নারায়ণ শান্ত-দাস্য-রসাস্পদ সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের নহে

জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে প্রথমে ভগবৎ-জ্ঞানের উদয়কালে, **শান্ত**-নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণ-পর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস সম্বন্ধবোধ হইতে একটী দাস্য-নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি,

গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কেই বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণ-নাথ, আমি তোমার পত্নী।"

দীন-হীন জীবের ঐশ্বর্য্য ও উন্নত জীবের মাধুর্য্য-উপাসনা

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র দীন-হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন, সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহ-পূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চ-রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তির পূর্ণ-লক্ষণ এবং উহা কর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা আবৃত নহে

অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তির পূর্ণ লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনের স্বধর্ম্মো-ন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোনক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন স্বভাবতঃ কাম ও জ্ঞানরূপী হইবে ; কিন্তু কর্ম্ম-চর্চ্চা ও জ্ঞান-চর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত্ত করে না। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তৎ চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—হরিনাম কি বস্তু?

উঃ—হরিনাম অচেতন পদার্থ ন'ন কিংবা কল্পিত বস্তু ন'ন—দৃশ্য-পদার্থবিশেষ ন'ন । হরিনাম ভগবদবতার—সাক্ষাৎ ভগবান্। নামই হরি, হরিই নাম। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু—পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং। অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং-বস্তু—নামী। শ্রীনাম স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। শ্রীনাম Can take initiative. অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

নামই পরিকরবান্, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়। অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত নাম শব্দব্রহ্ম। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ। বিভু-চেতন হরিনাম কথা বল্‌তে পারেন। যিনি হরিনাম করেন, তিনিও চেতনবস্তু। তিনি বল্‌ছেন—হে হরিনাম! আমি তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার কর্‌লাম।

যিনি হরিনাম কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি হরিনাম প্রভুর ভৃত্য। সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে এখানে এসেছেন। এজন্য আমরা হরিনামকেই সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব ; আর কারও কাছে যাব না।

প্রঃ—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কি মঙ্গললাভের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়?

উঃ—নাম ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ'তে পারে না। ইহজগতে যাঁ'দের কোন কৃত্য নাই, তাঁরাই হরিনাম করেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র উপায়—একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ-রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নাই।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। আর নাম-সঙ্কীর্ত্তনে যে প্রেমা লাভ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এজন্য শাস্ত্র ব'লেছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। তিনবার নিষেধ করা হয়েছে।

কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।

প্রঃ—মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—বিচার দুই প্রকার—প্রেয়ঃপর ও শ্রেয়ঃপর। শ্রেয়ের অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ ; কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। শ্রেয়ে আত্মার প্রেয়ঁ আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখ মানসিক প্রেয়ে আত্মার শ্রেয়ঃ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য কিন্তু পরমার্থপ্রদ। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন কর্‌লে একজন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'তে পারে। অতএব ধীর ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরমকল্যাণ লাভের জন্য যত্ন কর্‌বেন। আহার-বিহারাদি বিষয় সকল-জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হোক্ না কেন, বিষয়-লাভ প্রত্যেক জন্মেই হ'বে। মনুষ্য না হ'লেও বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যা'বে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কাণ দিয়ে শুন্‌তে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে পারি । কিন্তু পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষমতা নাই। যা'তে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তাহা লাভ কর্‌তে পারি মনুষ্যজন্মে। যা'তে আত্মমঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না কর্‌লে সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় বিচার হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবজন্ম হ'লেও ভোগে উন্মত্ত হ'য়ে পড়্‌ব—সদসদ্‌বিচার চাপা পড়্‌বে। এখানে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু দেবজন্মে প্রাকৃত সুখ বেশী। প্রাকৃত ব'লে সেই সুখও নিত্যস্থায়ী নহে—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

মনুষ্যজীবনে অনেক কাজ প'ড়ে গেছে। প্রভু সেজেছি—কার্য্যের কর্ত্তা ব'লে নিজেকে অভিমান কর্‌ছি—ভগবানের সেবাবঞ্চিত হ'য়ে অপরের সেবা গ্রহণ কর্‌ছি। বিভিন্ন বস্তুর প্রার্থী হ'য়ে বিভিন্ন দেবদেবীর সেবা কর্‌ছি। ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা কর্‌ছি। ইহা বস্তুতঃ পূজা নহে—পূজ্যকে আমার বস্তু সরবরাহ কর্‌বার সেবকই ক'রে ফেলছি।

সেবা বলে কাকে, তা' জানা দরকার। শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের নামই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল (Fountain-head) আমরা সকলে সেই শ্রীহরিরই সেবক, তাঁর সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কার্য্য বা কর্ত্তব্য। তাঁর সেবা কর্‌লে সকলেরই সেবা হ'য়ে থাকে। 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' শ্লোকই তা'র প্রমাণ।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানার দরুণ যত অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্যজন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যদি সাধুর নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তা' হ'লে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হ'ব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাক্‌ব।

দুনিয়াদারীতে যাঁরা ব্যস্ত আছেন, তাঁরা অধোক্ষজের সেবা বুঝ্‌তে পারেন না। কিন্তু অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি ক'রে আলোচনা হ'বে?—সাধুসঙ্গ-প্রভাবে।

সাধুগণের সঙ্গ করা দরকার। বদ্ধ-জীবের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হচ্ছে। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হ'লে ভগবানের শক্তি উপলব্ধি হবেই। সাধুসঙ্গের অভাব হ'লে জগতের শক্তিদ্বারা অর্থাৎ মায়াশক্তি দ্বারা প্রতারিত হ'ব। আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌ব—যদি হরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ভগবান্‌ই পূর্ণবস্তু—জীবের একমাত্র উপাস্যবস্তু বা আশ্রয়। তাঁর সেবা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

লাভ কর্‌তে হলে তাঁর সন্ধান-দাতা, তাঁর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বৈকুণ্ঠ-নাম পাওয়া যায়। সেই নামের আভাসেই সংসার হ'তে মুক্তি হয়। ভগবানের নাম কর্‌লে আর মাতৃকুক্ষিতে আসতে হয় না—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এসব কথা একবার শুনে যদি বুঝ্‌তে না পারা যায় তবে পুনঃ পুনঃ শুনতে হবে। শব্দব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের যিনি আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বেন না, তাঁকে আবার সংসারে আস্‌তে হ'বে।

ভগবান্‌কে যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁর নিকটেই ভগবানের কথা শুন্‌তে হ'বে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও শিক্ষাগারই মঠমন্দির।

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভক্তিচক্ষে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন। সাধুর কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাব। ভক্তি-চক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। এই চোখ দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হ'বে। এজগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হলে আর ভগবান্‌কে জান্‌তে পার্‌লাম না।

আমরা আর একটুও সময় নষ্ট কর্‌ব না, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুখের আধার যে ভগবান্, তাঁর বিষয় চিন্তা কর্‌ব—তাঁর অনুশীলন কর্‌ব। তৎফলে ভগবদ্দর্শনের বাধাগুলি কেটে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাদ্বারাই আমাদের পরমমঙ্গল লাভ হ'বে। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পার্‌ব—ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হবে। এ জগতে আরাধনা কর্‌বার আর কোন বস্তু নাই।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হ'বে ভগবান্‌কে ভুলে কর্ত্তাভিমানে যে কর্ম্ম করা যায়, তা'তে শুধু অমঙ্গলের কথা।

আমরা বর্ত্তমানে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছি—জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েছি। এখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে নিত্যস্বভাবকে প্রকট কর্‌তে হবে। আমরা চিরদিন এই পৃথিবীতে থাক্‌তে পার্‌ব না। যাঁরা ভগবানের সেবা চান, তাঁরা জগতের কিছু চান না। তাঁরা—অকিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য।

প্রঃ—কাহার নিকট কথা শুন্‌তে হ'বে?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে ভগবৎ-কথা শুন্‌তে হ'বে এবং সেই শ্রুতবাণী ইষ্টদেবের সুখার্থ অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে—অশ্রদ্দধানের নিকট নহে।

গুরুর নিকট শ্রবণ করতে হ'বে—পাষণ্ডের নিকট নহে। ভুলবশতঃ অভক্তকে গুরু কর্‌লে তাঁকে বর্জ্জন ক'রে পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা গ্রহণ করতে হ'বে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

প্রঃ—ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কি?

উঃ—ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জীব যে-সকল বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে-সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে সত্যবুদ্ধি বা অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি ক'রে সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান্ হয়, দেখে শুনে চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীনামাশ্রয়দ্বারা সেই কৃপা লাভ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—শরণাগতের মঙ্গল কি হ'বেই?

উঃ—নিশ্চয়ই হ'বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত। মূল মালিকের উপর নির্ভর করিলেই মঙ্গল। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি।

কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আনেন নাই। আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে নিজের কর্ত্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁর মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্ত্তা-অভিমান চিরতরে বিদূরিত হয় ; তখন আমরা কর্ম্মবীর সাজ্‌তে ধাবিত হই না, তাঁর বাণী শ্রবণের জন্য তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হই।

প্রঃ—শরণাগতের লক্ষণ কি?

উঃ—কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাল্য হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার কর'তে পারে না। আমি কৃষ্ণের আশ্রিত—এই অভিমান না হ'লে শরণাগতি বা আশ্রয় হ'ল না । তৎফলে 'পিতা' অভিমান, 'কর্ত্তা' অভিমান স্বাভাবিক।

প্রঃ—দেবজন্ম অপেক্ষাও কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিশ্চয়ই। দেবজন্ম থেকে মনুষ্যজন্ম ভাল। এজন্য দেবতাগণও মনুষ্য-জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। দেবতারা এত বিষয়ভোগে মত্ত থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাঁদের জন্য দুঃখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা' তাঁরা চিন্তাই কর্‌তে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশাতেই তাঁরা মস্‌গুল থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করেন, তাঁরা অধিক দিন ভোগ ক'রতে পারেন ; কিন্তু সেই দেবতাগণের শোষে অসুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির যত্ন করেন। তাঁরা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁদিগকে বড় মনে করি। কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁরা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ার দরুণ তারতম্য-গত মঙ্গল চিন্তা ক'রবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। মানুষও দেবতার অনুকরণে জন্ম-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাক্‌লে নিজের মঙ্গল চিন্তা ক'র্‌তে পারেন না। দেব-জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ভজনের ও সাধুসঙ্গের সুযোগ বেশী। এইজন্যই দেবজন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

মনুষ্যজীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের বা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা জানিয়ে দিচ্ছে ; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরব-চ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্য-জীবন লাভ ক'রে আমাদের অবকাশ হ'য়েছে, যা'তে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান ক'রতে পারি—কোন্‌টি মঙ্গল, কোন্‌টি অমঙ্গল, তা' জান্‌তে পারি।

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণা কি ?

আজকাল 'দক্ষিণা' দেওয়া সমাজের একটী বিশেষ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায়শঃ ভোজন-দক্ষিণা, গুরু-দক্ষিণা, বৈষ্ণব-দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা প্রভৃতি নানা-প্রকার দক্ষিণার কথা শুনা যায়। এমনকি, কেহ কেহ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়াকেও দক্ষিণার সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণাস্বরূপে ঘুষ না দিলে নাকি কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরি সহজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণার ব্যাপারে গণ-গড্ডালিকা স্রোতপ্রবাহে লোকের গা ভাসাইতে কোন আপত্তি নাই। 'দক্ষিণা' বলিতে সাধারণতঃ পুরোহিতের পারিশ্রমিক, পুরস্কার প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করে। তজ্জন্য বোধ হয় খনার-বচনে পাওয়া যায়,—"বাদল বামুন বান, দক্ষিণা পেলেই যান।" পুরোহিত ব্রাহ্মণ দক্ষিণা না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্থানে প্রস্থান করেন না। গুরু-বৈষ্ণবের দক্ষিণালাভের নিমিত্ত তীর্থের কাকের ন্যায় হাপিত্যেশ করিয়া বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন হয় না। জাগতিক লোকের সামান্য লাভের আশায়ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

ইহজগতে যতগুলি দক্ষিণার কথা পাওয়া যায়, সবগুলিই প্রায় কর্ম্মকাণ্ডীয়

ব্যাপারের অন্তর্গত। পুণ্যলাভই দক্ষিণা প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন কামনা নাই। ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা এক বস্তু নহে। দুষ্ট দুর্দ্দান্ত বহির্ম্মুখ মন কপট কুটীনাটীকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণা প্রদানের ছলে ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করে। যে কর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না হয়, আত্মার হরিসেবাবৃত্তির জাগরণ না হয়, সেই কর্ম্ম যতই পুণ্যজনক হউক অথবা যতই জগতের তথাকথিত হিতকারক হউক, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি বা প্রীতির উদয় করায় না। মনুপুত্র করূষের বংশে মরুত্ত-নামক রাজা পুণ্যের নিমিত্ত দ্বিজগণের দ্বারা বিরাট্ যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজশ্রবা ঔদ্দালকি স্বর্গলাভের আশায় 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কতকগুলি অকর্ম্মণ্য গাভীকে (যাহারা দুগ্ধদানে ও সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে) দক্ষিণা-স্বরূপে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্র নচিকেতা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। নচিকেতা জানিতেন অকর্ম্মণ্য গাভীগুলিকে দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান করিলে পিতার 'অনন্দা'-নামক নিরয়ে গমন অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণাপ্রদানে সকলক্ষেত্রেই যে পুণ্য অর্জ্জিত হইবে, তাহা কিন্তু নহে ; কোন কোন ক্ষেত্রে পাপও সঞ্চিত হইতে পারে—ইহা বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। নৃগরাজ দক্ষিণাস্বরূপে ভুলক্রমে একই গাভীকে দুইজন ব্রাহ্মণকে দান করায় কৃকলাস-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানা।

দান করিলে দক্ষিণা দেওয়া বিধি। দান-দক্ষিণার ব্যাপারে সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র গাধির তনয় বিশ্বামিত্রকে সমগ্র রাজ্য দান করিয়া দানের দক্ষিণা দিবার কালে চণ্ডালের বেশধারণপূর্ব্বক শ্মশানরক্ষী হইয়াছিলেন। এ হেন রাজা হরিশ্চন্দ্রও ভগবদ্ভক্তিরহিত হওয়ায় দেহান্তে স্বর্গলোকে ঠাঁই না পাইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহাভারতে উল্লেখিত নিষাদপুত্র একলব্যের গুরুদক্ষিণার আদর্শ আমাদের অনুসরণের যোগ্য হওয়া উচিত নহে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একলব্যকে একনিষ্ঠ গুরুসেবক বলিয়া মনে হইবে, যেহেতু অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য দক্ষিণাস্বরূপে ডানহস্তের একটী অঙ্গুলী চাহিবামাত্রই একলব্য তাহা নির্দ্দিধায় ছেদন করিয়া গুরুদেবকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গুরুদক্ষিণা প্রদান একপ্রকার নীতিবিশেষ মনে করিয়া একলব্য এই কার্য্য সম্পাদন করেন, বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরে বৈষ্ণব (অর্জ্জুন) অপেক্ষা বড় হইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছিল। গুরু-বৈষ্ণব হইতে বড় হইবার চেষ্টা অভক্তি, কখনও গুরুসেবা নহে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

শ্রীভগবদাভিন্ন কলেবর ভাগবতের সেবায় কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবাই সেবকের নিত্যধর্ম্ম, উপজীবিকা নহে। শ্রীভাগবতে (৭।১৩।৮) "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" শ্লোকে শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে ধনবস্ত্রাদিরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা ভাগবতসেবক নহেন, ভাগবতজীবি; তাঁহারা স্বীয় গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করেন না বা নিজেরাও কৃতার্থ হন না। ভাগবতজীবি, বিগ্রহজীবি ও নামবিক্রয়ী কখনই বৈষ্ণব নহেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যে দক্ষিণা বা আনুকূল্য সংগ্রহ করেন, তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাতেই ব্যয়িত হন, তাহাদ্বারা ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগান হয় না। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের গৃহ-বিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ দক্ষিণাস্বরূপে গ্রহণ করেন না। কর্ম্মী ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাস্বরূপে প্রাকৃত বৈভবসমূহাদি দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে রহিয়াছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্য বিষয়-বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না অর্থাৎ শিষ্যের পাল্যদাস হন না। সমাজে বহুল প্রচলিত ভোজনের পরে বৈষ্ণবকে দক্ষিণা প্রদান প্রণালীটি পারমার্থিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যজনক নহে। বৈষ্ণব-ভোজনে দক্ষিণা প্রদান কার্য্যটি কি কর্ম্মকাণ্ড নহে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'বৈষ্ণবসেবা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক?"

গুরুদক্ষিণার প্রকৃত তাৎপর্য্য

ব্রহ্মচারিগণ বেদ অধ্যয়ন সমাপনান্তে স্বীয় গুরুদেবকে বস্ত্র-ছত্র-পাদুকা প্রভৃতি দক্ষিণা-স্বরূপে অর্পণ করিবে—ইহা শাস্ত্রের সাধারণ বিধি। মনুসংহিতায় পাওয়া যায়,—"যদন্যানি দ্রব্যাণি যথালাভমুপহরতি দক্ষিণা এব তাঃ। স এব ব্রহ্মচারিণো যজ্ঞো নিত্যব্রতমিতি।" এইপ্রসঙ্গে লঘুহারীতে উক্ত হইয়াছে,—"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ।।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশে যমপুরী হইতে গুরুর মৃতপুত্রকে আনয়ন করিয়া গুরুর হস্তে অর্পণপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতে (১১।১৯।৩৯) "দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ" শ্লোকে জ্ঞানোপদেশকেই 'দক্ষিণা' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। জ্ঞানের অর্থাৎ উৎসবান্তে নিজের কীর্ত্তনাদি

রসের অনুভবের সন্দেশ নিজ ইষ্ট মিত্রগণের মধ্যে জ্ঞাপনই 'দক্ষিণা', ধন-বস্ত্রাদি অর্পণ নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, —"শ্রীবাসুদেবই যে ভগবত্তম এবং তদ্ভক্তিই সর্ব্বোত্তমা—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিরত থাকাই ভগবানের জ্ঞানলাভান্তে ভক্তির অনুশীলনকে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি রসানুভব-সংবাদ নিজ ইষ্টমিত্রগণকে জ্ঞাপনই গুরুদক্ষিণা। তদ্দ্বারাই গুরুদেবের সন্তোষ এবং নিজের জ্ঞানপর্য্যাপ্তি।" "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশকে স্নিগ্ধশিষ্য সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়া গুরুদেবের সন্তোষবিধান করেন।

যাঁহারা তদ্বিদ্ধি, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন—এই তিনপ্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হন, বৈষ্ণবদর্শনের আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে দর্শনের তথ্যসমূহ উপদেশ করেন। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুরূপে অবস্থিত জানিয়া ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্বসম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণাস্বরূপে গুরুকে সমর্পণ করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। নির্ম্মৎসর, অভিমানশূন্য, আলস্যরহিত, জড়বস্তুতে মমতাহীন, গুরুসেবাপর অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন। স্নিগ্ধশিষ্যই গুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী কৃপা লাভ করেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব স্নেহশীল সেবকের যে সেবাচেষ্টা তাহাতেই প্রীতিলাভ করেন, অন্য কোনপ্রকার যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন না। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার'—ইহাই গুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্বের প্রতি শিষ্যের সম্বন্ধের পূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রকৃত শিষ্য গুরুদেবের অশুদ্ধ দাসত্ব অর্থাৎ কোনরূপ বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া সেবা করেন। কোন হেতু বা নিজের লাভালাভের দিকে না তাকাইয়া একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখের জন্য যিনি সকল কিছুই করেন, তাঁহার কি গুরুদক্ষিণা দিবার কিছু বাকী থাকে?

জন-সমষ্টি অনেক লোকের দেখাদেখি বিনা বিচারে যে মত পোষণ করেন, তাহা অবশ্যই ভ্রান্ত ; অথচ জগতে তাহা সত্য ও পরম উদার মত বলিয়া বহুমানিত হয়। প্রকৃত সত্যপিপাসুগণকে ইহা হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগুরুচরণ-কল্পতরুর সেবায় সমস্ত আহুতি দিতে হয়। যিনি নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার খতিয়ান না করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বক্ষণ অবশ্যই সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, তিনিই ক্ষণে ক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

অলৌকিক

[২০]

চট্টগ্রামের চক্রশালা-গ্রামে জমিদার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব হয়। তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। গঙ্গাবাসের মানসে চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি বসতি স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি বাহ্যতঃ বিষয়ীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে বৈষ্ণব-দর্শন করাইবার জন্য পুণ্ডরীকের নিকট লইয়া আসিলেন। কিন্তু গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে বিষয়ীর বেশে দর্শন করিয়া অশ্রদ্ধাযুক্ত হন। মুকুন্দ উহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম অপনোদনের জন্য কৃষ্ণলীলা-উদ্দীপক দুইটী শ্লোক—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং" এবং "পুতনা লোক বালঘ্নী" কীর্ত্তন করিলেন। ইহা শুনিবামাত্রই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া পালঙ্ক হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইল। ইহা দর্শনে গদাধর পণ্ডিত খুবই অনুতপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এই অপরাধ ক্ষালনের জন্য তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ করিলেন। মহাপ্রভুর সম্মতিতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

যাহা হউক, ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরাইয়াছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উহা দেখিয়া স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,—"ইহা কি-প্রকার ব্যবস্থা? মাড়যুক্ত বস্তু অশুদ্ধ। উহা ঠাকুরকে পরান উচিত নয়। ইঁহারা ঠাকুরকে কেন অশুদ্ধ বস্ত্র পরাইয়াছেন? ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বস্ত্র ধৌত করিয়া পরানই উচিত।" স্বরূপ দামোদর প্রভু ইহাতে কোন দোষ নাই বলিলেন এবং ঈশ্বর লৌকিক আচারের অতীত বলিলেন। কিন্তু এই কথা বিদ্যানিধির মনঃপূত হইল না। স্বপ্নে বিদ্যানিধি রাত্রিকালে দেখিলেন,—জগন্নাথ-বলরাম তাঁহার নিকটে আসিয়া ক্রোধস্বরে বলিতেছেন,—"তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমার সেবকের দোষ তুমি দেখ। তোমার অপরাধের অন্ত নাই। আমার সেবকের কোন জাতি নাই। তুমি কেন এই জাতিনাশা স্থানে রহিয়াছ। এখনই এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" এই বলিয়া জগন্নাথ-বলরাম দুইভাই তাঁহার দুই গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় মারিতে লাগিলেন। তিনি ভীত হইয়া "রক্ষা কর, রক্ষা কর, অপরাধ ক্ষমা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, দেখা গেল জগন্নাথ-বলরামের চাপড় মারার জন্য সত্য সত্যই তাঁহার দুই গাল ফুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

এইপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া এবং তাঁহার প্রতি জগন্নাথ-বলরামের অশেষ কৃপা দেখিয়া বৈষ্ণবসকলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জয়গান করিতে লাগিলেন।

[২১]

শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্রীপাট কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিশহর)। ইঁনি ব্রজলীলায় বীরাদ্যুতি গোপিকা ছিলেন। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য নীলাচলে (শ্রীপুরীধামে) যাইতেন। উড়িয়া-পথের সন্ধান শিবানন্দের খুব ভালই জানা ছিল। তিনি সকল ভক্তগণকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেন এবং তাঁহাদের আহার, বাসস্থান প্রভৃতির সমূহ ভার বহন করিতেন। একসময় তাঁহারা পুরুষোত্তম ধামে চলিয়াছেন, শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুকুরও চলিয়াছে। পুরী যাইতে পথে নৌকায় নদী পার হইতে হয়। কিন্তু মাঝি কোনমতেই কুকুরটীকে নৌকায় চড়াইবে না। শিবানন্দ মাঝিকে বহু অনুরোধ করিয়া দশপণ কড়ি দিয়া কুকুরটীকে পার করাইলেন। একদিন কুকুরটীকে খাবার দিতে ভুল হইয়া গেল। কুকুরটী যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহাতে শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপবাসী হইয়া রহিলেন। যাহা হউক সকালে যথাসময়ে পুরীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। পরদিন ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সেই কুকুরটীকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মহাপ্রভু কুকুরটীকে সস্নেহে নারিকেল প্রসাদ দিয়া "কৃষ্ণ বল, হরি বল" বলিতেছেন, আর কুকুরটীও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সানন্দে প্রসাদ খাইতেছে। এইপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শিবানন্দ সেন নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া কুকুরটীকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার ইহার পরেই কুকুরটী অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহাপ্রভুর কৃপায় সে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।

[২২]

মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল এবং মাতার নাম দুরিকা দেবী। তাঁহার ডাক নাম ছিল দুঃখিয়া।

দুঃখিয়া একদিন স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে অম্বিকা কালনায় গিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

করিবার জন্য আদেশ করিলেন। পিতামাতাকে তিনি স্বপ্নের কথা জানাইলেন এবং একদিন গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে অম্বিকা কালনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়চৈতন্যের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। হৃদয়চৈতন্য প্রথমে তাঁহাকে মন্দির মার্জ্জন, বাগানে জল দেওয়া প্রভৃতি সেবাকর্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বাগানে জল দেওয়ার জন্য বহু দূরস্থিত জলাশয় হইতে মাথায় কলসী করিয়া জল বহিয়া আনিতে হইত। ইহাতে তাঁহার মাথায় ক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু দুঃখীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, মনের আনন্দে সেবাকার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। হৃদয়চৈতন্য তাঁহার এবম্প্রকার সেবাকার্য্যে নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং নাম রাখিলেন—কৃষ্ণদাস। সকলেই তাঁহাকে দুঃখী কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিতেন।

হৃদয়চৈতন্য একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"কৃষ্ণদাস! তুমি বৃন্দাবনে যাও। সেখানে শ্রীজীব গোস্বামী আছেন। আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিয়া দিব। তুমি তাঁহার নিকট ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিও এবং তাঁহার আনুগত্যে ভজন-সাধন শিক্ষা করিও। গুরুর আদেশে তিনি পদব্রজে শ্রীব্রজধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আনুগত্যে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন। এইভাবে ভজন করিতে করিতে তাঁহার মনে একদিন শ্রীরাধাগোপীনাথের নিভৃত নিকুঞ্জ লীলারস আস্বাদনের বাসনা জাগিল। তিনি শ্রীজীব গোস্বামিপাদকে তাহা জানাইলে গোস্বামিপাদ তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস নিকুঞ্জবনে ঝাড়ুদার-রূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শেষ রাত্রে আসিয়া তিনি নিকুঞ্জ বনে ঝাড়ু দেন। ঝাড়ু দিতে দিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করেন, নৃত্য করেন আর ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার এইপ্রকার শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব এবং রাধাগোপীনাথের লীলা দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর করুণা হইল। একদিন শেষ রাত্রে ঝাড়ু দিতে দিতে কৃষ্ণদাস একটী নূপুর কুড়াইয়া পাইলেন। নূপুরটীকে স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি ভাবের বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার চরণের নূপুর খুঁজিয়া পাইতেছেন না, কোথায় পড়িলা গেল। তিনি ললিতা সখীকে খুঁজিতে পাঠাইলেন। ললিতাসখী একটী বালিকার বেশে নূপুর খুঁজিতে খুঁজিতে কৃষ্ণদাসের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদাসের হাতে শ্রীমতীজীর চরণের নূপুরটী দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ নূপুরটী চাহিলেন। কৃষ্ণদাস নূপুরটী তাঁহার কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বালিকাটী উহা তাঁহার সখীর বলায় কৃষ্ণদাস যাঁহার নূপুর

তাঁহাকেই দিবেন বলিলেন। অগত্যা ললিতাদেবী ফিরিয়া গিয়া শ্রীমতী রাধারাণীকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া আসিলেন। রাধারাণী বালিকাবেশে নিকুঞ্জমন্দিরে আসিয়া কৃষ্ণদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নূপুরটী চাহিলেন। কৃষ্ণদাস ত' বুঝিয়া ফেলিয়াছেন—সেই বালিকাটী অপর কেহ নহেন, স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণী। তিনি শ্রীমতীজীকে তাঁহার চিন্ময়ী স্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। রাধারাণী কৃষ্ণদাসের হস্ত হইতে নূপুরটী লইয়া ব্রজরজে ঘর্ষণ করিলেন এবং কৃষ্ণদাসের ললাটে নুপুরটী স্পর্শ করাইলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ললাটে নূপুর-তিলক শোভা পাইতে লাগিল। রাধারাণী স্নেহভরে তাঁহার নাম রাখিলেন—শ্যামানন্দ।

ললিতাসখী তাঁহাকে বিশেষ গোপনীয় মন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্যামানন্দকে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার চিন্ময়ী রূপ দর্শন করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্যামানন্দ সেই রূপ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পরে দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম হইল শ্যামানন্দ।

হৃদয়চৈতন্য সংবাদ পাইলেন তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস নিজ নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এমনকি, তিলক পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া নুপূর-তিলক ধারণ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে অম্বিকা কালনায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস গুরুর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। হৃদয়চৈতন্য বাহ্যতঃ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যতই ভিজা কাপড়দ্বারা তাঁহার ললাটের তিলক মুছিতে থাকেন, ততই সেই তিলক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাধারাণীর এক নাম শ্যামা। তাঁহাকে আনন্দদান করিয়াছেন বলিয়া রাধারাণী স্বয়ং তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন—শ্যামানন্দ।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

দেবদেবীকে ভগবান্-বুদ্ধি—অপরাধ ও পাষণ্ডতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠার পর]

(৬) 'কালী' কি কারণে ও কোথা হতে কিভাবে আবির্ভূতা হলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীচণ্ডীতে (৭।৬) উল্লিখিত আছে,—

ভ্রূকুটি কুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী।।

অম্বিকাদেবীর তথা দুর্গাদেবীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ হতে শীঘ্র খড়্গধরা ও পাশহস্তা ভীষণ বদনা কালী বিনিঃসৃতা হলেন। চণ্ডাদি অসুরগণ অতি তমোগুণী বলে তাদের বিনাশার্থ তামসী দেবীর আবির্ভাব হল।

দংষ্ট্রা করালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। (শ্রীচণ্ডী ১১।২১)

চামুণ্ডে (কালী) বিকট দন্তবিশিষ্ট ভীষণবদনা নরমুণ্ডমালিনী ও মুণ্ডাসুর-নাশিনী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম!

অনন্তর কালী সবেগে অসুর-সেনার মধ্যে ধাবিতা হয়ে প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করতে করতে সৈন্যসমূহ ভক্ষণ করতে লাগলেন। কালীর মুখ-গহ্বরে পতিত রক্তবিন্দু হতে যে-সকল মহাসুর তথায় উৎপন্ন হল, চামুণ্ডা (কালী) তাদিগকে ভক্ষণ করলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করলেন।

'কালী' জীবের স্বরূপ জ্ঞানের আবরক বলে কালীকে 'তামসী শক্তি' বলা হয়। "অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।"—সেই অজ্ঞান-তমের মূর্ত্তবিগ্রহ কালী। কালী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করতে করতে যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য পথ-মধ্যে শ্রীশিবঠাকুর নিদ্রার ভাণ করে শয়ন করে থাকেন। কিন্তু যদি দেবী ভগবান্ হতেন, তাহলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হতেন ও শিবঠাকুর যে শয়ন করে আছেন, তাহা অবশ্যই তাঁর জানা থাকিত। কিন্তু দেবী তাহা না জেনে ও শিবঠাকুরকে না চিনে অকস্মাৎ অজ্ঞ মানুষের ন্যায় শিবের বক্ষে পা দিয়ে শিব-ঠাকুরকে চিনতে পেরে জিহ্বা বের করে লজ্জাবোধ করলেন ; ইহা কি দেবীর অজ্ঞানতার পরিচয় নয়? তিনি কি স্বামীর বক্ষে পা রেখে স্বামী-সেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, নাকি স্বামীর প্রতি অবজ্ঞার পরিচয় দিলেন? সেই দেবীকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলা যায় কি? যে দেবী স্বামীকে পদতলে রেখে মহানন্দে ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করেন, সেই দেবীকে কি স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে পতি-সুখ কামনা করেন—এরূপ বলা যেতে পারে? তমোগুণময়ী দেবীর উপাসকগণ তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও চিন্তান্বিত থাকায় তমঃগুণ ও তমোগুণের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে শক্তি কখনও তাঁর স্বামীকে নিজ পদতলে রাখতে পারেন না। কুবিষয়ি-গণই ঐ শক্তির অধীন থাকে। উহা একটী রূপক মাত্র। জীব স্বরূপজ্ঞান ব্যতীত ঐ শক্তির পাশ-মুক্ত হয় না।

যাঁহাতে চিন্তা বা ধ্যান হয়, সেই ধ্যেয় বস্তুর গুণটা চিত্তে উদিত হয়। যদি কেউ সর্ব্বদা বিষয়ের ধ্যান করে, তাহলে বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকায় বিষয়ের গুণ তার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ভগবান্ স্বয়ংই (ভাঃ ১১।১৪।২৭) বলেছেন,

—"সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তামগ্ন ব্যক্তির চিত্ত যেরূপ বিষয়েই নিমজ্জিত হয় ; সেইরূপ অনুক্ষণ মদীয় চিন্তারত ব্যক্তি আমার প্রতি আসক্ত হন অর্থাৎ আমাতেই তন্ময় থাকেন। শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।২৫।২৬) আরও বলেছেন,—"অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক', রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস', স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা—'নির্গুণ' নামে অভিহিত। এমতাবস্থায় প্রমাণিত যে, দেবী কালীর ভক্তগণ স্মৃতিভ্রষ্ট। শ্রীচণ্ডীতেও উক্ত হয়েছে,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" (চণ্ডী ৫।৭৬) অর্থাৎ দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১২-১৩) শ্লোকে ভগবদ্বাক্যে জানা যায়,—"সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমার প্রকৃতি মহামায়ার গুণকার্য্য। সে-সকল গুণে আমি বিদ্যমান নহি, কিন্তু সেই প্রাকৃত গুণগুলি আমার অধীন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত, ঐ ত্রিগুণ হতে অতীত নির্গুণ অব্যয়স্বরূপ আমাকে কেহ জানতে পারে না।" সুতরাং তামসিক দেবী কালী প্রাকৃত গুণাভিমানী হওয়ায় তিনি নির্গুণ ভগবান্ নহেন,—ইহা স্বীকার করতে আপত্তি থাকে কি?

(৭) শ্রীচণ্ডীতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৯।১০।১১ শ্লোকে আছে,—"রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য নদীতটে অবস্থানপূর্ব্বক দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী বা বালুকাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করে পুষ্প, ধূপ, দীপ, হোম ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবীর পূজা করলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হয়েছে,—"সুরথ ও সমাধি নদীতীরবর্ত্তী মেধসাশ্রমে পূজা সমাপনান্তে দেবী-প্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।" পুনরায় চণ্ডীতে ৫।৩৪ শ্লোকে মহামায়াকে চিৎশক্তিরূপে, স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে। কিন্তু শক্তি বস্তুর তথা শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারেন না। ভগবানের চিৎশক্তি অন্তরঙ্গা হতে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির গুণাদিদ্বারা ভেদ বিদ্যমান। তবে মহামায়া অচিৎরূপা হয়েও ভগবানেরই শক্তি ; তথাপি ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্গুণই। যেমন, জ্যোতির্ম্মাত্র সূর্য্যের মেঘ, অন্ধকার, হিম ইত্যাদি জ্যোতির প্রতিকূলরূপে দৃষ্ট হলেও উহারা সূর্য্যেরই। মহামায়া দুর্গাদেবী যদি চিৎশক্তিই হবেন, তবে তাঁকে বিসর্জ্জন দেন কেন? তিনি চিৎশক্তি হলে তিনি ব্রহ্ম হয়ে পড়েন। শাক্তগণের মতে, দেবী কখনও সগুণ বা ত্রিগুণময়ী, আবার কখন ত্রিগুণাতীতা বা নির্গুণ। বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তাঁর 'সিদ্ধান্তরত্নম্'-গ্রন্থে সুন্দর যুক্তির অবতারণা করেছেন,—"ব্রহ্ম কখন নির্গুণ কখন সগুণ—এরূপ অর্থ হয় না, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, তাঁহাতে বিকল্পের সম্ভাবনা নাই। অগ্নি কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল হতে পারে না।" "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—যেস্থলে প্রতিমা স্বরূপরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন, সেই প্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভক্ত কি বিসর্জ্জন দিতে

পারেন? জড়বস্তুরই বিসর্জ্জন হতে পারে, তাই দুর্গা, কালী, গণেশাদির পূজার পর বিসর্জ্জন হলে সেই পূজাকে জড়ের পূজা বললে অত্যুক্তি হবে না। দুর্গা, কালী, গণেশাদি দেবতাদিগের প্রতিমাকে জীবের ন্যায় বিসর্জ্জন করা হয়। কিন্তু 'নারায়ণে'র বিসর্জ্জন নাই,—কারণ 'নারায়ণে'র দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। নারায়ণের তথা কৃষ্ণের নাম, রূপ, বিগ্রহ—একই বস্তু-চিদানন্দময়। দেবতাদিগের প্রতি বৎসর কাঠামোতে আবাহন, প্রাণসঞ্চার ও বিসর্জ্জন হয়ে থাকে। কিন্তু 'শালগ্রামের' আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই, তাঁর অবস্থান নিত্য ; কারণ তিনি সকল দেবতার প্রাণ। প্রাণ না থাকলে যেমন ইন্দ্রিয় অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, সেইরূপ দুর্গা, কালীর অঙ্গী নারায়ণ ব্যতীত তাঁদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এমন দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাকে ভগবান্ বলা কি পাষণ্ডতা নহে?

(৮) শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,—কৃষ্ণই একবার কালীরূপ ধারণ করেছিলেন ; কিন্তু কখনও কৃষ্ণ হন নাই ও হতে পারেন না। অসিধারিণী কালী—বংশীধারী কৃষ্ণের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি—ইহা শ্রীচণ্ডীতেও স্বীকৃত। কালী বা দুর্গা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী এবং গোবিন্দের ইচ্ছাতেই তাঁরা কার্য্য করে থাকেন (ব্রঃ সং ৫।৪৪)। সেই গোবিন্দের দাসী কখনও মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ হতে পারেন না। শক্তি অর্থাৎ বিশেষতঃ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কখনও পূর্ণতম শক্তিমান্ হতে পারেন না। শাক্তগণের গীত,—'একবার অসি ছেড়ে ধর্ মা বাঁশী'—এই গীতি ভোগোন্মুখ রুচি অনুসারে কালীকে পুতুলরূপে মনোধর্ম্মের ছাঁচে রচিত ; ইহার বাস্তবতা ও সত্যতা আদৌ নাই। তাই দুর্গা, কালী—এঁদের কৃষ্ণ বা ভগবান্ বলা ভীষণ অপরাধ।

(৯) গৌর-আনা ঠাকুর ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব ; যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই জগৎকর্ত্তার অবতার —ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য। কৃষ্ণের সহিত অভিন্নহেতু তাঁর নাম 'অদ্বৈত', আর কৃষ্ণ-ভক্তি-শিক্ষক বলে তিনি 'আচার্য্য' (চৈঃ চঃ আদি)। শাস্ত্রে আরও জানা যায়,—যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই অদ্বৈতাচার্য্য (গৌঃ গঃ দীঃ ১১ সংখ্যা)। লাউর অধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত ও তাঁর পতিব্রতা সহ-ধর্ম্মিণী নাভাদেবীর পুত্ররূপে একদা মকর-সপ্তমী-তিথিতে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ও মহাপুরুষ-লক্ষণসমন্বিত হয়ে অদ্বৈত প্রভু আবির্ভূত হলেন। জ্যোতিষ পণ্ডিত শিশুর লক্ষণ দর্শন ও কোষ্ঠী গণনা করে নাম রাখলেন—'কমলাক্ষ'। তাঁহার পৌগণ্ড-লীলার একটী সত্য ঘটনা এস্থলে বিবৃত করছি।—

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন রাজার কালীমন্দিরে মহাসমারোহে উৎসব হয়।

রাজা অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে সেই উৎসবে যোগদান করত যথাস্থানে উপবিষ্ট হলেন। সেইসময় কৌতূহলাক্রান্ত কমলাক্ষও তথায় প্রবেশপূর্ব্বক কালীকে প্রণাম না করে একস্থানে উপবেশন করলেন। তদ্দর্শনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—"কমলাক্ষ! তুমি সকল জগদ্বাসীর প্রণম্যা জয়ন্তীদেবীকে প্রণাম করলে না কেন? শক্তিই সকলের আদি, তিনিই একমাত্র উপাস্যা ও প্রণম্যা—ইহা কি তুমি অস্বীকার কর?" কমলাক্ষ সবিনয়ে বলিলেন,—"রাজন্! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র আরাধ্য ও প্রণম্য। তাঁকে প্রণাম করলেই তাঁর অধীনস্থ দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ, সূর্য্যাদি সকল আধিকারিক দেব-দেবীকে প্রণাম করা হয়, কাহাকেও আর পৃথগ্‌ভাবে প্রণাম করার প্রয়োজন থাকে না এবং তজ্জন্য তাঁরা কেহই রুষ্ট হন না, পরন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম, পূজা, সম্মান না করলে সকল দেবতারা তাঁদের ভক্তদিগের প্রতিও রুষ্ট হন। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রণাম করেন না এবং অন্য কোন দেবতা কৃষ্ণভক্তের প্রণাম গ্রহণ করেন না। তবে কৃষ্ণভক্ত কোন দেবদেবীকে অবজ্ঞাও করেন না। ইহার অন্যথা করলে ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাব হয়।" রাজা ইহাতে আরও অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন,—"কমলাক্ষ, তুমি যথার্থ তত্ত্ব জান না। দেবদেবীগণ ব্রহ্মেরই রূপ, তাঁদের প্রণাম, পূজাদি না করলে মহাপাপ হয়। স্বরোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র-বংশোদ্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজা ও স্বজন পরিত্যক্ত সমাধি-নামক বৈশ্যের সময় হতে দুর্গাপূজার প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। দেবীর আরাধনায় সুরথ ও সমাধি—উভয়েরই আশা পূর্ণ হয়েছিল। সৌরাশ্বিন মাসে রামচন্দ্র অকালে রাবণ বধার্থে দুর্গাদেবীর বোধন করে পূজা করেন। তখন হতে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে।" তদুত্তরে বালক কমলাক্ষ করযোড়ে বললেন,—"রাজন্! মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণে দুর্গাদেবীর অকালবোধনের কথা কোনস্থানে উল্লিখিত নাই। কেবলমাত্র শাক্তকবি কৃত্তিবাস কল্পিত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করে রামায়ণে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় দেখিয়েছেন। স্বরূপশক্তির ছায়ারূপা ভুবনপূজিতা দুর্গাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের দাসী, তাঁর প্রভু রামচন্দ্র দাসী দুর্গার পূজা করবেন কেন? জড়জগতে পূজিত দুর্গা, কালী, গণেশাদি দেবতা মায়াশক্ত্যাত্মক।

ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবিকা যোগমায়াই ভগবৎ-সেবাপ্রার্থিণী ব্রজরাজ-কুমারীগণ-কর্ত্তৃক পূজিতা। সেই পূজায় কেবল ভগবৎ-প্রীতিকামনা ; নিজের ফল-ভোগ বা ফলত্যাগ কামনা নাই। যত অতাত্ত্বিক, অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণই ব্রজরাজ-কুমারীদের কাত্যায়নী অর্চ্চন-ব্রতের দোহাই দিয়া কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত-মূর্ত্তির পূজাকে সমর্থন করে থাকে ; তারাই কাত্যায়নীর চরণে, ব্রজরাজকুমারী-

গণের চরণে ও ভগবান্ কৃষ্ণের চরণে অপরাধী! ব্রজকুমারীরা শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর কায়ব্যূহ ; তাঁদের ধাম, দেহ—সবই চিন্ময়, কৃষ্ণপ্রীতি-কামনাই তাঁদের কামনা। জড়া দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করলে মহামায়ার দ্বারা আরও মোহিত হবেন,—প্রেমফল লাভ অসম্ভব। দুর্গাপূজায় পশুবলি হয়ে থাকে। বলিকৃত পশু ত' পশুত্ব হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করে। মুক্তির এমন সহজ উপায় থাকতে কালীপূজায় বৃদ্ধ বা মুমুর্ষু পিতা-মাতাকেই বলিদান করলেই ত' তাঁরা মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করতে পারেন।"

রাজা কমলাক্ষের ঐ সকল সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে লজ্জায় মস্তক অবনত করলেন। কিন্তু মন্ত্রী 'কুবের পণ্ডিত' রাজাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কমলাক্ষকে বললেন,—"এত বিচার-তর্কের প্রয়োজন নাই। 'সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি', বাবা কমলাক্ষ! তুমি দেবীকে একটীবার মাত্র প্রণাম কর, ইহাতে কোন দোষ হবে না।" কমলাক্ষ বললেন,—"আচ্ছা, আমি প্রণাম করছি ; দেখুন, দেবী কি করেন?" এইকথা বলে কমলাক্ষ যেইমাত্র প্রণাম করলেন, অমনি দেবী নিজপ্রভুর প্রণাম গ্রহণ করতে অসমর্থা হয়ে (প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি) সশব্দে ভূপতিত হলেন। রাজাসহ সকলেই এই অত্যাশ্চর্য্য ও অমঙ্গলময়ী ঘটনায় স্তব্ধীভূত হলেন। রাজা 'সর্ব্বনাশ হল' বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে ধরাতলে নিপতিত হলেন। কমলাক্ষ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করত পিতার সহিত পরামর্শপূর্ব্বক কালবিলম্ব না করে শান্তিপুরে গমন করলেন। রাজা কৃষ্ণ-নিন্দা করেছিলেন, কৃষ্ণদাসী দেবী কখনই কৃষ্ণ-নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণ-নিন্দা-শ্রবণে অসমর্থা দেবী প্রস্তরমূর্ত্তি হতে বহির্গতা হয়ে দেবীধামে গমন করলেন। এই ঘটনাতে দেবী কালী যে ভগবান্ নহেন, পরন্তু ভগবানের দাসী—তাহা প্রমাণিত। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

দ্রষ্টা

দ্রষ্টা, আমার দ্রষ্টা,—
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, আর ভগবান্,
মম আচরণ-দ্রষ্টা।
ওগো দ্রষ্টা আমার, সাক্ষী আমার,
আমার মরম-জ্ঞাতা!!
তোমা সবাকার, আঁখি দিঠি হ'তে,
আপন লুকা'ব কোথা?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

অন্তর্যামি হে দেবতা মোর,
জান এ মরম বিষয়েতে ভোর,
উপরে আমার, সাধুর আকার,
হৃদয়ে ছলনা পাতা!!
মোর বাক্যে ভুবনই বিশ্বনিখিল,
তা'রা ভাবে মোর কত বড় 'দিল্',
তোমরা ত' সবে, পড়িছ নীরবে,
জীবনপুঁথির পাতা!
ওহে চির সুগোপন অন্তরযামি,
নিখিল মরম-জ্ঞাতা!!
মোর জড় আঁখি, করি' নিরমাণ,
দেছ দরশন-শক্তি—
তব বিরচিত, ধরণীর রূপে,
সতত যে আনুরক্তি।
ভোগের নয়ন, সদা নিমগন,
বিশ্বের সুষমায়।
দ্রষ্টা, তোমার, ভোগ-উপচার—
তারে সে ভুঞ্জিতে চায়।।
(মোর) অন্ধ নয়ন, না হেরে তোমার,
(কোটি) ইন্দু উজল, পদ-শোভা সার,
জড় রূপ-রস, ক'রেছে বিবশ,
ভ্রান্ত চোখের পাতা।
বিশ্বের অণু-পরমাণু-মাঝে,
চিন্ময় তব সত্তা বিরাজে,
যাহা কিছু সব, তোমারি বৈভব,
সেবা উদ্দীপনা গাথা।
তব দত্ত ধনে, ধনী হ'য়ে প্রভো,
তোমারে লঙ্ঘিনু আমি।
বিশ্বাসঘাতক, আমি যে কপট,
জান অন্তরযামি।।
দ্রষ্টা আমার, সাক্ষী আমার,
নিগূঢ় মরম-জ্ঞাতা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

তোমরা ত' সবে, হেরিছ নীরবে,
(আমার) শূন্য জমার খাতা।।
অন্তরযামি, তব অন্তর,
দুর্গতিতে মম দহে নিরন্তর,
না চাহিতে আমি,
চাহ মোর স্বামি!
জয়তু করুণাদাতা।।
আমার মরম-জ্ঞাতা!!!

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

বন্ধু কে?

বন্ধু কে?—এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে হইলে বলিতে হয়, যিনি বা যাঁহারা আমাদের হিত-কামনায় বা হিত-সাধনে রত, তিনি বা তাঁহারা আমাদের বন্ধু। কিন্তু এই বন্ধুর স্বরূপ আমাদের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। "সমশীলা ভজন্তি বৈ"—এই ন্যায়ানুসারে যখন আমরা যে প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকি, তখন আমরা সেই প্রকৃতির ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করি অর্থাৎ আমাদের রুচি অনুযায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

শাস্ত্রে বিধি রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা উল্লিখিত আছে। যথা—প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থী। প্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ আপাতরুচিকর বিষয়ে আসক্ত এবং শ্রেয়ঃপন্থী লোকসমূহ নিত্যকল্যাণপ্রদ বিষয়ে অনুরক্ত। যাহারা প্রেয়ঃপন্থী, তাহারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ইন্ধনসরবরাহকারী ব্যক্তিসকলকে বন্ধুত্বে বরণ করে। আর যাঁহারা প্রেয়ঃপন্থী তাঁহারা "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া সাধুবর্ত্ম অনুসরণপূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে প্রয়াস পান। ইহাই সৎ ও অসৎ-সম্প্রদায় উৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

মুক্ত জীবের যেরূপ সেবা-প্রবৃত্তি এবং বদ্ধজীবের ভোগপ্রবৃত্তি যেরূপ স্বাভাবিকী, তদ্রূপ উহাদের পরস্পরের একনিষ্ঠতা ও বহুনিষ্ঠতা স্বাভাবিকী। এই একনিষ্ঠতা বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা এবং বহুনিষ্ঠতা-বুদ্ধিকে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলিয়া শাস্ত্রে গীত হইয়াছে।

আমরা বদ্ধজীব, সুতরাং বহুনিষ্ঠতা আমাদের স্বাভাবিকী, কিন্তু একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ যখন আমাদের এই ব্যভিচারধর্ম্ম হইতে উদ্ধারকল্পে একনিষ্ঠতা প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

করেন, তখন তাঁহাদের সেই শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যগুলির সহিত আমাদেরই মত ব্যভিচারধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিসকলের অসংলগ্ন বুলিগুলির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তগণকেই সাম্প্রদায়িক, অনুদার প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করি।

দৈবীমায়ায় বিমোহিত থাকায় শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও বুঝি না যে, সাধু ও শাস্ত্র একতানে বজ্রনিনাদে একনিষ্ঠতাই বিঘোষণ করিতেছেন। যথা,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"
"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।।"
"অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" প্রভৃতি।

এই কারণেই যখন সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই মর-জগতে আবির্ভূত হইয়া আমাদেরই আত্যন্তিক মঙ্গলার্থে আমাদিগকে দেহমনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণগ্রহণ করিতে বলিয়া গেলেন, তাহাতেও তাঁহার সেই বাক্যগুলিকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া আমরা কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, আবার কেহ বা অষ্টাঙ্গযোগী হইয়া বসিলাম। তিনি যে একমাত্র সেব্য বস্তু এবং তাঁহার সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যে একমাত্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিকী সেবা, তাহা আমাদের আদৌ উপলব্ধি হইল না।

আমাদের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সেই পরমকারুণিক কৃষ্ণ আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ নিরসনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে সেব্য এবং ভক্তিই যে সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষভাবে আচরণ ও প্রচারণ করিয়া গেলেন। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব এমনই যে, সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির কথা দূরে রাখিয়া তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদির অনুকরণে অঙ্গ-কম্পনাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহারই নাম লইয়া নানাবিধ অপসম্প্রদায়ে পরিণত হইলাম। তজ্জন্যই আজ আবার সেই গৌরশক্তি—গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সেই অসদ্‌বিষয়গুলির হস্ত হইতে পরিমুক্ত করাইয়া কৃষ্ণানুশীলনে অনুরক্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু আমরা সেই অসদ্‌বিষয়সমূহের মধ্যে একটীতে না একটীতে আমাদের নিজ অস্তিত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেও আমাদের ধারণার সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আসিয়া তাঁহার অনাবিল সত্যবাণীগুলি শ্রবণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

এ কথা একবারও মনে হইতেছে না যে, যখন ভক্ত ও ভগবান্ এই মর্ত্ত্যজগতে অবতীর্ণ হন, তখন অসুরমোহন ও ভক্ততোষণ এই এক অদ্ভুত লীলা যুগপৎ হইতে থাকে।

আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা তাহা করিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হয়। বহির্ম্মুখ জনগণের ধারণায় যাঁহারা সিদ্ধ মহাত্মা, অবতার প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যদি শ্রীহরির অভক্ত হন অর্থাৎ নিত্য-সেব্যের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহা হইলে "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ"—এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে বুঝিতে হইবে তাঁহাদিগের কোন সদ্‌গুণ নাই।

তাই বলি, ভাই, যদি কেহ শ্রেয়স্কামী থাক এবং প্রকৃত বন্ধু চাও, তাহা হইলে গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কর, দেখিবে তিনি ভিন্ন এ জগতে আর কেহ বন্ধু নাই।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর]

"অমন্দোদয়া"—যে দয়ার তুলনা হয় না, সেই দয়ার কথা বলতে গিয়েই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক উদ্ধার করেছেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

যেটা দেওয়া হয় নাই পূর্ব্বে, সেই জিনিষ বিতরণের জন্য, জগৎকে জানাবার জন্য এসেছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজে লোকশিক্ষক হয়ে। সেইটাকে ত' বলছেন ভক্তি। 'হৃষীকে গোবিন্দ সেবা'—ভগবানের দেওয়া জিনিষ, আমাদের কোন বাহাদুরি নাই। তাঁরই দেওয়া জিনিষ, তাঁর সেবায় সমর্পণ করছি। অনেক সময় আমরা অহঙ্কার করি, আমি দিচ্ছি ; কিন্তু কোন ক্ষমতা নাই আমাদের। সবটাই ভগবানের শুভেচ্ছা, শুভাশীর্ব্বাদ। তাতেই যা কিছু লাভ করি আমরা সেইটুকু ভগবানে সমর্পণ করবার বৃত্তিটাই হল ভক্তত্ব, সেইটাই হল ভক্তি। আবার সেই ভক্তিকে (রাগানুগা, রাগাত্মিকা) বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। উত্তমা ভক্তির লক্ষণের কথা গোস্বামিগণ শাস্ত্রে কীর্ত্তন করছেন।—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

অন্যাভিলাষ—ভগবৎসেবা ছাড়া ইতর বিষয়-পিপাসা, বিষয়াকাঙ্ক্ষা, জড় বিষয়াকাঙ্ক্ষা। যার চিন্তার ভিতরে ভগবৎপ্রীতি-কামনা নাই—আমি খাব, আমি থাকব, আমি বাঁচব—ঠিক এইরকম কথা। ভগবৎ-সম্পর্কবিহীন যে আকাঙ্ক্ষা, ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, জড় বিষয়াকাঙ্ক্ষা। জড়বিষয় বললে তার মধ্যে স্থূল-সূক্ষ্ম সবটাই এসে যায়—দেহগত, মনোগত সবকিছু এসে যায়। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী ইত্যাদি।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'বৈষ্ণব কে?'-নামে একটা কবিতা স্বয়ং রচনা করেছেন। যার প্রথম হচ্ছে,—"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?" এর ভিতরে বহু তত্ত্বদর্শন তিনি রেখেছেন। তাতে তিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার মধ্যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা —এই তিনটেকে এনেছেন। তিনি বলছেন, এর মধ্যে কনক-কামিনী মানুষ সাধারণ-ভাবে ছাড়তে পারে অভ্যাস করে ; কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা এমনই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাতিভাবে আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত যে ওটাকে ছাড়া ভয়ানক মুস্কিল্ কথা! হৃদয়ের কোন্ কোণে, কোন্ অন্তঃস্থলে লুকিয়ে আছে, বুঝা খুব মুস্কিল্। জড়প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উদাহরণ দিলেন শূকরের বিষ্ঠার। শূকর কি করে? অপরের পরিত্যক্ত (মল) যে জিনিষ, সেইটী গ্রহণ করে। সে আবার যখন পরিত্যাগ করছে, তখন সেটা যেমন খুবই খারাপ, ততোধিক খারাপ, জড়প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেইরূপ উদাহরণ দিয়েছেন। আবার কিন্তু এক জায়গায় বলছেন,—

"বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা,　　তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।।"

তাহলে এর তাৎপর্য্য কি? এর সামঞ্জস্য কোথায়? জড় প্রতিষ্ঠাকে নিষেধ করছেন, আবার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলছেন,—"তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।" বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ককে বলা হচ্ছে? বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা হল—আমি ভগবদ্দাস, বৈষ্ণবদাস, গুরুদাস—এই প্রতিষ্ঠা। ভগবৎ-সম্পর্কীয় বিচার, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্পর্কীয় বিচার। সেই দাসত্ব। দাস-শব্দটা শুনলে পরে আমরা অনেক সময় ঘৃণ্য নীচভাব মনে করি। বহু ব্যক্তির হৃদয়েতে এমন ভাবটা আছে। অথচ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, গৌড়ীয় গুরুবর্গের সকলেরই নামের শেষের দিকে দেখবেন অমুক দাস, অমুক দাস ইত্যাদি। দাস-শব্দটা নীচু জিনিষ, কমা জিনিষ—এইরূপ মনে করে অনেকে আবার 'দাস'-শব্দের বানান আবার একটু অন্যরকম করে লিখতে আরম্ভ করেছেন। 'দাস' মানে ভৃত্য, পরিচারক, সেটা যাতে না বুঝায় সেজন্য অনেকে দাস-শব্দের বানান লেখেন 'দাশ' অর্থাৎ প্রভু। 'দাস' এইরূপ লিখলে ভৃত্য,

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

পরিচারক, আর 'দাশ' লিখলে বোধ হয় প্রভু—এই অর্থ হয় মনে করে অনেকে এইরূপ বানান লেখেন। আমি দুই একজনকে জিজ্ঞাসাও করেছি, তাঁরা ঐ রকম ধরণেরই ধারণাটাও দিয়েছেন। কিন্তু ভগবদ্দাস যাঁরা, গুরুদাস যাঁরা, বৈষ্ণবদাস যাঁরা, তাঁরা কি কমা? বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দৈন্য আছে, সেটা ত' দাসত্ব ভাব। সেটাই ত' তাঁদের সাধারণ দৈন্য। যত ভক্তবৃন্দ আছেন, তাঁদের প্রার্থনার ভিতরে ঐরকম দেখতে পাই আমরা। পাণ্ডবগীতার মধ্যে এক জায়গায় রয়েছে,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।

কৃপাচার্য্য বলছেন,—হে লোকনাথ ভগবান্! হে কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি তোমার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য ভৃত্যের ভৃত্য বলে যদি আমায় মনে কর—এইটাই আমার স্বরূপ, আমি তাহলে বেঁচে যাই। এইজন্যই ত' কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—

অল্প করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্।।

ভগবান্ কি অল্পভাগ্যে আমাদিগকে তাঁর ভৃত্য, কিঙ্কর বলে মনে করেন? "কিঙ্করেরে দয়া কর সর্ব্বলোকে জানে।" হে ভগবান্! তোমার কিঙ্করকে তুমি দয়া করলে এটা সব লোকে জানুক যে, তুমি ভক্তবৎসল, আশ্রিতবৎসল, আশ্রিত-জনপালক। এটা দুনিয়ার সবাই বুঝুক, তোমার মহিমা-মাহাত্ম্য বিশ্বে বিঘোষিত হউক—তুমি কিঙ্করকে দয়া করেছ। ভক্তের এ দৈন্যভাব, প্রার্থনামূলক স্তব-স্তুতি রয়েছে।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ভগবান্, তিনি এলেন আচার্য্য-লীলাভিনয় করতে। তিনি কি বলে যাচ্ছেন? স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।

গোপীভর্ত্তা যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর দাসের দাসের অনুদাস আমি—এই হল আমার স্বরূপের পরিচয়। আত্মস্বরূপের পরিচয় এই। স্বয়ং ভগবান্ বলে যাচ্ছেন এটা। পার্থিব জগতের যে কালের কথা রয়েছে, এখানকার যে গুণীর গুণের কথা বলা হচ্ছে, তাতে আবদ্ধ হচ্ছেন না, হতে চাইছেন না তিনি। 'নাহং বিপ্রঃ'—এখানকার যে চার বর্ণ, চার আশ্রম, এই বর্ণী, আশ্রমী তিনি হতে চাচ্ছেন না। বললেন, ওটা

আমার স্বরূপের পরিচয় নয়। আমি ধনী নই, আমি গরীব নই ; আমি রাজা নই, প্রজা নই, গোপীভর্ত্তা যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের দাসানুদাস, দাসানুদাস। বার্ষভানবী দয়িতদাস বলে পরিচয় দিচ্ছেন একজন। অর্থাৎ আমি একল কৃষ্ণকে চিনি না, জানি না, বুঝি না। রাধার যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণের ভৃত্য আমি, ভৃত্যানুভৃত্য আমি। 'রাধার দাসীর কৃষ্ণ'—রাধার দয়িত যে কৃষ্ণ তাঁর আমি দাসানুদাস। আনুগত্যের কথা এর ভিতরে আছে। রূপানুগ গৌড়ীয় গুরুবর্গ তাঁরা স্বরূপের পরিচয় এইভাবেই জানিয়েছেন। জীবাত্মা পরমাত্মা ভগবান্‌কে ভালবাসতে চান—এটা তার স্বভাব। ভগবান্‌কে যখন আমরা ভালবাসতে পারি, তখন আমাদের ইতর প্রচেষ্টা যা কিছু সব দূরীভূত হয়। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই জড় দুনিয়াতে বসে আছি আমরা।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

সেই পর্য্যন্তই বদ্ধ জীবগণ প্রাকৃত কর্ম্মে আসক্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথায় রুচি তাদের না আসে। "মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।" ভগবান্ বলছেন,—আমার কথায় যতদিন তারা রুচিবিশিষ্ট না হবে, ততদিন তারা প্রাকৃত জগতের কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী হয়ে বসে থাকবে। আর যখন আমার কথায় রুচি আসবে, তখন জানবে ওগুলো অকিঞ্চিৎকর, কিছুই নয়। যতদিন মানুষ জড় অহঙ্কার, প্রাকৃত অহঙ্কার না ছাড়তে পারবে, ততদিন তার অপ্রাকৃত অনুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে শিক্ষাষ্টক, তার তৃতীয় শ্লোকে রয়েছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

সুতরাং ভগবানের নাম যে আমি করব, সে নাম করবার অধিকার আমার কোথায়? সে অধিকার লাভ করতে গেলে প্রথমে ত' সুষ্ঠু শ্রবণের প্রয়োজন। শ্রবণ যদি না হয়, তাহলে কীর্ত্তন করবার ক্ষমতা নাই। শ্রবণের অপেক্ষা রাখে কীর্ত্তন। আবার শ্রবণের অপেক্ষা রাখে স্মরণ। সুতরাং কৃত্রিমভাবে যে স্মরণ, সে স্মরণটা নিষিদ্ধ হয়েছে শাস্ত্রে।

আজ আপনারা বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম জগদ্‌গুরু শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন করেছেন। পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। কিন্তু জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ছে—যেটা সরস্বতী ঠাকুরও বলেছেন, সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় তিনি বলেছেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।

প্রাকৃত স্মরণপন্থী যাঁরা, প্রাকৃত স্মরণে যাঁরা আসক্ত, তাঁরা হচ্ছেন অধোপন্থী। স্মরণ কখন হবে? এটা গায়ের জোরে হবে না। আপনা হতে হবে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ সুষ্ঠুভাবে হলে পরে কীর্ত্তন করবার অধিকার লাভ হয়। সেই কীর্ত্তনকারী স্মরণের অধিকার লাভ করতে পারেন। এটা কৃত্রিমপন্থায় হয় না, সেটা বুঝাতে চেয়েছেন। জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ঐরকম কথা বলেছেন। স্মরণটা কীর্ত্তনপ্রভাবে আসে, আসবে। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ, রূপানুগ বৈষ্ণবগণ যে-সব উপদেশ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন, ভগবান্‌কে ভালবাসতে হবে —এটাই হল প্রধান কথা। সেই ভালবাসা যাতে সুষ্ঠু হয়, সেজন্যআমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ভজন-সাধন ব্যাপারে যত বাধা আছে, সেগুলো খুব যত্নের সহিত পরিহার করতে হয়, তা না হলে রুচি আসবে না, হরিনামে রুচি হবে না। কেউ কেউ বলছেন, অনেক হরিনাম ত' করি, রোজ লক্ষনাম জপ করি, কিন্তু কিছুই ত' হচ্ছে না! মালা জপ করে করে কালো করে ফেললাম, তথাপি ভগবানের নাম গ্রহণ করতে ত' ঠিক ইচ্ছা হচ্ছে না, যেন গায়ের জোরেই করতে হয়। বাধা-বিপত্তি আছে কোন জায়গায় মাঝপথে। সেইটা ওখানে বুঝবার বিষয়। ব্যবধান যেন না হয়।

"নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণকর্ত্তা বলেন প্রমাদ।।"

নাম করতে করতে অন্যমনস্ক হওয়াটা নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ ভগবানের স্মরণ নিয়েই ভগবানের নাম করতে হবে, তবে সুষ্ঠু হবে সে নাম। অন্যমনস্ক হলে হবে না। হরিনাম করতে গেলে 'ব্যবধান' বলে একটা জিনিষ আছে। সেই ব্যবধান জিনিষটা কি? উদাহরণ কি? উদাহরণ দুরকম রেখেছেন। হরি-শব্দের মাঝে যদি একটা আলাদা অক্ষর বসিয়ে দেওয়া যায়, যেমন—'হটিকরি'। হটিকরি-শব্দের ভিতরে হরি-শব্দ পাওয়া যায়, বেছে বের করা যায়। কিন্তু 'হটিকরি' 'হটিকরি' বললে হরিনামের ফলটা পাওয়া যাবে না। এ একটা ব্যবধান। আর একটা ব্যবধানের কথা বলেছেন,—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।"

'ব্যবহিতরহিতম্'—ব্যবধান ছেড়ে নাম করতে হবে। সে ব্যবধানটা কি? নামাপরাধরূপ ব্যবধান। সেটা নিয়মের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং নামাপরাধ বর্জ্জন করে যদি নাম করা যায়, তাহলে ফল নিশ্চয়ই দর্শাবে। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকবর *ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ* গত ২৪শে ভাদ্র, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১০।৯।২০০৩), বুধবার বিশ্বরূপ-পূর্ণিমা-তিথিতে মধ্যাহ্নে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে নিজ ভজনোচিত শ্রীধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধানে শ্রীসমিতির এক অপূরণীয় ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া সকলে যেরূপ ব্যথিত হইতেছেন, অপরদিকে তাঁহার পরম স্নিগ্ধ-সান্নিধ্যের চির অভাবহেতু বিরহ-ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়াতে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি পিতা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দেবনাথ ও মাতা শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী দেবীকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হন। পিতা-মাতা তাঁহার সাধূচিত লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জিতেন্দ্র-নামে অভিহিত করেন। তদানীন্তন পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কলহহেতু তাঁহারা বালক জিতেন্দ্রকে লইয়া আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বাসুগাঁও সহরের সন্নিকটে 'বান্দরছড়া'-গ্রামে উপনীত হন। পরবর্ত্তী সময়ে জেলা-সদর ধুবড়ী সহরে কলেজে বিজ্ঞান-বিভাগে অধ্যয়নকালে যুবক জিতেন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীবিশ্বরূপ দাস ব্রহ্মচারী (পরবর্ত্তিকালে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ) মহোদয়ের সঙ্গসান্নিধ্য লাভ করেন। তাহার ফলে তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ অবদানের কথা অবগত হইয়া সেই বৈরাগ্যবিদ্যায় এইপ্রকার অনুপ্রাণিত হইলেন যে, স্নাতক পরীক্ষার প্রাক্কালেই 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্রীগৌরকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতে ১৯৬৯ সালে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৯৬৮ সালে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে তন্নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার অধস্তনবর ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যুবক জিতেন্দ্রিয়কে দেখিয়া তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি পরীক্ষা করিতে সেই বিজ্ঞান-বিভাগের কলেজ-ছাত্রকে বলিলেন,—"এখানে তোমাকে ড্রেন্ পরিষ্কার করতে হবে, পারবে?" তদুত্তরে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তৎক্ষণাৎ 'অবশ্যই' বলিয়া হৃদয়ের নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে শ্রীচরণাশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক **'শ্রীজয়দেবদাস**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

ব্রহ্মচারী'-নামে অভিহিত করেন। তদবধি কায়মনোবাক্যে শ্রীজয়দেব অক্লান্তভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সকল বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিশেষ পারঙ্গত হন।

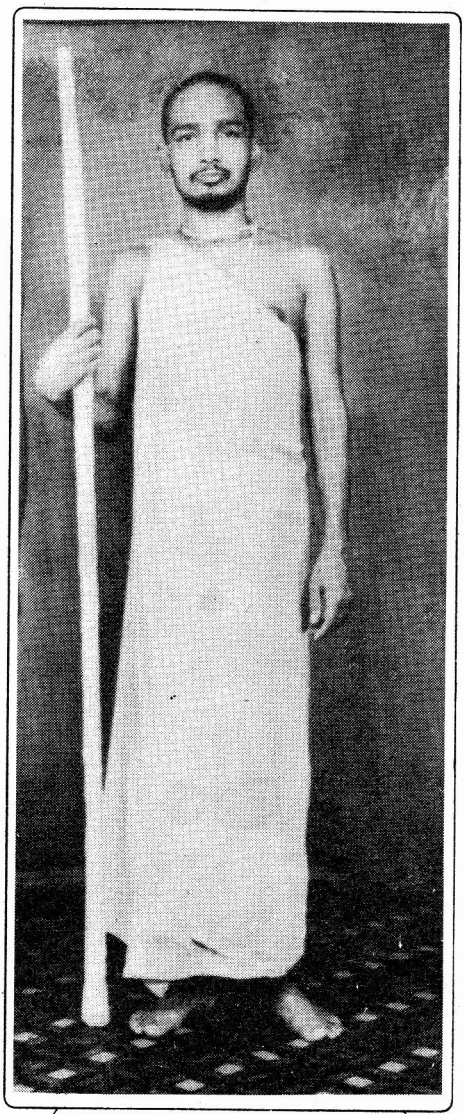

স্বধামগত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

তাহা দেখিয়া ও তাঁহার সহজ বৈরাগ্য ও নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্ব-জগতের কল্যাণবিধানের জন্য তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান-পূর্ব্বক '***শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ***'-নামে বিভূষিত করেন।

তিনি পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্য-দেবের সহিতই প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসের পর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে একটী পৃথক্ প্রচারদলের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া প্রচারকার্য্যে প্রেরণ করেন। ভারতের সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল যথা আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় প্রভৃতি তাঁহার প্রচারক্ষেত্র ছিল। বিহার-প্রদেশের ধানবাদ, বোকারো, জামালপুর, ভাগলপুর, দুমকা, মুঙ্গের, সাহেবগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ প্রভৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বহরমপুর, মালদহ, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতেন। বৎসরের ১২ মাসই তিনি এই-রূপে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেন। কুচবিহারে শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ, মেঘালয় প্রদেশে তুরা সহরে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, আসাম প্রদেশের শিলচর সহরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও

শিলচর গৌড়ীয় মঠ স্থাপন তাঁহারই নিরলস প্রচারের ফলে সম্ভব হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার অতন্দ্র সঙ্গীরূপে পূজনীয় শ্রীদামসখা প্রভুর নামোল্লেখ না হইলে শ্রীল মহারাজ তাঁহার নিত্যধামে অবস্থান করিয়াও কষ্ট পাইবেন। বাস্তবিকই তাঁহারা উভয়ে ছিলেন পরস্পর 'হরিহর আত্মা'—শ্রীল গুরু-মহারাজের ভাষায় 'মাণিকজোড়'। তাঁহার বীর্য্যবতী হরিকথা এত মধুর, প্রাঞ্জল ও সিদ্ধান্তপূর্ণ ছিল যে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার সেই মধুর হরিকথা আজও যেন আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। অহো! সেই মিষ্টভাষী মহারাজের শ্রীমুখে আমরা আর হরিকথা শুনিতে পাইব না—মনে করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

শ্রীল মহারাজ বাস্তবিকই 'তৃণাদপি' সুনীচ, 'তরোরপি' সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ ছিলেন। ইহা কিছুমাত্র অতিস্তুতি নহে—যাঁহারাই তাঁহার স্নিগ্ধ-সান্নিধ্য কিছু-মাত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তাঁহার এই সহজাত বৈষ্ণবতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অতিরূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিলেও তিনি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ মিষ্টভাষাতেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতেন। তিনি শ্রীগুরুসেবার জন্য সঞ্চিত প্রত্যেকটী পয়সা যাহাতে নিরর্থক না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টাপরায়ণ থাকিতেন। নিজের সংখ্যা-পূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণ, হরিকথা কীর্ত্তন, প্রচার প্রভৃতিই তাঁহার এরূপ প্রাণ ছিল যে, নিজের আহার-স্নান-বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়ঃশই উদাসীন থাকিতেন। তজ্জন্য যে ক্রমশঃ বিভিন্ন ব্যাধির শিকার হইতে হইত, তদ্বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ যত্নশীল হইতে দেখা যাইত না। তিনি এইরূপে তাঁহার শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

অবশেষে দেখা গেল, শ্রীল মহারাজ এক মারাত্মক ক্যান্সার-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে চিকিৎসার অতীত দেখিয়া অব্যাহতি প্রদান করিলে তিনি শ্রীখট্টাঙ্গ রাজার ন্যায়, মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লইলেন। তখন তিনি তামিলনাড়ু প্রদেশের ভেলোর সহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈদ্যবাটীস্থ শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানরত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিকট আসিয়া তাঁহার আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপশ্চাৎ তিনি শ্রীনবদ্বীপ-ধামে 'অপরাধ-ভঞ্জন-পাট' শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়ে মঠে আগমন করিলেন। করপুটে সকল বৈষ্ণবের নিকট তাঁহাকে কেবল কৃষ্ণনামৌষধ প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। তদবধি সকল বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট মহামন্ত্র কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, গোস্বামীবর্গের রচিত বিভিন্ন স্তবস্তুতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন প্রভৃতি কখনও এককভাবে ও কখনও দলবদ্ধ হইয়া সম্পাদন করিতেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪১০ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০৩

তিনি তৎকালে শয্যাশায়ী হইয়াও নিজে স্বয়ং সকল আহার-নিদ্রারহিত হইয়া নিরন্তর কখনও তুলসী-মালিকায়, কখনও উপনয়ন-সহকারে করজপ করিতে করিতে প্রায়োপবেশনে অবস্থান করেন। তাঁহার ভগবৎস্মৃতি এত অটুট ছিল যে, রোগযন্ত্রণা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। ইহা যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অপ্রকটের দুইদিন পূর্ব্বে তিনি সেবকগণের নিকট বিশ্বরূপ-পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ন্যায় তিনিও জগৎসংসার পরিত্যাগ করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প জানাইলেন। তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাঁহার নিকট দিবারাত্র মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! ক্রমশঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইলেও শ্রীমুখে হরিনাম ও হস্তে উপনয়ন ধারণপূর্ব্বক করজপ বন্ধ হইল না। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার এক-নিষ্ঠ গুরুসেবার ফল—ইহা একবাক্যে সকলেই শ্রদ্ধাবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী সে সত্যসঙ্কল্প গুরুসেবৈকপ্রাণ শ্রীল মহারাজের সঙ্কল্প অনুযায়ী তাঁহাকে বিশ্বরূপ-পূর্ণিমায় মধ্যাহ্নে ১১/৫০ ঘটিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আকাঙ্ক্ষিত শ্রীমাধ্যাহ্নিক-লীলায় আত্মসাৎ করিলেন। তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি জপমুদ্রায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিল এবং এক অপূর্ব্ব স্মিতহাসি তাঁহার ওষ্ঠে বিরাজ করিতে লাগিল—যেন তিনি এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার এই অপ্রকটের সংবাদ পাইয়া সকলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। সকল শাখামঠে ফোন-সহযোগে এই বেদনাদায়ক সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক বৈকাল ৪ টায় তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবরকে শ্রীনাট্যমন্দিরে পূজা ও আরতি করিয়া গদখালিস্থ শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে নামসঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে লইয়া যাওয়া হয়। সৎক্রিয়াসারদীপিকা-অনুযায়ী তথায় তাঁহাকে নামসঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত গম্ভীর বিরহাত্মক পরিবেশে সমাধি প্রদান করা হয়। উক্ত সমাধি আশ্রমে তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্ন্যাসী।

পরদিবস ১১।৯।২০০৩, বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের সভাপতিত্বে এক বিরহসভা আয়োজন করা হয়। সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ মহারাজের উদ্দেশ্যে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত অপূর্ব্ব গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পরদিবস ১২।৯।২০০৩, শুক্রবার এক বিরাট বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোলদ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপের সকল গৌড়ীয় মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত মহোৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজের সভাপতিত্বে আয়োজিত

বিরহসভায় অপ্রাকৃত বিরহতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রদানমুখে শ্রীল মহারাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী বর্ণন করেন এবং তিনি তাঁহার নিত্যধাম হইতে আমাদের প্রতি অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, এই প্রার্থনা করেন।

পরিশেষে শ্রীল মহারাজের সকলের নিকট এক বিশেষ সকাকু নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি তাঁহার পরমসুহৃদ্ শ্রীদামসখা প্রভুকে ও তাঁহার সেবক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন,—"আমি অনেকের নিকট অনেকপ্রকারে অসন্তোষের কারণ হইয়াছি। তাঁহাদের সহিত হয়ত' আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আপনারা আমার হইয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন—তাঁহারা যেন অহৈতুকভাবে আমাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।"

জয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ কি জয়! তদীয় ব্রজবিজয় কি জয়!

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবন

ছিয়ে ছিয়ে ছিয়ে রাজবেশ।ধ্রু।
যশোমতি নন্দ, অন্ধসম বৈঠল, নয়নে গলয়ে জলধারা।
বরজ কিশোরদল, বাট বাট ফিরত, বিহরত বাউর পারা!!
নধর গোধন-দল, কঙ্কালসার ভেল, ফুকারত শ্যামনামাভাস।
তিরণ পাদপদল, পরাণ হি তোড়ল, ছোড়ল জীওনক, আশ!!
কলাপী কলালাপী, পিঞ্জন মেলত, ন মধু বোলত শুকসারী।
রঙ্গিণী অভাগিনী, পথ পেখি' রোয়ত, তমালে মূরছ পিকনারী!!
কোমল কমলবালা, তাপে শুখায়ল, পরাণ রহুঁল অবশেষ।
সখীগণ মঞ্জরী, মরল কি জীয়ল, অবহুঁ কি কহ মথুরেশ!!

—শ্রীনন্দনন্দনানন্দ ব্রহ্মচারী

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বিগত ৫৪শ বর্ষের ও বর্ত্তমান ৫৫শ বর্ষের ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে

দক্ষিণ-ভারত তীর্থাদি দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।।"

শ্রদ্ধেয় সজ্জন-সুধীবৃন্দ!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে এবং সমিতির সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য-বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে Luxery super delux বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ (ইং ২০।১১।২০০৩), বৃহস্পতিবার সকাল ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে আহ্বান জানানো হইতেছে।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয়-স্থান

১। রেমুণা—শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ, ২। ভুবনেশ্বর—বিন্দু-সরোবর ও শ্রীলিঙ্গরাজ-মন্দির, ৩। গৌরীকুণ্ড, ৪। পুরীধাম, ৫। নন্দনকানন, ৬। সাক্ষীগোপাল, ৭। কোণারক সূর্য্যমন্দির, ৮। সিংহাচলম্—জিয়ড়-নৃসিংহ, ৯। কভুর—রায়রামানন্দ-মিলনস্থান, ১০। পানানৃসিংহ, ১১। মাদ্রাজ, ১২। মহাবলীপুরম্, ১৩। কুম্ভকোণম্, ১৪। শিবকাঞ্চী, ১৫। বিষ্ণুকাঞ্চী, ১৬। কাঞ্চিপুরম্, ১৭। মঙ্গলগিরি, ১৮। তাঞ্জোর, ১৯। পণ্ডিচেরী, ২০। চিদাম্বরম্, ২১। রামেশ্বরম্, ২২। কন্যাকুমারী, ২৩। মাদুরাই—শ্রীমীনাক্ষিদেবী, ২৪। শ্রীরঙ্গম্, ২৫। উড়ুপী—শ্রীমধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান, ২৬। শ্রীগোপাল-মন্দির, ২৭। হায়দ্রাবাদ, ২৮। বাঙ্গালোর, ২৯। উটি, ৩০। মহীশূর চামুণ্ডাপাহাড় ও মন্দির, ৩১। বৃন্দাবন গার্ডেন, ৩২। তিরুপতি, ৩৩। শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি।

নিয়মাবলী

১। দুইবেলা মহাপ্রসাদ-সেবা ও বাসভাড়া বাবদ প্রত্যেক যাত্রীকে ৭,০০০ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে। ২। বাসের সামনের ৩০টী আসনের জন্য ক্রমানুসারে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা দিতে হইবে। ৩। সিট্ রিজার্ভের জন্য যাত্রার একমাস পূর্ব্বে ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ ✆ ২৪০০৬৮
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৯ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, সোমবার, ১৪০৯, ইং ১৭/১১/২০০৩ { ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীইন্দ্র-সুরভি-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-ত্রয়োদশকম্‌"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশেঽধ্যায়ে—৪-১৩, ১৯-২১]

ইন্দ্র উবাচ,—

বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্‌।
মায়াময়োঽয়ং গুণ-সম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥১॥

(গোবর্দ্ধন-ধারণকালে অসীম-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া "আমিই ত্রিলোকের অধিপতি"—এইরূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা-জনিত লজ্জায় লজ্জিত হইয়া ইন্দ্র নির্জ্জনে সুরভির সহিত কৃষ্ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন),—

ইন্দ্র বলিলেন,—"হে দেব! আপনার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময়,

রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় । অজ্ঞানানুবন্ধজনিত, মায়াময় এই গুণপ্রবাহ অর্থাৎ সংসার আপনার নাই ॥১॥

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভোদয়ো যেঽবুধ-লিঙ্গভাবাঃ ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খল-নিগ্রহায় ॥২॥

হে ঈশ! আপনার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন আপনাতে দেহ-সম্বন্ধভূত এবং অন্য দেহোৎপত্তির মূল-কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানীর চিহ্ন লোভাদি-দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি আপনি ধর্ম্মরক্ষা এবং দুষ্টদমনের জন্য দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন ॥২॥

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্ত-দণ্ডঃ ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥৩॥

জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব-বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতার-সমূহের প্রকট করেন ॥৩॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্ ।
হিত্বার্য্য-মার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥৪॥

আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে । অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা খল ব্যক্তিদিগের শিক্ষা-স্বরূপ ॥৪॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্য-মদ-প্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্ ।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥৫॥

হে প্রভো! আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেইজন্যই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি । আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ । হে ঈশ! আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ম্মতি না হয় ॥৫॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ ভুবোভরাণামুরুভার-জন্মনাম্ ।
চমূ-পতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥৬॥

হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভার-জনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্য-সৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্যই এই মর্ত্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে । অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৬॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৭॥

আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আপনাকে নমস্কার । আপনি সর্ব্ব-অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বাসুদেব, সাত্বতদিগের অধিপতি, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

স্বচ্ছন্দোপাত্ত-দেহায় বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্ত্তয়ে ।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥৮॥

আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞানময় । অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বলিয়া আপনি সর্ব্বরূপ, সকলের মূল-কারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ । আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥৯॥

হে ভগবন্! আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠ-বিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ুদ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম ॥৯॥

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১০॥

হে ঈশ! আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব্ব নষ্ট করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম ॥"১০॥

সুরভিরুবাচ,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্ব-সম্ভব ।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥১১॥

(অতঃপর প্রশান্তচিত্তা সুরভি নিজ সন্তান গো-সমূহের সহিত গোপরূপী ঈশ্বর কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন,—) "হে অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিযুক্ত, হে বিশ্বান্তর্যামি, বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, জগৎপতি, তোমার দ্বারা আমরা গো-সকল রক্ষিত হইতেছি ॥"১১॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ।
ভবায় ভব গো-বিপ্র-দেবানাং যে চ সাধবঃ ॥১২॥

হে জগৎপতে! তুমি আমাদের পরম দেবতা, তুমি সাধুগণের এবং গো, বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র হও ॥১২॥

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্ ।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥১৩॥

হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পৃথিবীর ভারবিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ । ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা নিজেদের প্রভুরূপী তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিব ॥"১৩॥

প্রয়োজন-বিচার

বদ্ধজীবের মনোবৃত্তি

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেন না জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাবসকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার অভাবে ক্রন্দন করেন, কখনও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া হা-হুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন—আমি মরিলাম, কখন বলেন,—আমি ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে বসিয়া মনে করেন—আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কখন কতকগুলি নরসত্ত্বার হিংসা করিয়া মনে করেন আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেলগাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করত জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তি চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদান করত অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা ! এইসব কার্য্য কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এইসকল ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কোথায় হরিপ্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগজনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ, কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

পরমেশ্বরের নিকট অপরাধহেতু ত্রিতাপ

আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এখনই বা কি হইয়াছি ; এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতে আমাদের এরূপ অসদ্‌গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্ম-গ্লানিই আমাদের অপরাধ।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-সূত্রের নাম প্রীতি

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠন সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ-সূত্র, তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্‌গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র।

ভগবদ্বিস্মৃতিহেতু জীব মায়া-কারাগারবদ্ধ

জীব যখন ভ্রমজালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা-সুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎ প্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সমৃদ্ধি করিতেছে।

ধর্ম্মালোচনাই বর্ত্তমানে প্রয়োজন

এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র প্রয়োজন। যে-পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে-পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না ; কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তি ভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে।

মুক্তি সাধ্য বা প্রয়োজন নহে

মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসার-যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

প্রীতিই প্রয়োজন ও তাহার লক্ষণ

মৎকৃত দত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্।।

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটী স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক উপাধিশূন্য, তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কিভাবে কৃপা বা শক্তি লাভ হয়?

উঃ—একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে গুরুকর্ত্তৃক জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই কৃপা-শক্তি সেবাদ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে ক্রমশঃ অনর্থরাশি ধ্বংস করিতে থাকে। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে আবার অনর্থরাশি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণশক্তি ক্রমশঃ অপসৃত হয়। কোন বীজ উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল-সেচনাদি দ্বারা উহাতে অঙ্কুর বাহির হয় এবং সেই অঙ্কুর সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার গুরু-দত্ত কৃষ্ণ-শক্তি ভজনদ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন।

প্রঃ—ভক্তি ও অভক্তি কাহাকে বলে?

উঃ—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করার নাম অভক্তি। তাহা তিনটী খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। নিজের সুবিধা ও অপরের সুবিধা (ইন্দ্রিয়তর্পণ) করার নাম কর্ম্ম। সুবিধাও কর্‌ব না, অসুবিধাও কর্‌ব না, নিরপেক্ষ থাক্‌ব, ইহার নাম জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান এবং নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান উভয়কে পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজ বস্তু শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণই ভক্তি। ভোগ ও মুক্তির হাত হ'তে মুক্তিলাভ না হ'লে ভক্তির ভূমিকা আরম্ভ হয় না।

প্রঃ—দুর্ব্বলচিত্ত ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—দুর্ব্বলচিত্ত ও অপরাধী ঠিক এক শ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে

অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনারূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী ব্যক্তি কখনও ঐ সকলকে অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল, বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন।

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণ-কৃপা হইতেছে জানা যাইবে ; নতুবা কৃষ্ণ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

প্রঃ—হরিজন কাহাকে বলে?

উঃ—বর্ত্তমানে হরিজন-শব্দের অপব্যবহার হ'চ্ছে। বস্তুতঃ হরিজন ব'লতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণ, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাঁরা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউঃ না কেন, তাঁদের যে কোনরূপ বাহ্য পরিচয় থাকুক না কেন, যাঁরা সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে একান্ত হরিসেবক, তাঁরাই হরিজন। তাঁদের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষময় কৃত্য নাই। যাঁরা অবৈষ্ণব, যাঁদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁদিগকে হরিজন বলা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। যদিও স্বরূপে সকলেই নিত্য হরিজন,কিন্তু বিরূপগ্রস্ত অবস্থায় তাঁদের হরিজনত্বের পরিচয় নাই। তাঁদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁরা হরিসেবা করুন, তখন তাঁদিগকে হরিজন বল্‌তে আমাদের আপত্তি নাই। ধান্যমাত্রেই চাউল সত্য, কিন্তু ধান্যটা চাউল নহে। ধান্যের আবরণটা চলিয়া গেলেই তা'কে চাউল বলে।

জীবমাত্রেই হরিদাস বা হরিজন সত্য, কিন্তু জীব যখন হরিদাস্যে নিযুক্ত, তখনই সে হরিজন-পদবাচ্য, তৎপূর্ব্বে নহে।

প্রঃ—কেহ কেহ বলেন—সবই সমান, ইহা কি ঠিক?

উঃ—সৎ ও অসৎ, ভক্ত ও অভক্ত, পাপী ও পুণ্যবান্, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, দেবতা ও ভগবান্, সতী ও অসতী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আলো ও অন্ধকার, আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম, ভক্তি ও অভক্তি—এসব সমান কি ক'রে হ'বে?

যারা আভ্যন্তরীণ বস্তুর খবর রাখে না, বস্তু-তত্ত্বের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ বিচারে যারা প্রবেশ করে নাই, তাদের নিকট সবই ভাল। অজ্ঞ বালক বল্‌তে পারে—'তা'দের হিজিবিজি লেখার অর্থ হ'বে না কেন? অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখার যদি অর্থ হয়, তাহলে হিজিবিজিরও অর্থ হওয়া আবশ্যক।' হিজিবিজি লেখা ও অর্থসূচক লেখা উভয়কেই সমান না বল্‌লে মূর্খব্যক্তি তা'তে সাম্প্রদায়িকরা বা পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করে। যাঁরা হরিবিষয়, হরিকথা বা সত্য-সিদ্ধান্তের আন্তরিক খবর রাখেন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

না, সেইরূপ জনমতের নিকট appeal ক'রলে তাঁরা বলবেন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়াই সাম্প্রদায়িকতা, অসৎ সিদ্ধান্ত নিরাস করাটাই নিন্দা। তাঁহাদের মত এই যে—আমরা যখন কিছু জানি না, তখন সবই সমান বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াটাই ভাল। তা'তে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবে, কাহারও সঙ্গে অসদ্ভাব হ'বে না। কিন্তু সত্য ও অসত্য, ভক্তি ও অভক্তি কখনও এক হ'তে পারে না। ভক্তি যাঁদের নাই, যাঁরা ভগবৎ-সেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, প্রকৃত মঙ্গল যাঁরা চান না, ভোগ ও প্রতিষ্ঠাই যাঁদের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাঁ'দের নিকট বিদ্ধা ও শুদ্ধা ত' একই মনে হ'বে।

প্রঃ—শুদ্ধভক্তগণ গুরুকে কিভাবে দেখেন?

উঃ—গুরু সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত, অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট অন্য-রূপে। শুদ্ধভক্তের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের পরম-আত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, একমাত্র প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্যসেব্য, জীবন ও সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুস্যূত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁ'রাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব।

পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। মনুষ্যদর্শন—গুরুদর্শন নহে, তা'তে নরক হয়। গুরু লঘু নহেন, মনুষ্য নহেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ভগবানের নিজজন, তিনি মহাপুরুষ, মহাজন, নামাচার্য্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

প্রঃ—আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট-পূরণ হ'চ্ছে না কেন?

উঃ—ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য দোষদৃষ্টি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমরা তাঁর চরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারি নাই। বেদবাক্য, ভগবদ্‌বাক্য, গীতাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানে শিলা-পাথর-কাঠ-মাটি-বুদ্ধি করার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা।

প্রঃ—জীবের কৃত্য কি?

উঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই কামদেব—সকলের একমাত্র নিত্য সেব্য। তাঁ'র সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা কৃত্য। ভগবৎসেবার কথা ভুলিয়া গিয়াই জীব কখনও 'হাম খোদাই' বুদ্ধি লইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী হয়, কখনও বা ভোগী সাজিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তা'র প্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়ে। এইজন্যই বলি—হে জীবগণ! আপনারা দম্ভ, স্ত্রীপূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিয়োগ করুন। ব্রজগোপীর আনুগত্যে অনুক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হউন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

প্রঃ—শ্রীনাম-গ্রহণকালে জড়চিন্তা আসে কেন ?

উঃ—গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-গ্রহণকালে জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে। তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরমমঙ্গলময়-স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

প্রঃ—কি ক'রে সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

উঃ—যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁরা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বদা সেই সব আলোচনা করেন। যাঁরা ভগবানের সুখের জন্য সেবা করেন, তাঁদের সঙ্গ ক'রলেই মঙ্গল হ'বে। ভক্তগণ নিজের সুখের জন্য ভগবৎ-সেবার ভাণ করেন না। তাঁ'রা ইহকালের সুখ, পরকালের সুখ, দেহ-গেহাদির সুখ, এমন কি মুক্তিও চান না। তাঁরা 'ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে' সতত ভগবানের সেবা করেন। সেই সেবাপ্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। ভক্তগণ সতত ভগবান্ ও তদ্ভক্তের প্রতি প্রীতিযুক্ত। নিজ দেহে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিতে, গৃহ, গৃহস্থিত আত্মীয়-স্বজনে বা নিজ বন্ধুবান্ধবে তাঁদের প্রীতি নাই। ভক্তগণ ভগবানেই প্রপন্ন। ভক্তগণ ভগবান্‌কেই সার ক'রেছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তের প্রীতিতে আবদ্ধ হ'য়ে নিজে সারাৎসার বস্তু হয়েও সেই ভক্তগণকেই সার ক'রেছেন।

গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সেবাদ্বারাই সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নষ্ট-প্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।

প্রঃ—শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণে অর্থদান কি মঙ্গলকর?

উঃ—বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের ভোগবিলাস-গৃহ নির্ম্মাণের বিচার অপেক্ষা সেই অর্থদ্বারা ভগবৎ-সেবা করা, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা বা ভগবানের সেবামন্দির নির্ম্মাণ করার সুবিচার ও সুবুদ্ধি যে কত অধিক শ্লাঘ্য, কত মহামঙ্গলকর, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা যমদ্বারে যান না ; পরন্তু বিষ্ণু-দূতকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।

প্রঃ—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কে?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

উঃ—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-দাস ছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁর প্রবল অভিমান—তিনি শ্রীরূপানুগ, তিনি স্বরূপ-রূপের কিঙ্কর, স্বরূপের রঘু তিনি, মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠের প্রেষ্ঠ তিনি, স্বরূপ-রূপের পরমপ্রেষ্ঠ তিনি। শ্রীরঘুনাথ শ্রীরাধাগোবিন্দের বড় প্রিয় সেবক। শ্রীরূপ মঞ্জরীর সাহচর্য্যে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন।

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যদাসাভিমান থাকিলেও শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরূপের কিঙ্করাভিমান অধিকতর প্রবল। শ্রীবার্ষভানবীর সেবার কথা এরূপ প্রগাঢ়-ভাবে আর কি কেহ বলিয়াছেন?

প্রঃ—গৃহস্থ-ভক্তের বিচার কিরূপ হইবে?

উঃ—গৃহস্থভক্ত মনে রাখিবেন—গৃহটী শ্রীকৃষ্ণের এবং তিনি তাঁহার পাল্য কুক্কুররূপে গৃহে আছেন। "ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি। তোমার সংসারে আমি বিষয়প্রহরী।।" শ্রীকৃষ্ণকে গৃহের প্রভু জানিয়া সর্ব্বস্ব দিয়াই তাঁহার সেবা করিতে হইবে। গৃহব্রতগণ শ্রীহরি ও শ্রীগুরুকে পূজ্যবুদ্ধি করে না। তাহারা শ্রীগুরু ও শ্রীবিগ্রহকে অন্য বস্তুসামান্যে দর্শন করে। যাঁহারা গৃহব্রতবুদ্ধি ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণনাম করিতে পারেন। গৃহাসক্তি না ছাড়িলে, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ না করিলে, গুরু-কৃষ্ণের না হইলে কৃষ্ণনাম হয় না।

প্রঃ—কোথায় শ্রদ্ধা করিতে হইবে?

উঃ—জগতের সকল কথা ছাড়িয়া আমাদিগকে গুরুর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ গুরু-কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না —মঙ্গললাভ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকেই ভগবানের নিকট যাইবার একমাত্র উপায় ও নিত্যবান্ধব বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধা-শব্দে Full confidence in the words of Shri Gurudeb. We have got no reliance in the words of the so-called gurus or religious reformers or pretenders.

সাধুগুরুর সঙ্গ করিলেই অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে—শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে। এজন্য We should have implicit reliance in Shri Gurudeb in order to approach and serve the Absolute Person.

A sadhu is he who will relieve me from all puzzling doubts. A sadhu will give me the highest good. I shoud make friends with such a real Guru who is really wishing my highest good. If perchance we meet a real Guru then we must be saved and must be able to

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

reach our goal. He will always supply and enrich us with transcendental knowledge and service.

প্রঃ—অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—যেমন আনুগত্য ও তোষামোদ এক নহে, তদ্রূপ অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। অনেকে অনুকরণ কার্য্যকে অনুসরণ ব'লে ভ্রম করেন। দু'টী কথা—অনুকরণ ও অনুসরণ। যাত্রার দলের নারদ সাজা—অনুকরণ, আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ও আচরিত ভক্তিপথে গমন—অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরণ, আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ।

আমরা মনে করি—আমরা অনুসরণ কর্‌ছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক'রে বস্‌ছি। অনুসরণ—নিজের আচরণ। কেবল অনুকরণ-কার্য্যের দ্বারা অনুসরণ-কার্য্যটা হবে না। অনুকরণ (Imitation)—বিকৃত প্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। অনুকরণ ও অনুসরণ-কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকি সোণা (Chemical gold) ও খাঁটি সোণা (Pure gold) বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা একপ্রকার। অনুকরণকে অপর ভাষায় ঢং বলে। আমাদের হৃদয়ে বিপ্রলিপ্সা-নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তার দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা অনুকরণ ক'রে থাকি। শ্রৌতপথের অনুকরণ মাত্র হ'লে অনুসরণ হয় না। অনুকরণ-কার্য্যদ্বারা অনুসরণ হয় না বলিয়া সে-কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। (ক্রমশঃ)

কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য

বদ্ধজীবের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাকাঙ্ক্ষামূলে যে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান তাহা কর্ম্মকাণ্ড, আর ভগবদ্ভক্তের ভগবৎসেবার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠানসমূহ, তাহা নৈষ্কর্ম্ম্য। আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকাণ্ড এবং ভগবৎসেবারূপ নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানমূলে আত্মসুখবাঞ্ছা আছে, কিন্তু কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার মধ্যে যে-সকল বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান, তাহা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ভগবৎসেবার অমিশ্র অঙ্গবিশেষ। যেখানে ফলভোগেচ্ছা অপস্বার্থপরতায় নীত হয়,সেখানেই উহা কর্ম্মকাণ্ড, আর যেখানে ভগবৎসেবা অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির জন্য চেষ্টা, তাহা কখনই কর্ম্মকাণ্ডের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড—ফলভোগময়। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের তোষণ হয়, সেইসকল কার্য্যে বদ্ধজীবগণের প্রবৃত্তি বা রুচি। কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্ম্মফলেই দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলে কর্ম্ম। এই কর্ম্মবন্ধন হইতে

মুক্তি বা নিষ্কৃতির অবস্থাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' বলা হয়। যেখানে কর্ম্মকারীই ফলভোক্তা, সেইস্থানে কর্ম্ম ব্যতীত নৈষ্কর্ম্ম্য বা সেবার কোন সন্ধান থাকিতে পারে না। কর্ম্মস্পৃহা—ব্যভিচারিণী বারবনিতার ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য লালায়িতা, আর নৈষ্কর্ম্ম্য বা সেবা—সতী-সহধর্ম্মিণীর ন্যায় ভগবানের সন্তোষ বিধানে নিযুক্তা। শুদ্ধ চিদ্বিলাসের অভাবের নিমিত্তই কর্ম্মের শুষ্কতা, তাহা ভোগময় জড়েই আবদ্ধ। "ধনং দেহি, জনং দেহি" সকলই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কর্ম্ম, কখনই 'নৈষ্কর্ম্ম্য'-পদবাচ্য নহে।

কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনিত্য। প্রাকৃত জগতেই স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিযুক্ত কর্ম্মসমূহের অধিষ্ঠান। মায়াবদ্ধ জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড কর্ম্মের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। মায়ারই বৃত্তিবিশেষ 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্ম-বাসনার উৎপত্তি, আবার সেই কর্ম্মবাসনা হইতে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের সমস্ত জাগতিক কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই অবিদ্যা, ইহাই জীবকে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ গর্ত্তে নিপতিত করিয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করাইতে করাইতে নানাপ্রকার কর্ম্মসমূহে নিয়োজিত করিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করায়। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, যণ্ডবিষ্ঠা সেরূপ করে না ; তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখচেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

জীবনধারণপূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্মের দ্বারা জাগতিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ ভোগই সংগৃহীত হয়। কর্ম্মের ফলাফল অনুসারে ভোগেরও ফলাফল অবশ্যই অনুভূত হয়। যেমনই কর্ম্ম করা হয়, অনুরূপ ভোগই লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম ত্রিবিধ—বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও শুভকর্ম্ম। শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণকেই বিকর্ম্ম বা পাপ বলা হয়। শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অপালনই অকর্ম্ম। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম—উভয়ই মন্দ অর্থাৎ অশুভ, অতএব ত্যাজ্য। বিকর্ম্মের দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের অকল্যাণ হইয়া থাকে। বুদ্ধিবিপর্য্যয়ই বেদবহির্ভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান কারণ।

যে কর্ম্মের দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের মঙ্গল সাধিত হয় এবং পারত্রিক স্বর্গসুখাদি লাভ হইয়া থাকে, তাহাই শুভকর্ম্ম। শুভকর্ম্ম তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। হেয়ত্ব ও উপাদেয়তা বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্র শুভকর্ম্মসমূহকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। কামনাপূর্ব্বক যে-সকলকর্ম্ম কৃত হয়, তাহাকেই কাম্যকর্ম্ম বলা হয়। যেমন, সন্তান লাভার্থে ষষ্ঠীপূজা, সর্পদংশন হইতে রক্ষার্থে মনসাপূজা, ধনপ্রাপ্তির আশায় লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া অত্যন্ত হেয় ও অধম,

অতএব পরিত্যজ্য। বিশৃঙ্খল বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মকারী ভোগিগণকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্তই কাম্যকর্ম্মসমূহ ত্যাগ করত তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে নিযুক্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাহাতে সুন্দরভাবে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তদভিপ্রায়ে শাস্ত্রকারগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্ব্বক 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যে-সকল কর্ম্ম নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়াও নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। মৃত পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ এবং পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত—এই সমস্তই নৈমিত্তিক। আবার অনাবৃষ্টিরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করাই বিধি। যজ্ঞাদির দ্বারা অর্জ্জিত পুণ্যফলে পরিমিত বৃষ্টি হইলে শস্যাদি পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে জগতে দুর্ভিক্ষাদি হইতে পারে না। শরীর ও মনের দ্বারা সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলে। সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি, পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য-পালন—এইসকলই নিত্যকর্ম্ম। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। কর্ম্ম যেহেতু কখনই নিত্য নয়, সেইহেতু নিত্যকর্ম্ম কি করিয়া নিত্য হইতে পারে? ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মকে উপচার বলা হয়। 'উপচার' অর্থে বিধান, তাহা কখনও নিত্য নহে। উপচার বলিতে শারীরিক ও ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা। তাত্ত্বিক-বিচারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্য ও তপস্যা প্রভৃতি নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। বদ্ধজীবের মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক 'নিমিত্ত', এই নিমিত্তের জন্যই ঐ সকল কর্ম্ম 'ধর্ম্ম' হইয়াছে।

কর্ম্ম করিতে হইলেই ত' প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে হইল এবং কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য—সুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম আর কর্ম্ম। কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ফলভোগকামী হইয়া কর্ম্মসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধি, শুভাশুভ ও গুণদোষ বিচার করেন। পারমার্থিকের বিচার উহাতে আবদ্ধ নহে। শুভাশুভ উভয় কর্ম্মই কৃষ্ণভক্তির বাধক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ হয় জীবের এক অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম।। (চৈঃ চঃ)

পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মিগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মগুলিকে নিষ্কামভাবে করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া যে ধারণা পোষণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কর্ম্মবন্ধন নাশ হয় না বলিয়া তাহা কখনই নৈষ্কর্ম্ম্য পদবাচ্য নহে। কর্ম্মমাত্রই কামনা হইতে জাত হইয়াছে বলিয়া কোন কর্ম্ম কামনাশূন্যভাবে কৃত

হইলেও ফলদানই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। স্বর্গাদি-ফলাভিলাষপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান অতি নিন্দিত, কিন্তু এই সংসারে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবও দেখা যায় না, কেননা, বেদাধ্যয়ন বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান সবই কাম্য ফললাভের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার (২।৪) "অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে" শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়,—"অকামী ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ কোন কর্ম্মই ইহজগতে পরিদৃষ্ট হয় না। (এই পৃথিবীতে) কি লৌকিক, ভোজন-গমনাদি, কি বৈদিক জ্যোতিষ্টোমযাগাদি যাহা কিছুই প্রাণী করে, তাহার সবই কামনার অভিব্যক্তিরূপেই সাধিত হয়।"

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম যে পুণ্যের নিমিত্ত কৃত হয়, তাহা নশ্বর বলিয়া শাস্ত্র ঐ কর্ম্মদ্বয় হইতেও পরিশেষে বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরতির উপদেশ করিয়াছেন। বিরত-কর্ম্ম পুরুষকে আবার তীর্থপদের সেবাকর্ম্ম অর্থাৎ ভগবানের ভক্তি করিবার উপদেশ—ইহা শ্রীভাগবতের "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে" শ্লোক হইতে জানা যায়। কর্ম্মমিশ্রা চেষ্টাই কেবলাভক্তিতে পরিণত হইলে জীবের ঐকান্তিকতা হয়, তখন কৃষ্ণার্থে যে অখিলচেষ্টা দেখা যায়, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি না হইয়া কেবলা ভক্তিরই পূর্ব্বানুষ্ঠান নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্র। জীবগণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যকে বরণ করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই কর্ম্মবিধানে নানাবিধ ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। "নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" (ভাঃ ১১।৩।৪৬)। "তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ" (ভাঃ ১।৩।৮)।

জীবের স্বরূপজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। জীবের নিত্যস্বভাব কৃষ্ণসেবা-তৎপরতা। বাস্তববস্তু কৃষ্ণের নিত্যসেবায় হেয়তা, অবরতা, আদান-প্রদান বিনিময় প্রথা, স্ব-ভোগবাঞ্ছা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, দেহ, দ্রবিণ কোনটীরই স্থান নাই বলিয়া তাহা শুদ্ধভক্তি নামে অভিহিত ; তাহা কখনই 'কর্ম্ম' পদবাচ্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র "বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়াঃ সৈব ভক্তিঃ" শ্লোকে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রে শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের আদেশ রহিয়াছে, তাহা কর্ম্ম-শব্দবাচ্য নহে, তাহা ভক্তি নামে অভিহিত।" অতএব শ্রীভগবৎসেবারূপ কর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিই প্রকৃত নিষ্কর্ম্ম নামে অভিহিত। নিষ্কর্ম্মের ভাবকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। "নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধনহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্ম্মাণি তেষাং ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণামেব মোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্টে ইত্যর্থঃ।" (শ্রীধরস্বামী)। শ্রীহরির প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার ফলভোক্তা শ্রীহরি স্বয়ং হওয়ায় কর্ম্মকারীকে কোনরূপেই কর্ম্মফলরূপ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন স্বীকার করিতে হয় না। আনন্দময় ভগবানের সেবায় জীব-হৃদয়ে নিরানন্দের কোন অবকাশ নাই। ভগবদ্ভক্ত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

সর্ব্বদাই হৃদয়-সিংহাসনে ভগবান্‌কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন, সুতরাং নিজভোগ কামনা তাঁহাকে কোনকালে ক্লেশ দিতে পারে না।

ভক্তিরূপ নৈষ্কর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ এবং তাহাই পরম কৃত্য। নৈষ্কর্ম্ম্য ভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া নিত্য বস্তু, তাহা লাভ হইলে কখনই বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। আত্মধর্ম্মানুশীলনকারী শুদ্ধভক্তগণই একমাত্র সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের অধিকারী। পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর স্থূল দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বুভুক্ষু অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধবুদ্ধি মুমুক্ষু জ্ঞানী সেই নিত্য নৈষ্কর্ম্ম্যের সন্ধান পাইতে পারেন না, যেহেতু অনিত্য চেষ্টাদ্বারা নিত্যবস্তু কখনও প্রাপ্তব্য নহে। এমনকি, মুক্তপুরুষগণও যদি ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া জড়োপাধি বিনাশের জন্য নৈষ্কর্ম্ম্য ফলভোগরাহিত্য বিচার করেন, তাহাও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (১০।২।৩২) "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন" শ্লোকে দেবগণ ভগবানের স্তবে বলিয়াছেন,—"হে পদ্মলোচন হরি! নৈষ্কর্ম্ম্যাশ্রয়ী আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন-ফলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসন্ন্যাসযুক্ত মুক্তিপদ লাভ করিয়াও আপনার সেবারূপ নৈষ্কর্ম্ম্যকে অনাদর করার জন্য অধঃপতিত হন।"

ভগবৎসেবাবর্জ্জিত ভোগ-ত্যাগাদি প্রবৃত্তিরহিত নিরুপাধিক জ্ঞানও জীবের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। আর যে-সকল বদ্ধজীবের নশ্বর ক্রিয়া ভগবদুদ্যেশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় অমঙ্গল ও অধমতা সংগ্রহে নিযুক্ত, তদ্দ্বারা আর কি ফল হইবে? শ্রীভাগবতের (১।৫।১২) "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান যদি বিষ্ণুভক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহা যথাযথরূপে শোভাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং যে কর্ম্ম সাধনকালে ও ফলকালে সর্ব্বদা দুঃখাত্মক, তাদৃশ কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম হইলেও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারে?"

ভক্তিহীন কর্ম্ম যে বৃথা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের কখনও উপদেশ দেন না। হরিসেবা-কর্ম্ম নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বরভোগ প্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তিনি কখনই চরমমঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হন না। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে অপর বস্তুর ভোগ আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ভগবানের মায়া জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, আবার ভগবৎপ্রবৃত্তিই জীবকে ভোগপ্রবৃত্তিরহিত করিয়া নিত্য সেবাপ্রবৃত্তিতে অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যে অবস্থিত করায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

অলৌকিক

[২৩]

কর্ণাটদেশে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র হয়। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। কুমারদেবের তিনটী পুত্র—অমরনাথ, সন্তোষ ও অনুপম অর্থাৎ সনাতন, রূপ ও বল্লভ। ইঁহারা মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে বাস করেন এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন।

নন্দগ্রাম ও যাবটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে টেরিকদম। টেরিকদম্ব বৃক্ষতলে শ্রীরূপ গোস্বামী ভজন করিতেন। একদিন জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামী টেরিকদমে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলীতে উপস্থিত। রূপের মনে ইচ্ছা হইল, সনাতনকে আজ একটু পরমান্ন ভোজন করাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু পরমান্ন ভোজন করাইতে হইলে ত' চাউল, চিনি, দুধের প্রয়োজন। তিনি ত' বিরক্ত বৈরাগী। তাঁহার ত' কিছুই নাই। কি করিবেন—মনের কথা মনেই রহিল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তখনই একটী গোপবালিকা চাউল, চিনি, দুধ লইয়া উপস্থিত হইয়া রূপ গোস্বামীকে ডাকিয়া কহিলেন,—'গোঁসাই! তুমি মাধুকরী করিতে যাও নাই কেন? কি বা ধ্যান কর? আহারও ত' একটু প্রয়োজন। এই নাও, আমি দুধ, চিনি ও চাউল আনিয়াছি। আজ একটু পরমান্ন রান্না কর।'

শ্রীরূপ গোস্বামী কি করিবেন, না করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন গোপবালিকাটী বলিলেন,—"ওঃ বুঝিয়াছি। তুমি বৈরাগী মানুষ। রান্নাবান্নায় তত অভ্যস্ত নও। যাক্, আমিই পরমান্ন রান্না করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া বালিকাটী পরমান্ন রন্ধন করিয়া দিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন—রূপ গোস্বামী আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না! কি আর করিবেন। তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সেই পরমান্ন ভোগ দিলেন। সেই পরমান্নের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া গেল। ঠাকুরের ভোগের পর তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ সম্মান করাইলেন। সনাতন গোস্বামী সেই পরমান্ন প্রসাদ পাইয়া ভাবে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রূপ! এই প্রসাদ তুমি কোথায় পাইলে, বা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিলে?" শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার মনের বাসনা এবং গোপবালিকার কথাসমূহ তাঁহাকে বলিলে সনাতন বলিলেন,—"রূপ! ঐ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

বালিকাটী কে জান? উনি ত' স্বয়ং রাধারাণী। তোমার মনের বাসনা পূরণের জন্য তিনি স্বয়ং হাঁটিয়া আসিয়া পরমান্ন রন্ধন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আহা! আর কোনদিন তুমি বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণীকে এইরূপ কষ্ট দিও না। তুমি প্রত্যহই মাধুকরী করিতে যাইও। কারণ রাধারাণী এখানে কাহাকেও অভুক্ত রাখেন না।" এই বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া জয় রাধে, হে রাধে বলিতে বলিতে দুই ভাই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

[২৪]

পুরী হইতে ১৫ মাইল দূরে আলালনাথ। সত্যযুগে ব্রহ্মা এখানে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতি নির্জ্জন এই স্থানে কয়েকজন দিব্যসূরি ভজনের জন্য দক্ষিণদেশ হইতে আগমন করেন এবং ভজনের এই অনুকূল স্থানে শ্রীনারায়ণের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেবাপূজা করিতে থাকেন। নারায়ণ চতুর্ভুজ। দিব্যসূরি-গণকে 'আলোয়ার' বলে। আলোয়ারগণের নাথ বা প্রভু বলিয়া এইস্থানের নারায়ণের নাম 'আলোয়ার নাথ'। এই আলোয়ারনাথের সংক্ষিপ্ত নাম 'আলালনাথ'। বিগ্রহের নামানুসারে স্থানটীর নাম আলালনাথ হইয়াছে।

যাহা হউক, একটী বালক আলালনাথে আসিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। বালকটীর পিতাও থাকেন ও পূজা করেন। কিন্তু বালকটীর পূজা আন্তরিক। সে আর্ত্তিসহকারে পূজা করে, ভোগ নিবেদন করে এবং আত্মনিবেদনপূর্ব্বক ঠাকুরের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তাও বলে। নারায়ণের অর্থাৎ আলালনাথেরও বালকটীর সেবা না হইলে সন্তুষ্টি হয় না। বালকটী একদিন ভোগ নিবেদন করিয়াছে। চতুর্ভুজ আলালনাথ আনন্দমনে চারিটী হস্তদ্বারাই সমস্ত ভোগ খাইতে লাগিলেন। বালকটীর পিতা ইহা দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন,—নারায়ণ বিগ্রহ যদি প্রত্যহ এইরূপ সবই খাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমরা কি খাইয়া জীবনধারণ করিব? এই বলিয়া তিনি তখন নারায়ণের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং সমস্ত খাইতে বারণ করিলেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ নির্ব্বংশ হইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র ঐ বালকটীর বৈকুণ্ঠগতি হইল। তখন আলালনাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্নে বলিলেন,—"মহারাজ! আমার সেবার জন্য তুমি সেবকের ব্যবস্থা কর।" স্বপ্ন পাইয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সেখানে ব্রাহ্মণ পূজারী প্রেরণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পূজারীর বংশধরগণ অদ্যাবধি আলালনাথের সেবাপূজা করিয়া আসিতেছেন।

অনবসরকালে জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া সকল ভক্তগণকে ছাড়িয়া আলালনাথে গেলেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিগ্রহের সম্মুখে একটী বিরাট পাথর ছিল। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেই পাথরে বার বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতেন। তাঁহার

শ্রীঅঙ্গস্পর্শে ও ঘর্ষণে পাথরটী স্থানে স্থানে গলিয়া যায়। এখনও মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-চিহ্নযুক্ত বিরাট্ পাথরটী সেখানে রহিয়াছে।

[২৫]

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট অবিদিত নহে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নই প্রতাপরুদ্র-রূপে আবির্ভূত হন। প্রতাপরুদ্রের রাজধানী উড়িষ্যার কটকে অবস্থিত ছিল। তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা হইয়াও অত্যন্ত নিরভিমানী পরমভাগবত ছিলেন। তাঁহার গুরুদেব ছিলেন—পুরুষোত্তমধামের শ্রীকাশী মিশ্র। তাঁহার অতুলনীয় গুরুসেবা ও নিষ্ঠার কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই।—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে।।
নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৮১-৮২)

তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্রের পিতৃদেব ছিলেন শ্রীপুরুষোত্তমদেব। শ্রীপুরুষোত্তমদেব নিজের ক্ষমতায় উড়িষ্যারাজ্যকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের একান্ত শরণাগত ভক্ত ছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবা তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব ছিল। তিনি এমনই ভক্ত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং জগন্নাথ ও বলরাম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণে আমাদের ভক্তি অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে—সন্দেহ নাই।

কাঞ্চীনগরের রাজকুমারীর সহিত শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। রাজকুমারীর নাম পদ্মাবতী। পুরীতে পাত্রের গৃহে পাত্র দেখিবার জন্য এবং পাকা কথার জন্য পদ্মাবতীর পিতা কাঞ্চীরাজ আসিয়াছেন। সেইসময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপস্থিত। রথযাত্রার প্রচলিত নিয়ম—পুরীর রাজা প্রথমে সোণার ঝাড়ু দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবেন, তারপরেই রথ টানা আরম্ভ হইবে। রাজা পুরুষোত্তমদেবও প্রচলিত প্রথানুসারে রথযাত্রার প্রাক্কালে সোণার ঝাড়ু দিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এই ঝাড়ুপ্রদানরূপ সেবাকার্য্য দেখিয়া অভিমানী কাঞ্চী-রাজ ভাবিলেন—"এ কি ব্যাপার! পুরুষোত্তমদেব ত' ঝাড়ুদারের কার্য্যে রত। ইহা ত' অন্ত্যজ অস্পৃশ্য চণ্ডালের কাজ। ছিঃ! ছিঃ! ইহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ আমি কোনমতেই দিতে পারি না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি এই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কাঞ্চীরাজ গণেশের ভক্ত ছিলেন। তিনি গণেশের আরাধনা করিতেন। জগন্নাথের প্রতি তাঁহার তদ্রূপ ভগবদ্বুদ্ধি বা বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। পুরুষোত্তমদেব যখন এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। বিশেষ করিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে কাঞ্চীরাজের অপরাধসূচক মনোভাব বা অশ্রদ্ধভাব জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত লইয়া তিনি যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা—তিনি পরাজিত হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে পর তিনি জগন্নাথদেবের নিকট আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিলেন,—'যাও, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার সহায়তা করিব। কোন চিন্তা নাই।" জগন্নাথদেবের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমদেব পুনরায় যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। পুরী হইতে ১২ মাইল দূরে আনন্দপুর গ্রাম। রাজা সেই গ্রামের উপর দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটী গোয়ালিনী দৌড়াইয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—"রাজা মহাশয়! আপনার দুইটী সৈনিক ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার নিকট দুধ, দুই, ঘোল খাইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট পয়সা ছিল না বলিয়া মূল্য বাবদ এই আংটী দুইটী দিয়া বলিলেন,—মা! আমাদের নিকট পয়সা নাই। এই দুইটী আংটী রাখুন। আমাদের রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেব আসিতেছেন। তাঁহাকে এই আংটী দুইটী ফেরৎ দিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে দুধ, দুই, ঘোলের প্রকৃত মূল্য লইবেন।" এই বলিয়া গোয়ালিনী রাজা পুরুষোত্তমদেবকে আংটী দুইটী দিলেন। রাজা আংটী দেখিয়া চিনিলেন—এ যে জগন্নাথ-বলরামের হাতের আংটী। তিনি বুঝিলেন, স্বয়ং জগন্নাথ-বলরাম তাঁহার সৈনিক হইয়া যুদ্ধে চলিয়াছেন। তাঁহার দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। রাজা গোয়ালিনীকে কহিলেন,—"মা! তোমার জন্ম সার্থক। আমাকে তুমি কি দেখাইলে?" তিনি গোয়ালিনীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন—যাহাতে তাহার আর জাগতিক কোন কষ্ট না হয়।

তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই যুদ্ধে কাঞ্চীরাজের পরাজয় ঘটিল এবং পুরুষোত্তমদেব জয়ী হইলেন। তিনি কাঞ্চীরাজের মাণিক্য-সিংহাসনটী লইয়া আসিলেন এবং তাহা জগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজার পূজিত গণেশকেও তিনি পুরীধামে লইয়া আসিলেন। ভক্তরক্ষক দর্পহারী জগন্নাথ কাঞ্চীরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া ভক্তবাৎসল্যের নিদর্শন প্রকাশ করিলেন। কাঞ্চীরাজ তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে পুরী লইয়া আসিয়া রথযাত্রা-কালে সমাদরে পুরুষোত্তমদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

দেবদেবীকে ভগবান্-বুদ্ধি—অপরাধ ও পাষণ্ডতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর]

(১০) পুরাকালে ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত হরিদ্বারে গণ্ডকী নদীর তীরে আরাধনাকালে নদীর জলে পতিত এক হরিণীর শাবককে বাঁচিয়ে সেবা-যত্নে লালন-পালন করেন ও মৃত্যুর সময় সেই হরিণ-শিশুটির চিন্তা করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মৃত্যুর পর হরিণ-জন্ম প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিণ-জন্ম ত্যাগ করে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিস্মর থাকায় আর যাহাতে পতন না হয়, সেজন্য মূর্খ, বোবা ও কালার ভাণ করে থাকতেন। লোকে তাঁকে জড়ভরত বলত। তিনি বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইদের নির্য্যাতন সহ্য করে সর্ব্বদা হরিচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। একদিন এক ডাকাত-সর্দ্দার চামুণ্ডাদেবীর (কালীর) নিকট নরবলি দিবার জন্য লোক খুঁজতে খুঁজতে একটী ক্ষেতে জড়ভরতকে ভাইদের আদেশে পাহারা দিতে দেখে তাকে ধরে এনে স্নান করিয়ে ও বস্ত্রাদি পরিয়ে দেবীর মন্দিরে বলির যূপকাষ্ঠে প্রবেশ করা'ল। পরমভাগবত জড়ভরত দেহ ও দৈহিক বস্তু সম্বন্ধে বোধহীন হয়ে সমাধি-মগ্ন হলেন। ডাকাতরা খড়্গ তুলে যেই মুহূর্ত্তে বলি দিতে উদ্যত হল, অমনি সহসা দেবী-প্রতিমা বিদীর্ণ করে তেজোময়ীরূপে আবির্ভূতা হলেন ভদ্রকালীদেবী এবং নিজ উপাসক ডাকাতদের খড়্গ ছিনিয়ে নিয়ে সেই খড়্গদ্বারা ডাকাতদের বধ করেন ও জড়ভরতকে যূপকাষ্ঠের ফাঁস থেকে মুক্ত করে রক্ষা করেন। কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তকে দেবতাগণও রক্ষা করেন। তাই কালী প্রভৃতি দেবদেবীকে ভগবান্ না বলে ভগবানের দাসী বলাই শ্রেয়ঃ। যদিও দুর্গা, কালী, গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণ আমাদের নমস্য।

(১১) উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদেব যখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন কাঞ্চী-নগরীর রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর সহিত পুরুষোত্তমদেবের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করতে কাঞ্চীরাজ উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তমদেবকে রথযাত্রাকলে দেখতে আসেন। সেই সময় শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা রথের পথ পরিষ্কার করছিলেন। কাঞ্চীরাজ তাহা দেখে রাজা পুরুষোত্তমদেবকে ঝাড়ুদার বলে অপমান করে তাঁকে কন্যা দান করতে অস্বীকৃত হন। কাঞ্চীরাজ শ্রীগণেশের সেবক ছিলেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মান করতেন না। গজপতি শ্রীপুরুষোত্তম এই অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কাঞ্চীনগর আক্রমণ করলেন। পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হলেন। স্বয়ং জগন্নাথদেব ও শ্রীবলরাম রাজাকে সাহায্য করবার জন্য যুদ্ধযাত্রায় অগ্রবর্ত্তী হলেন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

ও যুদ্ধকালে কাঞ্চীনগরীকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। গণেশ দেবতা যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম প্রভুদ্বয়কে দেখে প্রণাম করত পলায়ন করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজের মাণিক্য সিংহাসনটী নিয়ে যান ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করেন। কথিত আছে,—'গণেশ ঠাকুর' নানাভাবে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের যুদ্ধে বিঘ্ন উৎপাদন করায় উনি 'ভণ্ড গণেশ' নামে খ্যাত হন। ইহাও কথিত হয় যে,—পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হতে শ্রীরাধাকান্তদেব, ভণ্ড গণেশ, রত্নসিংহাসন প্রভৃতি কয়েকমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ ও সেবোপকরণ আনয়ন করে শ্রীমন্দিরে ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থানে সংরক্ষণ করেন। এইভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত যুদ্ধে গণেশ পরাজয় বরণ করেন এবং প্রভুকে প্রণাম করত নিজেকে দাসরূপে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ববোধ করেন। বিঘ্নবিনাশ-কার্য্যরূপ অধিকারপ্রাপ্ত একজন শক্তাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা গণেশ যে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, তাহা শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে (ব্রঃ সং ৫।৫০) জানা যায়,—"গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্নবিনাশ করবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁর পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিদেব গোবিন্দেকে আমি ভজন করি।"

(১২) একদা বিখ্যাত কালীসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীঅন্নদা ঠাকুর গঙ্গানদীর মধ্যে দেবী কালীর একটী সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং আহলাদিত হয়ে তাহা স্ব-গৃহে আনয়ন করেন। দেবী কালী তাঁকে স্বপ্নাদেশ করেন,—'অবিলম্বে তাঁকে যেন গঙ্গার গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয় বা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁর ছবি তুলে তাহা আলেখ্যরূপে বাঁধিয়ে পূজা করা হয়। আর তাঁর সেই আলেখ্যর মস্তকোপরে তাঁর আরাধ্য ভগবান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির আলেখ্য রাখা হয় ও তাঁর পদতলে ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলেখ্য রেখে যথাবিধি সকলেরই যেন পূজা, হোম ইত্যাদি করা হয়। তবেই তিনি প্রসন্না হবেন ও ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।' দেবীর এবম্বিধ আদেশ প্রাপ্ত হয়ে অন্নদা ঠাকুর সেইমত সুব্যবস্থা গ্রহণ করে পূজা করতে থাকেন। এইরূপ কয়েক বৎসর অতীত হলে সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীকালী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সুন্দর প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত ঐরূপ তিন মূর্ত্তি 'আদ্যাপীঠ'-নামক স্থানে বিরাট্ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রত্যহ ভক্তগণের দ্বারা সেবিত হচ্ছেন। এখনও যে কোনও ব্যক্তি তাহা স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। ইহাতে কি প্রতীয়মান হয় না যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রীকালী তাঁর দাসী বা সেবিকারূপে সর্ব্বদা সেবায় নিয়োজিতা? সুতরাং কালীকে ভগবান্ বলা অন্যায়, অপরাধ ও পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি হতে পারে?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

(১৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ প্রধান শিষ্য বিশ্বখ্যাত কর্ম্মযোগী ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "The Sages of India"-গ্রন্থে লিখেছেন,—"Shri Krishna is much greater than any idea of God you or I can have." অর্থাৎ "আমি কিংবা আপনি ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে ধারণাই করি না কেন, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব তাহার উপরে।" ইহাতে সহজেই প্রমাণিত যে, ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর।

(১৪) দেবদেবীর নামে সংসার-মুক্তি বা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয় না। মহারাজ খট্বাঙ্গের ইতিহাসে জানা যায়,—তিনি দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন করে দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দৈত্যগণকে পরাজিত ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করেন। তখন দেবতাগণ তাঁকে বর দিতে চাহিলে তিনি দেবতাগণকে তাঁর অবশিষ্ট পরমায়ুকাল জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে দেবতাগণ বললেন,—তাঁর পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহা শ্রবণ করে তাঁর আসন্নমৃত্যু হতে দেবতাগণ তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন,—'কোনও দেবদেবী পারেন না, একমাত্র বিষ্ণুই পারেন।' তখন খট্বাঙ্গরাজা মুহূর্ত্তকালের জন্য বিষ্ণুপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে সংসার-মুক্ত হন এবং বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করেন। জীব চিৎস্বরূপ—শুদ্ধকৃষ্ণদাস। অবিদ্যাপ্রবেশ তার পক্ষে বৈরূপ্য ; এই বৈরূপ্য অন্যথা রূপ। ঐ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করে স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি (প্রয়োজন)। মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি কাহারও ঐকান্তিকী হরিসেবায় প্রবৃত্তি হয়, তাহাতেও শ্রীহরির অভয়পদ প্রাপ্তি হয়। খট্বাঙ্গরাজাই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।২০) দেবগণ মুচুকুন্দকে মুক্তি-সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"হে রাজন! আপনার মঙ্গল হোক্। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন ; মুক্তি একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই প্রদান করতে সমর্থ।" অতএব দেবগণ কেহই ভগবান্ নহেন, মুক্তিপ্রদানের ক্ষমতা কোনও দেবতারই নাই ও তাঁরা কেহই উদ্ধার করতে সমর্থ নহেন।

(১৫) 'বৈকুণ্ঠের' বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় 'ব্রহ্মধাম', তার বাহিরে 'কারণ-সমুদ্র'।

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৩)

মায়াশক্তির অবস্থিতি কোথায়?

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৭)

যে মায়াশক্তি তথা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাগণ কারণ-সমুদ্র স্পর্শ করতে পারেন না, তাঁরা কি বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন? অতএব দেবতাগণ কৃষ্ণের ছায়া-শক্তি

হওয়ায় চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন বা ছায়া—এই অচিজ্জগতে অবস্থান করেন। বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দ নিত্য, কিন্তু এ জগতের উত্থিত শব্দ অনিত্য। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অকাট্য যুক্তি ও বিচার উল্লেখ করছি,—"বৈকুণ্ঠ ও মায়া—এই দুইটীর স্বরূপ বিচার করলে জানা যায় যে, একটী কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিত ; উহাতে কোনপ্রকার অভাব নাই। আর একটী কুণ্ঠা ধর্ম্মযুক্ত, তাহা অভাবময়। কুণ্ঠরাজ্যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, সুতরাং ইতর-ব্যোমে শব্দ অনিত্যত্ব সম্ভব হলেও বৈকুণ্ঠ অদ্বয় জগতে নাম ও নামী এক, শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। ★★ বৈকুণ্ঠ-জগতের শব্দ ও শব্দ-তাৎপর্য্য কুণ্ঠ-জগতের সহিত diametrically opposite (সম্পূর্ণ বিপরীত)। কালী, দুর্গা, গণেশাদি শব্দের সহিত যে-স্থলে শব্দীর ভেদ অর্থাৎ যেস্থলে সেইসকল শব্দ ও শব্দীর অনিত্যত্ব কল্পিত হয়, সেইস্থলে তাহা কিরূপে 'বৈকুণ্ঠ'-পদবাচ্য হইবে? বৈকুণ্ঠ শব্দ ও বৈকুণ্ঠ শব্দী ত' অনিত্য হতে পারে না। ★★ কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও রূপী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও গুণী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও লীলাময় কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। ★★ যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা করছেন। কারণ কৃষ্ণ হতে কারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হয়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। গোবিন্দের আদেশ বহনই দেবতাগণের কার্য্য। **যাঁরা দেবতাগণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হতে পারেন না।**" ভগবান্ গীতায় ৯।২৪ শ্লোকে বলেছেন,—যেহেতু আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ; কিন্তু অন্য দেব-ভক্তগণ দেবগণকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ফলদাতা বুদ্ধিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করে আমার প্রতি শ্রদ্ধারহিত হয় এবং এমত উপাসনার ফলস্বরূপে তারা তত্ত্বতঃ মৎপ্রাপক পথ হতে চ্যুত হয় অর্থাৎ নশ্বর ফল লাভ করেন। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত জানাচ্ছি,—সূর্য্যের দিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বিধিমত ধরলে সে গ্লাসের মধ্য হতে আগুন পাওয়া যাবে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক ধরলে আগুন বাহির হবে না। তাই বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনায় নিত্যফল লাভ হয়, কিন্তু দেবগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করলে তাঁদের পূজায় যথাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা না হওয়ায় ও তাহা বিধিপূর্ব্বক না হওয়ায় অনিত্য দেবোপাসনার অনিত্য ফলই প্রাপ্তি হয়।

অতএব দেবতাগণের নামে মায়িক ব্যবধান থাকায় শব্দ ও শব্দীতে ভেদ বিদ্যমান ; কিন্তু 'বিষ্ণু'র নাম মায়াতীত হওয়ায় শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই—পরন্তু শব্দই শব্দী। আবার দেবতাগণ ভগবানের ছায়াশক্তি হওয়ায় তাঁদের স্বতন্ত্র পূজা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

ছায়ার পূজা হওয়ায় প্রকৃতপ্রস্তাবে সাক্ষাৎ ভগবৎপূজার ফল প্রাপ্তি হয় না, এজন্য তাঁদের সংসারে গতাগতি হয়। যাঁরা বৈষ্ণবমার্গ হতে ভ্রষ্ট, শাস্ত্র তাঁদের 'পাষণ্ডী' বলেছেন।

এস্থলে উল্লেখ্য,—"ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাঁরা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠে নিত্য বিষ্ণুর কিঙ্কর (ভাঃ ১১।২৭।২৯)।" সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশ, দুর্গাদি দেবতাগণ মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁরা ভগবানের স্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক। পঞ্চোপাসনায় পঞ্চ-দেবতার নিত্যরূপ স্বীকৃত হয় না। অতএব দেবতাকে ভগবান্ বলা কোনক্রমেই সমীচীন হয় না।

(১৬) পরমহংস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রীরূপ-শিক্ষা'-প্রসঙ্গে যাহা উপদেশ করেছেন, তার কিয়দংশ বিবৃত করছি,—"অর্চ্যে বিষ্ণৌ ★★ বা নারকী সঃ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমল-নাশক শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে—সে নারকী।" (পদ্মপুরাণ)। এইরূপ বুদ্ধি করলে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। বিগ্রহে কাঠ, মাটী দর্শন করলে নরক। নারায়ণসহ ইতর দেবতাগণের সমত্ব করা পাষণ্ডতা। শিবাদির স্বতন্ত্র মনন নামাপরাধের অন্তর্গত। **কৃষ্ণনামের বদলে কালী বা গণেশের নাম করলে দ্বিতীয় নামাপরাধ।**

মূঢ় লোক সারাদিন এই কথাই বলে অন্য দেবতার নাম করলে মঙ্গল হবে না কেন? ভগবান্ তাঁদের কিছু কিছু শক্তি দিয়েছেন, যে কেবল জড়ভূমিকায় পরিচালনা করতে সমর্থ মাত্র। সেটাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা—নরকগমন চেষ্টামাত্র। ভগবানের দাসকে ভগবান্ বললে অপরাধ।

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।"

অন্য পর্ব্বতের শিলা এনে রাস্তা তৈরী করে। ঐ শিলা ও গিরিধারী Chemical laboratoryতে এক হতে পারে, কিন্তু গিরিধারীকে বিষ্ণুজ্ঞানের পরিবর্ত্তে মায়িক জ্ঞান করলে নরক অবশ্যম্ভাবী। শালগ্রামের সেবাগ্রহণ-যোগ্যতা নাই বিচার করলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হতে হবে। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিও নরকপাতের কারণ।" মিশ্র সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই মায়িক ত্রিগুণ হতে মুক্ত হলে ত্রিগুণাতীত ভগবান্ কৃষ্ণই যে একমাত্র নিত্যসেব্য তাহা উপলব্ধি হয়। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণ ভগবানের ছায়াশক্তি অর্থাৎ মায়া। এঁদের হাত হতে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। ভগবানের মায়া ভগবানের কৃপাতেই উত্তীর্ণ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

হওয়া যায়। দেবদেবীর উপাসনাদ্বারা জীব কখনও জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে না ; অনিত্য তুচ্ছ কিঞ্চিৎ বিষয়ভোগ প্রাপ্তি হয় মাত্র। কালী, দুর্গা, ব্রহ্মা, গণেশাদি নাম ভগবৎ-স্বরূপের নাম নয়, এগুলো সমস্ত দেবদেবীর নাম ; ইঁহারা কেহই ভগবান্ নহেন—সবাই ভগবান্ কৃষ্ণেরই অধীনস্থ দাস। ভগবৎস্বরূপের যত নাম আছে, অন্য কোনও নামে তদ্রূপ নাই। তাই গাইতে হয়,—

"হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা,　　না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি কথা।
আর যত উপালম্ভ,　　বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা।।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ যুগপৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীহরিদাসবর্য্য। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করেন। এই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অজস্র প্রেমামৃতে প্লাবিত এবং কৃষ্ণসেবোপকরণ গো, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী। বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের পূজ্য হইয়াছেন ; কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর পূজার পাত্র হইয়াছেন। কারণ, তিনি ভক্তাপ্লুত-হৃদয়ে কোটি গঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণ-জাত শ্রীশ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য নিধিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে অবনতমস্তকে বহন করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন। এই গিরিরাজের নিভৃত গুহা ব্রজনবযুদ্বন্দ্বের ক্রীড়ার স্থান। এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহু কুণ্ড শোভিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে, অত্যুন্নত গিরিগণকে, নন্দীশ্বরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন রক্ষার্থ ভূধরগণের শিরোভূষণস্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইঁহার পূজনীয়ত্ব স্বয়ং জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই গোবর্দ্ধন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দান-ক্রীড়ার সাক্ষিস্বরূপ এবং রসিক ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধক।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

করায় ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রজে অজস্র বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে ব্রজজনবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপর গোবর্দ্ধনকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ দুইপ্রকারে স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি দেবলীল ও নরলীল। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাই—দেবলীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলাই—নরলীলা। বৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিত। তথায় ভগবানের জন্মাদি-লীলা নাই। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি সকলেই লক্ষ্মীযুক্ত, চতুর্ভুজ, অজ ও দেবলীল। ইঁহারা সকলেই ব্যূহরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন। শ্রীনারায়ণই বৈকুণ্ঠেশ্বর। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম প্রবল। সেব্য-সেবকের মাখামাখি ভাব বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা অজ ভগবানের জন্মলীলা-স্থান মথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমিকা। প্রেম ঘনীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ায় মথুরায় ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়াছে। তথায় ঐশ্বর্য্যের প্রখরতা মাধুর্য্যের কমনীয়তায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। এখানে ভগবান্ নরলীল। এই মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। এই বৃন্দাবন হইতে উদারপাণি কৃষ্ণের রমণত্বনিবন্ধন শ্রীগোবর্দ্ধন এবং প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। লীলাবিলাসের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যেখানে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনকে আমরা জড়চক্ষে অচেতন প্রস্তর দেখি, এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য! যে গোবর্দ্ধন প্রেমের ঘনীভূত জমাট অবস্থা, যে স্থান শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ লীলাবিলাসের ক্ষেত্র, সেই নিবিড় নিভৃত গোবর্দ্ধনকে অচেতন মনে করা কিরূপ দুর্ভাগ্য ও জড়তার পরিচয়, তাহা চিন্তা করা যায় না। অচেতনতার শেষ সীমায় পৌঁছিলে, ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ হইলে এইরূপ দুরদৃষ্ট উদিত হয়।

শ্রীগোবর্দ্ধন অপ্রাকৃত বস্তু। এই অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা না করিলে শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা অপ্রাকৃত গো অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি বা বিকাশ সাধন করেন, যাঁহারা পরবিদ্যার অনুশীলন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকেই গোবর্দ্ধন-সেবা বলিয়া জানেন। জড়যুক্তিবাদী অরিষ্টাসুর তাহার শৃঙ্গদ্বারা যখন গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়া নিজভোগ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যখন পরম আস্তিকতা—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররসের বিষয় বাস্তব-সত্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর নিহতা হইলে প্রৌঢ়া গোপী মদনিকা তৎকার্য্যের পুরস্কাররূপে শ্রীরাধিকাসুন্দরীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধন। মথুরা হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন প্রায় ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতে ও পুরাণে হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের অনন্ত মহিমা বিঘোষিত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

হইয়াছে। এই শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিলাসক্ষেত্র। শ্রীগোবর্দ্ধনগিরির উপরিভাগে শ্রীমানসী-গঙ্গা বিরাজমানা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে জলবিহার করেন। এক সময় শ্রীনন্দপ্রমুখ গোপগণ শ্রীযশোমতী প্রভৃতি গোপীগণকে লইয়া গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন—এই ব্রজে নিখিল তীর্থ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, কিন্তু ব্রজবাসিগণ আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহা অবগত নহেন ; তাই তাঁহারা অন্যত্র গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ইহা বিচার করিবামাত্রই শ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহিনী-মূর্ত্তিতে ব্রজবাসিগণের নয়নগোচর হইলেন। সেই গঙ্গায় ব্রজবাসিগণ স্নান করিলেন এবং ঐদিন হইতে ঐ তীর্থ শ্রীমানসী-গঙ্গা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে এই মানসী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায়,—

মানসী-গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সবারে পার নাবিক হইয়া।।
শ্রীরাধিকা-সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ।।

চক্রতীর্থ গোবর্দ্ধনের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। চক্রতীর্থ শ্রীরাধাগোবিন্দের দোল-ক্রীড়াস্থান। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চক্রতীর্থে একটী কুটীরে বাস করিয়া প্রত্যহ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর বৃদ্ধকালে প্রত্যহ ঐরূপ পরিক্রমার শ্রম-স্বীকার দর্শন করিয়া একদিন শ্রীগোপীনাথ গোপবালকের বেশে শ্রীসনাতনের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া ব্যজনাদির দ্বারা তাঁহার ঘর্ম্ম ও শ্রম নিবারণ করিলেন এবং সজলনয়নে বলিলেন,—"সনাতন, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, প্রত্যহ তোমার এত পরিশ্রম করা উচিত নহে। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তুমি আমার সেই অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া ঐ গোপবালক গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্নযুক্ত একটী গোবর্দ্ধন-শিলা আনয়নপূর্ব্বক শ্রীল সনাতন প্রভুকে দিলেন এবং বলিলেন,—"প্রত্যহ এই গোবর্দ্ধন-শিলা পরিক্রমা করিলেই তোমার গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা হইবে।" শিলা প্রদান করিয়াই গোপবালক অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন বালকের অদর্শনে ব্যাকুল হইলে বালক অদৃশ্যভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি—ইহা জানাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পুনঃ প্রকাশিত করিয়া গোবর্দ্ধনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

গোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং একটী শিলাকে আলিঙ্গন করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপরদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাতঃকালে মানসীগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতনও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর আরোহণ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বৈষ্ণব-প্রধান। যেহেতু ইনি রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পানীয় জল ও খাদ্যদ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

শুনা যায়, এই গোবর্দ্ধনের নিকটে এক ধনী বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীবলদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল ; তিনি অনুক্ষণ বলদেবের চরিত্র চিন্তা করিতেন। 'শ্রীবলদেব প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন',—এইরূপ দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিয়া ঐ বিপ্র গোবর্দ্ধন-বন ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ বিপ্র আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্য উদিত হইবে। এদিকে নিত্যানন্দ-রাম যখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই স্থানটী অতীব নির্জ্জন-দর্শনে তিনি এখানেই রহিলেন। দূর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-রামের অভূতপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ বিপ্র মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ অবধূত নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন এবং আরও বিচার করিলেন যে, ঐ অবধূতের কৃপায়ই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া ঐ বিপ্র দধি, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত প্রভৃতি উপায়ন লইয়া নিত্যানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকটে রোহিণীনন্দনের দর্শন-সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিলেন। অভিন্ন রোহিণীনন্দন পদ্মাবতীসুত শ্রীনিতাইচাঁদ বিপ্রের ঐ ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিলে বিপ্র নিত্যানন্দ প্রভুর অবশেষ লইয়া নিজস্থানে গমন করিলেন। অবশেষ গ্রহণমাত্রেই বিপ্রের অদ্ভুত প্রেমবিকার উপস্থিত হইল। বিপ্র আর নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে গমন করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রাদেবী আসীনা হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্বরূপসিদ্ধ বিপ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সেই অবধূত বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত। অবধূতের সেই মূর্ত্তিই পুনরায় শ্রীবলদেব-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীবলদেবের শ্রীঅঙ্গে নানাপ্রকার আভরণ ঝলমল করিতেছিল। বিপ্রের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিবার পর শ্রীবলদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিপ্রও নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যেখানে অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন, বিপ্র সেইস্থানে যাইবার জন্য সেই নিশাকালেই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে বিপ্রকে সেই রাত্রির মত ধৈর্য্যধারণ করাইবার জন্য এক দৈববাণী প্রকাশিত হইল। দৈববাণী শুনিয়া বিপ্র মনে মনে

বিচার করিলেন যে, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। এখন তিনি সেই অবধূত প্রভুকে আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি অবধূতের শ্রীচরণ ধরিয়া তাঁহার অবধূত-বেশ ঘুচাইবেন এবং রজনীপ্রভাতে স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাপ্রকার অলঙ্কার পরাইবেন। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রের নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্র নিত্যানন্দপ্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্তর্হিত হইলে বিপ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিপ্র প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলে প্রভু মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে ঐ বিপ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক নিজতত্ত্ব জানাইলেন। বিপ্র অবধূত প্রভুকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে চাহিলে ভক্তাধীন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—তিনি কিছুদিন পরে বিপ্রের অলঙ্কার স্বীকার করিবেন। প্রভু বিপ্রকে আরও বলিলেন,—"এখন যদি আমাকে স্বর্ণ পরাইবার তোমার একান্ত সাধ থাকে, তব তুমি এক কার্য্য কর। এই অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলাকে স্বর্ণদ্বারা বাঁধাইয়া দাও। আমি এই শিলা কণ্ঠে ধারণ করিব।" বিপ্র প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহা করিলে অবধূত কণ্ঠে স্বর্ণবদ্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ধারণ করিলেন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন,—'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।' সে রূপটা কি? নামাপরাধ ছাড়তে হবে। রূপানুগ বৈষ্ণবগণের যে বিচারধারা সেই বিচারধারা অবলম্বন করে হরিনাম গ্রহণ করবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে প্রেম উপজয়। সে তো অনেক পরের কথা। আদৌ শ্রদ্ধা থেকে আরম্ভ করে প্রেমের যে স্তর বর্ণনা করেছেন, সে অনেক পরের কথা। ভগবানের নাম করতে করতে যদি চোখে জল না এল, তাহলে কি নাম হচ্ছে? প্রীতিভরে, একান্তচিত্তে সেই নাম করবার বিধান রয়েছে শাস্ত্রে। ওটা যদি না হয়, তাহলে জানতে হবে হৃদয় কঠোর।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

কঠোর—কঠিন চিত্তে নাম হবে না। হৃদয় সরস হওয়া চাই, ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হওয়া চাই, তবে ত' নাম করলে নামীর সন্ধান মিলবে বা নাম তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন আমার কাছে। 'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়'—সে অবস্থা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

অবলম্বন করতে হবে। আমি নাম করছি, নাম করছি—মুখে বললে ত' হবে না। তাহলে নাম সেখানে ঠিক হচ্ছে না, অনবধানযুক্ত নাম হয়ে যাচ্ছে। ব্যবহিতরহিত নাম হচ্ছে না, ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, নামাপরাধ থেকে যাচ্ছে, সেজন্য নামের ফল মিলছে না। এইটাই বুঝতে হবে। তাই শাস্ত্রে ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছেন—যদিও তোমার ব্যবধান হতে থাকে, তথাপি তুমি নাম ছেড়ো না।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী।।

পিত্তদ্বারা উত্তপ্ত যে জিহ্বা, সেই পিত্তকে প্রশমিত করবে কিসে? মিছরির টুকরো। ব্যবস্থা দিয়েছেন কবিরাজ, বৈদ্যরাজ। তোমার পিত্ত বৃদ্ধি হয়েছে, তুমি মিছরির চুষতে থাক। এইটাই তোমার ঔষধ, এইটাই তোমার পথ্য। রোগী মিছরি চুষতে গিয়েও বলছে—এটা তেতো লাগছে। বৈদ্যরাজ বলছেন,—তেতো লাগবে প্রথমে, কিন্তু মিছরিটা যে মিষ্টি, তা তুমি উপলব্ধি করবে পরে। কথাটা মেনে চল। নাম সম্বন্ধে সেই কথা বলা হয়েছে,—"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।" ভগবানের নাম করতে ইচ্ছা যায় না আমাদের, ইচ্ছা হয় না। যেন জোরজুলুম করে, ঘাড় ধরে নাম করাতে হয়। "কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী।" ইচ্ছা ত' করে না নাম করতে কোনদিন, তথাপি যদি চেষ্টা করে সেই নাম গ্রহণ করি, তাহলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সব কেটে যাবে। অবিদ্যারূপ যে পিত্ত, সে পিত্ত বিদূরিত হবে। সেই কথাই বলছেন এই শ্লোকের মধ্যে। এরই পদ্যানুবাদ করেছেন জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর,—

হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয়-সুখেতে ভোর॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে-নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল, ক্রমে স্বাদু হয়, হরি!!
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল, দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে, আস্বাদিব নামাসব॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

সুতরাং সেইরকম ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ছাড়ব না আমি। আরও চেষ্টা করে সেই নাম গ্রহণ করতে হবে। যাতে সুষ্ঠুভাবে সেই নাম গ্রহণ করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় নামাপরাধ হবে, হয়, হতে পারে, তার জন্য ঘাবড়াবার কোন কথা নাই। ঐ নামাপরাধ বর্জ্জন করে যাতে হরিনাম করতে পারি, সেই প্রচেষ্টা থাকবে আমাদের। সেইজন্য বলছেন,—

নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি যৎ।।

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ নামই তার সবকিছু—আশ্রয়স্থল, রক্ষক। শ্রদ্ধাভরে সেই নাম অনুক্ষণ গ্রহণ করবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে শ্রীনামের কৃপা আমার প্রতি হবে। ভজন-সাধন বলতে গেলে ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণই মুখ্য এবং একে কেন্দ্র করে অনেকগুলো বিধি-নিষেধ পাশাপাশি রয়েছে। অর্থাৎ নামই যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। নামের দ্বারাই প্রেমলাভ—কথাটা শাস্ত্রে রয়েছে। কৃষ্ণমন্ত্র এবং কৃষ্ণনামের কথা বলতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।

কৃষ্ণমন্ত্র জপ করলে মননধর্ম্ম থেকে ত্রাণলাভ করতে পারি আমরা। কিন্তু কৃষ্ণনামের দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করা যায়। সে অধিকার আসে। যদিও এখানে মন্ত্রের সঙ্গে, নামের সঙ্গে পার্থক্য বিবেচনা করা হয় নাই। একে পার্থক্য বলে না, একে জড়ভেদ বলে না, একে বলে বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয়েছে শাস্ত্রে এইভাবে। ভগবানের নামেরই মহিমা-মাহাত্ম্য সর্ব্বক্ষেত্রে অধিক। এর থেকে আর বড় কথা কিছু নাই। সেই নাম গ্রহণ যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, তার জন্য পাশাপাশি আরও বহুবিধ বিধি-নিষেধের আরোপ রয়েছে।

শরীরটা যদি অসুস্থ থাকে, তাহলে বৈদ্যের কাছে যদি যাই। তিনি যে ব্যবস্থা দেন, তাতে রোগনির্ণয় করে ঔষধের ব্যবস্থা, পথ্যের ব্যবস্থা এবং কুপথ্য বর্জ্জনেরও ব্যবস্থা দেওয়া থাকে। তিনটা সমানভাবে যখন আমরা গ্রহণ করি, তখনই আমাদের ফলটা মেলে অর্থাৎ রোগটা সেরে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ পৃথক্ ব্যাপার। সংসারের যে জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, এটা চলে যাওয়া এক জিনিষ ; আর স্বাস্থ্যলাভ আর একটা জিনিষ। আত্মার যে স্বাস্থ্যলাভ—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ, সেটা পৃথক্ জিনিষ। জড়জগতের লোক যে-সব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা আমাদের দেহের খোরাক, মনের খোরাক দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আত্মার খোরাক কেউ দিচ্ছেন না। তাই এই

হরিকথার, ভগবৎকথার দুর্ভিক্ষ আজ জগতে! এমনি আমরা অনেক দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাই, প্রাণ আমাদের আকুলিত-ব্যাকুলিত হয় সেইসব সংবাদ শুনে, কিন্তু হরিকথার যে দুর্ভিক্ষ, এ চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ করতে পারেন নাই, কোনদিন পারবেনও না। তাদের মাথায় ওটা ঢোকে না, ঢুকবে না। হরিকথার দুর্ভিক্ষ—এটা চিন্তা করেছেন ভগবদ্ভক্তগণ, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ। তাঁরা এই খোরাক দেওয়ার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করেন। আপনারাও তাতে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন আত্মার খোরাক গ্রহণ করবার জন্য। যেটা পেলে পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব জয় হয়ে যেতে পারে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই ভয়ের অন্তর্গত ব্যাপার। 'শোকমোহভয়াপহা'—শ্লোকটা ভাগবতেরই শ্লোক। আত্মার খোরাকটা পেলে পরে শোক-মোহ-ভয় সবকিছু অপনীত হয়। প্রাকৃত জগতের যে শোক আমাদের—বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছেদজনিত যে শোক-মোহ ও আর যতরকম ভয় আছে এ জগতে, সব নিবারিত হয়। শ্রেষ্ঠ ভয়—মৃত্যুভয়। এর থেকে আর বড় ভয় কিছু নাই। সেকথা গীতা-ভাগবতে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।

মহান ভয় থেকে ত্রাণলাভ করতে পারি আমরা কিসে? সনাতন ধর্ম্মকথা, ভাগবতধর্ম্ম কথা, আত্মধর্ম্ম কথার অনুশীলন যদি করি আমরা, তাহলে ঐ ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ঠিক ঐ একই জাতীয় কথা ভাগবতেও বলছেন। প্রশ্ন করেছেন বসুদেব মহারাজ নারদ ঋষির কাছে,—

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজ।।

সনাতন ভাগবতধর্ম্ম কথা জানতে চাচ্ছেন বসুদেব মহারাজ নারদ ঋষির কাছে। বলছেন, ভাগবত ধর্ম্ম খুব সুন্দর, আমি শুনেছি। এই ধর্ম্ম যাঁরা গ্রহণ করেন, এই ধর্ম্ম যাঁরা অনুশীলন, আচরণ করেন জীবনে, তাঁদের আর কোন ভয় থাকে না। "মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ" কথাটা আছে ওখানে। সবথেকে বড় ভয় মৃত্যুভয়। ভগবানের নামের যদি আশ্রয় গ্রহণ করি আমরা তাহলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। শিবঠাকুরের এক নাম মৃত্যুঞ্জয়। বৈষ্ণবগণেরও নাম মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ সংসারের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় আধি-ব্যাধি সবকিছু অবদমিত হয় ভগবানের নামের আশ্রয় করলে। সেই নামই আমাদের পরম আশ্রয়, নিখিল আশ্রয় সাধক জীবনে। ভগবান্‌কে ভালবাসতে গেলে এ নাম ছাড়া চলবে না। সুতরাং অভ্যাসযোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় যেমন এই নাম গ্রহণীয়, আবার চরমেও এই নাম গ্রহীতব্য। চরমে কেন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

বলছি? যাঁরা মুক্ত, পরমমুক্ত, তাঁরা কি নাম করবেন না? তাঁদের কি সব হয়ে গেছে—এমন মনে করেন তাঁরা? সাধারণ মুক্ত-অভিমান করছেন যাঁরা—জগতে এমনও বহু লোক বিচরণ করছেন, তাঁরা মনে করেন আমরা মুক্ত, আমাদের সব হয়ে গেছে। যে কথা কবিরাজ গোস্বামী বলছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।

ভগবদ্ভক্তি ছাড়া ভক্তি শুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে ভগবান্‌কে ভালবাসতে গেলে ভগবানের নামকে আশ্রয় করতে হবে ঠিক ঠিকভাবে। মুক্তগণ, পরমমুক্ত-গণও এই নাম আশ্রয় করেন, অর্থাৎ এই নামের সেবা কখনও শেষ হয়ে যাবে এমন যদি কেউ চিন্তা করেন, তাহলে তারা ভ্রান্ত। তাই শাস্ত্রে দেখিয়েছেন—সাধক অবস্থায়, সিদ্ধাবস্থায়ও এই নাম পরম উপাস্য। এই নাম কখনও ছেড়ে নয়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" এই যে ভগবানের ভজন—নাম-ভজন শ্রেষ্ঠসেবা। পরমমুক্তগণ তাঁরাও ভগবদিচ্ছায় এ জগতে প্রেরিত হন। ভগবদিচ্ছানুসারে তাঁরা এ জগতে আসেন এবং এখান থেকে চলে যান। জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য তাঁরা এ জগতে আসেন। বার বার করে তাঁরা সেই তত্ত্বদর্শনটাকে এখানে ঝালিয়ে রাখতে চান। সেই ঘটনাই ত' হয়।

শাস্ত্র প্রচার করলেন ভগবান্, জগতের লোক সব ভুলে যাচ্ছে। আবার তাঁরা আসছেন, সেটাকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন। বুঝাবে কে? শাস্ত্র ত' পড়ে রয়েছে, তার সার সঙ্কলন করবে কে? শাস্ত্রের যে নিগূঢ় রহস্য, তাৎপর্য্য তা কে বুঝাবেন? সেইজন্য পরমমুক্ত পুরুষগণকে এ জগতে ভগবান্‌ই প্রেরণ করেন। তাঁরাই এসে সেই সব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাদের কাছে জানিয়ে দেন। তবে ত' আমরা জানতে পারি, তা না হলে আমাদের জানবার কোন উপায় নাই। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাই উদ্ধবকে বলেছিলেন,—উদ্ধব! আমি এসেছিলাম জগতে আমার আবির্ভাবের যে কারণ, আমার যে প্রতিজ্ঞা, সেগুলো ত' আমি সম্পাদন করেছি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

আমার ও কাজ হয়ে গেছে। এখন তোমার কাজ। কি কাজ? তুমি আমারই সেই নাম-মহিমা জগতে প্রচার কর—যে নাম থেকে বিশ্বসৃষ্টি, যে নাম থেকে সংস্থিতি, যে নামেতেই আবার সকলের পুনরায় অবস্থিতি। সুতরাং নাম থেকে সৃষ্টি, নামেতেই স্থিতি, আবার নামেতেই প্রবেশ।

---

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

অভাব ও স্বভাব

'অভাবে' স্বভাব যায়, 'স্বভাবে' আনন্দ হয়,
নাহি জানি মায়ার কারণে ।
লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরি', বদ্ধদশা ভোগ করি',
ঘুরিতেছি মরত ভুবনে ॥১॥
জড়েতে আনন্দ চাই, কিন্তু তাহা বৃথা, ভাই,
তথাপি তাহাতে মন মজে ।
সদাই হইল ভ্রম, ত্রিগুণ বাড়িল ক্রম,
সর্ব্বকাল মায়াদেবী ভজে ॥২॥
কৃষ্ণ-দাস্য গেল ভুলি', বিষয়েতে সদা কেলি,
ভোক্তা-অভিমানে হয় হত ।
জীব কভু ভোক্তা নয়, কৃষ্ণদাস্য সত্য হয়,
তাহা ভুলি' বদ্ধ অবিরত ॥৩॥
এ ভব সিন্ধুর জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
বাসনার নাহি পায় অন্ত ।
কর্ম্মফাঁসে বদ্ধ রয়, মরণেতে সদা ভয়,
আশাপাশে মন মোর হত ॥৪॥
কাম, ক্রোধ, লোভ-দ্বারে, ত্রিবিধ তাপেতে জারে,
রিপু সবে করয়ে পীড়ন ।
রিপুর পীড়ন ছাড়ি', ভোগবাঞ্ছা কিসে এড়ি,
মনে জাগে মুক্তির চিন্তন ॥৫॥
মায়া মোরে নাহি ছাড়ে, মিথ্যা সুখ দিয়া ফিরে,
ভুক্তি-মুক্তি যাচে অবিরত ।
মায়াদত্ত ভোগ পাঞা, দাস্য-ভাব ছাড়ে হিয়া,
প্রতিষ্ঠা-পিশাচী করে হত ॥৬॥
ভুক্তি-মুক্তি-যোগ ছাড়ি', শুদ্ধ ভক্তিপথ ধরি',
স্বভাবের করয়ে সাধন ।
সাধিতে সাধিতে তা'র, ঘুচে মায়া-অন্ধকার,
হৃদে হয় ভক্তির আসন ॥৭॥
সাধনের ক্রম ধরি', ভজে পাদপদ্ম হরি,
আত্মভাব হয় উদ্বোধন ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

উপাধি-রহিত হ'লে, চিত্ত শুদ্ধি তা'র মিলে,
ক্রমে পায় ভক্তি-মহাধন ॥৮॥
আনন্দে সে অনুক্ষণ, থাকে তা'র তনু মন,
সেবামগ্ন তাহার জীবন ।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবেতে, শুদ্ধারতি হয় তা'তে,
সদা করে আত্মনিবেদন ॥৯॥
সকল অভাব যায়, স্বভাবে আনন্দ পায়,
অসদ্ ভাব নাহি পায় স্থান ।
সর্ব্বকাল নামানন্দে, সেবা করে ভক্তবৃন্দে,
নিত্যানন্দ পায় অনুক্ষণ ॥১০॥

—শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সংবাদ-প্রসঙ্গ

জম্মু, কাশ্মীর ও জয়পুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারজের একান্ত অনুগৃহীত অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ আতঙ্কবাদীর আড্ডাখানা জম্মু-কাশ্মীর এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপাভিষিক্ত জয়পুরে বিগত ৭/৯/২০০৩ হইতে ২৫/৯/২০০৩ তারিখ পর্য্যন্ত বিপুলভাবে প্রচার করিয়া শ্রীব্রজ-মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ ৯/৯/২০০৩ তারিখে জম্মুতে পৌঁছান। তাহার দিবসদ্বয় পূর্ব্বেই শ্রীভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত অরণ্য মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রায় অর্দ্ধশতাধিক ভক্তগণ জম্মুতে উপস্থিত হইয়াছিল। বিমানবন্দরে প্রায় ত্রিশতাধিক ভক্তবৃন্দ, কতিপয় সাংবাদিক ও দূরদর্শনের প্রতিনিধিও অপেক্ষমান ছিলেন। শ্রীল মহারাজ বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে পর সাংবাদিকগণ সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীল মহারাজ তাহাতে নিজ সম্মতি প্রদান করেন। ১০/৯/২০০৩ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনের কিয়দংশ নিম্নে বর্ণন করিলাম।—

সাংবাদিক সম্মেলনের প্রারম্ভে শ্রীল মহারাজজী বলেন,—এই সম্মেলনে প্রত্যেকেরই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে। আপনারা যদি প্রশ্ন না করেন, তাহা হইলে আমিই আপনাদিগকে প্রশ্ন করিব। সাংবাদিকগণ মৃদুহাস্যসহকারে বলেন,—স্বামীজি! প্রথমে আপনি কিছু বলুন। আপনি আপনার রাশিয়ার প্রস্তাবিত

প্রচারসূচী বাতিল করিয়া আতঙ্কের স্থান জম্মু-কাশ্মীরে কেনই বা আসিয়াছেন এবং জগৎকে আপনি কি বস্তু দান করিতেছেন? শ্রীল মহারাজ বলেন,—পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া তাহার যথাযথ উত্তর পাইয়া অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বহির্ভারতে অধিকাংশ ধার্ম্মিক ব্যক্তি বেদের 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' স্বীকার করিলেও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারেন না। কেননা, মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে তাহারা উপরোক্ত বেদবাক্যকে প্রয়োগ না করিয়া মাতৃতুল্য গাভীকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছি,—Meat অর্থাৎ me + eat = Meat. To whom I eat today they will eat me tomorrow or any other day. আমার এই কথা শাস্ত্রের বিভিন্ন উদাহরণসহ শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র বিদেশী আজ মদ্য-মাংস পরিত্যাগ করিয়া, গলায় তুলসী মালা, মাথায় শিখা, ললাটে তিলক ধারণ করিয়া ভজন করিতেছেন, আর আপনারা ঠিক এর বিপরীত আচরণ করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই সাংবাদিকগণ বিদেশী ভক্তগণের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকেন।

শ্রীল মহারাজ আরও বলেন,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থকে অবহেলা করিবার জন্যই আজ সমাজের এই দুর্দ্দশা। অনেকেই ইহা জানেন যে, আমরা অস্থি-চর্ম্মময় এই জড় শরীর নহি, তথাপি আমরা মূর্খের ন্যায় জড় শরীরের প্রসন্নতার জন্যই সব কিছু করিতেছি। সকলেই যদি গীতাদি শাস্ত্রের উপদেশ স্বীকার করেন, সমস্ত প্রাণীতেই আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন, ভগবানের রূপ স্বীকার করিয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে অংশগ্রহণপূর্ব্বক হস্ত উত্তোলন করিয়া হরিবোল হরিবোল করেন, তাহা হইলে কাশ্মীরের সমস্যার কথাই বা কি, জগতের যে কোন সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইয়া যাইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব বাস্তবিক না বুঝিয়া অনভিজ্ঞ ধর্ম্মনেতৃবৃন্দ নিজেদের মতানুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভেদ করিবার শিক্ষা দিয়া থাকেন। ফলস্বরূপ নিজেও দুঃখী হন এবং অপরকেও দুঃখী করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে স্বীকার করেন, তিনি কখনও ভয়ভীত হন না এবং নিজ সম্পর্কে আগত সকলকেই অভয় প্রদান করেন।

সকল ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য—জীবাত্মা অজর-অমর এবং ভগবানের অংশ। ভগবান্ অহৈতুকী কৃপা করিয়া মনুষ্য শরীর প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য শরীর পাইয়া আমরা যদি ভজন না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষ্ঠাভোজী শূকর, কুকুর ইত্যাদি হইতে হইবে। সাধারণ লোক আজকাল শারীরিক কসরৎ, ব্যায়াম প্রভৃতিকে যোগ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। গাণিতিক ভাষানুসারে যোগ-শব্দের অর্থ কিন্তু শারীরিক কসরৎ বা ব্যায়ামাদি নহে। যোগ-শব্দের অর্থ যোগযুক্ত করা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

যেমন—১+১=২। বেদাদি শাস্ত্রীয় ভাষায় যোগ-শব্দের বাস্তবিক অর্থ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে যোগযুক্ত করা। সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা হরি-ভজন না করেন, তাহাদের জীবন ব্যর্থ, তাহাদিগকে শত শত বার ধিক্কার। যোগের মূল তাৎপর্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আত্মসমর্পণ।

শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় সাংবাদিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি।—

জনৈক সাংবাদিক—জগজ্জীবের বাস্তবিক কল্যাণের জন্য কি করা উচিত এবং আনন্দলাভের উপায় কি?

শ্রীল মহারাজ—আমরা স্ব-স্ব-কর্ম্মের ফল অনুসারে সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। এই কারাগারে জড়ীয় আসক্তি 'আমি আমার' এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্য হইল আমাদের বদ্ধতা। বাস্তবিক কল্যাণের জন্য সদ্‌গুরু এবং বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবান্ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতে হইবে। কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ইহার দ্বারাই তুচ্ছ জড়াসক্তি, ভোগের প্রতি লালসা দূর হইবে এবং আমরা পরমানন্দ লাভ করিতে পারিব।

সাংবাদিক—আজকাল ভারতবর্ষে নানাপ্রকারের সাধু, গুরু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সদ্‌গুরু কিভাবে চিনিতে বা বুঝিতে পারা যাইবে?

শ্রীল মহারাজ—শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমরা গুরুকরণ করিয়া থাকি। কলিযুগে চারিটী শুদ্ধ সম্প্রদায়। এই প্রামাণিক সম্প্রদায়-চতুষ্টয় ব্যতীত মন্ত্র গ্রহণ করিলেও তাহা বিফল হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তাঁহার গুরু-পরম্পরা কি? শুদ্ধ সম্প্রদায়ান্তর্ভুক্ত না হইলে কখনই দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত নহে। সদ্‌গুরু চিনিবার উপায় হইল উক্ত গুরুর ভগবানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। যদিও এ বিষয়ে অনেক গূঢ় সিদ্ধান্ত আছে, তথাপি তটস্থ লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে হইবে। তটস্থ লক্ষণ কি? তিনি সাংসারিক ভোগবিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইবেন এবং শিষ্যের সংশয়-ছেদনে দক্ষ হইবেন। এই লক্ষণযুক্ত না হইলে তিনি সদ্‌গুরু হইবার যোগ্য হইতে পারেন না।

সাংবাদিক—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন,—'আমি ভগবান্', 'আমি সকলের প্রভু।' আর ত' কেহ এরূপ বলেন না। কেন আর কি কোন ভগবান্ নাই?

শ্রীল মহারাজ—আপনার গণিতের উপর বিশ্বাস আছে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস আছে, নিউটনের Theoryতে বিশ্বাস আছে, অথচ বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবতে

বিশ্বাস নাই—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে। কোন ভারতীয়কে আমি এরূপ বলিতে শুনি নাই।

সাংবাদিক—শ্রীকৃষ্ণ যদি ভগবান্ হন, তাহলে নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য কেন করেন? ছল, কপটাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন কেন?

শ্রীল মহারাজ—দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর একটী সহজ উদাহরণদ্বারা দিতেছি। কোন মা সাপকে ঘরের ভিতর ফলে মুখ দিতে দেখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত মায়ের ছোট একটী সন্তান যদি উক্ত ফলটী খাইবার জন্য জিদ্ করিতে থাকে, তাহলে তিনি বালকটীকে নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। বালক না বুঝতে চাহিলেও মা বিভিন্নপ্রকার বাহানা করিয়া বালককে ফলটী খাইতে দেন না। আপনি কি বলিবেন, মা নিজ পুত্রের সহিত ছল করিয়াছেন, কপটতা করিয়াছেন? অথবা বালকের প্রতি দয়া করিয়াছেন? ঠিক এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কৃত কার্য্যাবলী বাহ্যিকদৃষ্টিতে কপটতা হইলেও কপটতা নহে। জগজ্জীব তাঁহারই সন্তান। জগৎ-পিতা কি কখনও নিজ সন্তানের প্রতি কপটতা প্রকাশ করিতে পারেন? কখনই না।

সাংবাদিক—আপনাদের মঠ সমাজের জন্য কি করিতেছে?

শ্রীল মহারাজ—অন্যান্য সংস্থা যাহা করে না বা করিতে পারে না, আমরা তাহাই করিতেছি। আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়া জীবহিংসা হইতে বিরত এবং গোমাংস প্রভৃতি অভক্ষ্য ছাড়াইয়া শুদ্ধ এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী করিতেছি। আমাদের উপদেশ পালন করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বিভিন্ন দেশের ভক্ত আপনাদের সম্মুখেই বিরাজমান রহিয়াছে। এককথায় আমরা Diversity in unity, unity in diversity প্রচার করিতেছি। ইহার দ্বারাই বর্ত্তমান জগতে বাস্তবিক সুখ-শান্তি সম্ভব। আমরা জগৎকে আরও শিক্ষা দিয়া থাকি—অগ্নির দ্বারা অগ্নি প্রশমিত হইতে পারে না। আপনাকে কেহ অপমান করিলেও তাহাকে আপনি সম্মান করিবেন। যদি কেহ আপনার নিন্দা বা সমালোচনা করে তথাপিও তাহার কল্যাণ চিন্তা করিবেন। মহামায়ার দুর্গ হইতে কোন একটী জীবকে ভগবানের দিকে আনাই প্রকৃত দয়া। আমাদের মঠ বা সংস্থা সেই বাস্তবিক দয়ারই কার্য্য করিতেছে।

সাংবাদিক—পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণ ভারতকে কোথায় লইয়া যাইবে?

শ্রীল মহারাজ—সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে।

সাংবাদিক—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় বা বৈদিক শাস্ত্রকে Mythology বলিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

শ্রীল মহারাজ—আমরাই বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তকে Mythology বলিয়া থাকি। কেন, জানেন? আজ কোন এক বৈজ্ঞানিক কত সময়, কত সম্পদ্ খরচ

করিয়া এক Theory আবিষ্কার করিল, পরবর্ত্তিকালে অপর এক বৈজ্ঞানিক উক্ত Theory খণ্ডন করিয়া নূতন Theory স্থাপন করিল। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্তের কথা বলা আছে, তাহা কখনও কোন যুগে মিথ্যা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণের কথাতে যদি এতই বিশ্বাস, তবে আতঙ্কবাদীদিগকে খারাপ বলা হয় কেন? তাহারাও ত' বিনাশের জন্য নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ, এইজন্যই তাহারা অনেকক্ষেত্রেই বলিয়া থাকেন,—It may be. বৈদিক শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ। শাস্ত্র আমাদিগকে সকল জীবে প্রেম করিতে শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দ্বারাই হৃদয় নির্ম্মল হইবে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা নহে।

সাংবাদিক—জগতের কল্যাণ কিভাবে হইতে পারে?

শ্রীল মহারাজ—একমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই জগতের কল্যাণ সম্ভব।

সাংবাদিক—আপনি যে জম্মু-কাশ্মীরে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাতে জগতের কিভাবে কল্যাণ হইতে পারে?

শ্রীল মহারাজ—একটী উদাহরণের দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেছি। যেমন, কোন একটী সরোবরে এক টুকরা পাথর ছুঁড়িলে সরোবরের জল তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত তটকে স্পর্শ করিবে, তদ্রূপ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের শব্দতরঙ্গ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তকে স্পর্শ করিবে। এই শব্দতরঙ্গের মাধ্যমেই আজ বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি কার্য্যকরী হইয়াছে। নানাপ্রকার জড়শব্দ বায়ুমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিতেছে, একমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের শব্দই (Transcendental Sound) পৃথিবীকে শুদ্ধ করিতেছে। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন না থাকিলে আজ পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিত। অতএব প্রত্যেকেরই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

জম্মু-কাশ্মীরে 'অমর-উজালা', 'দৈনিক জাগরণ', 'পাঞ্জাব কেশরী', Kashmir Times, Daily Excelisor, Views Today, Times of India প্রভৃতি সংবাদপত্র ও স্থানীয় দূরদর্শন প্রতিদিন শ্রীল মহারাজের বক্তৃতা প্রকাশ, প্রচার ও Telecast করিত। জয়পুরে 'রাজস্থান পত্রিকা' ও 'দৈনিক ভাস্করে'ও বক্তৃতা প্রকাশিত হইত। শ্রীল মহারাজের সহিত প্রচারে ভারতীয় এবং বিদেশী সাতজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত সমেত শতাধিক ভক্ত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার ১১ পঙ্‌ক্তিতে "কিন্তু কখনও কৃষ্ণ হন নাই" স্থলে "কিন্তু কালী কখনও কৃষ্ণ হন নাই" হইবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

পরলোকে শ্রীপাদ কালাচাঁদ ব্রহ্মচারী প্রভু

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৩০শে শ্রাবণ, ১৪১০ (ইং ১৬/৮/২০০৩), শনিবার কৃষ্ণ-চতুর্থী-তিথিতে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে স্বজ্ঞানে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ কালচাঁদ ব্রহ্মচারী প্রভু চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। ঐ সময়ে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমঠে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারতির পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের উপস্থিতিতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উপস্থিত সকল ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে শ্রীযমুনাতীরে ধ্রুবঘাটে লইয়া যান এবং শাস্ত্রীয় বিধিমতে তাঁহার অন্তিম সংস্কার সম্পাদন করেন।

শ্রীপাদ কালাচাঁদ ব্রহ্মচারী প্রভু মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি মূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত সরল, নিরভিমানী ও মধুর স্বভাবের ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও হরিকথা কীর্ত্তনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁহার শ্রুতিমধুর হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রমে থাকিয়া মধুর হরিকথাদ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিতেন।

মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক-গমনের সংবাদে সমিতির সকল সেবকগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কয়েকমাস যাবৎ তিনি দিল্লীতে চিকিৎসারত ছিলেন। দিল্লী হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কয়েকদিন-মধ্যেই স্বধামে গমন করেন।

আমরা এইরূপ ঐকান্তিক এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরলোকগমনে বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। এই সংসারে দুঃখ-মধ্যে সবথেকে বড় দুঃখ হইল—বৈষ্ণব-বিরহ-দুঃখ। আমরা তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি—তিনি যেন তাঁহার সাধনোচিত ধাম হইতে আমাদিগকে গুরুসেবানিষ্ঠায় অণুপ্রাণিত করেন।

—জনৈক বিরহী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪১০ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০৩

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৮ নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৪১০, ইং ১৬/১২/২০০৩ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

নাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য প্রথমাষ্টকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শেঽধ্যায়ে—৩৩-৪০]

নাগপত্ন্য ঊচুঃ—

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃত-কিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খল-নিগ্রহায় ।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্য-দৃষ্টি-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥১॥

নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিল,—হে দেব, দুষ্ট-দমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্য হইয়াছে । আপনি শত্রু ও পুত্রে উভয়ের প্রতি সমদর্শী এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আলোচনা করিয়াই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥১॥

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ ।
যদ্দ্বন্দ্ব-শূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥২॥

যেহেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন । বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি ॥২॥

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং
নিরস্ত-মানেন চ মানদেন ।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥৩॥

সম্মানাদিদ্বারা ভক্ত জীবসমূহকে সন্তুষ্ট করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া আপনি সর্ব্বজীব-স্বরূপ অথবা সর্ব্বজীব আপনাতে অবস্থিত বলিয়া আপনি 'সর্ব্বজীব' স্বরূপা । আমাদের এই স্বামী পূর্ব্বজন্মে অমানী এবং মানদ হইয়া কোন্ তপস্যা কিংবা সর্ব্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন—যাহাতে আপনি ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন??৩॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি-রেণু-স্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৪॥

হে দেব, যে পদরেণু লাভের আশায় ললনা শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কালিয় কোন্ পুণ্য-প্রভাবে সেই চরণ-রেণু লাভের অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥৪॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগ-সিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদ-রজঃ প্রপন্নাঃ ॥৫॥

আপনার পদরজঃ-প্রাপ্ত জনগণ স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ বাসনা করে না ॥৫॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধ-বশোঽপ্যহীশঃ ।
সংসার-চক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্-বিভবঃ সমক্ষঃ ॥৬॥

হে প্রভো, যে পদরজঃ বাঞ্ছা করিয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণশীল ব্যক্তিগণও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, ক্রোধ-পরবশ তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ সেই পদরজঃ প্রাপ্ত হইল ॥৬॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥৭॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন আপনাকে নমস্কার । আপনি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপক এবং আকাশাদি সর্ব্বভূতের আশ্রয়-স্বরূপ, যেহেতু আকাশাদি ভূত-সৃষ্টির পূর্ব্বেও আপনি বর্ত্তমান ছিলেন । আপনি সর্ব্বকারণ-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্ব-কারণাতীত তুরীয়-বস্তু ॥৭॥

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্ত-শক্তয়ে ।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥৮॥

নির্গুণ, নির্ব্বিকার চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক অনন্ত শক্তিযুক্ত পরমাত্ম-স্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

প্রীতি

প্রীতি-শব্দের মাধুর্য্য

প্রীতি—এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতা-গণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ-নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

জীবমাত্রই প্রীতির বশ

প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়—তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

ভুক্তি ও মুক্তির প্রতি প্রীতিহেতুই তাহাদের অন্বেষণ

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ্, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব-দেবত্বে ব্রহ্মালোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতি-লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রীতি-সম্বন্ধে চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস প্রীতি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে, ইহা বই নাহি আর।।
বিধি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে, তাহে উপজিল "রী"।।
পুনঃ যে মাথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিঁয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব সে কি??
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতি কুল তার।।
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।।

জড়বস্তু চিদ্বস্তুর ছায়া

পদার্থ দুই প্রকার—চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতি-বিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে,

ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

প্রীতিই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম এবং সেই প্রীতির বিকৃতি জড়ে লক্ষিত হয়

চিৎপদার্থে কি-ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতি-ধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি?

প্রীতির স্বরূপ

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা-শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধ জীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ **প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়।** জড় জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে একবস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহৎ জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।১৩) বলিয়াছেন ;—

স ব্রয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তবানোযোহন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।।

জড় সূর্য্যাদি ও চিৎ সূর্য্যাদির পার্থক্য

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি। সে-সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড় জগতে ঐ সমস্ত হেয় পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

প্রীতিই চিজ্জগতের ধর্ম্ম

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে-জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে-জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে।।
'পিরীতি' 'পিরীতি', তিনটী আখর,
পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত।।"

সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মণ্ডলাকারে আকর্ষণ ও তাঁহার নিত্যরাস

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও **জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস।** তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন-সিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

মুক্তজীব কৃষ্ণাকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ, মুক্ত জীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্।

বদ্ধজীব কৃষ্ণাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইবার কারণ

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখ-সমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমাননদ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্ম কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া, এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করত আত্মজগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন।

বদ্ধজীব বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে কৃষ্ণাকৃষ্ট হন

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করত কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;—

কানু যে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটী নয়নের তারা ।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিখ হারা ॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার মনে যেবা লয় ।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম-বঁধূ বিনে, আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও, ধরম-করম, মন স্বতন্তরী নয় ।
কুলবতী হৈঞা, পিরীতি-আরতি, আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায় ।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, থাক্ ঘরে কুল লই ॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন-চুয়া ।
শ্যাম-অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল-তুলসী দিয়া ॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক, পাড়া ।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি-কুল-শীল ছাড়া ॥

স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের স্বভাব

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানকে সম্মান করত নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূল দেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান। ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করত একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় ও শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বরাগ, অভিসার ও মিলন

এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।। (চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১)

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহারা আকর্ষণী শক্তি স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতিয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

শুদ্ধা ও অশুদ্ধা প্রীতি

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাবগত-প্রীতি—শুদ্ধ-প্রীতির বিকৃতিমাত্র। ইহারা প্রীতি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আনুরক্তি, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতি শব্দের অর্থ ; যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৫।৬)—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। (ইত্যুপক্রম্য) ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয় ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতমতি।

প্রেমের আদর্শ

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড়জগতে ও লিঙ্গজগতে বিরাগলাভ করত স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে মৈত্রেয়ি! স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হন না, কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গশরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম-সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। **বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম, কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র**। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

কৃষ্ণপ্রীতিই চরম উপদেশ

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করত জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন্।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

[১] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩১ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—ভগবন্নাম ও ভগবৎ-কথা ত' বৈকুণ্ঠবস্তু। আমরা এজগতে থেকে তা' কি ক'রে পাব?

উঃ—ভগবন্নাম ভগবদ্রাজ্য হইতে কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীঅর্চ্চাবতার, শ্রীনামাবতার ও শ্রীগুরুদেবাবতার ভগবানের কথা বহন ক'রে এ জগতে আনেন। ইঁহারা তিনজনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার বিষয়জাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেবাবতার আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সন্ধান পাই। তবে এখানে একটী কথা এই যে—শ্রীরাধা আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া শ্রীরাধানাম ও শ্রীরাধাবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বস্তু। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জড়ের নামে ও জড়-বস্তুতে ভেদ আছে।

প্রঃ—যীশুখ্রীষ্ট জগদ্‌গুরু। তাঁহার উপদেশই ত' আমাদের মঙ্গললাভে যথেষ্ট। তবে আবার মহান্তগুরুর আবশ্যক কি?

উঃ—আমরা জগদ্‌গুরু ও মহান্তগুরু—উভয়ই স্বীকার করি। কেবল-জগদ্‌গুরু-বাদ স্বীকার করিলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্‌গুরু স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্তগুরুর অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। মহান্ত-গুরু-পারম্পর্য্যই ভগবান্ বা জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণের বার্ত্তা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে যে মূল জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা যেমন বহুদূরে এই নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকট গঙ্গার খাত আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্তগুরু ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারা আমার নিকট পর্য্যন্ত আনয়ন পূর্ব্বক আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু যদি ঐরূপ গঙ্গার খাত না থাকিত তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক—বলহীন, অর্থহীন লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না। আর হিমালয়ের সেই রোড-সম্মেলন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকে হিমালয়ের পবিত্র জলধারা বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইত। মহাত্মা যীশু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যদি গুরু-পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট প্রবাহিত না হইয়া আসে, কেবল তাহা পুস্তকে ও উপদেশের মধ্য হইতে

খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হয়ত' মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যের বিকৃতিকেই, এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধবাদকেই তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে।

মহান্তগুরু ও জগদ্‌গুরু। তিনি পূর্ব্ব জগদ্‌গুরুরই প্রকাশবিগ্রহ। তিনি জগদ্‌গুরুরই কথা গুরু-পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি কোন প্রকার বঞ্চক নহেন—আমার তোষামোদকারী নহেন—আমার নিকট হইতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রার্থী নহেন। তিনি নিরপেক্ষ সত্যের বার্ত্তা-বহনকারী।

প্রঃ—জীব ত' তটস্থশক্তি। এজন্য সে সেবা করিতেও পারে, আবার ভোগ করিতেও পারে। ভোগবীজও তাহাতে অব্যক্তভাবে থাকে। সিদ্ধির পরেও কি জীবের সেই ভোগবীজ বা ভোগবাসনা থাকে?

উঃ—না। শাস্ত্র বলেন,—

জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৭)

ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্য-রূপ ভোগবাসনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কাল-প্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধনদ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে।

যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতল-বারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগ-বাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম সম্ভাবনা রহিল না।

প্রঃ—অর্থের সদ্ব্যবহার কিসে হয়?

উঃ—আমরা সৎকর্ম্মী বা কুকর্ম্মী নহি, আমরা অকৈতব হরিভক্তের পাদ-ত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।

গ্রন্থ-প্রকাশে, হরিকথা-প্রচারে ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অর্থের নিয়োগই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ।

প্রঃ—পরনিন্দা কি গর্হণীয়?

উঃ—পরের স্বভাব বা কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলিয়াছেন,—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" পরনিন্দকের গতি নরকপ্রাপক। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও সমালোচনা লোকের মঙ্গলের জন্য। আমাদের ঐরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে না যাওয়াই ভাল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

প্রঃ—সংসারে কি সুখ আছে?

উঃ—সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। সংসার নানাপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তি উদয় করায়। তাহাতে ভাল-মন্দ ও আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানা প্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের প্রাকট্য। শ্রীগোলোকধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। স্থান-বিশেষে বা কাল-বিশেষে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—ভজনের সহায় কি কি?

উঃ—ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর-প্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

প্রঃ—ঠাকুরের বিষয়-রক্ষণও কি সেবা?

উঃ—আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে-সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক।

প্রঃ—বৈষ্ণবের কৃত্য কি?

উঃ—বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন ভগবদনুগ্রহসাপেক্ষ। এজন্য ভগবন্নির্ভরতা সকলেরই অবশ্য কৃত্য।

শরীর-সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয় কিন্তু কোন অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর সংরক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে।

প্রঃ—শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি কি একই বস্তু?

উঃ—শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী পৃথক্ বস্তু নহেন, একটীমাত্র বস্তু। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধ জীবের অন্য চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপাস্থিত হয়, সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিমবিচারে অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ করিতে নাই।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

প্রঃ—ভক্তমাত্রেই কি পূজনীয়? ভক্তের রক্ষক কে?

উঃ—কাঙ্গালভক্তগণের প্রতি কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

সামাজিক উচ্চাবচ-জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপরাধ।

প্রঃ—বৈকুণ্ঠ ও জগতের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্বসদৃশ ;অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই যে, চিন্ময়রাজ্যে যে সব ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ-পিণ্ডের বাধা নাই, চিন্ময় সদ্‌গুণসমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। অচিজ্জগতে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দবোধ, নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখয়াছে। চিন্ময়জগৎ—নিত্য অচিদ্-বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময়-বিচিত্রতাপূর্ণ, সর্ব্বসদ্‌গুণ-মণ্ডিত ও অনুক্ষণ নিত্য আনন্দপ্রদ। আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

প্রঃ—নাস্তিকের পরিণাম কি?

উঃ—শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল বিধান করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা জগতে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে নাস্তিকের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে। **(ক্রমশঃ)**

খাল কেটে কুমীর আনা

জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্য সেবক, সুতরাং ভগবৎসেবা করা তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন ভোগ্য বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে সেইসকল নশ্বর বস্তুতে স্নেহ বা আসক্তিবশতঃ তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়। ভগবদ্‌বিস্মৃতিই জড় স্নেহ ও আসক্তির কারণ। ভগবানের স্নেহ ও ভগবানের প্রতি জীবের আসক্তি—নিত্য, তাহা বিপর্য্যস্ত হইলেই নশ্বর বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ স্নেহ ও আসক্তি প্রবল হইয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ আনন্দাভাস উৎপাদন করে। ভগবদ্‌বিস্মৃত বদ্ধজীবগণ ভোগধর্ম্মক্রমে বৃথা গল্প, ক্রীড়া, ভ্রমণ, শয্যা, আসন,

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

আহার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলস্বরূপে তাঁহাদের "কাঁটা গাছের তলায় থাকার" ন্যায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও অসুখী অবস্থায় জীবন কাটাইতে হয়। ভগবৎসেবকগণ ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অনিত্য কার্য্যে নিজদিগকে আত্মনিয়োগ না করিয়া পরমানন্দ ও পরাশান্তি লাভ করেন। ভগবানের সেবার জন্যই ভক্তের শয্যা-স্থাপন, ভ্রমণ, বাক্যালাপাদি যাবতীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তুর সহিত পার্থক্য স্থাপনফলেই মায়াবদ্ধ জীবের চরম দুর্গতি উপস্থিত হয়।

মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই স্বভাবতঃ স্বীয় অনর্থকর কাম্যবিষয়, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য ও পুত্রাদি-বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে। লোকহিতকর বেদশাস্ত্র পরমসুখ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কামমার্গে ভ্রমণশীল ও তামসযোনি প্রবেশশীল ব্যক্তি-দিগকেই কামবিষয়ে প্রয়োগের উপদেশ প্রদান করের ; কিন্তু স্বীয় বাক্যে বিশ্বস্ত জীবগণকে তাহা করেন না। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ ভগবৎসেবায় উন্মুখতা প্রদর্শন না করিবার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে ভগবৎকর্ত্তৃক বিপরীত শক্তি লাভ করে এবং ভোক্তা সাজিয়া মায়া-বিস্তারিত জালে আবদ্ধ হইয়া সংসারভোগে প্রবৃত্ত হয়।

ভোগময়ী দৃষ্টি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশের জন্যই জীবের দুর্দ্দশা

আত্মসুখ ভোগের জন্য ভগবানকে স্ব-সেবাদানে বঞ্চিত করিলে অনিত্য বস্তুতে চিত্ত প্রসাধিত হইয়া নানাপ্রকারে অশান্তি উৎপন্ন করে। যেকালে চিত্ত দেহ-গেহাদি বিষয়ে অর্পিত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহে ভ্রমণ করে, তৎকালে রজোগুণাধিক্য ও অসদ্‌বিষয়নিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, ভোগবাসনা ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। মক্ষিকা যেরূপ সঞ্চিত মধু গ্রহণ করিতে করিতে মধুতে আটকাইয়া যায়, ভগবৎসেবাবিমুখ বদ্ধজীবগণ সেইরূপ নিজের ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অমঙ্গলে পতিত হয়। মানবগণের জীবন ক্ষণস্থায়ী। যেরূপ অল্পজলে বসবাসকারী মৎস্যাদি প্রাণিগণ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান জলের বিষয় জানিতে পারে না, তদ্রূপ পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত মূঢ় মানবগণ প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মান আয়ুর বিষয় অবগত হয় না। তাঁহারা "স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি একমাত্র ভগবান্"—এইকথা না জানিয়া আপনাকে হৃষীকেশ-তুল্য মনে করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে ভোগ্যা ও নিজেদের ভোক্তা অভিমানে স্ত্রৈণ হইয়া অর্থসংগ্রহের দাসত্বে ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনায় জগতে নানা কার্য্যের আবাহনপূর্ব্বক অবিবেচনার কার্য্য করিয়া বসে। স্ত্রীর চাহিদার অন্ত্য নাই। তাঁহার চাহিদা পূরণের নিমিত্ত পুরুষাভিমানীর গাধার ন্যায় বোঝা বহনপূর্ব্বক হাড়-মাস কালি করিয়াও নিস্তার নাই। বদ্ধজীবগণ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির

নিমিত্ত পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় নানাপ্রকার ব্রতাদি পালন করিয়া থাকে এবং পুত্র না হইলে মনোদুঃখে জীবনযাপন করে। কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঢাক-ঢোল-সানাই বাজাইয়া আনন্দের ফোয়ারা বহাইতে থাকে। পরে ভোগ্য পুত্রাদির মনোহর-বাক্যে তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে আনন্দ পাইয়া থাকে। কালসাপকে দুধ-কলা দিয়া পোষণ করিলেও যেরূপ যে কোন মুহূর্ত্তে দংশনের আশঙ্কা থাকে ; তদ্রূপ পুত্র হইতে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-পূরণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির যে কোন সময়ে স্নেহের পুত্রের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। যিনি পিতৃপুরুষগণকে 'পুৎ'-নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-ভক্তি লাভের পথের সন্ধান দেন, তিনিই প্রকৃত পুত্র। তাহা না হইলে সেই পুত্র মূত্রসদৃশ ; কারণ পুত্র ও মূত্রের উৎপত্তিস্থান একই। "কুলং পবিত্র"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে প্রকৃত পুত্র বিশ্বের সমস্ত কিছুকে পবিত্র করিতে সমর্থ। "ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে, আগুনে পুড়ে মলুম"—এই প্রবাদবাক্যের ন্যায় বুদ্ধিভ্রষ্ট মানব-গণ স্থূল শরীরের দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে নশ্বর জড়ানন্দ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পরমার্থ ধন হারাইয়া ফেলে এবং অনন্তপ্রকার ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া ব্যর্থতার মধ্যে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া থাকে।

জড় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভগবদ্বিমুখতার প্রাবল্য দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ ত' একে অহর্নিশ ভোগের দ্বারা আক্রান্ত, তদুপরি সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টি. ভি., ও বিজ্ঞানের অন্যান্য অবদানগুলি তাঁহাদের ভোগে ইন্ধন যোগাইয়া চরম সর্ব্বনাশ করিতেছে। সিনেমা, টি. ভি. হইতে সৎশিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া সকলে অসৎশিক্ষার শিকার হইতেছে। "গর্ত্তের সাপকে খুঁচিয়ে বের করার ন্যায়" টি. ভি. প্রভৃতি যে আমাদের অনুপস্থিত বিপদকেও পরিষ্কারভাবে ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন। ভগবৎ-সেবা করিয়া ভক্ত যে-প্রকার সুখপ্রাপ্ত হন, জড়ভোগের চেষ্টায় ইতস্ততঃ ধাবমান পুরুষের সে-প্রকার সুখ কোথায়? কোন কারণে বদ্ধজীবগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিবার ফলেই ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের বাসনাকে গ্রাস করিয়াছে।

কর্ম্ম-জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি অনুশীলনে পারমার্থিক কল্যাণ ত' দূরের কথা, ভববন্ধনই দৃঢ়তর হয়

কথায় বলে,—"Out of the frying pan into the fire" অর্থাৎ এক বিপদ এড়িয়ে আর এক বিপদে পড়া। বিদ্বদভিমানী পুরুষ এই সংসারে বৈষয়িক সুখের জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক বারম্বার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া

অভিলষিত ফললাভ ব্যতীত প্রায়ই বিপরীত ফল পাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইহলোকে কর্ম্মিগণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহারা চেষ্টা না করেন, সেই পর্য্যন্তই সুখে থাকেন, চেষ্টার অব্যবহিত পর হইতে সর্ব্বদাই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল কর্ম্ম অপকৃষ্ট এবং ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। যে-সকল অবিবেকী-ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 'জনসেবা' বলিয়া জীবের দুঃখমোচনকল্পে কর্ম্মিগণ 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান' প্রভৃতির যোগান দিয়া যে সাময়িক অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন, তাহা জীবের প্রতি বঞ্চনা মাত্র। যেরূপ শরীরের দাদ ভাল করিতে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি উপস্থিত হইয়া শরীরের অধিক সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবের সাময়িক দুঃখমোচন-কল্পে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া অনন্তকালের জন্য ভবচক্রে ঘুরপাক খাওয়াইয়া কর্ম্মিগণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করেন।

যাঁহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষ হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তদ্রূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্র হইয়া থাকে। ভগবদাদেশে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রচারিত 'কেবলাদ্বৈতবাদ'কে যাঁহারা পরমার্থানুশীলনের একমাত্র পন্থা জানিয়া তাহাকে বহুমাননপূর্ব্বক তাহাতে আসক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা আত্মবিনাশপূর্ব্বক চিরকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দসুখ হইতে বঞ্চিত হন। শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীব জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও ভগবানের পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃ-পতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অভক্ত প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাঁহারা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

আউল-বাউল-সহজিয়াদি অপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ—চরম দুর্দ্দশার শিকার

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গনাগরী—এই ১৩টী অপসম্প্রদায় 'ভক্তি'র বিকৃত রূপ দিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ আত্মভোগপর মতবাদ প্রচার করেন। অপসম্প্রদায়িগণের ইতরাসক্তির প্রাবল্য অধিক পরিমাণ হওয়ায় তাঁহারা 'অসৎ'; অতএব অসতের সঙ্গপ্রভাবে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? "কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনোর" ন্যায় আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়িগণ কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া "শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক"—এই চারিটী সৎসম্প্রদায়কে অবমাননাপূর্ব্বক

জীবের অপ্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিয়া নিরয়ে অশেষ যাতনা ভোগ করিবার জন্য চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম লিখাইয়া থাকেন। অপসম্প্রদায়িগণের অনেকে আখড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরোধী ও অবৈধ আচরণ করিয়া থাকেন। এইসকল "বমন করিয়া বমন ভক্ষণকারী অর্থাৎ বান্তাশীদিগের" সহিত বৈষ্ণবের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বান্তাশীরা শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করেন বলিয়া তাহারা নামাপরাধী। শ্রীহরিনাম ও নামপরাধ পৃথক্ বস্তু। নামের বলে যেখানে পাপ, সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধী শ্রীহরিনাম করিয়াও নরকের দ্বারা পরিষ্কার করেন। আবার গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহত্যাগীর বেষ গ্রহণ করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা করা হয়। গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণে কেবল গৃহত্যাগী বেষাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা হয় মাত্র। ত্যক্তগৃহাশ্রমীর বেষধারণপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম করিয়াও গৃহস্থগণ মঙ্গললাভ না করিয়া চিরকালের জন্য অমঙ্গলকে আবাহন করিয়া বসেন। যখন ঐ সকল অপসম্প্রদায়িগণ সকল অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর নাম গ্রহণ করতে করিতে ক্রন্দন করিবেন, তখন তাঁহারা ভক্তমধ্যে গণ্য হইবেন।

ভগবৎসেবাপর হইলেই জীবের সর্ব্ববিঘ্ন-নাশ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ছলনা তমোগুণের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া তামসিকতায় পর্য্যবসিত হইলে বদ্ধজীব আপনাকে সংসার-মুক্ত মায়াবাদী বলিয়া জানে। ভক্ত ও ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভগবৎসেবনাবস্থায় কৃষ্ণসংসারের সেবা তাঁহার জড় সংসার ধ্বংস করে। ভোগময়ী দৃষ্টি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত জীবের শান্তিলাভ ঘটে না। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামিগণের শরণাগত হইলে অশান্তি অপনোদিত হয় না। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণভজনোপদেশ লাভ করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গললাভ হয়। ভক্তি ব্যতীত অপর সকল পন্থাই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বৃথা। ভক্তিই সকল জীবের আশ্রয়িতব্য হওয়া উচিত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

অলৌকিক

[২৬]

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম **শ্রীঅভিরাম ঠাকুর**। ইঁনি পূর্ব্বে ছিলেন ব্রজের শ্রীদাম সখা। হাওড়া-আমতা লাইনে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাট। শ্রীপাটের মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীটি খনন করিবার সময় অত্যাশ্চর্য্যভাবে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকটিত হন। পুষ্করিণীটির নাম "অভিরাম কুণ্ড"। পুকুরের পাড়ে একটী

বকুলগাছ আছে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে এই বকুলগাছের নীচে আসিয়া বসিয়াছিলেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি খুব তেজস্বী ও শক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বহু বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যে, একশত জন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যক্তি যে কাঠকে নড়াইতে সক্ষম হয় নাই, সেই কাঠ তিনি অনায়াসে উঠাইয়া বাঁশির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ কাঠ ৩২ জনের বাহিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশি।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৬)

তাঁহার এইপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে ভক্তগণ অতীব বিস্মিত হইয়া তাঁহার জয়গান করিতেন। তাঁহার আরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বিষ্ণু শিলা ব্যতীত অন্য শিলাকে তিনি প্রণাম করিলেই তৎক্ষণাৎ সেই শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অবৈষ্ণবগণ কোন মতেই তাঁহার প্রণাম সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার একটী অদ্ভুত চাবুক ছিল। তাহার নাম জয়মঙ্গল চাবুক। সেই চাবুকটীর দ্বারা যাঁহাকেই তিনি আঘাত করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন।

[২৭]

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সন্নিকটে অমুয়া মুলুকে পরম ভাগবত **শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী** বাস করিতেন। তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান্, ভজনপরায়ণ গৌরগত প্রাণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার জীবনে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। জীব উদ্ধার-কল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে আবিষ্ট হইলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণই প্রেমোন্মত্ত হইয়া বিবশ অবস্থায় হাসিয়া, কাঁদিয়া, নাচিয়া, গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব আসিয়া তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হইল। এমন কি, মহাপ্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি বা ভুবনমোহন রূপলাবণ্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মহাপ্রভুর ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভাই সব! বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তোমাদের স্বরূপের জাগরণ হউক। আর কতকাল পড়িয়া রহিবে। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।" তাঁহার এইপ্রকার ভাব দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণ দৌড়াইয়া আসিলেন এবং অত্যাশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এমনকি তাঁহারাও তৎসন্দর্শনে প্রেমে পাগল হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

এই অলৌকিক সংবাদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কাণে পৌঁছিল। তিনি কোনমতেই

ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—"নকুল ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ কি সম্ভব? ইহা কেমন কথা! আচ্ছা, ইহার সত্যাসত্য আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থানে আসিয়া ভাবিলেন,—"আমি নকুলের নিকট যাইব না বা তাঁহাকে দেখা দিব না, দূরে গোপনে অবস্থান করিব। দেখি তাঁহাতে যদি সত্য সত্যই মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমার আগমন জানিতে পারিবেন এবং আমাকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিবেন। দেখি, তিনি যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তবে এই অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিব।"

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর দর্শনের জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। শিবানন্দ আসিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই জনারণ্যের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, হঠাৎ শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ভাবাবিষ্ট হইয়া শিবানন্দ, শিবানন্দ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই ইতঃস্তত হইয়া শিবানন্দ কোথায় খোঁজ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন সত্য সত্যই শিবানন্দ আসিয়াছেন। শিবানন্দ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে নকুল ব্রহ্মচারীর নিকট আসিলেন এবং মহাপ্রভুর ভাবে বিভাবিত, আবিষ্ট তাঁহাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। নকুল তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"বাঃ শিবানন্দ! তোমার মনে সংশয় বা অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইল কেন? তুমি ত' গৌরগোপাল মন্ত্রের উপাসক হে।" এই বলিয়া মস্তক দোলাইয়া দোলাইয়া মহাপ্রভুর ভাবে হাসিতে লাগিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শিবানন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সত্য সত্যই শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। ইহা সত্য সত্যই এক অলৌকিক ঘটনা।

[২৮]

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীমতী রাধা-রাণীর প্রিয় সখী শশীরেখা বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি এমন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি একভাবে তিনদিন চব্বিশ প্রহর উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই নৃত্যকলা যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই তাঁহার নর্ত্তনের সময় গান করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া একদিন নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব্ব দাও। তাহারা গান করিবে, আর আমি সেই সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিব।" মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, —"বক্রেশ্বর! যাও তুমি সহস্র পক্ষযুক্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাও।" তাঁহার নৃত্যে দেবতা, এমনকি অসুর পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু

নিজমুখে বলিয়াছেন যে,—বক্রেশ্বরের নর্ত্তনে স্বয়ং কৃষ্ণ নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার দ্বারাই শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষালন হইয়াছিল।

[২৯]

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যের নাম **শ্রীগোপালগুরু**। পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত। ইঁনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইঁনি এমন ভাগ্যবান্ যে, বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বালক অবস্থা হইতে তিনি সকলকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,—"যাঁহারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের শুচি-অশুচির বালাই নাই। আপনারা যে যেখানে থাকুন না কেন, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করুন।" বালকের মুখে এইপ্রকার হিতোপদেশ, তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাঁহাকে "গুরু" উপাধি দিলেন। তিনি শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল—শ্রীগোপালগুরু।

শ্রীগোপালগুরু শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাধাকান্তের সেবায় সমর্পিতাত্মা হইয়া ভজনে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে, অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বার্দ্ধক্যহেতু শ্রীবিগ্রহের সেবা কি করিয়া করিবেন—এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একজন স্নিগ্ধ সেবাপরায়ণ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। তিনি একদিন ধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বাপু! বার্দ্ধক্যহেতু আমি ত' আর শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে পারিতেছি না। তোমার হস্তে আমার রাধাকান্তের সেবাভার সমর্পণ করিলাম। তুমি যথারীতি সেবাকার্য্য পরিচালনা করিও।" শ্রীরাধাকান্তের সেবাভার শিষ্য ধ্যানচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াই তিনি তিরোধানলীলা আবিষ্কার করিলেন। ধ্যানচন্দ্র গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কি আর করিবেন, তিনি তাঁহার গুরুদেবের অপ্রাকৃত কলেবর দাহ করিবার জন্য স্বর্গদ্বারে আনিলেন। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া রাজপুরুষগণ রাধাকান্ত মঠ অবরোধ করিয়া ফেলিল। ধ্যানচন্দ্র ইহাতে উদ্বেলিত হইয়া ভাবিলেন,—"হায়, হায়! গুরুদেব আমাকে রাধাকান্তের সেবাভার সমর্পণ করিয়া গেলেন, কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, তাঁহার আদেশ পালন করা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমার বা কি ক্ষমতা আছে—আমার ত' অর্থবল নাই, লোকবলও নাই যে আমি এই দুর্ব্বৃত্তগণকে নিবৃত্ত করিতে পারিব।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। গুরুদেব ত' অন্তর্যামী।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

শিষ্যের হৃদয়ের ভাব সবই বুঝিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গেই গোপালগুরু শ্মশানের চিতা হইতে উঠিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি দৌড়াইতে দৌড়াইতে শ্রীরাধাকান্ত মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুরুষগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। তিনি শ্রীরাধাকান্ত মঠের সমূহ সেবার কার্য্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পুনরায় স্বেচ্ছা-ক্রমে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার তাঁহার তিরোধানের পরেও ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনধামে সশরীরে সাক্ষাৎভাবে ভজন করিতে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরুর এমনই অলৌকিক মহিমা।

[৩০]

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অর্জ্জুন সখাই **শ্রীপরমেশ্বর দাস**রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীপাট আঁটপুরে অবস্থিত। ইঁনি শ্রীপরমেশ্বরী দাস বা পরমেশ্বরী ঠাকুর বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। ব্রজের ভাবেই তাঁহার আনন্দ। তিনি সর্ব্বসময় গোপালভাবে হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রধান পার্ষদ ছিলেন। তাঁহাকে নিত্যানন্দের জীবন বলা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস এবং গৌরচন্দ্রের প্রকাশ বলিয়া বলা হইয়াছে। শ্রীজাহ্নবামাতা ঠাকুরাণীর তাঁহার প্রতি প্রচুর কৃপা ছিল। তিনি তাঁহাকে খেতুরীর মহোৎসবে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৃন্দাবন গমনকালেও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। জাহ্নবাদেবীর অশেষ করুণায় তাঁহার বৃন্দাবনে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তিনি শ্রীরাধা-গোপীনাথের মিলন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমে পাগল হইয়া গেলেন। জাহ্নবা-মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পরমেশ্বরী! তুমি আঁটপুরে ফিরিয়া যাও। সেখানে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকাশ কর।" আদেশ পাইয়া পরমেশ্বরী ঠাকুর আঁটপুরে আসেন এবং শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর পাট। সেখানে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের আসর বসিয়াছে। পরমেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনপ্রভাবে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু "দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।" পাষণ্ডিগণের বিরক্তি ও হিংসার উদয় হইল। তাহারা ভক্তগণকে জব্দ করিবার জন্য ও কীর্ত্তনস্থানকে অপবিত্র করিবার মানসে একটী মৃত শৃগাল লইয়া আসিয়া সেই কীর্ত্তনের আসরে ফেলিয়া দিল। পরমেশ্বরী ঠাকুর কীর্ত্তন ও নৃত্যে তদ্গতচিত্ত। তাঁহার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। পরমেশ্বরীর

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

কীর্ত্তনপ্রভাবে সেই মৃত শৃগালটী বাঁচিয়া উঠিল এবং কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বরী ঠাকুরের জয়গান করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনস্থানে মৃত শৃগালকে জীবিত করিয়া হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন—এমনই তাঁহার অলৌকিক শক্তি।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

রসরাজ মহাভাব

রস কাহাকে বলে? শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে নিরূপিত হইয়াছে।—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫।১৩২)

"(বিভাব ও ব্যভিচারী প্রভৃতির) ভাবনার পথ অতিক্রমণপূর্ব্বক যাহা শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে (রত্যাপেক্ষা) অতিশয় চমৎকারজনকভাবে আস্বাদনীয়তা লাভ করে, তাহাই রস বলিয়া কথিত হয়।"

রতি-অনুভূতি অপেক্ষা রস-অনুভূতিতে আনন্দের আস্বাদ কোটিগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ আনন্দ অনুভবজনিত চমৎকারিতা-বিশিষ্ট সুখই রস।

'রস'-শব্দের অর্থ দুইভাবে গৃহীত হইতে পারে। "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"—যাহার আস্বাদন গ্রহণ করা যায়, তাহাই রস। যেমন—মধু। আবার "রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ"—যে আস্বাদন গ্রহণ করে, তাহাকেও রস বলা হয়। যেমন —ভ্রমর। তাহা হইলে রস-শব্দের অর্থ—আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রস অর্থাৎ রসিক। দ্বিতীয় অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রস-আস্বাদক হিসাবে আস্বাদক রস। এই কারণে শাস্ত্রে তাঁহাকে রসিকশেখর অর্থাৎ রসিক-চূড়ামণি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

রসরাজ ঃ—যিনি রসসমূহের রাজা, যিনি সকল রসের নিধান অর্থাৎ ভাণ্ডার, যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, যিনি নিজেই রস-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বরস-শিরোমণি অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসের অপ্রাকৃত রসময়মূর্ত্তি, তিনিই রসরাজ। কে এই রসরাজ? ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ।" 'রাজ'-শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা পটু। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—"মধুর বৃন্দাবন-মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ।।" রসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

তাঁহার পারদর্শিতার পরিচয় আমরা কিভাবে পাই? ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের আস্বাদন করিয়াছেন বিষয়রূপে। আশ্রয়রূপে ঐ রস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রজলীলায় বিষয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিলেও আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে পারেন নাই। বিষয়জাতীয় সুখ বিষয়ের দ্বারা সম্ভব, আর আশ্রয়-জাতীয় সুখ আশ্রয়ের দ্বারা সম্ভব। কিন্তু ব্রজলীলায় শৃঙ্গার রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয় শ্রীরাধা। আশ্রয়জাতীয় সুখের পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীরাধাতে। সেই কারণে রসের আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে রসের বিষয়জাতীয় ও আশ্রয়জাতীয় আস্বাদনের পূর্ণতম প্রকাশ নবদ্বীপ-লীলায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'উপদেশামৃত' বিশেষভাবে স্মরণীয়। "শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশরস পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ-বিচারময়, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব—সেবকের চেষ্টার অভিনয়-কারী। শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিততনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব।"

"শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে বিভাবিত। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণই। ** শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা ; কিন্তু তিনি আশ্রয়বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী।"

"পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২।৮০)

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তিনটী অভিলাষ আশ্রয়জাতীয় ভাব না থাকায় পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সেই তিনটী অভিলাষ কি কি?—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৬ ধৃত শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা)

শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই কেমন এবং আমার মধুরিমা আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা কেমন সুখ

অনুভব করেন—এই তিনটী বিষয় জানিবার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন।

ভাবের আশ্রয় শ্রীরাধা, ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসার অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং **"আশ্রয়ের প্রণয়ভাবময় বিষয়-বিগ্রহ গৌরসুন্দর।"**

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৬।১০৭)

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ বিভিন্ন রসের আস্বাদনোদ্দেশে তত্তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ।"—অনুভাষ্য। রসাস্বাদনের মাহাত্ম্য ও রসিক-শেখরত্বের বিকাশ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অধিকভাবে অভিব্যক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২২২)

সম্ভোগ-বিগ্রহ নন্দনন্দনই বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ গৌরসুন্দর। শ্রীকৃষ্ণই রসময়মূর্ত্তি অর্থাৎ রসস্বরূপ। রসময় = রস + ময়। প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট' প্রত্যয়। শ্রীকৃষ্ণ রস-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। তিনিই মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। অতএব শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ।

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম 'মহাভাব'।। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮)

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তি তিন প্রকার—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। শ্রীকৃষ্ণের 'আনন্দ' অংশের শক্তির নাম 'হ্লাদিনী', 'সৎ' অংশের শক্তির নাম 'সন্ধিনী' এবং 'চিৎ' অংশের শক্তির নাম 'সম্বিৎ'। হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি। হ্লাদিনী ভগবানে অবস্থিত। হ্লাদিনী-শক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দ অনুভব করিলেও আনন্দের আতিশয্য বা আস্বাদন-চমৎকারিতা অনুভবের নিমিত্ত শুদ্ধভক্ত-চিত্তে ঐ শক্তি নিক্ষিপ্ত করেন। ভক্তের বিশুদ্ধচিত্তে যখন হ্লাদিনী প্রীতিপ্রদ হইয়া ওঠে, তখন তাহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্যরূপে পরিগণিত হয়। এই হ্লাদিনীর সার প্রেম। 'প্রেম'-শব্দের অর্থ প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি প্রদানই প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

স্বসুখ-কামনারহিত ভক্তের চিত্ত যখন শুদ্ধভক্তের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া

শুদ্ধসত্ত্বের সমান ধর্ম্ম লাভ করে, তখন হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব যে বৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা অর্থাৎ প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "হ্লাদিনীর সার প্রেম"—অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের গাঢ়তা প্রাপ্তিই প্রেম।

প্রেমসার অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা ভাব নামে অভিহিত। কয়েকটী স্তর অতিক্রম করিয়া প্রেম ভাবে পরিণত হয়। ছয়টী স্তরে প্রেমের গাঢ়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্তি যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে। তাহা হইলে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা—যাহার নাম ভাব। মহাভাব ভাবের পরমকাষ্ঠা অর্থাৎ ভাবের চরম পরিণতি। প্রেমবৈচিত্র্যতার উচ্চতম স্তর হইল মহাভাবের স্তর। এই মহাভাব 'মাদনাখ্য-মহাভাব'-নামে অভিহিত। যথা,—

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা।।

(উঃ নীঃ স্থায়িভাব ২১৯)

সমস্ত ভাবের উদগমদ্বারা উল্লাসশীল পরমোৎকৃষ্ট মহাভাবই মাদন নামে অভিহিত হয়। ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই অবস্থিত।

শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা। কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠাই শ্রীরাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের স্বরূপ মাদনাখ্য মহাভাব পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই কারণেই শ্রীরাধা সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমবতী। প্রেম চরমতম স্তরে উদ্দামশীল হওয়াই মহাভাবের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

রসরাজ মহাভাব ঃ—উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট যে, অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, আর মাদনাখ্য মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা। স্বরূপতঃ তাঁহারা এক হইয়াও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই হইয়াছেন। আবার রসরাজ মহাভাব একত্র সম্মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গস্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহা এক অচিন্ত্যভেদাভেদ রহস্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতাদৃশ রহস্যপূর্ণ স্বরূপটি শ্রীরামানন্দের সমীপে গোদাবরী তটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যথা,—

পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৬৭-২৬৯)

প্রথম দর্শনে সন্ন্যাসী রূপ। দ্বিতীয় দর্শনে শ্যাম-গোপরূপ অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে

শ্যামবর্ণ ও গোপবেশধারীরূপে দর্শন। আবার এই শ্যাম-গোপরূপের সম্মুখে দর্শন করিলেন এক কাঞ্চন-পঞ্চালিকাকে। কাঞ্চন-পঞ্চালিকা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রতিমা, স্বর্ণ প্রতিমাসদৃশ এক পরম রমণীয় রমণী। এই রমণীর গৌরকান্তিতে শ্রীশ্যামসুন্দরের অঙ্গ পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত। কেবল তাহাই নহে, শ্যাম-গোপরূপধারীর বদনে বংশী এবং নানাপ্রকার ভাবে চঞ্চলায়িত তাঁহার কমল নয়ন—ইহাও শ্রীরামানন্দ রায় দেখিলেন।

এই রূপ দর্শনে রামানন্দ রায়ের মনে সংশয় উদ্রেক হইল। সন্ন্যাসিরূপের পরিবর্ত্তে সবংশীবদন শ্যাম-গোপরূপ এবং তাঁহার সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাকে দর্শন করিলেন কেন? তাঁহার মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হইল। সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত তিনি মহাপ্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করাইতে নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রভু আত্মগোপনের পথ অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৬)

"রামানন্দ! রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম। এই প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি যাহা কিছু দেখ, তাহাতেই রাধাকৃষ্ণ দর্শন কর। উহা তোমার ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিমাত্র।"

কিন্তু মহাভাগবত রায় রামানন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহা যে মহাপ্রভুর চাতুরালি, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি মহাপ্রভুকে চাতুরালি পরিত্যাগ করিয়া এবং আত্মগোপন না করিয়া যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিলেন।

মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। রায় রামানন্দের নিকট তখনও পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। কিন্তু প্রেমরসকে উদ্বেলিত করিবারমানসে চতুর-চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত ভক্তের প্রেমরসে সিক্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন। পরাজয়ে তাঁহার অত্যধিক আনন্দ। হারিয়া আনন্দ! এই আনন্দের উদ্বেলিত ধারায় মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,—

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮১)

"রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা, দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব—সেই স্বরূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দেখাইলেন।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

এক-এ দুই এবং দুই-এ এক অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে

একতত্ত্ব দুই এবং দুইতত্ত্বই এক। এই 'এক' হইল "রসরাজ মহাভাব—দুই এক রূপ।" 'দুই এক রূপ' হইল মহাপ্রভুর যথার্থ স্বরূপ। এই স্বরূপ এক অপূর্ব্ব বস্তু, যাহা রায় রামানন্দ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছেন তাহা দূরে অবস্থিতা কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে আবরিত শ্যামসুন্দর রূপ। কিন্তু মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এখন যে রূপটী রায় রামানন্দকে দেখাইলেন, তাহা 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'—এই দুইয়ের সুন্দরতম মিলনে এক অত্যাশ্চর্য্য রূপ। 'রসরাজ'—অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, 'মহাভাব'—মাদনাখ্য-মহাভাব যাহা একান্ত শ্রীরাধার সম্পত্তি। সুতরাং "রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলনে এক অপূর্ব্ব রূপ। শৃঙ্গাররস—সর্ব্বরস-শিরোমণি, আর মাদনাখ্য মহাভাব প্রেমের চরমতম প্রকাশ। এই দুই-এর মিলনে এক অপূর্ব্বরূপ রায় রামানন্দের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্যামরূপ শ্রীরাধার কেবলমাত্র অঙ্গকান্তিদ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে—নবগোরচনা গৌরী শ্রীরাধিকার গৌর অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত। শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমে বিগলিত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্যাম অঙ্গে, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাভাবময়ী শ্রীরাধার গৌর আবরণের ভিতর দিয়াও রসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দরের নবজলধর-শ্যামরূপ যেন লক্ষিত হইতেছে।

শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের উৎকর্ষতা। শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত নিবিড় হইতে নিবিড়তর বা নিবিড়তম হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের প্রকাশও ততোধিক হইয়া থাকে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য নিবিড় হইলেও তাঁহারা দুই অঙ্গে পৃথকভাবে বিরাজ করিতেন। কিন্তু "রসরাজ, মহাভাব—দুই এক রূপ" এর ক্ষেত্রে তাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন এবং উভয়ের মাধুর্য্যের পূর্ণতম প্রকাশে 'রসরাজ-মহাভাব' রূপটী সত্যই অপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়। ইহাতে যুগলিত তত্ত্বের পরম ও চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে। রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত রূপই চরম রূপ ও পরম স্বরূপ।

প্রথমে সন্ন্যাসী রূপ, দ্বিতীয়ে বংশীধারী শ্যামরূপ এবং তাঁহার সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা শ্রীরাধাকে দেখিয়াও রামানন্দ রায় আনন্দের বিহ্বলতায় মূর্চ্ছিত হন নাই। কিন্তু "রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ" দর্শন করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮২)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

আনন্দের আতিশয্যে রায় রামানন্দের মূর্চ্ছা ঘটিল। রসরাজ মহাভাব রূপটী দেখিয়া তাঁহার শরীরে আনন্দের শিহরণ এতই প্রবলভাবে প্রবাহিত যে, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রসরাজ মহাভাব রূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের আনন্দ-তরঙ্গ অঙ্গকে এমনভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, রায় রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী হইয়াও তরঙ্গায়িত আনন্দের ধারায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনা হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, গৌরস্বরূপেই মাধুর্য্যের চরমতম প্রকাশ। শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকশিত বিগ্রহ। রসরাজ ও মহাভাবের অপূর্ব্ব মিলনে শ্রীগৌরবিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু রসরাজ-মহাভাব রূপের যথার্থ স্বরূপ নিজেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।।
তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।।
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮৬-২৮৮)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রায় রামানন্দকে বলিলেন,—"হে রামানন্দ! তুমি আমাকে গৌরাঙ্গরূপে দর্শন করিতেছ। কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গ নহি, আমি গোপেন্দ্র-সুত অর্থাৎ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অঙ্গদ্বারা আমার প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছেন। এইভাবে তাঁহার গৌরকান্তি আমাকে গৌরাঙ্গ করিয়াছে। আমাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও শ্রীরাধা স্পর্শ করেন না। আমি শ্রীরাধার কেবল গৌরকান্তিদ্বারাই আচ্ছাদিত নহি, শ্রীরাধার গৌর অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত। তাঁহার গৌরকান্তি বাহিরে প্রকাশিত। শ্রীরাধার ভাবে আত্ম-মন ভাবিত করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিতেছি।"

পূর্ণতমরূপে মাধুর্য্যরস আস্বাদনের একমাত্র উপায় মাদনাখ্য-মহাভাব। মাদনাখ্য-মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধা। মাদনাখ্য মহাভাবে যুগপৎ অসমোর্দ্ধ আনন্দ ও অসমোর্দ্ধ যন্ত্রণা উপস্থিত। সেই কারণে ইহার পরাক্রম অতি প্রবল। শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই পরাক্রম অসহনীয়। তজ্জন্য শ্রীরাধার আশঙ্কা তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িতে পারেন। কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তায় বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। চিন্তার অভিব্যক্তিতে যাহা স্থির করিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবের পরাক্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে রসরাজ ও মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন। একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের 'রসরাজ-মহাভাব—দুই এক রূপ'টী প্রেমিক ভক্ত শ্রীরামানন্দ রায়ের বেদ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রায় রামানন্দকে রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত রূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

—শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী

পরমারাধ্যতম রূপানুগাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

৩৪শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে

আক্ষেপ-গীতিকা

(১)

জয় গুরুদেব, শ্রীঠাকুর কেশব,
জয় মোর প্রাণাধার ।
তুমি ব্রজবাসী, শ্রীরাধিকা-দাসী,
তুমি কৃপা পারাবার ॥
(যদি) তুমি না আসিতে, এ মর্ত্ত্য-ভূমিতে,
কে জানা'ত তত্ত্ব-সার?
তব কৃপা বিনা, পরতত্ত্ব জানা,
সম্ভব হ'য়েছে কা'র??
তত্ত্ব নাহি বুঝি', কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী,
অসারে জেনেছে সার ।
ভক্তি-পথ ছাড়ি', অন্যপথ ধরি',
(কেহ) যেতে নারে মায়া-পার ॥
মায়াবাদ-মত, ভক্তির কণ্টক,
তাহা তমান্ধকার ।
তার উৎসাদন, কৈলে প্রাণপণ,
যেন মধ্ব-অবতার ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

(২)

শুদ্ধোধন-সুত, শূন্যবাদী বুদ্ধ,
নহে (বিষ্ণু)-বুদ্ধ-অবতার ।
শাস্ত্রীয় প্রমাণে, এ সত্য স্থাপনে,
অভ্রান্ত তব বিচার ॥
যত মায়াবাদী, ভক্তির বিরোধী,
সে মত দূষিত ছার ।
শাস্ত্রের বিচারে, জানা'লে সবারে,
গৌর মতই সিদ্ধি-সার ॥

(৩)

অপসম্প্রদায়, দোষ-দুষ্ট হয়,
—ত্রয়োদশ পরকার ।
প্রতিটি দোষেরে, তিনগুণ করে,
কৈলে নব আবিষ্কার ॥
ঊনচল্লিশাকারে, খণ্ড করি' তারে,
কৈলে বিশ্বে পরচার ।
শাস্ত্র-যুক্তি-আশ্রয়ে, সর্ব্বাপসম্প্রদায়ে,
করিয়াছ ছারখার ॥

(৪)

যদি ব্রজ হ'তে, হেথা না আসিতে,
আশ্রয় লইতাম কা'র?
বেদান্ত দর্শনের, নাম-পর ব্যাখ্যার,
দিলে নব উপহার ॥
বেদান্ত-দর্শন, ভকতি-দর্শন,
শ্রীনাম-ভজন সার ।
শাস্ত্রের বচন— 'ভক্তিই ভজন',—
শ্রীগৌরের শিক্ষা-সার ॥
বেদান্ত-বিরুদ্ধ, শঙ্কর-সিদ্ধান্ত,
'মায়াবাদ' নাম তা'র ।
মায়াবাদ-ব্রহ্ম, নহে 'নাম-ব্রহ্ম',
সে-মত দূষিত ছার ॥
বেদান্ত-সূত্র মাঝ, নামের বিলাস,
কৃষ্ণই সারাৎসার ।

তোমার বদনে,　　শ্রীরূপ-সনাতনে,
কৈলা ইহা পরচার ॥

(৫)

(সদা) রাধা-প্রেম চিন্তি',　　টুটি' কৃষ্ণ-কান্তি,
রাধা-বর্ণ হৈল যাঁর ।
সেই কৃষ্ণ-রূপ,　　রাধা আলিঙ্গিত,
(মর্ত্ত্যে) প্রকটিলে সেবা তাঁর ॥
সে যুগল-মাধুর্য্য,　　প্রেমের রহস্য,
তাহা সর্ব্বরস-সার ।
তব কৃপা বিনে,　　সে রসাস্বাদনে,
শকতি আছয়ে কার ??

(৬)

পাষণ্ডে শোধিয়া,　　শ্রীনাম বিতরিয়া,
কৈলে প্রেম পরচার ।
তোমার লেখনী,　　আর তব বাণী,
সাক্ষ্য দিছে আজো তাঁর ॥
কহিতে মোদেরে,—　　"(শুদ্ধ) নাম ভজন ছেড়ে,
জীব-গতি নাহি আর ।
(প্রত্যহ) লক্ষ নাম ল'বে,　　লক্ষ্য স্থির রেখে,
তবে যাবে ধামে তাঁর ॥
নিজ সুখ ছেড়ে,　　শ্রীহরি-সুখ তরে,
নিষ্কপট ভজন যা'র ।
সে উত্তম ভকত,　　লভে তাঁর শ্রীপদ,
যায় ত্বরা মায়া-পার ॥"
তব মহাগুণ,　　অনন্ত অগণন,
বুঝে না এ মূঢ় ছার ।
জনমে জনমে,　　তোমার চরণে,
যাচি সেবা-অধিকার ॥

(৭)

(আজি) তোমার বিহনে,　　দুঃখ পাই মনে,
শূন্য হেরি চারিধার ।
ত্বষানল-সম,　　জ্বলে হৃদি মম,
শক্তি নাহি সহিবার ॥

তব সেবা লাগি', দুঃখ পাই যদি,
সেই দুঃখ সুখ-সার ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, (মোর) প্রাণের সম্পদ,
ভব-দুঃখ দূরীবার ॥
তোমার চরিত, অপ্রাকৃত, পূত,
বৈশিষ্ট্যের নাহি পার ।
রবি-শশী সাথে, তব কীর্ত্তি র'বে,
ক্ষয় নাহি হবে তার ॥
জল বিনা মীন, হয় শক্তিহীন,
বাঁচিতে পারে না আর ।
তব অন্তর্দ্ধানে, মুঞি মনে-প্রাণে,
করি সদা হাহাকার !!
এই ধরা-বুকে, সবার সম্মুখে,
আসিবে না বুঝি আর!
(তাই) মাগি নত শিরে, দেহান্তে মোরে,
দেখা দিয়া করো পার !!

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রার্থী—

—**শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, কবিভূষণ

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া)

আমরা আজ এখানে একত্র সমবেত হয়েছি একটা বিশেষ কারণে। কারণটা আর কিছু নয়, অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব বা বিরহ-তিথি। জগতের লোক তাঁরা যেভাবে সাধারণের বা নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মার জীবনী লেখেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা দুটো জিনিষকে প্রধান বিবেচনা করেন—একটা জন্ম, আর একটা মৃত্যু। কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষের কর্ম্ম, কর্ম্মফল আছে। তদনুসারে তাদের জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই সংঘটিত হয়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ তাঁর এইরকম ধরণের জন্ম-মৃত্যুর কথা নাই। সচ্চিদানন্দ বস্তু তাঁর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই। ঠিক সেই আইনানুসারে নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মাগণেরও প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই, তাঁদের কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগ নাই। সেই কথাই শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করছেন। আমাদের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

গুরুপাদপদ্ম কোন একটা বিশেষ সময়ে তিনি এ জগৎ থেকে চলে গেছেন। কোথায় গেলেন? তাঁদের যাওয়ার যে স্থান সেই স্থানে গেছেন—গোলোক-বৃন্দাবনে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, নিত্যসিদ্ধ-নিত্যমুক্ত মহাত্মাগণের পক্ষে সেটা স্বতঃসিদ্ধভাবেই স্বীকৃত। গুরুপাদপদ্ম এই পূর্ণিমা-তিথিতে আমাদিগকে বঞ্চনা করবার জন্য এ জগৎ থেকে চলে গেছেন।

গুরু-বৈষ্ণবগণ কি বঞ্চক? যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে শাস্ত্র বলছেন,—হ্যাঁ, একদিকে তাঁরা বঞ্চক। হরিভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি যাঁরা, সাধন-ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি যাঁরা, তাঁদের জন্য তাঁরা সবরকম ধরণের কষ্ট স্বীকার করছেন। কিন্তু যাঁরা সাধন-ভজন করেন না; উল্টোপাল্টা সব করছেন, করেন, তাঁদের প্রতি নিশ্চয়ই তাঁরা একটু বিমুখ। সেই কথাটা বিশেষ বুঝবার বিষয়। ছেলেপিলেরা যদি ঠিক ঠিকভাবে মঠবাস করে, সাধন-ভজন করে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই যদি তাদের জীবনটা তারা লাগিয়ে দেয়, সেখানে সবটাই সম্ভব আছে। ঠিক ঠিক উপযুক্ত Guardian—অভিভাবক যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এইসব বিচারগুলো আছে এই সাংসারিক বিচারে। আর পরমার্থের ক্ষেত্রে ত' আরও বেশী কড়াকড়ি, আরও বেশী সুন্দর বিচার সেখানে দেখানো আছে।

গুরুদেব কে? তিনি বান্ধব, অগতির গতি। কিরকম অগতির গতি? যার কোন গতি নাই এ সংসারে, তার গতি। এমন দয়ালু, কৃপালু আর কেউ নাই এই সংসার-কারাগারে। 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে বলতে গেলে বহু কথা আছে। পারমার্থিক কল্যাণ চিন্তা করছেন গুরুদেব। জাগতিক কল্যাণ চিন্তা করার নামেতে বহু লোকে বহু কিছু প্রচেষ্টা দেখাচ্ছেন। কিন্তু পারমার্থিক কল্যাণ তাঁরা নিজেরাও বুঝেন না, আর অপরকেও বুঝান না। সেইক্ষেত্রে ভগবানের বিশেষ কৃপা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা পথ খুঁজে পাই না, উপযুক্ত Guardian—অভিভাবক খুঁজে পাই না। যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই পদ্ধতিতে দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দেখে সাধন-ভজনের পথ নির্ণয় করেন এবং সেইদিকেই শুশ্রূষু ব্যক্তিগণকে পরিচালিত করেন, তাঁরা হচ্ছেন জগদ্‌গুরু-তত্ত্ব। আমার গুরু, তোমার গুরু, তার গুরু—এই একটা কথা আছে। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" কথাটা শাস্ত্রেরই কথা। কিন্তু তার ভিতরেও অজ্ঞ ব্যক্তি অনেক কিছু ভুল, দোষ-ত্রুটী বের করবার চেষ্টা করেন। যিনি আমার গুরু, তিনি চৌদ্দভুবনের গুরু, তিনি জগদ্‌গুরু। এ কথা শাস্ত্রেরই কথা, এটা কোন বানানো কথা নয়। আমার গুরুকে আমি একটু বেশী প্রশংসা করে তাঁর স্তব-স্তুতি করলাম। ভিতরে ভাব আছে—আমি একটু আঁকুপাঁকু ভাব দেখাব, তাহলে হয়ত' গুরুদেব সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু বিষয়বস্তুটা তা নয়। তাঁরা যখন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

অন্তর্যামিত্ব লাভ করেছেন, তখন তাঁরা ত' সবটাই বুঝতে পারেন। অন্তর্যামি-তত্ত্ব। তাঁদের কাছে নূতন করে আর পড়া দেওয়ার কিছু নাই। স্বতঃসিদ্ধভাবে তাঁরা আমাদের ভুল, দোষ-ত্রুটী সব জেনে, শুনে, বুঝে বসে আছেন। তথাপি আমাদের সাধন-ভজনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এই পারমার্থিক পথে চলবার জন্য তাঁরা বহু উৎসাহ দান করেন। এইটাই তাঁদের বিশেষ কাজ।

একটা জিনিষ আমি শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের হরিকথার মধ্যে পেয়েছি। সেখানে তিনি বলছেন,—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ তিনি গীতা-ভাগবত উপদেশ করেছেন। সাক্ষাৎ উপদেশ তাঁর। কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে তাঁর কথা জগৎ বুঝতে পারেনি, পারছে না, পারল না। জগজ্জীবের এই দুঃখের কথা চিন্তা করে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে—রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরহরি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অখিললোকশিক্ষক জগদ্‌গুরুরূপে এই জগতে আবির্ভূত হলেন। তাহলে জীবকে হরিভজন করানোর মূল যে ভগবান্, তাঁর নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা আছে। তজ্জন্যই এই ব্যবস্থাটা নিয়েছেন তিনি। তোমরা কি করে কৃষ্ণনাম করবে, কি করে কৃষ্ণভজন করবে, রাধাকৃষ্ণ-ভজন কি করে করবে, নিজে সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। আকুল ক্রন্দন, ব্যাকুলতা নিজে দেখাচ্ছেন। তার ভাষা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থাদিতে সব রয়েছে।

কি অভাব তাঁর? তাঁর ত' কোন অভাব নাই। "স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্" সেই ভগবান্। কিন্তু জীবের দুঃখ দেখে তাঁর প্রাণ কাঁদে। এটা Guardian-এর স্বাভাবিক স্বভাব। সেইজন্য তিনি এসে সাধন-ভজন-প্রণালী, নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি প্রচার করলেন। অনেকে পূর্ব্বপক্ষ করে বলছেন, কি আর কৃপা করেছেন চৈতন্য-মহাপ্রভু? সবই ত' তাঁর নিজেরই পার্ষদ। উদাহরণ ত' আছে অনেক। বদ্ধজীবের স্বভাব সবসময় একটা খুটিনাটি দোষ-ত্রুটী বের করা, সে বৈষ্ণবেরই হোক, আর স্বয়ং ভগবানেরই হোক। তাদের বৃত্তিটাই হল 'মণিময় মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্।' এই হল তাদের দুর্ভাগ্য। শাস্ত্র বলছেন,—তুমি তোমার ভাল দেখ, সকলের ভাল দেখ। বুঝতে পারি না আমরা, স্বভাবদোষে সবই গণ্ডগোল হয়ে যায়, কেটে যায়। এ করলে ত' হবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

এই অমানী-মানদ কি করে হতে হবে, সেটাও শাস্ত্রে বলা আছে। আমার ঊর্দ্ধতন গুরুবর্গ সবাই সেগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রে।—

"অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

কথাটা কি? আমি যদি অমানী মানদ হতে পারি, তাহলে আমার কিছু প্রাপ্তি আছে। আর যদি তা না হতে পারি, অথচ যদি দুরাশা পোষণ করি, তাহলে কিছুই হয় না, হবে না। দুনিয়াকে ফাঁকি দেওয়া হয়, নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। ঠিক এই কথাগুলো গুরুবর্গ জানিয়েছেন। শাস্ত্রে ত' বহু কথাই লেখা আছে আমাদের মঙ্গলসূচক। আত্মকল্যাণসূচক বহু উপদেশ-নির্দ্দেশ আছে ; কিন্তু আমরা ত' সেটা বুঝি না। সদ্‌গুরুর যে উপদেশ-বাণী বিশেষ ক্ষমতা আছে তার ভিতরে। সেই ক্ষমতা নিয়েই তাঁরা জগজ্জীবের প্রতি কৃপালু, দয়ার্দ্রচিত্ত। বুঝতে পারি না ত' কিছু, বুঝব কি করে? যদি আমার আত্মসমর্পণ থাকে, শরণাগতি থাকে, তাহলে আমার কিছু হবে। আর যদি গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে দেখেন মহাদাম্ভিক, প্রতিষ্ঠাকামী, উল্টোপাল্টা বিচার নিয়ে আমি চলছি, তাহলে তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে রাখবেন। বার বার বলেও যদি আমি যদি কিছু না বুঝি, গুরূপদিষ্ট পথে যদি না চলি, তাহলে তাঁরা বঞ্চনা করতে পারেন। কিন্তু বঞ্চনা করবার উদ্দেশ্য তাঁদের নয়। স্বয়ং ভগবানের নয়, আর তাঁর নিজের পার্ষদ ইত্যাদিরও তা নয়। তাঁরা সবসময় বদ্ধজীবাত্মাকে কৃপা করতে চান। উন্নীত করতে চান তাদের আত্মকল্যাণ। কিন্তু আমরা ত' সেটা বুঝি না।

আমার গুরুদেবের আজকের তিরোভাব-তিথি। এই চিন্তা করেই আমার হৃদয় ত' কাঁদছে না, আমার হৃদয়ে ত' তাঁর অভাব কভু নাই। আমি যে মহামণি—স্পর্শমণি হারিয়ে ফেলেছি, সে চিন্তা-ভাবনা ত' আমার নাই। বেশ ত' আছি খেয়ে-পরে। কিন্তু চিন্তার বিষয়! সাধন-ভজন যাঁরা করবেন, ভগবানের চিন্তা যাঁরা করবেন, তাঁদের খুব সাবধান হতে হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখলেন,—"বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে।" কি সাবধানতা? শাস্ত্র বলছেন,—অপরাধ হয় না যেন। এ জিনিষটা চিন্তার মধ্যে থাকবে আমার। নাম করতে গেলে—নামাপরাধ, ধামদর্শন করতে গেলে—ধামাপরাধ, সেবা করতে গেলে—সেবাপরাধ। গুরু-বৈষ্ণবের কাছে থাকতে গেলে, সেবা করতে গেলে গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ। তাহলে এখন 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়?' কি করব? এত রকমের বাধা-বিপত্তি। যেখানে যত বাধা-বিপত্তি আছে, সেইখানে প্রাপ্তিটা তত সুলভ। একথাও শাস্ত্রে বুঝানো আছে। শাস্ত্র সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখব শাস্ত্র হল শাসনবাণী। কার?—ভগবানের। গুরুদেব যে-সব উপদেশ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেই শাসনবাণীর কথাই গুরু-বৈষ্ণবগণ বলছেন, নিজের কোন কথা নয়। তাঁরা সেবক-সম্প্রদায়কে যে কথাগুলো বলছেন, সবই শাস্ত্রের কথা—Positive, negative side-এর কথা। আমার প্রশংসা হলে আমি খুবই আনন্দিত হই, আর যদি আমার সমালোচনা হয়, তাহলে মুস্কিলে পড়লাম। তা নয়। গুরু-বৈষ্ণবের কাছ থেকে প্রশংসা-বাক্য

শুনা উচিত নয়। তাঁরা যদি দয়া করে, কৃপা করে আমাদের পরমার্থ-কল্যাণের জন্য শাসন করেন, যে শাসনের অপর নাম স্নেহশাসন, সে শাসন আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলের কথা। কিন্তু তা সহ্য করতে পারি না আমরা। সঙ্গে সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করে ফেলি। নীতি-শাস্ত্রে বলা আছে,—"ভৃত্যশ্চ উত্তরদায়কঃ"। ভৃত্য—সেবকের যদি কোন কিছু বলবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দেয় উল্টোপাল্টা, তাহলে তাকে মেনে নেওয়া যাবে না। সেটা শুনতে হবে, বুঝতে হবে ধীর-স্থির চিত্তে। আমারই কল্যাণের জন্য তাঁরা ওটা বলছেন তাঁদের ত' কোন স্বার্থ নাই। চিন্তা-ভাবনাটা ঠিক এইরকম থাকা দরকার আছে। তাহলে গুরুদেব আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবাহার করবেন? খুব Mild—নম্র ব্যবহার? অর্থাৎ আমি মাতব্বর, মালিক, আর গুরুদেব আমার সেবক! আমার কথা যদি না শোনেন, তাহলে তিনি আমার গুরুদেব নন। খুব দুঃখ করে গুরুবর্গ—শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন,—"যারা মনে করছেন, এই সংসারে থাকতে গেলে, চলতে গেলে একটা গুরু রাখতে হয়, যেমন নদী পার হতে গেলে মাঝির দরকার, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করবার জন্য একজন ধোপার দরকার, সেরূপ। এই যদি কেউ মনে করে আমাকে, তাহলে তারা সব বঞ্চিত। তাদের সঙ্গে আমার কোনদিনই দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, হতে পারে না—যারা গুরুর উপরে বিচার করছেন।" নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমহাত্মা যাঁরা, তাঁরা বৈকুণ্ঠবাণী বলেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে কিছুই বলেন না, তথাপি তাঁদের ভুল বুঝছি আমরা। মুস্কিল্ হয়ে যাচ্ছে সবদিক্ দিয়েই। সব দিক্ দিয়েই আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

সংবাদ-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের 'যুগাচার্য্য'-উপাধি প্রাপ্তি

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব-প্রচারক এবং ব্রজধামের উন্নয়নহেতু সঙ্কল্পিতাত্মা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে বিগত ১৩ই কার্ত্তিক, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ৩১।১১।২০০৩), শুক্রবার শ্রীধাম বর্ষাণার সমীপবর্ত্তী উঁচাগাঁওস্থিত ব্রজাচার্য্যপীঠ ও দিল্লীস্থিত বিশ্ব ধর্ম্ম সংসদ (World Religious Parliament) একত্রে 'যুগাচার্য্য' (Acharya of Millenium)-উপাধিতে বিমণ্ডিত করেন। উক্ত সমারোহ-সভায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের প্রায় ৭৫০ ভক্তবৃন্দ, ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগাঁও, বর্ষাণা প্রভৃতির গোস্বামী সমাজের প্রধানগণ এবং স্থানীয় বহু ব্রজবাসি-গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১০ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

নন্দগাঁও, বর্ষাণার গোস্বামী সমাজ সম্মিলিতভাবে ভজন-কীর্ত্তনদ্বারা উক্ত সভার কার্য্য সূচনা করেন। তৎপরে ব্রজাচার্য্য শ্রীদীপকরাজ ভট্ট গোস্বামী বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীল মহারাজকে পুষ্পাভিষেক করেন এবং স্মৃতিফলক প্রদানপূর্ব্বক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পুষ্পাভিষেকান্তে শ্রীদীপকরাজ ভট্ট মহাশয় বলেন,—"ব্রজমণ্ডলে এই প্রথম কোন সন্ত বা আচার্য্যকে ব্রজবাসিগণ নিজ শাশ্বত-প্রেমের পরিচয় প্রদানার্থ শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে 'যুগাচার্য্য'-উপাধিতে ভূষিত করেন।" তিনি আরও জানান,—"শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ ব্রজভূমি ও ব্রজবাসীর নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব-বিষয়ে শুধু নন, তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক স্বাভাবিক নিজজন।"

বিশ্বধর্ম্ম সংসদ-এর প্রতিনিধি এবং 'শ্রীনারায়ণ ভট্ট শোধ সংস্থার' নির্দ্দেশক স্বামী শ্যামজী জানান যে,—চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-বিষয়ে ও ব্রজসংস্কৃতিকে পুনর্জীবন দান করেন শ্রীনারায়ণ ভট্ট গোস্বামী (প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য)। আর আজ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করত বিশ্বের দরবারে ব্রজবাসীর প্রাণপ্রিয়তম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহিমা প্রচার ও ব্রজমণ্ডলের সংরক্ষণ-কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইল।"

উপাধি গ্রহণ করিবার পর শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বলেন,—"আমি শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রতি সমর্পিতাত্মা। আপনাদের (বিশেষতঃ ব্রজবাসিগণের) নিকট হইতে এই উপাধি গ্রহণ করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের চরণধূলারও যোগ্য নহি। ব্রজের লুপ্তপ্রায় লীলাস্থলী পুনঃস্থাপন ও উহার উন্নতির জন্য আমি সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ কখনই সম্ভব নহে।"

অতঃপর শ্রীল মহারাজকে মাল্যদানপূর্ব্বক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন নন্দগাঁও গোস্বামী সমাজের প্রধান শ্রীশ্যাম পেশগার, বর্ষাণা গোস্বামী সমাজের প্রধান শ্রীরামভরোসী গোস্বামী, ললিতাসখী-মন্দিরের মহান্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভট্ট গোস্বামী, প্রেমপীঠ ও মীরাবাইয়ের দীক্ষাস্থলী তিজারার পীঠাধীশ শ্রীললিতমোহন ওঝা, ব্রজগোপ-বংশের প্রধান শ্রীরঘুবীর গুর্জ্জর, ললিতাসখীর বংশোদ্ভূত শ্রীভগবন্তা গুর্জ্জর, ভারতীয় জনতা পার্টীর নগর-অধ্যক্ষ শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী, শ্রীরাধামাধব সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলের পরিচালক শ্রীপ্রবীণ গোস্বামী, নরনাগর সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলের (দিল্লী) পরিচালক শ্রীসুভাষ গুপ্তা, শ্রীঅশোক গুপ্তা, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, Mr. Y. K. Agarwal, অষ্টসখীর গ্রাম হইতে আগত প্রতিনিধিগণের মধ্যে শ্রীরতন সিংহ সরপঞ্চ, শ্রীশ্যাম সিংহ, ডাঃ এ. কে. চৌহান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

এই উপাধি-প্রদান অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কার্য্য পরিচালনা করেন 'ব্রজবিকাশ সাংস্কৃতিক পর্য্যাবরণ সমিতি'র মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিবেকদন্ত মথুরিয়া এবং উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রীঘনশ্যামরাজ ভট্ট গোস্বামী মহাশয়।

ব্রজাचार्य-पीठ

(VRAJACHARYA-PEETH)

श्रीधाम बरसाना (भारत)

SHREE DHAM BARSANA (INDIA)

एवं

विश्व धर्म संसद

(WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT)

नई दिल्ली (भारत)

NEW DELHI (INDIA)

* युग-आचार्य *

(ACHARYA OF MILLENIUM)

আধ্যাত্মিক সম্পদা বিভূষিত, বেদ, বেদাংগ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষাদিশাস্ত্র, পরম্পরা সুরক্ষা ব্রতী, অখিল সংস্কৃত বাঙ্ময় সংরক্ষণ, প্রচার প্রসার পক্ষধর, মানবকল্যাণ-নিরত, মহাপ্রভু চৈতন্য-মত-ভাস্কর স্বগুরু-পরম্পরা প্রতিষ্ঠা পথ-সংচালক, অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ, আর্য সনাতন মর্যাদা জীবন পদ্ধতি সদাচার পালক, সর্বধর্ম সদ্‌ভাবনা ভাবিত, সর্বভূত হিতরত, বসুধৈবকুটুম্বকম্ ব্রজ সংস্কৃতি কে সদ্‌ভাবনা পর্যাবরণ সে ওত-প্রোত, ব্রজ-বিকাস অভিলাষী, ব্রজ সাংস্কৃতিক সম্পদা সংরক্ষণ কে প্রতি সংকল্পিত এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি পতাকা কে যশস্বী সংবাহক—

শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরা (উ. প্র.) কো

ব্রজাচার্য পীঠ পর আয়োজিত ব্রজ-মহোৎসব মেঁ **যুগ-আচার্য** কে পদ পর ব্রজাচার্য-পীঠ এবং বিশ্ব ধর্ম সংসদ কে দ্বারা সংযুক্ত রূপ সে বিভূষিত কিয়া জাতা হৈ ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

তিথি : কার্তিক শুক্ল পক্ষ সপ্তমী ২০৬০
তদনুসার ৩১ অক্টুবর ২০০৩
স্থল : ব্রজাচার্য-পীঠ
শ্রীদাঊজী মন্দির, ঊঁচাগাঁও
শ্রীধাম বরসানা, পিন : ২৮১৪০৫

Sd/ *गोस्वामी दीपकराज भट्ट*
পীঠাধীশ
ব্রজাচার্য-পীঠ

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

✆ ০৩৩/২৬৩২-৯৫৯৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
✆ ২৪০০৬৮

শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ
১/১, নিমাইতীর্থ রোড
পোঃ—বৈদ্যবাটী (হুগলী)।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৯ই নারায়ণ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১লা পৌষ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৭/১২/২০০৩), বুধবার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ **বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮৩তম শুভাবির্ভাব পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরুপঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন এবং ২রা পৌষ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮/১২/২০০৩), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ-এর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরি-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪১০

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারীর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

卐 অনুষ্ঠান-সূচী 卐

২৯শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৬/১২/২০০৩), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

১লা পৌষ (ইং ১৭/১২/২০০৩), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৬-৩০ মিঃ হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

পূর্ব্বাহ্ণ—৮টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—"শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে ভাষণ।

২রা পৌষ (ইং ১৮/১২/২০০৩), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

প্রাতঃ—৭ টা হইতে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি-কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' এবং 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৮ মাধব, কারণোদশায়ী, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৪১০, ইং ১৫/১/২০০৪ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

নাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-ত্রয়োদশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শেঽধ্যায়ে—৪১-৫৩]

কালায় কাল-নাভায় কালাবয়ব-সাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্ব-হেতবে ॥১॥

(হে দেব! অনন্ত-শক্তিত্বহেতু) আপনি কাল-স্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ এবং কাল-শক্তির আশ্রয় ও কালের অবয়ব অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী। আপনি বিশ্বরূপ ও দৃশ্য-বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও নিখিল-কারণ ॥১॥

ভূতমাত্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন মূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥২॥

আপনি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, দশ বা পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বস্তুর চৈতন্য প্রদান অর্থাৎ প্রবর্ত্তন এবং

ত্রিগুণাত্মক অভিমানদ্বারা চেতন-স্বাংশভূত-জীবসমূহেরও স্ব-স্বরূপানুভূতি আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ॥২॥

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে ।
নামা-বাদানুরোধায় বাচ্য-বাচক-শক্তয়ে ॥৩॥

আপনি দেশ, কাল, সীমার অতীত, অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ও দৃশ্য বস্তুর অন্যতম নহেন বলিয়া দুর্জ্ঞেয় এবং বিকারশূন্য বলিয়া 'কূটস্থ' ও সর্ব্বজ্ঞ, আপনি স্বীয় বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা 'অস্তি', 'নাস্তি' প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ সিদ্ধান্তের প্রকাশক, আপনি শব্দ ও অর্থের বহুবিধ শক্তির মূলকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, এতাদৃশ আপনাকে প্রণাম ॥৩॥

নমঃ প্রমাণ-মূলায় কবয়ে শাস্ত্র-যোনয়ে ।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥৪॥

আপনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ও স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অথবা আপনি শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ ও ভাগবতের প্রকাশক বেদব্যাস-স্বরূপ। আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আপনি শাস্ত্র-যোনি অথবা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক নিগম-শাস্ত্রস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥৪॥

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেব-সুতায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৫॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক সাত্বতপতি কৃষ্ণকে নমস্কার ॥৫॥

নমো গুণ-প্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥৬॥

আপনি বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি চতুর্ম্মূর্ত্তিতে চিত্ত প্রভৃতির প্রকাশক, আপনি উপাসকগণের প্রতীতি অনুসারে ফল-বৈচিত্র্য প্রদানার্থ স্বীয় স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নানারূপে প্রকাশমান হন। চিত্তাদির অধ্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা আপনি কথঞ্চিৎ অনুমিত হন, যেহেতু আপনি গুণ-সমূহের দ্রষ্টা ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অগোচর, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥৬॥

অব্যাকৃত-বিহারায় সর্ব্ব-ব্যাকৃত-সিদ্ধয়ে ।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশালিনে ॥৭॥

আপনার মহিমা অতর্ক্য। সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতুরূপে আপনি অনুমিত হন (পরন্তু সাক্ষাৎকার হন না)। হে হৃষীকেশ, 'আবাক্যনাদর'—এই শ্রুতি-বচনানুসারে আপনি মৌন ও আত্মারাম, আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

পরাবর-গতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্‌দ্রষ্ট্রেহস্য চ হেতবে ॥৯॥

আপনি স্থূল-সূক্ষ্ম ভূতসমূহের গতি অবগত আছেন। আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপ, আপনি অবিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' বলিয়া অতন্নিরসন করিতে করিতে অবশেষে তৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; আবার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম'—এইরূপ বিশ্বের বিবর্ত্ত-স্থল অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদিগণ অতৎ-স্বরূপ বিশ্বকে তৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। (যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বলিয়া সিদ্ধান্ত করাইয়া থাকেন), বস্তুতঃ আপনি এই প্রকার 'অধ্যাস' ও 'অপবাদের' * সাক্ষীস্বরূপ ও মূলকারণ, আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

ত্বং হ্যস্য জন্ম-স্থিতি-সংযমান্ বিভো
গুণৈরনীহোঽকৃত-কাল-শক্তিধৃক্ ।
তত্তৎ-স্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘ-বিহায় ঈহসে ॥৯॥

অনাদিকাল-শক্তিধারী আপনি নিরীহ হইয়াও প্রধানের প্রতি ঈক্ষণপূর্ব্বক গুণের দ্বারা পূর্ব্ব কল্পান্তে লয়প্রাপ্ত বিশ্বগত জীবসমূহের শান্ত, ঘোর, মূঢ় প্রভৃতি সেই সেই পূর্ব্ব-স্বভাব জাগরিত করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারাদি করিয়া থাকেন ; প্রকৃত-ঈক্ষণরূপ আপনার লীলা অব্যর্থা ॥৯॥

তস্যৈব তেঽমুস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়-যোনয়ঃ ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্ম-পরীপ্সয়েহতঃ ॥১০॥

এই ত্রিলোকমধ্যে শান্ত, অশান্ত এবং মূঢ় সকলেই আপনার অংশ, তথাপি সম্প্রতি ধর্ম্মরক্ষা-বাসনায় চেষ্টাযুক্ত এবং সজ্জন-পালনার্থ অবস্থিত আপনার নিকট শান্তগণই প্রিয় হইয়া থাকেন ॥১০॥

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥১১॥

হে শান্তাত্মন্! আমাদের ভর্ত্তা বা পালক ও আপনার পুত্রতুল্য পাল্য এই সর্প যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা একবার সহ্য করা উচিত ; কেননা, সে মূঢ় ভবদীয় প্রভাব জানে না, তাহার অপরাধ ক্ষমার্হ ॥১১॥

---

* *অধ্যাস—অবস্তুতে বস্তুর আরোপ, যথা—রজ্জুতে সর্পের আরোপ ; অপবাদ—অনিত্য বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব ও কারণের নিত্যত্ব।*

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

অনুগৃহ্ণীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ ।
স্ত্রীনাং নঃ সাধু-শোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥১২॥

হে ভগবন্! অনুগ্রহ করুন। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্রী এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন ॥১৩॥

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া ।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥১২॥

আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের আদেশ করুন ॥১২॥

বৈষ্ণব-নিন্দা

বৈষ্ণব-নিন্দার ফল

জীব যতপ্রকার অপরাধ করিতে পারেন, তন্মধ্যে বৈষ্ণব-নিন্দা তুল্য আর ভয়ঙ্কর অপরাধ নাই। অতএব বৈষ্ণব-নিন্দা কাহাকে বলে, ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করা আবশ্যক। স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে।।
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্।।

যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয় ; তাহার পক্ষে এই ছয়টী গর্হিত আচার পতনের কারণ হয়।

ভাগবতে লিখিয়াছেন,—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।

যে-স্থলে ভগবান্ বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

জীবের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের প্রতি ব্যবহার

বৈষ্ণব-নিন্দা হইতে যখন এরূপ সতর্ক করা হইতেছে, তখন প্রথমে বৈষ্ণব

নির্দ্দেশ করা ও যে যে কার্য্যদ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীব-সকলকে চারি প্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন। জীব সাধারণ, ধার্ম্মিক জীব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব ও বৈষ্ণব জীব—এই প্রকার জীবের চারিটী বিভাগ। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-প্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব-প্রায় জীবের সম্মান না করিলে **পাপ হয়**। বৈষ্ণব জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে **অপরাধ হয়**। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর-নিষ্ঠ। অপরাধ জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা।

কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম-ভেদে তিনপ্রকার বৈষ্ণব

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোকদ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম —এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব যথা,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।। (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ; অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ মাত্র করিতেছেন। **পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে, পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা** কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদয় হয়। **শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে** শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্য প্রমাণদ্বারা বৈষ্ণবজন-প্রতি শ্রদ্ধা উদয় হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হন। যে-পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে কিন্তু বৈষ্ণবের প্রায়।"

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন।

মধ্যম বৈষ্ণব যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।। (ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায়

জীবে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জনের প্রতি উপেক্ষা (অর্থাৎ অবস্থাক্রমে ঔদাসীন্য, সহিষ্ণুতা বা পরিত্যাগ) করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। বিদ্বেষী-গণও বালিশ—এরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কৃপাও করেন। মধ্যম-বৈষ্ণবদিগেরই বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার ; যেহেতু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-প্রায় বলা যায় ; বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব যথা ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।। (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেইসমস্ত ভূতকে স্বীয় চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বে অনুভব করেন এবং তদাশ্রিত বোধে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণবরূপ ভেদ-দৃষ্টি নাই।

মহাপ্রভুর শিক্ষায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবতর-বৈষ্ণবতম-ভেদে ত্রিবিধ অধিকারী

এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাঁহারা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা লাভ করত বৈষ্ণবসেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই মধ্যম বৈষ্ণবের অন্যান্য লক্ষণ না পাওয়া পর্য্যন্ত **কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব। মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর। উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম**। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে বিচার্য্য—

(কনিষ্ঠ) ঃ—অতএব যার মুখে এক 'কৃষ্ণ'নাম।
সেই ত' বৈষ্ণব তাঁর করহ সম্মান।।

(মধ্যম) ঃ—'কৃষ্ণ'-নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব(তর) ভজ তাঁহার চরণে।।

(উত্তম) ঃ—যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাতে জানিহ তুমি **বৈষ্ণব-প্রধান**।।
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম'।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণ-মাত্রই বৈষ্ণবত্ব। কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস বলিয়া দর্শিত হইয়াছেন, তাঁহারা নামা-ভাসমাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব ; যিনি সেই শুদ্ধনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

একবার শুদ্ধ-নামকারীই বৈষ্ণব—শ্রীনাম-তত্ত্বে দীক্ষা অনাবশ্যক

এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, **শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই।** বৈষ্ণব-প্রায় হইবার জন্য অর্চ্চাতে হরি-পূজোপযোগী মন্ত্র গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে-দীক্ষা নাম-তত্ত্বে অনাবশ্যক। যথা প্রভু-বাক্য,—

প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাকার।।
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়।।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।।
অনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।।
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তাঁর পরম সম্মান।।

শ্রীনাম ও নামাভাসের পার্থক্য ; নামাভাসকারী বৈষ্ণব নহে

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার অবকাশ এখানে নাই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে-বিষয়ে বিচার করিব। এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলিতে পারি যে, **শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হইলে 'নাম' হয়।** অন্যাভিলাষিতাযুক্ত বা জ্ঞান-কর্ম্মযোগ-বৈরাগ্যাদিদ্বারা আবৃত যে নাম, তাহা **'নামাভাস'**। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফলোদয় হইলেও **বৈষ্ণবের মুখে 'নামাভাস' উচ্চারিত হয় না, শুদ্ধ 'নাম' উচ্চারিত হয়।** নামের স্বরূপ-জ্ঞান, 'নাম'-'নামীর' অভিন্নত্ব বুদ্ধি জীবের শুদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ে নামের উৎপত্তিস্থান (এই) অনুভবের দ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাই নাম। তদ্রূপ এক নাম যাঁহার জিহ্বায় উদয় হয়—তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে না হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। উদয় হইবামাত্র প্রেম উদিত হইয়া পড়ে।

শুদ্ধ-নামকারী বৈষ্ণব সর্ব্বগুণসম্পন্ন, নিষ্পাপ ও পাপ-পুণ্যে রুচিহীন

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। চরিতামৃতে ;—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।।
'বিধি' 'ধর্ম্ম' ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর কভু নহে মন।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।।
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ)

যেদিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হয়, সেইদিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্যতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সকলেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই ; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন।

দুষ্টলোকের বৈষ্ণবের প্রতি তিনপ্রকার দোষদৃষ্টি

বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্টলোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। **(প্রথমতঃ)** শুদ্ধভক্তি উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা একপ্রকার দুষ্ট লোকের আলোচ্য হয়। ভক্তি উদয় হইলেই দোষসমূহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। **(দ্বিতীয়তঃ)** বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের **তৃতীয়** আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্টলোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্ব-রত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়। ;—

প্রাগ্ ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ **ক্ষয়াবশিষ্ট** এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন।
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধু-নিন্দকোঽধমঃ।।

বৈষ্ণবের পূর্ব্বকৃত দোষের আলোচনা নিন্দনীয়

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গতীয় কহিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

(গীতা ৯।৩০-৩১)

বৈষ্ণবের ক্ষয়-প্রায় দোষের ও দৈবাৎ কোনও দোষের নিন্দা অপরাধজনক

নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া **সদুদ্দেশ্য ব্যতীত** আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না। তৎসম্বন্ধে করভাজন বলিয়াছেন,—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।

(ভাঃ ১১।৫।৩৮)

দৈবোৎপন্ন দোষের **সদুদ্দেশ্য ব্যতীত** আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূলকথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইলে নাম স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

সদুদ্দেশ্যে পরদোষ আলোচনীয়

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে, উক্ত তিনপ্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্যান্য দোষের আলোচনা করা উচিত কিনা? উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের উক্ত তিনপ্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ হইতে পারে না। যাহাদের উক্ত তিনপ্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ আছে, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জীবমাত্রের দোষসকল সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিত নয়। **বৈষ্ণবনিন্দা অপরাধ। অন্য জীব-নিন্দা পাপ।** যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সেরূপ পাপেও রুচি হয় না। **সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষ আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই।**

সদুদ্দেশ্য তিনপ্রকার, যথা ঃ—নিন্দিতজনের মঙ্গল-কামনা, জগতের মঙ্গল ও নিজ-মঙ্গল

সদুদ্দেশ্য তিনপ্রকার (১) যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। (২) জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপালোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভ-কার্য্যের মধ্যে

গণিত। (৩) নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাতেও গুণ বই দোষ হয় না। এই সকল সদুদ্দেশ্যেই বাল্মীকির পূর্ব্ব চরিত্র, জগাই-মাধাই-এর পূর্ব্ব চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্ব্বদা নিষ্পাপরূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুর নিকট বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে, গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া, সাধু-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। **সাধু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু-নিন্দা বা বৈষ্ণব-অপরাধ হয় না। যদি সে-বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও সদোষ হইতে পারে না।** এই সকলই সদুদ্দেশ্যের উদাহরণ।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ গ্রহণ

হে পাঠকবর্গ, আপনারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই গভীর বিষয়ে চিন্তা করিবেন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নাম-তত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।। (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

এইসকল কারণে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ লোক সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেননা, সাধু-উপদেশদ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়া থাকেন।

সাধু-সেবা মধ্যমাধিকারীর—কনিষ্ঠ বা উত্তমাধিকারীর নহে ; অনধিকার-চর্চ্চা দূষণীয়

এমত মনে করিবেন না যে, আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবার ফল পাইব। পূর্ব্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধু-সেবার প্রয়োজন ; কেননা, কনিষ্ঠ সাধুসেবা করেন না ও উত্তমাধিকারীর সাধু ও অসাধুতে ভেদবুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমাধিকারী, অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে কৃপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষ-গুণ সম্বন্ধে ভাগবতের আজ্ঞা এই যে,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।। (ভাঃ ১১।২১।২)

আপনারা না জানিয়াও অসাধু-সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন। যথা ভাগবতে ;—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

অধিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিলেও যে অসৎসঙ্গ হয়, তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপ সাধুতে সঙ্গ হইলে নিঃসঙ্গত্ব সহজে হয়।

ভক্তমাল, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থে উত্তম ভক্তদিগের (পক্ষে) সর্ব্বত্র সাধুদর্শনের যে মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মধ্যম-বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকারচর্চ্চা-দোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে। আমরা সদুদ্দেশ্যে এই সমস্ত আলোচনা করিলাম, শুদ্ধ ভক্তগণ কৃপা করিয়া বিচার করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

উঃ—স্বসুখবাঞ্ছার অপর নাম কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা-বিমুখতাই আমাদিগকে ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ, জানিতে হইবে। ইহ জগতে কৃষ্ণসেবকই কৃষ্ণ-প্রেম-বিরোধী কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কামপ্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত আমার ইন্দ্রিয়তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধি-বিমুক্ত আত্মার একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত কামবীজ-বিনাশক ও তাহার একমাত্র প্রতিষেধক।

প্রঃ—সংশয়াত্মার কি মঙ্গল হয়?

উঃ—না। সংশয়াত্মার বিনাশ অর্থাৎ সংসার অবশ্যম্ভাবী। সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-আদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের নিকট Return Journey-র Ticket-holder-এর কোন দ্রব্য নাই। কেন না কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচার-পরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

প্রঃ—শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি কৃষ্ণই?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশরস পূর্ণ-মাত্রায় তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ-বিচারময় আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত ; শ্রীকৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়-জাতীয় শক্তি। যেকালে আমরা শ্রীগৌর-সুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেইকালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity-রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি।

প্রঃ—ভক্তসেবা ও ভগবৎ-সেবা কি স্বহস্তে করণীয়?

উঁ—পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরা-বস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই। মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি' বিচার অসমর্থপক্ষে আমরা গ্রহণ করি, সমর্থপক্ষে গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক। নতুবা ব্যবহারিক জীবন Godless বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। Godloving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোনদিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না।

প্রঃ—শ্রাদ্ধে পিতপুরুষকে কি প্রসাদ দেওয়াই উচিত?

উঃ—শ্রাদ্ধবাসরে মহাপ্রসাদ পরলোকগত হরিনামপরায়ণ জনগণকে দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফল-ভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদদ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-বিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদদ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—মায়াতীত কৃষ্ণের সঙ্গে মায়াবদ্ধ আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন কি করিয়া সম্ভব?

উঃ—কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব মনে হইলেও করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

ভূতাকাশ-নামক একটী পদার্থের দ্বারা সম্ভব হইতেছে। সেইরূপ জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।

সূর্য্য বৃহৎ ও সুদূরবর্ত্তী হইলেও সূর্য্যের কৃপালোকের সাহায্যেই সূর্য্যদর্শন যেমন সম্ভব হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের কৃপালোকেই—কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে বা আশ্রয়েই আমরা কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের সুযোগ পাই। ভগবৎ-কৃপায় সবই সম্ভব হয়।

প্রঃ—শ্রীনাম-ভজনের কি ফল?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফল-ভোগ ও মুক্তি-পিপাসা দূর হইতে থাকে। শ্রীনাম-প্রভাবে জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ—কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত। শ্রীকৃষ্ণনামানন্দই আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্য রূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্য রূপে মুগ্ধ হই।

প্রঃ—শ্রীচণ্ডীদাস কি শুদ্ধভক্ত?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীচণ্ডীদাস শুদ্ধভক্ত বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন। সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor-এর চিত্তবৃত্তি। Servitor আপনাকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে কদর্য্য ব্যাপার কিছু নাই। শ্রীচণ্ডীদাস ও প্রেমিক ভক্ত। স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র তাঁহাতে নাই। জড়ভোগবাদি-গণ তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়া নরকগামী হইতেছে। আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

আপ্রকৃত দেহে মধুররসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রী-দেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে; উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভু অভিমান বা প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপনপূর্ব্বক নিজেদের ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

প্রঃ—নিজের চিকিৎসা নিজে করা উচিৎ?

উঃ—সংসারী-লোকের এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে ঐরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মে মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিয়া সদ্‌বৈদ্যের আশ্রয়-গ্রহণেই মঙ্গল হয়।

প্রঃ—সেবা কি অবশ্য করণীয়?

উঃ—আমাদের কর্ত্তব্য গুরু-কৃষ্ণ-সেবা আমরা করিয়া যাইব। এখন কৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কৃষ্ণ যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।

প্রঃ—রিটার্ণ টিকিট করিয়া কি শ্রীগুরু-গৌরঙ্গের নিকট আসা উচিত?

উঃ—কখনই না। যাঁহারা রিটার্ণ টিকিট করিয়া মঠে আসেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ-ভাবে ভগবান্‌কে চান না। যে প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌কে চায়, সে কি ভগবানের নিকট আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে চায়? ভগবৎ-সেবক-অভিমান জাগিলে কি কেহ সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিবার জন্য পুনরায় ব্যস্ত হয়? দিব্যজ্ঞান যাহাদের হইয়াছে, তাহারা কোনদিন রিটার্ণ টিকিট করিয়া ইষ্টদেবের নিকট আসে না বা আসিতে পারে না। যাহাদের প্রভু-অভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, যাহাদের লাল্য-পাল্য আছে, ভগবান্ ব্যতীত যাহাদের অন্য কেহ আছে বা অন্য কিছু আছে, যাহাদের গুরুদাস-অভিমান-হওয়ার পরিবর্ত্তে পতি, পিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মায়িক অভিমান আছে, তাহারাই সেব্যকে ছাড়িয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সেবক-অভিমানে প্রমত্ত হইয়া উদ্বেগ ও দুঃখ পায়। এজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে গুরুকৃষ্ণের নিকট গমন করার পরিবর্ত্তে অভিগমন করিতে বলিয়াছেন। অভিগমনে No question of return. শ্রুতি বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-গচ্ছেৎ।" অভিগমন-অর্থে আশ্রয়। **(ক্রমশঃ)**

কবন্ধ

ভূত-প্রেতের নামের ন্যায় কবন্ধের নামও অনেকের নিকট পরিচিত। কবন্ধ রাত্রে শিশুর ঘুম কাড়িয়া লয়, নিশুতি রাতে কবন্ধের কথা মনে পড়িলেই লোকের গায়ের লোম ভয়ে খাড়া হইয়া উঠে। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে কবন্ধের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবন্ধের নাম লোকে জানুক বা না জানুক, আমার আচার-আচরণের সঙ্গে কিন্তু কবন্ধের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত 'কবন্ধ'

মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের কৃপাতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কবন্ধতা হইতে মুক্তিলাভের পথ খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টাই করিতেছি না। রামায়ণে বর্ণিত কবন্ধের উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

পূর্ব্বে গভীর অরণ্যে এক দৈত্য বাস করিত। সে দৈত্য হওয়া সত্ত্বেও রাক্ষসবেশে মুনিঋষিদিগকে উৎপীড়ন করিত। একদা এই দৈত্য স্থূলশিরা মুনির ফলমূলাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া মুনিকে নির্য্যাতন করিলে মুনির অভিশাপে প্রকৃত রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। ঐ রাক্ষস কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘজীবি হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া রাক্ষস দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হইলে ইন্দ্র ইহাকে মস্তক ও জঙ্ঘাহীন করেন। পরে ইন্দ্রের কৃপাতে ইহার যোজন বিস্তৃত বাহু ও কুক্ষিমধ্যে দন্তযুক্ত মুখ হয়। কবন্ধ রাক্ষস এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণে জীবজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করিত। দীর্ঘকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে কবন্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া ফেলে। তখন রামচন্দ্র ইহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে কবন্ধ শাপমুক্ত হইয়া দিব্যদেহ ধারণ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

কন্ধকাটা অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত মস্তকবিহীন দেহকেই 'কবন্ধ' বলা হয়। মস্তকেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, জিহ্বা প্রভৃতির অবস্থান এবং সূক্ষ্মদেহ বুদ্ধিও মস্তককে আশ্রয় করিয়া থাকে। মস্তক ব্যতীত হস্ত-পদও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মস্তক ছাড়া যে ক্রিয়াযুক্ত দেহ, তাহার দ্বারা কোন ভাল কর্ম্মের আশা কোনকালেই করা যায় না। বেদবাক্য, ভগবদ্বাক্য, গীতাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানে শিলা-পাথর-কাঠ-মাটী বুদ্ধি করিবার জন্যই আমার এই কবন্ধের ন্যায় দুরবস্থা। "আমি কৃষ্ণের নিত্য গোলাম"—এই কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার নফর হইয়া সংসারে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার মস্তকহীনতার প্রধান পরিচায়ক। মস্তক থাকিলে ত' মস্তক নিজে এবং তাহার অনুগত ইন্দ্রিয়সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিত। মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, করযুগলকে হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে, কর্ণদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দ-মন্দির ও বৈষ্ণব-দর্শনে, চরণযুগলকে মথুরাদি বিষ্ণুস্থান-পর্য্যটনে নিযুক্ত করিবার জন্য সকল শাস্ত্রের উপদেশ। কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের আরাধ্য বস্তু, তাহার অভাবে নেত্রের আধার-স্বরূপ মস্তকে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত যে ইন্দ্রিয়সমূহ হরিসেবাবিমুখ, তাহাদের নিন্দা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যে মস্তক ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত হয়, তাহাই প্রকৃত মস্তক। পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কীরিটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি শ্রীহরির চরণে প্রণত না হয়, তবে তাহা কেবল

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

সংসারসিন্ধুর অতল জলে প্রবিষ্টমান ব্যক্তিকে আরও গভীরে নিমজ্জিত করে। যাহার দ্বারা নিরন্তর ভগবৎকৃত্য সম্পাদিত হয়, উহাই বস্তুতঃ হস্ত। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান হইয়াও ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতকের হস্তসদৃশ। যে চক্ষু শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণবগণকে দর্শন করে, তাহাই প্রকৃত চক্ষু ; দর্শনবর্জ্জিত হইলে সেই চক্ষু ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় বৃথা। যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ করে, তাহাই বস্তুতঃ 'পদ', নতুবা পদসমূহ বৃক্ষতুল্য পাথর, উহা যমদূতগণের কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের যে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎ গুণসমূহ কীর্ত্তিত হয়, উহাই প্রকৃত বাগিন্দ্রিয়। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বা-সদৃশ—যাহা কালসর্পরূপ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকে। যাহার দ্বারা ভগবানের পুণ্যচরিত শ্রুত হয়, তাহাই 'কর্ণ' নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভুরিগুণসম্পন্ন ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করেন, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র।" লোকে আমার মস্তক ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ দেখিতে পাইলেও বাস্তবিকপক্ষে শাস্ত্রের বিচারানুযায়ী আমি ভগবৎসেবাবিমুখ প্রকৃত মস্তকহীন 'কবন্ধ'।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না করিয়া জড়জগতের তুচ্ছ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিবার জন্য যে ব্যস্ত হইয়াছি, তাহা 'মরা গরুর জন্য ঘাস কাটিবার' ন্যায় নিরর্থক। ইহাতে কেবলমাত্র ভূতের বেগারই খাটা হয়। "ভাল-মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন" বাক্যের সমর্থক আমার সকল চেষ্টা তাৎকালিক সমাজকল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল বা আকাশকুসুমসদৃশ কাল্পনিক। ভগবৎসেবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া আমি যে দিনে দিনে অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িতেছি—সংসারাসক্তি বাড়াইয়া তুলিতেছি, তাহা আমার অল্পবুদ্ধিতার পরিচায়ক। আপাত মধুর ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিণামে অনেক দুঃখ আনয়ন করে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ তাপে জর্জ্জরিত করে। পরমার্থশূন্য সংসারে কোন শান্তি নাই, সেখানে আছে কেবল শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু। বিবর্ত্তের ফাঁদে অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করিয়া সংসারে আহার-নিদ্রাদিতে সময় ক্ষেপণ করা সর্ব্বনাশের কারণ। দুনিয়াদারীতে যাহারা ব্যস্ত থাকেন, তাহারা কখনও ভগবানের সেবা করিতে পারে না। ভগবৎসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্মের অপালনই মহাপাপ বা মহাপরাধ। সেই নিত্যধর্ম্মে উদাসীন হইয়া বহুবিধ অনিত্য ধর্ম্মের পালনকেই নিত্যধর্ম্ম মনে করিয়া তাহাতেই আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় যিনি জীবকে লুব্ধ করেন, তিনি আমার ন্যায় বঞ্চক। এই সংসারে সম্বন্ধ অনিত্য বস্তুর সহিত, সকল চেষ্টা নশ্বর বস্তু পাইবার জন্য,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

কাজেই ফলটীও অনিত্য হয় অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহা কিছুদিন পরে বিনষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়। ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীর শরণগ্রহণকারীর মঙ্গল লাভের আশা সুদূরপরাহত। জড়ভোগী ও জড় রসানন্দী ব্যক্তিমাত্রই অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত।

ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার সেবা না করিয়া যে আমার দিনগুলি ও অখিল ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যর্থ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পাষাণ ও শুষ্ক কাষ্ঠাধারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করিতে গিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি আমি যে বিরাগ প্রদর্শন করিতেছি, তাহা আমার দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমি মনে করিতেছি,—"যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন নিরীশ্বর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠন করা অথবা দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি আমার অনেক কার্য্য রহিয়াছে।" আমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জগতের প্রিয় হইতে চাই। মায়ার বৈভবস্বরূপ জড়বিদ্যা অর্জ্জনপূর্ব্বক সংসারের সকল কর্ম্ম যথাসাধ্য করিয়া আত্মীয়স্বজনের প্রীতি আকর্ষণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে উদ্‌গ্রীব হই। ইহ জগতের লোকের আখেরের বন্দোবস্ত করিতে গিয়া কেন যে নিরয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছি, তাহা আমার কিছুতেই বোধগম্য হইতেছে না। নিরীশ্বর শিক্ষা সুশঙ্খল সমাজ সুগঠনের পরিবর্ত্তে সমাজ ধ্বংস করিতে সিদ্ধহস্ত এবং তাহা আমারই ন্যায় ছিন্নমস্তা। এক প্রাকৃত কবি বলিয়াছেন,—

নাই ভগবান্, নাইকো ধর্ম্ম, যাদের শিক্ষামূলে।
ছিন্নমস্তা সেই শিক্ষা শয়তানী ইস্কুলে।।

ইহজগতে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি, তাহা জড়-বিদ্যা। মানুষ পাগল হইয়া গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার কোন মূল্য থাকে না।

সৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিবার ফলে প্রভু হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে কবন্ধের দশা প্রাপ্ত করাইয়াছে। আমি চতুর ও বুদ্ধিমান্ অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে আমার ন্যায় অবিবেকী জগতে আর কেহই নাই। তাহা না হইলে এই সাধনের দেহটা থাকিতে থাকিতে অন্যান্য বিষয়কর্ম্ম সব পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করিতেছি না কেন? শ্রীহরিই সকলের মূল, আমরা সেই শ্রীহরির সেবক, তাঁহার সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কার্য্য বা কর্ত্তব্য। তাঁহার সেবা করিলে সকলের সেবা হইয়া থাকে—এই সুবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার কবন্ধের দশা হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

---

[১] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

কলিকালে

যুধিষ্ঠির মহারাজ ভ্রাতাগণসহ কৃষ্ণের নিকট আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ অতীব উৎসুক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! কলিকাল কিরূপ হইবে, ইহা জানিবার জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া যদি বল, তাহা হইলে আনন্দিত হইব।" ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—"খুবই ভাল করিয়াছ। আমি আর কি বলিব, তোমাদিগকে একটী কাজ করিতে হইবে। তোমরা যাও, সংসার ঘুরিয়া দেখ। সংসারের কোন অদ্ভুত জিনিষ যদি দেখিতে পাও, তাহা দেখিয়া আমার নিকট আসিও।" যুধিষ্ঠির মহারাজ চারিভাইকে সমস্ত সংসার ঘুরিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। চারিভাই সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত সংসার ঘুরিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যেক ভাই ভগবানের নিকট তাঁহাদের দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

প্রথম ভাই বলিলেন,—"আমি দুই মুখওয়ালা হাতী দেখিয়া আসিলাম। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হইল।"

ভগবান্ বলিলেন,—"আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কলিকালের মহিমাই তুমি দেখিলে অর্থাৎ তুমি কলিকালই দেখিতে পাইলে। কলিকালের লোক দুই মুখওয়ালা হইবে। অবশ্য উহাদের শরীরে দুইটী মুখ থাকিবে না। কিন্তু বিচারে উহারা দুই মুখ হইবে। তাহারা মুখে একরূপ বলিবে, কিন্তু কার্য্যে অন্যপ্রকার করিবে।"

দ্বিতীয় ভাই বলিলেন,—"আমি পথিমধ্যে দেখিলাম—একটী গাভী সন্তান প্রসব করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ বাছুরটী হাঁটিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, ঐ গাভীটী বাছুরের দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। হে ভগবান্! আমি ইহার প্রকৃত অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বাছুরই ত' তাহার মায়ের দুগ্ধপান করিবে ; কিন্তু এখানে ত' বিপরীত দেখিলাম।"

শ্রীভগবান্ হাসিয়া কহিলেন,—"আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। তুমি কলিকাল দর্শন করিলে। ইহার অর্থ হইতেছে যে,—যে কন্যা দান করা হইল, ঐ কন্যার দ্বারাই উহাদের সংসার পালন-পোষণ হইতেছে। অর্থাৎ যে পিতামাতা কন্যাকে দেবী-স্বরূপা মনে করিয়া কন্যা দান করিল, সেই কন্যাকে দিয়া উপার্জ্জন করাইয়া নিজেদের পালন-পোষণ করিবে। কলিকালে এইপ্রকার অধর্ম্ম হইবে।"

তৃতীয় ভাই বলিলেন,—"আমি দেখিলাম তিনিটী পুষ্করিণী খনন হইতেছে। একটীতে জল আছে, বাকী দুইটীতে জল নাই, শুষ্ক। কেন এমন হইল? একই স্থানে এইপ্রকার বিপরীত অবস্থা কেন হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—"দেখিবে, কলিকালে একভাই খুব ধনবান্ হইল এবং একই মাতাপিতার অপর পুত্রগুলি গরীব। কিন্তু ঐ ধনবান্ ভাই গরীব ভাইগুলিকে কোন সাহায্য করিবে না। বরং ধনমদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর অধিকাংশই স্ত্রীর বশীভূত হইবে। পিতামাতার সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। সত্যকথার সমাদর নাই। মিথ্যায় সকলে ভুলিয়া রহিবে। দুগ্ধপান না করিয়া সুরার প্রতি আসক্ত হইবে।"

চতুর্থ ভাই বলিলেন,—"আমি বিরাট বিরাট পর্ব্বত দেখিয়া আসিলাম। ঐ সকল পর্ব্বতোপরি সহস্র সহস্র বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি বর্ত্তমান। পর্ব্বত অনায়াসে উহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রবল ঝড় উঠিল। ঝড়ে ঐ বিশাল পর্ব্বতকে পড়িয়া যাইতে দেখিলাম। কোন বৃক্ষাদি রক্ষা পায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরিস্থিত বৃক্ষ বাঁচিয়া গেল। তাহাদের কিছুই হইল না। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"তুমি কলিকাল দর্শন করিলে। ইহাই কলিকালের মহানতা। কলিকাল অশেষ দোষের আকর হওয়া সত্ত্বেও কলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইবে যে, ভগবান্ নিজ ভক্তকে সমস্ত অসুবিধা ও বিপদ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। ভক্তগণ ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে ঐ নামের আশ্রয়ের দ্বারাই ক্ষুদ্র জীবও রক্ষা পাইবে। যিনি শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন, তাঁহার কেশাগ্র কেহই স্পর্শ করিতে পারিবে না। কেহই কোনদিন তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি সমস্ত বিপদ্ হইতে অবশ্যই রক্ষা পাইবেন—সন্দেহ নাই।"

তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"সুত দারা ঔর লক্ষ্মী, পাপী ঘরভি হোয়।
সন্ত সমাগম, হরিকথা তুলসী দুর্ল্লভ দোয়।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।"

অর্থাৎ "বর্ত্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের মূল। এই যুগে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গ অত্যন্ত প্রবল। অতএব পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য,

কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র! তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! আমি ঐ সকলদ্বারা বিকল হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব?"

কলিকালে শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে তিনিই তাঁহার সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং নামী অপেক্ষাও নামরূপে অধিক কারুণ্য বিস্তার করিয়াছেন।

"কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।।"
"সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা—আর কলিহত জন।।"

সুতরাং কলিযুগ ধন্য। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"হর্ষে প্রভু কহে,—শুন, স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।"

অতএব মহামন্ত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হইবে। কলি-কাল ধন্য।

—**শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী**

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৮৩তম শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে এ দীনের

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

পরম আরাধ্যতম, শ্রীগুরুপাদপদ্মে মম,
ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
শ্রীকেশব প্রাণধন, ভক্তিবেদান্ত বামন,
ধন্য তব আবির্ভাব-তিথি ॥১॥

ধন্য ধন্য সর্ব্বোত্তম, শ্রীমতীর প্রাণসম,
ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুস্বরূপ।
শুদ্ধভক্তি কলেবর, জগত পবিত্র কর,
দীর্ঘতনু অতি অপরূপ ॥২॥

কমল-হৃদয় তাঁর, সমদৃষ্ট, সদাচার,
যথালাভে হও গো সন্তোষ।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্যশূন্য, সুশীল, সহিষ্ণুপূর্ণ,
কারো প্রতি নাহি কোন রোষ ॥৩॥

অকাম, নিরীহ, স্থির, বদান্য, মৃদু, গম্ভীর,
সত্যসার, শুচি, অকিঞ্চন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

সর্ব্বোপকারক শান্ত,　　ষড়্ভিজ্ঞ গুণ দান্ত,
কবি দক্ষ মৌনপরায়ণ ॥৪॥
মুখে মৃদু মন্দ হাসি,　　হরিকথা সুধারাশি,
কৃপাদৃষ্টি অতি মনোহর ।
সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রবাণী,　　শ্রবণে সার্থক মানি,
কৃপাময় বৈষ্ণব সুন্দর ॥৫॥
অদোষদরশি প্রভু,　　অমানী মানদ বিভু,
ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকশরণ ।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত,　　অনন্ত তাঁর চরিত্র,
করি মাত্র দিগ্‌দরশন ॥৬॥
হেন গুরুশ্রীচরণ,　　সর্ব্বজীবের জীবন,
পূজি যতন হৃদয় ধরি ।
গুরু সর্ব্বদেবময়,　　গুরুদেব মনুষ্য নয়,
গুরুদেব—আশ্রয় শ্রীহরি ॥৭॥
শুনেছি বৈষ্ণব-স্থানে,　　পতিত অধম জনে,
অহৈতুকী কৃপা কর দান ।
পরম দয়ালু প্রভু,　　না ছাড়িহ মোরে কভু,
কাতরে জানাই নিবেদন ॥৮॥
তুমি ত' অন্তর্যামী,　　উদ্ধারিহ মোরে স্বামী,
তোমা বিনা নাহিক উপায় ।
অনাদিকাল হৈতে,　　পড়িয়া সংসার-স্রোতে,
ফুকারিয়া ডাকি উচ্চরায় ॥৯॥
দুঃখরূপ সিন্ধুজলে,　　কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
দু'হাত তুলি' লৈনু শরণ ।
থাকিয়া বিষয়ে রত,　　পাইনু যাতনা কত,
হারাইনু পরমার্থ ধন ॥১০॥
ওহে প্রভু দয়াময়,　　এ দাসে যা যোগ্য হয়,
কৃপা করি' করহ বিধান ।
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে,　　দিবানিশি হিয়া কাঁদে,
অতি শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥১১॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১০শ সংখ্যা, ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর]

জিনিষটা ত' তা নয়। শ্রদ্ধা, আর্ত্তি থাকা দরকার আছে ত'। শ্রদ্ধা যদি না থাকল, তাহলে কি উপকারটা হল আমাদের। কবিরাজ গোস্বামী শ্রদ্ধা-শব্দে ব্যাখ্যা করলেন,—

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।"

যদি আমরা কৃষ্ণে ভক্তিবিধান করি, তাহলে আমাদের সব ফল অবশ্যম্ভাবী, পাওয়া যাবে। আর যদি চিন্তাটা ঐ না হয়, তাহলে সবটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। নারদ পঞ্চরাত্র—নারদঋষির লেখা স্মৃতি-গ্রন্থ, তার ভিতরে একটা শ্লোক বলছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্"—ভগবান্ শ্রীহরি যদি আমাকর্ত্তৃক আরাধিত হন, তাহলে তপস্যার কষ্টের কি প্রয়োজন? "নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"—আর ভগবান্ যদি সন্তুষ্ট না হলেন আমার প্রতি, তাহলে তপস্যার কষ্টের কি প্রয়োজন? "অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্"—অন্তরে-বাহিরে যদি আমি ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে তপস্যার প্রয়োজন নাই। "নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্"—আর ভগবান্ শ্রীহরি যদি আরাধিত না হলেন, তাঁকে যদি সন্তুষ্ট করতে না পারলাম, তাঁকে যদি সেবা না করতে পারলাম, তাহলে তপস্যার কি প্রয়োজন? ঠিক কথাগুলো বুঝতে হবে এইরকম।

দৌড়ঝাঁপ করব আমরা, কিন্তু সব দৌড়ঝাঁপের মূল থাকবে কৃষ্ণভক্তি। সেটা লাভ করতে গেলে আমি নিজে নিজে পারি না, এইজন্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দরকার, সাহায্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি দরকার। সেইকথাই ত' শাস্ত্রে বলা আছে। আমার ইচ্ছানুসারে আমি যেটা ভাল মনে করি, সেই অনুসারে চলব, তাহলে সেবা হয় না নিশ্চয়ই। সেই সেবাকে কর্ম্মের মধ্যে ফেলেছেন, কর্ম্মের বন্ধন-দশা। গুরুদেব যা বলছেন, সেই অনুসারে যদি আমি চলি, তাহলে আমার কিছু পারমার্থিক কল্যাণ হয়।

অর্জ্জুন প্রথম পড়াতে যেন ফেল করছেন। পরে বুঝতে পারছেন, বলছেন,—ঠাকুর! তুমি ত' আমার সখা। সখার সঙ্গে কোনরকম ত' বিরোধ নাই, মিল আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

কিন্তু আমি ব্যক্তি, আমার এই চিন্তাটাই সব শেষ করে দিচ্ছে। তাই আমি বলছি, তুমি আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দাও। আমার যে ভুল বিচার রয়েছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-প্রচেষ্টার মধ্যে আমার কিছু বাহাদুরি দেখছি আমি, সব ভুল আমি বুঝতে পারছি। কি করব আমি? তুমি আমাকে এমন উপদেশ দাও, যে উপদেশে আমার বাস্তব কল্যাণ হয়। আমি যখন মনে করি তুমি আমার সখা, তখন আমি সব ভুল করে ফেলি। তাই সখ্যভাব ছাড়লেন তিনি। সখ্যভাব ছেড়ে বললেন,—আমি দাস্য-ভাবে এলাম, আমি তোমার শিষ্য, আমাকে উপদেশ কর। যদৃচ্ছাক্রমে আমাকে উপদেশ কর, আমি তা পালন করব।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"—গীতার উপদেশ। শিষ্য মুখে বললেই হয়ে গেল? কৃষ্ণ বিচার করছেন, তুমি মুখে বলছ 'তুমি আমার শিষ্য', কাজের বেলায় করছ না। তা ত' ঠিক নয়। হবে না ওটা। শিষ্যের কর্ত্তব্য কি? 'শাধি মাম্'—তুমি আমাকে শাসন কর ঠাকুর, আমার যা ভুল-ত্রুটী হচ্ছে, সব শোধন করে দাও। হবে না, Practical field নয়। 'ত্বাং প্রপন্নম্'—আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার কাছে প্রপত্তি স্বীকার করছি, আত্মসমর্পণ করছি। আমি আমার কোন বাহাদুরি রাখছি না—যাতে আমার কল্যাণ হয়, সেই কল্যাণই তুমি চিন্তা কর, সেই উপদেশই কর। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা আছে—গুরুদেবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলা আছে, শিষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও বলা আছে। তিনি অনেককে নিয়ে চলতে পারেন, তাঁর ভিতরে কিছু উদারতা আছে। কিন্তু উদারতা দেখাতে গিয়ে যদি আবার lenience—দয়া কিছু এসে যায়, গণ্ডগোল হয়ে যায়, খারাপ হবে। সেইজন্যই সেখানে কড়াকড়ি ভাবটা আছে। ওটাও বুঝতে হবে, আসলে ওঁর মধ্যে কেমন স্নেহ আছে, কেমন কৃপা আছে। যে শাসন অপার্থিব, তা আমি ত' বুঝতে পারি না। কান্নাকাটি যদি করে সন্তান, সেবক, শিষ্য, নিশ্চয়ই ভগবান্ তাকে জানিয়ে দেন। এটা স্বভাব, নিয়ম। তাহলে আমি কেন মিছামিছি নিজের হাতে সবটা নিতে যাচ্ছি। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফল নিয়ে টানাটানি করছ কেন তুমি?

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।।

বাঃ! আমি খেটে খেটে মরব, আর সব কর্ম্মের ফল তুমি নিয়ে নেবে—এ আবার কি? কৃষ্ণ বলছেন,—না, আমি সেজন্য বলিনি, তুমি ত' বাচ্চা, অবুঝ, যেহেতু আমি সর্ব্বোপরি মালিক, সেজন্য আমি বুঝে-সুঝে তোমাকে কর্ম্মের ফলটা দেব। কিরম ব্যাপার! কর্ম্মফল নেন ভগবান্, কর্ম্মফল কাকেও দেন ভগবান্? গীতা যে পড়ছি আমরা, তার ভিতরে ত' সব উল্টোপাল্টা বলা আছে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।।

তাহলে আমি কারও কর্ম্মের ফল নেই না, কাকেও কর্ম্মের ফল দেই না।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।"

জীবের স্বাভাবিক যে স্বভাব আছে, সেই স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন, তা তার অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হতেই হয়।

ভগবান্‌কে নিজের করে নেওয়া, তাঁর কথা আমি কোনভাবেই অস্বীকার করব না, যা বলবেন, আমি ঠিক সেই অনুসারে চলব, ঠিক সেই অনুসারে করব সব। ঠিক ঐ রকম ধরণের গুরু-বৈষ্ণবের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। যদি কম হয়ে যায় আমার আনুগত্য, আমার যদি অহঙ্কার এসে যায়, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এসে যায়, সব মুস্কিল্ হয়ে গেল। সব কেটে যাবে। তাহলে কি করব?

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

এর ব্যাখ্যা কি করলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর?—

"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন।।"

তুমি কীর্ত্তন করবে, কর ; কিন্তু আগে তোমার অহঙ্কার ছাড়তে হবে। কীর্ত্তন তুমি ঠাকুরকে শুনাবে, গুরু-বৈষ্ণবগণকে শুনাবে, সেজন্য তুমি কীর্ত্তন করবে। তা না, অনেক শ্রোতা আছে, তাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য খুব তাল-লয়-মান দিয়ে যে কীর্ত্তন, সেই কীর্ত্তন ত' কীর্ত্তন নয়। তাতে ত' সর্ব্বনাশ। কীর্ত্তন করতে হবে আমার দুষ্ট মনকে শুনাবার জন্য, কীর্ত্তন করতে হবে গুরু-বৈষ্ণবকে শুনাবার জন্য, কীর্ত্তন করতে হবে রাধাকৃষ্ণকে শুনাবার জন্য। সেইজন্য আমি কীর্ত্তন করব। গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত এইসমস্ত জিনিষগুলো আমাদের কে বুঝাবে? এমন চিকিৎসক, সদ্বৈদ্য আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত দয়ালু, এত তাঁদের স্নেহ-মমতা, দয়া, বুঝতে পারি না আমরা। সব জিনিষগুলো আমাদের বুঝে চলতে হবে।

যারা নির্ব্বিশেষবাদী তারাও গুরুপূজা করে। কিন্তু তাদের বিচারটা কি? "গুরু অনবগতস্যাৎ।" গুরুদেব তত্ত্বসিদ্ধান্ত কিছু জানেন না। তাহলে আবার গুরু কিসের? তাহলে ত' তিনি লঘু। ঠিক এরকম ধরণের বিচারগুলো আমাদের বুঝতে হয়। যখনই আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে যে, গুরুদেব অসম্পূর্ণ, কেননা তিনি ত' সংসার করেন নাই, সুতরাং সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। যদি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে তাঁকে সংসার করে এসে উত্তর দিতে হবে। যেমন করলেন শঙ্করাচার্য্য। জিনিষটা কিন্তু তা নয়। গুরু যদি লাখ টাকা, তাহলে তার মধ্যে দশ হাজার টাকা আছে, পাঁচ হাজার টাকা আছে, এক টাকাও আছে। তত্ত্বদর্শন হল এই। সবটাই আরোপসিদ্ধা নয়। বর্ত্তমানে একটা ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়েছে বাজারে—আরোপসিদ্ধা, আরোপসিদ্ধা। আমি যাকে আরোপসিদ্ধা বলছি, তিনি ত' সেটা নাও হতে পারেন। আমি কেন তাহলে Command করতে যাচ্ছি? আমি কেন Remark pass করতে যাচ্ছি? কথাগুলো ত' রয়েছে সেখানে। শাস্ত্র বলছেন,—"ন নিন্দেৎ ন প্রশংসেৎ।" **হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিন্দা করতে যাবে না, আবার প্রশংসা করতেও যাবে না।** বাঃ! প্রশংসা করাও খারাপ? বললেন,—হ্যাঁ। **কারণ, আমি ত' তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নই।** আমি কিভাবে বলছি, প্রশংসা করছি? সেজন্য দুটোই নিষেধ করলেন। আর যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের পক্ষে সবটাই সম্ভব। যখন যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় সবটাই সম্ভব। তাঁদের যে কোন অভিমত পূর্ণ, তাত্ত্বিক। সেখানে অন্য কোন বিচারের ক্ষেত্র নাই। **আমি যদি গুরু-বৈষ্ণবের ভুল-দোষ-ত্রুটী দেখতে যাই, তাহলে সব শেষ আমার।** শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখলেন,—

সাধুসঙ্গ না হইল হায়!
গেল দিন অকারণ,　　করি' অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায়??
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ,　　তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।

আমি ত' দুর্ভাগা। সেজন্য ভাল চিন্তা আমি রাখতে পারছি না, আনতে পারছি না। আমি কি করব? গুরুদেব যা বলেছেন, তার ভিতরে কিছু ভুল রয়েছে—এ জাতীয় সংশয় সর্ব্বনেশে ব্যাপার।

নির্ব্বিশেষবাদীরাও গুরুপূজা করে, ব্যাসপূজা করে ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে চিন্তা—গুরুদেব তত্ত্বদর্শন কিছু জানেন না। তেমন গুরু করে কি লাভ? তাতে কি ফল হবে? এটা বুঝানো আছে। **গুরুদেব যেভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সেই-ভাবেই ওটা প্রকাশ করা দরকার। আর যদি সেখানে এদিক-ওদিক করা যায়, তার 'পরে যদি কলম চালানো যায়, তাহলে কি হবে?—ভীষণ অপরাধপঙ্কে আমি পতিত হব।** আমাকে কি ভার দিয়েছেন ভগবান্, তুমি গুরুর উপর কলম চালিয়ে দাও? নিশ্চয়ই না। **ভীষণ অপরাধ! শাস্ত্রের পাঠ যারা পরিবর্ত্তন করে, নরকগামী তারা। তাদের কখনও কল্যাণ হতে পারে না।** এখানে ভুল আছে কিছু। ওঃ! আমি খুব বড় বাহাদুর, সব ঠিক করবার জন্য আমি বসে আছি। আমার গুরুদেব

হরিকথা বলবার সময়ে একটা শ্লোক উল্টোপাল্টা বলেছেন। আমি কি ভাবব, এটা ওঁর ভুল। না, এটা ওঁর ভুল নয়। তাহলে কি?—ওটা মহাজনানুভব আর্ষপ্রয়োগ। একটা শব্দ ভুল হয়ে গেছে ব্যাকরণের, কি বলব? উনি জানেন, কিন্তু এখন Slip of tongue একটা হয়েছে, এটা বুঝে নিতে হবে। আর যদি আমি গুরুর পরে গুরুগিরি করি, তাহলে কি হবে? আমি সবজান্তা, গুরুদেব ভুল করে ফেললেন। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্‌গরের ভিতরে আছে একটা কথা,—"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতি-রেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।।" এখন 'নৌকা'র জায়গায় আমি 'একা' না বলে যদি 'একো' বলে ফেলি, তাহলে ব্যাকরণে ভুল হয়ে যাবে। কিন্তু তত্ত্বদর্শনগুলো সব আমাদের বুঝতে হবে।

কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দিরে বিরাট সভা হয়েছে, সেখানে শিবঠাকুর সাক্ষী দিচ্ছেন। কার সম্বন্ধে?—শ্রীধরস্বামীর সম্বন্ধে। কি বলছেন?—"শ্রীধর সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ।" এ সাক্ষী কেন শিবঠাকুরকে দিতে হচ্ছে? তিনি ত' আমাদের গুরুবর্গ, উপরওয়ালা। তাঁকে আমরা কেন খাটাতে চাচ্ছি? তিনি ত' জগতে তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। এইজন্য তিনি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" সেই কর্ত্তব্য-দায়িত্ব নিয়ে তিনি বসে আছেন, তাঁকে ওটা ত' করতেই হবে।

স্বয়ং যমরাজ তিনি একটা কিছু কথা বলছেন, সেখানে বললেন কি? "অহং বেদ্মি" হয়, তিনি বলেন নাই 'বেদ্মি'। কি বলেছেন?—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যঃ ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।।

সেখানেও স্বয়ং যমরাজ, পরম বৈষ্ণব। তিনি বলতে গিয়েও যেন একটু ব্যাকরণের ভুল করে ফেললেন। তা আমরা কি বলব যে, উনি ব্যাকরণ জানেন না? বৈষ্ণবরাজ, যমরাজ তিনি ব্যাকরণ জানেন না। তাঁর স্ত্রী—যাঁর নাম শ্যামলা, তিনি লেখাপড়া জানেন না, তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানেন না—এ বললে পরে যমরাজের প্রতি অপরাধ হবে, আর তাঁর শক্তির প্রতিও অপরাধ হবে। কখনই বলা যাবে না এটা। আমার গুরুদেব কিছুই জানেন না, আমার বাপ-ঠাকুরদা সব মূর্খ, আমি বড় পণ্ডিত! আমার মত এমন বড় পণ্ডিত আর কেউ আছে, জাননেবালা কেউ আছে? তত্ত্বদর্শনের ক্ষেত্রে ওসব চলবে না।

আপনারা ত' এখানে বসে আছেন কিছু কথা শুনবার জন্য। কিন্তু আমি যদি আমার নিজের কথা কিছু বলি, তাহলে আপনাদের চরণে আমার অপরাধ হয়ে যাবে। আপনারা কেন বসে আছেন? নিশ্চয়ই তত্ত্বসিদ্ধান্ত শুনবার জন্য। তত্ত্বসিদ্ধান্ত মানে Axiomatic Truth, Universal Truth—বাস্তব সত্য। যেটা স্বয়ং

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

ভগবান্ বলেছেন গীতা-ভাগবতে, যেটা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ বলেছেন, আমি সেই কথাই বলবার জন্য আপনাদের কাছে এখানে বসেছি। এখানে অহঙ্কার ত' আমার কিছুই থাকা উচিত নয়। যা আমি বলছি, তা ত' আমার কথা নয়, আমার উপরওয়ালাদের কথা। সেখানে আমার অভিমান, অহঙ্কার আসবে কেন? আমি ত' সবসময় আমার গুরুবর্গের কথাই বলব, গোস্বামীবর্গের কথাই বলব, চৈতন্য-মহাপ্রভুর কথাই বলব, স্বয়ং শ্রীরাধাগোবিন্দের কথাই বলব। এটাই ত' নিয়ম, রীতি। সব জিনিষটা নিয়েই ত' বিচার রয়েছে শাস্ত্রে। মাঝখানে আমি কেন অহঙ্কার করে মরি? এটা ত' আমার সেবকত্ব নয়, এটা ত' আমার শিষ্যত্ব নয়। সব জিনিষগুলো আমাদের এইভাবেই বুঝে চলতে হবে। **(ক্রমশঃ)**

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জয় শ্রীগুরু ভকতিবেদান্ত বামন।
তব পদে এইবার লইনু শরণ।।
অশেষ মায়াতে মন বিষয়েতে ধায়।
সাঁতারি সাঁতারি যাই ওর নাহি পায়।।
স্বতন্ত্রতা করি' মুঞি ইতি উতি ফিরি।
হারাইনু অমূল্যনিধি তোমা পাসরি'।।
তব নিজজন কত উপদেশ কৈল।
দুর্দ্দৈব তাহাতে মোর রতি না হইল।।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
অনলে পুড়িয়া আজি ছারখার হৈনু।।
শাস্ত্রের বাণী—"যে যত পতিত হয়।
তব কৃপা তত তায়"—মহাজনে কয়।।
আর না করহ প্রভু এ অধমে রোষ।
তব পদে দিয়া স্থান করহ সন্তোষ।।

—শ্রীদীনেশকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

জ্ঞাতব্য

সংবাদপত্র (RNI)-আইনানুসারে পত্রিকার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা (Cover-page) পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যার সহিত যুক্ত হওয়ায় বর্ত্তমান ১১শ সংখ্যা হইতে পৃষ্ঠা-সংখ্যার পরিবর্ত্তন করা হইল।

(সংবাদ-প্রসঙ্গ)

প্রত্নতাত্ত্বিক-তথ্য-বিশ্লেষণ

বর্ত্তমান বিশ্বে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে পদদলিত করিবার জন্য, বৈদিক শাস্ত্রকে Mythology-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাশ্চাত্ত্যদেশে এক প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যবাসীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, একদিন না একদিন সত্য প্রকাশিত হইবেই। পাশ্চাত্ত্যবাসী মানব সভ্যতাকে ৪,৫০০—৫,০০০ বর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া মানিতে রাজী নহেন। কেননা, তাহাদের পরীক্ষাগারের ক্ষমতা এবং অনুসন্ধান-ক্ষমতা ৪,৫০০—৫,০০০ বর্ষের সীমাকে অতিক্রম করিতে অপরাগ। কিন্তু সত্য ঠিক এর বিরুদ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করে বা করিয়া থাকে। অগ্নিকে ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেও যদ্রূপ তাহার তাপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সত্যও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, লুক্কায়িত থাকে না।

শ্রীব্রজনাথ প্রভু—গুরুদেব! এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কি?

শ্রীল মহারাজী—কেন, সমগ্র জগৎ আমেরিকার 'NASA'-র সহায়তায় প্রকৃত তথ্যের দিকে একধাপ অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের নির্দ্দেশে লঙ্কা বিজয়ের জন্য যে সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করিয়াছে।

শ্রীমাধব মহারাজ—বর্ত্তমান বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে আরও কোন তথ্য পাওয়া গিয়াছে কি?

শ্রীল মহারাজ—দু'একটী নয়, বহু তথ্য ধীরে ধীরে পাওয়া যাইতেছে ও পাওয়া যাইবে। কলকাতা হইতে প্রকাশিত 'The Telegraph'-এ প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী এরূপ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বর্ণরেখা নদীর তীরে ২০ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে মানবের বসবাস ছিল।

জনৈক শ্রোতা—'The Telegraph'-এ কি report প্রকাশিত হইয়াছে?

শ্রীল মহারাজ—মাধব মহারাজ! আমার জামার পকেট হইতে 'অমর উজালা' পত্রিকার cutting টী আনিয়া সংক্ষেপে সকলকে সারাংশ শুনাইয়া দাও।

মাধব মহারাজ—'অমর উজালা' নাম দৈনিক সংবাদপত্রের (ভারতের জলন্ধর হইতে প্রকাশিত) বিগত ১০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যাতে কলকাতার 'The Telegraph'-এর উপর ভিত্তি করিয়া প্রকাশিত report-অনুসারে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ছোটনাগপুরের লুপ্ত আদিবাসী কলা ও শিল্প পরিযোজনার প্রধান নৃবিজ্ঞানী তথা ভূপাল (M.P.)-স্থিত সংগ্রহালয়ের উপদেষ্টা মিঃ এস. চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান ঝাড়খণ্ড-প্রদেশের ঘাটশিলা হইতে উড়িষ্যা-প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত স্বর্ণরেখা নদীর তটে ২০ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের মানব সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

অলডোবাই ঘাটী, ফ্রান্সের সোমঘাটী, ইংল্যাণ্ডের স্টোন্ হেনজেস্, মধ্যপ্রদেশের নর্ম্মদা ঘাটী এবং তামিলনাড়ুর বেলামদুরাইপল্লবরমের সভ্যতা হইতে উপরোক্ত সভ্যতা সম্পূর্ণ পৃথক্ ও প্রাচীন। বিগত আগষ্ট মাসের শেষের দিকে মিঃ এস. চক্রবর্ত্তী ৫ সদস্যবিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ দলের সহিত ২০ কিলোমিটার ব্যাপিয়া প্রাক্ পাষাণ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধাতুযুগ পর্য্যন্ত সময়ের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। একস্থান হইতে প্রায় তিন হাজার কুঠার ও অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীল মহারাজ—পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যত অনুসন্ধান করিবেন, ততই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এমন সব তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে যে, বৈজ্ঞানিকগণ Carbon dated theory-দ্বারা কাল নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইবেন। সময় আর বেশী বাকী নাই, অতি অবশ্যই আর বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইবেই।

সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী—শ্রীল গুরুদেব! আপনার ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত। Internet-এ দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী সম্বন্ধে এইরূপ একটী Report প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা সমুদ্রগর্ভে এখনও বিদ্যমান। বর্ত্তমানে জগৎ তাহা মানতে বাধ্য হইতেছে।

শ্রীল মহারাজ—তুমি কিছু পড়িয়া আমাদিগকে শুনাও।

সুন্দরগোপাল—Internet-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম—"The Golden City in the Sea." (A report on the marine excavation of Dwaraka).

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে।। (ভাঃ ১০।৫০।৪৮)

(Shri Krishna said to Lord Sankarshan) Therefore we will immediately construct a fortress that no human force can penetrate. After settling our family members there, we will slay Kalayavana, the barbarian king.

শ্রীল মহারাজ—সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা ভাগবত পড়েন? তদুত্তরে অনেকে হ্যাঁ এবং অনেকে না উত্তর দিলেন। যাঁহারা হ্যাঁ উত্তর দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব প্রভুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন? সভাস্থ কেহ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে না পারায় শ্রীল মহারাজ মাধব মহারাজকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে আদেশ দেন।

মাধব মহারাজ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ, সাধুগণের রক্ষণ, অসাধুগণের বিনাশ-নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কংস মারা যাওয়ার পর অস্তি

ও প্রাপ্তি-নাম্নী কংস-মহিষীদ্বয় পিতৃগৃহে গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের নিকট নালিশ করেন। রাজা জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য লইয়া মথুরা অবরোধ করেন। শ্রীবলদেব প্রভু জরাসন্ধকে পাশবদ্ধ করিয়া মারিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে জরাসন্ধ সপ্তদশবার যাদবগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে কালযবন-নামক জনৈক বীর নিজতুল্য যোদ্ধা অন্বেষণ করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদ তাহাকে যাদবগণের কথা জানান। কালযবন তিনকোটি সৈন্য লইয়া মথুরাপুরী আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়া জরাসন্ধকর্ত্তৃক পুনঃ আক্রমণাশঙ্কাপূর্ব্বক উভয়ের দ্বারা যাদবগণের বিপদাশঙ্কা করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুকে এইকথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীল মহারাজ—সুন্দরগোপাল! এই কথার উৎস কোথায়?

সুন্দরগোপাল—Dr. S. R. Rao, an emeritees scientist at the marine archacology unit of the National Institute of Oceanography. এই ভদ্রলোক বিভিন্ন সংস্থার সহিত যুক্ত। উক্ত সংস্থা হইতে এবং Housden, T. "Lost City Could Rewrite History" (BBC news online, 19/1/2002, 06.33 GMT).

শ্রীল মহারাজ—ব্রজনাথ! এ বিষয়ে কি তুমি কিছু জান?

ব্রজনাথ—আমি এ বিষয়ে কিছু শুনিয়াছি। কিন্তু 'মুদ্রা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীল মহারাজ—আশ্রম মহারাজ! মুদ্রা সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে কি? মনে হয় তুমি কিছু বলিতে চাহিতেছ।

আশ্রম মহারাজ—হ্যাঁ গুরুদেব! মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যে কোন লোকের সংশয় বা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। শ্রোতারা অনেকেই তাঁহার বক্তব্যের সমর্থন করিলেন।

শ্রীল মহারাজ—যাহারা সামঞ্জস্য করিতে জানে না, তাহাদের মনেই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। সুন্দরগোপাল! মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, সকলকে তাহা পড়িয়া শুনাও।

সুন্দরগোপাল—Title is—"Ancient Mudras"

Seal (mudras) found in the Indus valley, some of which dating back 5,000 years, prove that Shri Krishna and the Yadavas actually existed and are not merely a figment of imagination. On one seal the archaeologist Rajaram and Jha deciphered the name Devapi, the elder brother of Bhisma's father Shantanu. Among other names related to Krishna deciphered are Krishna's friend Akrura, maharaj

Jadu and Shri Tirth (an old name for Dwaraka). One seal carried the words Murari Vrishni Ananga, "Murari of the Vrishnis", and another the words Vrishni Varpa, implying that Murari or Krishna had a beautiful body.

শ্রীল মহারাজ—ইহাতে সংশয় বা সন্দেহের কোন কারণ দেখিতেছি না।

অরণ্য মহারাজ—মুদ্রা বিষয়ে আরও কিছু বর্ণনা আছে, যাহা দেখিলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীল মহারাজ—ব্রজনাথ প্রভো! মুদ্রা সম্বন্ধে আরও যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করুন।

ব্রজনাথ—The Dwaraka Mudra

But perhaps the most significant find, corroborating a statement of the 'Harivansa', is a seal (just 18mm × 20mm) bearing the motif of a three-headed animal representing the bull, unicorn and goat. The Harivansa says that, every citizen of Dwaraka had to carry a seal (mudra) as a mark of identification and that none without a seal could enter the city.

অরণ্য মহারাজ—হরিবংশে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রা ব্যতীত কেহ দ্বারকানগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। দেবর্ষি নারদ ত' প্রায়ই দ্বারকা যাইতেন, কেননা, শ্রীগোবিন্দের ভুজের দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপ তথায় কার্য্যকরী হইত না ; অতএব তিনি মুদ্রা ব্যতীত কিরূপে প্রবেশ করিতেন?

শ্রীল মহারাজ—মাধব মহারাজ এর উত্তর প্রদান করিবে।

মাধব মহারাজ—শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ঠিকই বলিয়াছেন, নারদঋষি মধ্যে মধ্যে দ্বারকায় আসিতেন। দক্ষের অভিশাপ তাহার মূল কারণ নহে, গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ।।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! নারদ ঋষি কোথাও বাস না করিলেও কৃষ্ণারাধন-লালসায় শ্রীগোবিন্দের বাহুবলের দ্বারা রক্ষিত দ্বারকায় বাস করিতেন। যদি দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণারাধনার প্রবল বাসনা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি অন্য কোথাও যাইতে পারিতেন। যেমন, বারাণসী শিবঠাকুরের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত ; পৃথিবীর মধ্যে থাকিলেও পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত। এইরূপ ভগবদ্ধাম ও দক্ষের অভিশাপের আওতায় আসে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময় প্রকটলীলা করিতেছিলেন বলিয়া নারদঋষি ওখানেই বারম্বার যাইতেন। কেবল

নারদঋষি নহেন, সুদামা বিপ্রও দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা মুদ্রা লইয়া যাইত বলিয়া শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাই। হরিবংশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারকার নাগরিকগণের জন্য বলা হইয়াছে, বাহির হইতে আগত কোন আগন্তুকের জন্য বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সময়ের কথাই বা কি, কলিযুগ ব্যতীত অন্যান্য যুগে ব্রাহ্মণগণের, সাধু-সন্তগণের, মুনি-ঋষিগণের বিশেষ সম্মান ছিল।

শ্রীল মহারাজ—এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সভাস্থ অনেকেই জানাইলেন যে,—হ্যাঁ, আরও বহু তথ্য আছে। শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীতমোপহা দাসাধিকারী প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

"A Second Lost City"

Recently came an even greater surprise. While conducting a regular survey of pollution, oceanographers from India's National Institute of Ocean Technology discovered the remains of a second huge lost city 120 feet under water in the gulf of Cambay, not far from the Dwaraka site. When debris from the site was carbon dated, it was found to be over 9,000 years old. Current academic opinion insist that no civilisations existed untill roughly 4,500 years ago when the first big cities begin to appear in Mesopotamia.

In a report of BBC news on line author and film-maker Graham Hancock—who has written extensively on the uncovering of ancient civilisation—said the evidence forced historians and archaeologists to radically reconsider their view of ancient human History. He said.

There's a huge chronological problem in this discovery. It means that the whole model of the origins of civilisation with which archaeologists have been working will have to be remade from scratch.

শ্রীল মহারাজ—আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান, বিচারবান্। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, বৈদিক সংস্কৃতিকে আধুনিক বলিবার জন্য কুচক্রীগণ যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, সত্য প্রকাশিত হইয়া যাইতেছে। বৈদিক সভ্যতার সহিত মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কোনপ্রকার তুলনা হয় না। আমার মনে হয় Mr. Graham Hancock এখনও পর্য্যন্ত হয়ত' NASA-র report পড়েন নাই। নতুবা এতদিনে তিনি নিশ্চয় আরও কিছু মন্তব্য অবশ্যই করিতেন। এই discovery-তে coin বা মুদ্রা ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য বস্তু পাওয়া গিয়াছে কি?

সুন্দরগোপাল—হ্যাঁ, আমি ইহাই বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছি।

Dr. Rao and his team found part of a paved road, as well as several beautiful deities of Shri Vishnu, who would have been worshipped by Jadavas. The reference to Dwaraka as nagar (city) is born out by the engineering skills, advanced technology and high literacy of its people ....., other finds include a lunate-shaped moonstone (Chandra-sila), a copper lota and bell, a stone mound for casting spearheads and a large iron stake.

শ্রীল মহারাজ—তদানীন্তন সভ্যতার সহিত অন্যান্য দেশের কোন যোগসূত্র পাওয়া গিয়াছে কি?

বৃন্দাবনদাস—হ্যাঁ, আমিও internet-এ দেখিয়াছি Heliodours-নামক এক গ্রীক্ রাষ্ট্রদূতদ্বারা নির্ম্মিত গরুড়স্তম্ভ। উক্ত স্তম্ভেতে Heliodours শ্রীবাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে God of Gods বলিয়াছেন। গ্রীক্ এবং ব্রাহ্মী ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহা পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি বৈষ্ণব ছিলেন (Heliodours a worshipper of Vishnu)।

সুন্দরগোপাল—শ্রীল গুরুদেব! যদি আপনি আদেশ করেন, কাহা হইলে উক্ত report-এর কিয়দংশ আমি পড়িয়া শুনাইতে পারি।

অতঃপর শ্রীল মহারাজের আদেশে সুন্দরগোপাল প্রভু উক্ত report-টি পাঠ করিয়া শুনাইলেন,—'The Agathocles Coins'

The Greek king Agathocles (2nd century BC) was also a devoted vaishnava. Exacavations at Al-Khanuram in Afganisthan, conducted by P. Bernard and a French archaeological expedition, unearthed six rectangular bronze coins issued by the Indo-Greek ruler. The coins had script written in both Greek and Brahmi and most interestingly, show an image of Vasudeva, carring a chakra and conchshell and of Lord Sankarsana.

শ্রীল মহারাজ—কলিযুগে নাস্তিকতার প্রাবল্যের জন্য সরকার কোথাও কোন মুদ্রাতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতিমূর্ত্তি বা নাম ব্যবহার করেন না। একমাত্র আমেরিকা সরকার তাহাদের currency-তে 'In God we trust' লিখিতে সাহস করিয়াছে। পূর্ব্বে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মানের জন্য দেশ সমৃদ্ধ ছিল ও সুখ-শান্তি বজায় ছিল। বর্ত্তমানে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। সকলেই যদি হরিনাম করেন, তাহলে ভয় হইতে মুক্ত হইবেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যকেশরী জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পরম স্নেহভাজন শ্রীচৈতন্যান্নায় একাদশাধস্তনবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে তদভিন্ন সুহৃৎ ও সতীর্থগণের বিশেষ উদ্যোগ ও সেবাপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে বিগত ১৭ই ভাদ্র,

১৪১০ (ইং ৩।৯।২০০৩), বুধবার ও ১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত অগণিত শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের উপস্থিতিতে শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র কোচবিহারস্থ শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোদ্‌যাপন ও নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীও শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রায় একমাস পূর্ব্বেই শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিবার মানসে ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজের আনুগত্যে বিশেষ দায়িত্ববান্ অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেবকগণকে প্রেরণ করেন। প্রাণপণ প্রচেষ্টাদ্বারা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

তাঁহারা আর্থিক ও অন্যান্য নানাবিধ প্রতিকূলতার ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করত যথাসময়ে আন্তরিকভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করিয়া শ্রীসমিতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর পর শ্রীসমিতির বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র হইতে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমঠে শুভবিজয় করিতে থাকেন। তৎকালে ঐতিহাসিক কোচবিহার শহর বর্ষার ক্রন্দনাবেগ বর্জ্জন করিয়া শরতের কুহেলি ঢাকা, শিউলীঝরা সকাল ও নির্ম্মল গগনে অষ্টমীর স্নিগ্ধ চাঁদনী-নীলিমার ডালিভরা আকাশকুসুম হাতে আর একটী পরমোজ্জ্বল ইতিহাসকে বরণ করিতে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপূর হইয়া উঠিল। সমবেত বৈষ্ণবগণ শহরতলীর বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ সড়কে তোরণ নির্ম্মাণ, প্রচারপত্র বিতরণ, ধ্বজা-পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিতকরণে নিযুক্ত হন।

পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ী, বামনপাড়া, তালতলা, গুঞ্জাবাড়ী, শহরের বিভিন্ন স্থান তথা নিকটস্থ গৃহাদি ও ক্লাবের সদস্যগণ শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করিয়া বহিরাগত বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের বাসস্থানাদির ব্যবস্থার জন্য সকল সঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমঠের সেবকবৃন্দকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত যাত্রী বহনের জন্য অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করেন। ফলে কোচবিহারে দিবসত্রয় জনাধিক্যজনিত পরম চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়।

১৭ই ভাদ্র, বুধবার প্রাতঃকালে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী অধিবাস ও শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। বৈকাল ৩ ঘটিকা হইতে উন্মুক্ত ট্রাকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী ও শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য ও বিভিন্ন সুসজ্জিত ট্যাবলো লইয়া 'শতবীণা বেণুরবে' শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাঙ্গ-যাজনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীনাম, গীত, বাদ্যাদি ও নৃত্যচাঞ্চল্যে মধুর মধুর ভাবাবলী প্রদর্শন করেন।

শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে প্রায় অর্দ্ধশত যুবক দ্বিচক্রযানে চক্রমণকালে সঙ্কীর্ত্তন-তালে শব্দতরঙ্গ রচনা করিয়া 'শ্রীমহাসঙ্কীর্ত্তন রাজরাজেশ্বরের' আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে থাকেন। অতঃপর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী ও তৎপশ্চাৎ প্রায় ত্রিসহস্রাধিক শ্রীনামকৃপাপ্রার্থী বিঘশাসী ভগবদ্ভৃত্যগণ পরমোল্লাসে মহাসঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি করিতে করিতে "পশু-পাখী-কীটাদি বলিতে না পারে। শুনিলে হরিনাম তারা সব তরে।।"—বাণীর মর্ম্মভেদ করত শ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তনকে জয়যুক্ত করেন।

শহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমদনমোহন-দেবের শ্রীমন্দির অতিক্রম করিয়া সাগরদীঘি তথা ইহার বিশালতাকে তিরস্কার

করিতে থাকিলে শব্দবিবর্দ্ধকোত্থিত সঙ্কীর্ত্তন-বেগ উহার চতুঃপার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গ প্রাচীন রাজার মহিমাকে ভুলিয়া রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মধুর মধুর নামামৃত-সাগররূপ বিরাট সাগরদীঘিতে ভাসিতে লাগিল। অতঃপর সেই বন্যার ঢেউ প্রাচীনরাজার রাজবাটীতে আছড়াইয়া পড়িলে বিপুল জনতার উদ্‌গীরণ হয়।

অতঃপর সন্ধ্যায় স্থানীয় কিশোর-কিশোরীগণ শ্রীজগন্নাথাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক ও বিভিন্ন ভক্তিগীতিসমূহ সুললিতকণ্ঠে গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

পরদিবস ১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে গঙ্গাবরণ অনুষ্ঠানে ১০৮টী কলস লইয়া পূর্ব্বদিবসের শোভাযাত্রার অনুকরণে বিশাল ভক্তগোষ্ঠী সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে 'রাজমাতা দীঘি' হইতে গঙ্গাপূজাদি করিয়া পূত যজ্ঞবারি আনয়ন করিলে বিপুল জনতা, মঠবাসী ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও বৈষ্ণববৃন্দের উপস্থিতিতে শ্রীবিগ্রহ অভিষেক, মহাযজ্ঞ ইত্যাদি সমাপ্ত হইবার পর প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে বৈষ্ণবগণ সুললিতকণ্ঠে বিভিন্ন বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য শুরু হয়। তিনি কোচবিহার গৌড়ীয় মঠের ইতিবৃত্ত বর্ণনামুখে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজের প্রশংসা করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ প্রভৃতি অপূর্ব্ব হরিকথা পরিবেশন করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজের আদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছাশক্তিই শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান রূপান্তরের কারণ' বলিয়া অভিহিত করেন এবং রূপান্তরকরণে আনুকূল্য বিধানকারী পারমার্থিক দাতা-গণের নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্রীসমিতির পক্ষ হইতে এই বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

পরিশেষে অসমাপ্ত নির্ম্মাণ-কার্য্যজনিত কারণে মহোৎসবকালে ভক্তবৃন্দের বিড়ম্বনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা প্রার্থনা করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করিলে পর পূজনীয় সভাপতি মহারাজের বক্তৃতান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত অন্তরে জানাইতেছি যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুগৃহীত প্রবীণ শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ বিগত ২৫ কেশব, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪১০ (ইং ৩।১২।২০০৩), বুধবার রাত্রি ৮।৪৫ মিনিটে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধহৃদয়, সঙ্কীর্ত্তনে ও হরিকথা-প্রচারে পরমোৎসাহ ও সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আমরা আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

তাঁহার অপ্রকট-সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও সকল শাখামঠ-সমূহে ছড়িয়ে পড়ে। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সংবাদ পাইবামাত্র শিলিগুড়ি-অভি-মুখে রওনা হন। কিন্তু তাঁহাদের পৌঁছাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য শ্রীল মহারাজকে সমাধি প্রদান করিতেও বিশেষ দেরী হয়। গত ১৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ৫।১২।২০০৩), শুক্রবার প্রাতে শ্রীল মহারাজের শয়নদোলাসহ শ্রীমন্দির ও শিলিগুড়ি শহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমান্তে বেলা ১০।৩০ মিনিটে শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দিরের নিকট আশ্রমবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের উপ-স্থিতিতে সাত্বত-বিধানানুযায়ী সৎক্রিয়াসার-দীপিকাবলম্বনে বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ তাঁহার সমাধিকৃত্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীল মহারাজ বর্ত্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর অঞ্চলে গজমুড়ি-নামক গ্রামে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেন। গৃহে থাকাকালীন তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্যকেশরী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক **শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী**-নামে পরিচিত হন। পূর্ব্বাশ্রমে ভজনা-নুকূল পরিবেশ না থাকায় 'ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কাম্য, ভজন-প্রতিকূল স্থান পরিত্যাগই বিধেয়'—এইরূপ সদ্‌বিচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা-মানসে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসমিতিতে যোগদান করেন। শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে দক্ষতা, হরিকথা প্রচারে পারদর্শিতা ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিগত ৫ই চৈত্র, ১৩৭১ (ইং ১৯।৩।১৯৬৫), শুক্রবার তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ প্রদান করেন। বেষ-গ্রহণান্তে তিনি **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

বেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ-নামে পরিচিত হন। তদবধি তিনি প্রচারপার্টিসহ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে নির্ভীকতার সহিত বিভিন্ন অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। তাঁহার হরিকথায় আকৃষ্ট

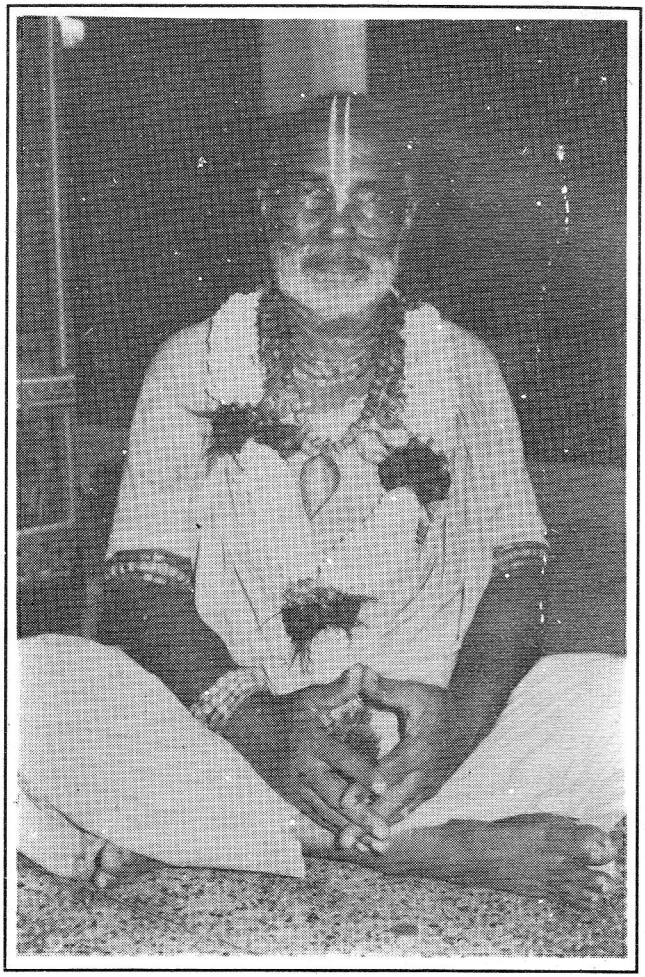

হইয়া বহু যুবক গৃহত্যাগপূর্ব্বক মঠবাসী হইয়া ভগবদ্ভজন করিতেছেন। হরিকথা-প্রচারে তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর শব্দবিবর্দ্ধক যন্ত্রকেও হার মানাইত। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাকালে শ্রীনৃসিংহপল্লীতে তাঁহার গুরুগম্ভীর বক্তৃতা সত্যই সকলের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। তিনি শ্রীসমিতির পরিচালক কমিটির একজন সদস্যও ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদকও ছিলেন তিনি।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

শিলিগুড়ি-শহরস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ তাঁহারই সেবাপ্রচেষ্টার নিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি উক্ত শাখামঠের মঠাধ্যক্ষরূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারীতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। স্বহস্তে পোষাক তৈয়ারী করিয়া তিনি শ্রীবিগ্রহগণকে পরাইতেন।

বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ, বুধবার শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে শ্রীল মহারাজের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিরহ-সভায় পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুবল-সখা ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ শ্রীল মহারাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও ভজনাদর্শ বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিকান্তে প্রায় ছয় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

শ্রীল মহারাজ আমাদিগকে স্বীয় ধাম হইতে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—যাহাতে আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারি। তিনি আজ আমাদের জড় দৃষ্টির অন্তরালে গেলেও তাঁহার জীবন-দীপশিখা যেন আমাদের সংসার-রণাঙ্গনে চলার পথে পাথেয়-স্বরূপ হয়—ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণ-ব্যয় আস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৫৬শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৫০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। অতঃপর গ্রাহকগণকে তদনুসারে গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বিগত ৫৪শ বর্ষের ও বর্ত্তমান ৫৫শ বর্ষের ভিক্ষা প্রেরণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে উক্ত ভিক্ষা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত—
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
✆ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩০শে পৌষ, ১৪১০ ; ১৫/১/২০০৪

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৫শে মাঘ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ৯/২/২০০৪), সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ২৭শে মাঘ (ইং ১১।২।২০০৪), বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—*২৫শে মাঘ, সোমবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি-প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।*

২৬শে মাঘ, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২৭শে মাঘ, বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ পৌষ, ১৪১০ ; ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৫শ বর্ষ } ৭ গোবিন্দ, গর্ভোদশায়ী, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, শুক্রবার, ১৪১০, ইং ১৩/২/২০০৪ { ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ-কৃতং "অনুতাপ-লক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশকম্"

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশেঽধ্যায়ে—৪০-৫১]

(যাজ্ঞিক-বিপ্রা ঊচুঃ)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥১॥

(যাজ্ঞিক বিপ্রগণ অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করত বলিতে লাগিলেন),—আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্য সমস্তেই ধিক্ ॥১॥

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃ্নাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥২॥

ভগবানের মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যেহেতু

আমরা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্ত্তব্য-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছি ॥২॥

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ ।
দুরন্ত-ভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যু-পাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৩॥

যে ভাব জন্মিলে গৃহ-নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, অহো! নারীগণের জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশী ভক্তি হইয়াছে, দর্শন কর ॥৩॥

নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি ।
ন তপো নাত্ম-মীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪॥
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৫॥

ইঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ এবং মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়াভক্তি জন্মিয়াছে, পরন্তু আমরা উপনয়নাদি-সংস্কারযুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না ॥৪-৫॥

ননু স্বার্থ-বিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া ।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৬॥

আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত বলিয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত রহিয়াছি । সজ্জনগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ গোপমুখে অন্ন-প্রার্থনা-বাক্যদ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়াছিলেন । হায়! ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় ॥৬॥

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥৭॥

অন্যথা কৈবল্যবশতঃ পূর্ণকাম সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা ভগবানের আমাদের ন্যায় তদীয় বশ্যজনের নিকট প্রার্থনাদির আবশ্যক কি? ইহা কেবল দয়াবশতঃ যাচ্ঞার অনুকরণমাত্রই করিয়াছেন ॥৭॥

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ ।
স্বাত্ম-দোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা জন-মোহিনী ॥৮॥

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত পাদস্পর্শ-বাসনায় অন্যদেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের চাঞ্চল্য দোষ পরিহার-সহকারে স্থির হইয়া নিরন্তর যাঁহার ভজনা করেন, তৎকৃত প্রার্থনা লোকসমূহের বিমোহিনী মাত্র ॥৮॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্র-তন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥৯॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥১০॥

দেশ, কাল, বিবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, পুরোহিত, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং যজ্ঞজন্যফল যাঁহার স্বরূপভূত, মহাযোগিগণের অধিপতি সেই বিষ্ণুরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়াও অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই ॥৯-১০॥

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠ-মেধসে ।
যন্মায়া-মোহিত-ধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্ম-বর্ত্মসু ॥১১॥

আমরা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া এই যাগাদি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি, সেই অলুপ্ত-জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥১১॥

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্ব-মায়া-মোহিতাত্মনাম্ ।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥১২॥

আমরা তাঁহারই মায়াবলে মুগ্ধ হইয়া তদীয় ভগবৎপ্রভাব অবগত হইতে পারি নাই । সেই আদিপুরুষ নিশ্চয়ই আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥১২॥

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য

রঘুনাথের বাসস্থান ও বাল্যকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা

মহানগরী কলিকাতার উত্তরাংশে বরাহনগর-নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রামে রঘুনাথ-নামক একজন ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়া তিনি "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই উপদেশ-ক্রমে কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যত্নবান্ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের চূড়ামণি, তাহা ১।১।২ শ্লোকে ব্যক্ত

বহু ভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণিস্বরূপ। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে এরূপ কথিত আছে যে, নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রাপ্য যে সম্পূর্ণ শঠতাশূন্য পরমধর্ম্ম, তাহা এই ভাগবতেই আছে। তাপত্রয়ের বিধ্বংসকারী পরম মঙ্গলপ্রদ বাস্তব-বস্তু এই ভাগবতে জানা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত থাকিলে আর অন্য শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? এই ভাগবত শ্রবণ করিতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার হৃদয়ে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অবিলম্বে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

ভাগবতাচার্য্য ও দেবানন্দ পণ্ডিত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু

বরাহনগর-নিবাসী সেই পরম ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণকুমার বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যে শুদ্ধভক্তগণের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য'-নাম দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' বলিয়া পদ দেন, তিনি কিরূপ পণ্ডিত, তাহা সহজে জানা যায়। যে-সময় মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় বিরাজমান, সে-সময়ে বিদ্যানগরে দেবানন্দ-নামে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ একটী মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাঁহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে বিদ্যানগরে যাইতেন। এমত কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শ্রীভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ পরে জানিয়া আমার মহাপ্রভুকে ভাগবত-ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান

যে মহাপ্রভু নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করেন এবং অন্যান্য বহু দেশের পণ্ডিতগণকে ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য শিক্ষা দেন, তিনিই রঘুনাথের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। ইহাতে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি"—এই মতানুসারে ভাগবতাচার্য্যের তুল্য তাত্ত্বিক পণ্ডিত সে-সময়ে আর ছিল না।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রতি মহাপ্রভুর যে অপার কৃপা হয়, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

হেনমতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি' ।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে ।
মহা-ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে ।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন ।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয় সদায় ॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া ।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে ।
পুনঃ পুনঃ আছাড়ি' পড়েন পৃথিবীতে ॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস ॥
এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি ।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি ॥
বাহ্য পাই' বসিলেন শ্রীশচীনন্দন ।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥
প্রভু বলে,—ভাগবত এমত পড়িতে ।
কভু নাহি শুনি কাহার মুখেতে ॥
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য ।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥
বিপ্র-প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি ।
সবে করিলেন মহা হরি হরি-ধ্বনি ॥

শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পানিহাটী ও বরাহনগর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রা

রামকেলি-গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া কয়েকদিন ছিলেন। তথায় শচীদেবী আসিয়া কয়েকদিন রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভোজন করান। ফাল্গুন শুক্লা-দ্বাদশী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-তিথি। সেই দিবসের মহোৎসবের কয়েকদিন পরেই প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীতে কয়েকদিন থাকেন। পরে পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাটীতে কয়েকদিন থাকিয়া ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষে প্রভু শ্রীবরাহনগরে উপস্থিত হন। তথায় পরম ভাগবত ভাগবতাচার্য্যের বাটীতে প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েক ভক্তের সহিত কয়েকদিন থাকিয়া নীলাচল যাত্রা করেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের প্রভুপ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত

শ্রীভাগবতাচার্য্য যে প্রভুর একান্ত ভক্ত, তাহা সহজেই জানা যায়। চরিতামৃতে প্রভুগণ-গণনায় এইরূপ আদি দশমে লেখা আছে,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস।।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা-গণনায় চরিতামৃতে আদি ১২শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী।।

শ্রীভাগবতাচার্য্য সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীকবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন যে,—

মালতী চন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা বরাঙ্গদা ।
রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া সুকেশিনী ॥
কর্পূর-মঞ্জরী শ্যাম-মঞ্জরী শ্বেত-মঞ্জরী ।
বিলাস-মঞ্জরী কামলেখা চ মৌন-মঞ্জরী ॥
গন্ধোন্মাদা রসোন্মাদা চন্দ্রিকা ফলভাষিণী ।
গোপালী হরিণী কালী কালাক্ষী নিত্য-মঞ্জরী ॥
কলকণ্ঠী কুরঙ্গাক্ষী চন্দ্রিকা চন্দ্র-শেখরা ।
যা যাঃ স্বযোগ্যসেবায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি রাধয়া ॥
গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ধৃত-পুরুষ-বিগ্রহাঃ ।
খেলন্তি স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা ॥
শুভানন্দো দ্বিজো ব্রহ্মচারী শ্রীধর-নামকঃ ।
পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণ-স্তবাবলী ॥
রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্‌গৌরাঙ্গানন্য-সেবকঃ ।
কংসারি-সেনঃ সেনঃ শ্রীজগন্নাথো মহাশয়ঃ ॥
সুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীহর্ষো রঘুমিশ্রো দ্বিজোত্তমঃ ।
রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ ॥
যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ ।
নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত-বল্লভঃ ।
সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ ॥

শ্রীভাগবতাচার্য্যই শ্যামমঞ্জরী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনে পাদ্যাদি দানের পরিবর্ত্তে তদগ্রে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠরূপ সিদ্ধসেবা

কৃষ্ণগণ ও গৌরগণ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

শ্যামমঞ্জরী-নামা সখী গৌরাবতারে ভাগবতাচার্য্য। কৃষ্ণলীলায় শ্যাম-মঞ্জরী শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে কৃষ্ণগান অর্থাৎ শ্যাম-লীলা শ্রবণ করাইতেন। তিনিই গৌরলীলায় ভাগবতাচার্য্য হইয়া গৌরাঙ্গকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়া নিজ সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধা তাঁহাকে ঐ সেবা দান করেন। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে স্বীয় শাখায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের যথাযোগ্য সেবা দান করিয়াছিলেন। সেবার লক্ষণ এই যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে বরাহনগরে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন পাদ্য-জলাদি-দান সেবা অবলম্বন না করিয়া ভাগবতাচার্য্য স্বীয় সিদ্ধসেবা যে ভাগবতপাঠ, তাহাই করিতে লাগিলেন। সখীদিগের রাধা-দত্ত সেবাই কর্ত্তব্য, ইহাই এই লীলায় প্রদত্ত হইল।

বরাহনগর—শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জ, ইহা ব্রজাভিন্ন গৌরমণ্ডলের অন্তর্গত

হে কলিকাতা মহানগরী-নিবাসী ভাই সকল! তোমরা ধন্য। তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশ বলিলেও হয়—বরাহনগর গ্রাম। যেখানে গৌরলীলা, সেস্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অন্তরঙ্গ ভাগবতাচার্য্যের সেবা-ভূমি পরম আদরের স্থান। দৃঢ় চিত্ত করিয়া তোমরা বরাহনগর দর্শন-স্পর্শন কর। হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ! কবে আমরা একত্রে শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মগ্ন হইব? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশ বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য কথা কেন ভুলিয়া যাই? তিনি লিখিয়াছেন,—

এ গৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজপুরে বাস।

ভাইসব! এই কথাটীতে তাৎপর্য্য-সমুদ্র আছে। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা কর। ব্রজপুরী প্রকট ও অপ্রকটরূপে নিত্যলীলা-ধাম। কৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজধামকে এই গৌড়দেশে আনিলেন ; যেখানে যে রসের যে ভক্তের সহিত সেই শচীনন্দন কৃষ্ণের যে লীলা হইয়াছে, সেই স্থানটীই ব্রজখণ্ড অর্থাৎ সেই লীলাপীঠ। সমস্তই চিন্ময়। গৌরমণ্ডল যে এক সংলগ্ন ভূমি তাহা নয়, বাহ্যে অসংলগ্নরূপে রহিয়াছে। ষোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রভুর বাল্যলীলা-স্থান। ব্রজের মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহাই অখণ্ডভাবে নবদ্বীপে নবদ্বীপ। মধ্যে শ্রীগোকুল মায়াপুর। সখীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ সেই সেই স্থানে, যথায় সেই সেই সখীর সেবা শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবরাহনগর গৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়।

এইটী অতি গুহ্য রহস্য আমরা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আশা করি যে,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

কলিকাতার বৈষ্ণবমণ্ডলী এই কথাটী জানিয়া কোন একটী অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কিঙ্কর। তাঁহাদের কোন্ ভাব, জানিতে পারিলে, আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কিভাবে লোককে কথা বল্‌তে হবে?

উঃ—মানুষের রোগ রকম রকম। এদের পৃথক্ পৃথক্ ক'রে চিকিৎসা করা দরকার। রোগ নির্ণয় না হ'লে ঠিক চিকিৎসা হ'বে না, তাতে রোগও সার্‌বে না। Platform speaker এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বেশী উপকার কর্‌তে পারে না, তা'তে কিছুটা উপকার হ'তে পারে। আমি ৪০ বৎসর যাবৎ কোন লোকই পাই নাই। তার পরে যে-সব লোক পাচ্ছি, তা'রা খানিকটা কথা শুন্‌ছে, আর খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল ছাড়্‌তে চাচ্ছে না।

জগতের জনগণ লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু ; বাস্তব সত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই বললেই হয়। যাঁরা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে জাহির কর্‌ছেন, তাঁরা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। সত্যকথা বল্‌লে ও সত্যকথা শুন্‌লে Popularity—জনপ্রিয়তার পরিচর্য্যা করা যায় না। এজন্য আমরা বহির্ম্মুখ গণমতের Support—সহানুভূতি চাই না।

প্রঃ—ভগবৎ-সেবা কি নিজে নিজে বা অন্য লোকের সঙ্গে হয় না?

উঃ—যাঁরা সেবা করেন, পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁদের সঙ্গ ছাড়া অন্যের সঙ্গে বা নিজের খেয়ালে কি ক'রে সেবা হ'বে? যাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চান, তাঁরা ত' সেবক ন'ন বা যাঁরা সেবার অভিনয় মাত্র ক'রে সেব্যবস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নফর কর্‌বার জন্য প্রস্তুত, তাঁরাও সেবক ন'ন, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে কিরূপেসেবা হবে?

সাধারণ বদ্ধজীবের নিজে নিজে বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশ বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। যেহেতু তা'রা গৃহব্রত—গৃহাসক্ত। গৃহব্রত তা'রাই, যা'রা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। এইজন্যই শাস্ত্র-বহির্ম্মুখ লোকের দুঃসঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে ব'লেছেন।

সাধুর কার্য্য হচ্ছে—Absolute-এর touch-এ (বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে)

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। এরূপ সাধুর সঙ্গ হলেই সেবাপ্রবৃত্তি জাগ্‌বে। সাধু তা'কেই বলে—যাঁর সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁর বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব অসুবিধা ছাড়িয়ে দিতে পারেন—সংসারের প্রতি আসক্তি, মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন করে দিতে পারেন।

সঙ্গ কিসে হয়? কাণ দিয়ে। অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে। কাণ দিয়েও সৎসঙ্গ না হ'তে পারে, যদি প্রণতি বাদ দিয়ে অহমিকা প্রবল করি।

প্রঃ—হরিনাম ছাড়া কি অন্য উপায়ে আমাদের মঙ্গল হ'বে না?

উঃ—কি ক'রে হ'বে? হরিনামকীর্ত্তন ত' যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম বাদ দিয়ে ত' যুগবাসীর মঙ্গল হ'তেই পারে না। মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের যে ব্যবস্থা দিলেন, সেই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ছেড়ে অন্যপথে কি ক'রে মঙ্গল হ'বে?

হরিনামকীর্ত্তন ছাড়া অন্য Alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন Alternative কল্পনা করাটাই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। যাঁরা হরিনাম-গ্রহণকারিগণকে একটা party মনে ক'রছেন, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যাঁরা মনে ক'রছেন, তাঁরা অপ্রাকৃতকে মাপ্‌তে যাচ্ছেন, ভগবানের আদেশ বা নির্দ্দেশ তাঁরা লঙ্ঘন কর্‌ছেন। এজন্য তাঁরা মাপার দল বা মায়ার দল, অভক্ত-সম্প্রদায়। খোদার উপর খোদ্‌গিরি কর্‌তে যাওয়া ভাল নয়, তা'তে সর্ব্বনাশ হয়—অমঙ্গলই হয়। শাস্ত্র কি বল্‌ছেন শুনুন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

প্রঃ—চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্যামীর কৃপা জিনিষটি কিরূপ?

উঃ—চৈত্ত্যগুরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর উপদেশ গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্য-গুরুর কৃপা ব্যতীত (অন্তর্যামীর কৃপা ভিন্ন) মহান্তগুরুর (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর) কথা বুঝা যায় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরু-রূপে দিব্যজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরু-সকলকে জগতে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বার শক্তি দেন।

প্রঃ—বেদান্ত কি পঠনীয়?

উঃ—বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তবে শাঙ্কর-ভাষ্য পড়া উচিত নয়। শ্রীভাষ্য বা গোবিন্দ-ভাষ্যের সাহায্য নিয়ে বেদান্ত পড়্‌লে মঙ্গল হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই বেদান্ত পড়্‌তে

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

হ'বে । বেদান্ত-শাস্ত্রে শ্রীহরিনাম-প্রভুর কথা আছে। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' শ্রীহরিনাম-প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত বেদান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—জ্ঞানী ও ভক্তের সন্ন্যাসে পার্থক্য কি?

উঃ—ভগবদ্ভজনেই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। জ্ঞানমার্গীয়গণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচারে সন্ন্যাস—পরব্রহ্মের সেবা পরিত্যাগ। তাঁরা সন্ন্যাস কর্‌তে গিয়ে ভগবানের সেবা ত্যাগ ক'রেছেন। অনুক্ষণ ভগবদ্ভজনেই যে প্রকৃত সন্ন্যাস—একথাটা দুর্ভাগা তাঁহাদের মাথায় ঢুক্‌লো না। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলের সহিতই সন্ন্যাস ক'রেছেন। কিন্তু ভক্তের সন্ন্যাস —ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়াবাদী ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস কর্‌তে গিয়ে ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস ক'রেছেন। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস ক'রে শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় ক'রেছেন। শ্রুতিদেবী যাঁর শ্রীচরণ-নখের অর্চ্চন করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, শ্রীনামকে অনিত্য জ্ঞান করেন নাই। কারণ তাঁরা শ্রীনামাশ্রিত—শ্রীনামের সেবক। তাই তাঁরা সতত শ্রীনামভজনে তৎপর।

প্রশ্ন—মঙ্গল কি ক'রে হবে?

উত্তর—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই সুবিধা হ'বে। যে ব্যক্তি নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, তার মঙ্গল হয় না। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত কর্‌তে হ'লে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করা দরকার। ভক্তব্রুবের সঙ্গদ্বারা মঙ্গল হ'বে না।

কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত সবই অসুবিধা, সবই অমঙ্গল। ধর্ম্ম-কামনা, অর্থ-কামনা, কামিনী-কামনা, প্রতিষ্ঠা-কামনা ও মোক্ষ-কামনা—এগুলি ভক্তি নয়। প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে—প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণের সেবা হয়, তবেই তা' ঠিক হ'ল, তাতেই মঙ্গল হ'বে।

সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের চিত্তে যদি আলস্য, কপটতা ও অন্য অভিলাষ থাকে, তা' হ'লে সেরূপ সাধু বা গুরুই মিল্‌বে। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়েই বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হ'বে। ভাগ্য ভাল হ'লে কৃষ্ণকৃপায় নিশ্চয়ই এরূপ সদ্‌গুরু মিল্‌বে।

দুশ্চরিত্র লোক হরিকীর্ত্তন বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর্‌তে পারে না। ভক্ত-ভাগবতই শাস্ত্র পাঠ কর্‌তে—হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারেন। চরিত্রহীন, অন্যাভিলাষী, দাম্ভিক ব্যক্তির মুখে হরিকীর্ত্তনামৃত বে'র হয় না। তা'রা যে-সকল কথা বলে, সেগুলি মায়ার কুহক বা বিষ। এজন্য যা'র তা'র কাছে পাঠ বা হরিকথা শুন্‌তে নাই। তা'তে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

গুরুত্যাগী ও গুরুসেবাবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। তা'রা অসৎ। তা'দের সঙ্গ কর্‌লে জীবের সর্ব্বনাশ হয়।

গুরুনিষ্ঠ ভক্তের কাছেই হরিকথা শুন্‌তে হবে। তা' হ'লে আমাদেরও গুরু-নিষ্ঠা ও হরিগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি হ'বে, হৃদয়ে দৃঢ়তা, বল ও সাহস আসবে। এরূপ নিষ্কিঞ্চন গুরুনিষ্ঠ ভক্তের কাছে হরিকথা শ্রবণ কর্‌লে তাঁর সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, এই সুবিচার আস্‌বে। তখন নির্ব্বিশেষবাদ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ সব তুচ্ছ বোধ হ'বে।

কৃষ্ণাশ্রয়ই একমাত্র মঙ্গল। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই।

ভগবানের ভক্তগণ মানবের উপকারের জন্য এ জগতে আসেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নাই—এজগতে আস্‌বার কোন আবশ্যকতা নাই। জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে কৃষ্ণোন্মুখ করাই তাঁদের একমাত্র কার্য্য ও কর্ত্তব্য। এরূপ শুদ্ধভক্তের সঙ্গই মঙ্গলপ্রদ।

প্রঃ—কি করে সাধুকে চিনবো?

উঃ—আমরা অনেক সময় সাধুকে মেপে নিতে চাই। সাধুর সেবাময় ক্রিয়াকলাপ বুঝ্‌তে না পেরে তাঁকে Reject (নাকচ) ক'রে দিই, যেন আমি তাঁর Examiner (পরীক্ষক)। আমি কোন্ যন্ত্র দিয়ে সাধুকে দেখ্‌ছি? অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈন্য ও আর্ত্তি নিয়ে সাধুর কাছে যেতে হয় এবং শরণাগত হয়ে তাঁর সঙ্গ কর্‌লে তাঁর কৃপায় তাঁকে জানা যায়। অন্যভাবে সাধুকে চেনা যায় না। নিষ্কপট হ'য়ে সাধুর নিকট হরিকথা শুন্‌লে আমাদের সমস্ত অসুবিধা কেটে যায় এবং হৃদয়ে প্রচুর বল আসে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (গীতা ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি নিয়ে ভগবত্তত্ত্ববিৎ সাধুর নিকট গেলে সাধু ভগবদ্ভজনেচ্ছু প্রণত সজ্জনকে উপদেশ প্রদান করেন।

প্রণিপাত মানে—Unconditional surrender, পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ Honest enquiry, সেবা-প্রবৃত্তি অর্থাৎ Serving temper নিয়ে সাধুর কাছে যেতে হবে, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—আমরা ভগবজ্-জ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'তে পার্‌ব।

প্রঃ—বিষয়ী কে?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

উঃ—যিনি নিজের সুখের জন্য বিষয় সংগ্রহ করেন, বিষয় যাঁহার ভোগের যন্ত্র বা উপকরণ, তিনিই বিষয়ী। কিন্তু যিনি ভগবানের সেবার জন্য বিষয় সংগ্রহ করেন, তিনি বিষয়ী নহেন, তিনি ভগবৎসেবক ভক্ত। ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ভোগী বা ভক্ত চেনা যায় না, উদ্দেশ্য দেখিয়া তাহা বুঝা যায়।

যিনি নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভোজন করেন, তিনি ভোগী ; কিন্তু যিনি ভগবৎ-সেবার্থ শরীর রক্ষা করেন এবং তজ্জন্য ভোজন করেন, তিনি ভক্ত।

ভক্ত ভোগীও ন'ন ত্যাগীও ন'ন। ভক্ত হলেন ভগবৎ-সেবক। ভক্ত অর্থ, বিষয়, জাগতিক সকল দ্রব্যকেই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। (ক্রমশঃ)

কামভোগ ভক্তির অন্তরায়

অন্ধ ভিখারী পথ ভুল করি' প্রবেশিল বদ্ধ ঘরে ।
একটী মাত্র যাহার দরজা বাহিরে যাওয়ার তরে ॥
অন্ধকার সেই ঘরের ভিতরে ডাঁশ-মশা ভরপুর ।
তাদের কামড়ে ভিখারী হইল অতীব ব্যথাতুর ॥
তিন দিন পেটে কিছু পড়ে নাই, তা'তে পুনঃ দংশন ।
দুঃখে তাহার শরীর হইতে ছেড়ে যেতে চায় প্রাণ ॥
বাঁচিবার তরে ভিখারী চাহিল ঘরের বাহিরে যে'তে ।
হাঁটিতে লাগিল দেওয়াল ধরে তাই সে যে কোনমতে ॥
দরজার কাছে আসিয়া তাহার চুলকানি শুরু মাথে ।
সেই চুলকানি কণ্টক হল বাহিরে যাওয়ার পথে ॥
পুনঃ সে করিল বহুত চেষ্টা ঘর থেকে বের হ'তে ।
পূর্ব্বের ন্যায় চুলকানি তাহারে বাহিরে না দেয় যেতে ॥
কতবার সে যে ঘুরপাক খেল হিসাব নাহিক তার ।
দেহের ক্ষমতা শিথিল হইলে চুলকানি থামে হায় ॥
'কে আছে বাঁচাও' বলিয়া ডাকিল দরজার কাছে আসি' ।
বাঁচাতে তাহারে এক আগন্তুক প্রবেশিল গৃহে হাসি' ॥
হস্তে তাঁহার লণ্ঠন জ্বালা বদনে অপূর্ব্ব জ্যোতি ।
ভিখারীকে ল'য়ে বাহিরে আসিল ঘুচাইয়া তার ভীতি ॥
মায়ান্ধ জীব ভিখারী হইল কৃষ্ণরূপ ধন ত্যজি' ।
মায়া-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া জড়সুখে রয় মজি' ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

মশা-ডাঁশরূপ স্ত্রী-পুত্রাদি সব দংশয়ে অবিরত ।
দুঃখে কাতর হইয়া যে জীব ব্যথা পায় মনে কত ॥
মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে যে চায় মুক্তি পে'তে ।
যাহা শুধু মেলে অত্যন্ত দুর্ল্লভ মনুষ্য জনমেতে ॥
মানব জনম লাভ করে জীব আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি' ।
ভজন-পথের কণ্টকস্বরূপ কামরূপ চুলকানি ॥
মনুষ্য জনম ব্যয় করে নর বৃথা শুধু কামভোগে ।
গোবিন্দের দাস হইয়াও সে যে গোবিন্দে নাহিক সেবে ॥
বহুত যাতনা পাইয়া সে শেষে ডাকয়ে কাতর স্বরে ।
"কে আছ কোথায়, মায়াকূপ হ'তে উদ্ধার করহ মোরে ॥"
কৃপাবারি ল'য়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে আসেন তথা ।
ভিখারীকে দিল কৃষ্ণপ্রেমধন ঘুচাইয়া অজ্ঞানতা ॥
গুরুকৃপা-ফলে ভিখারী লভয়ে ধন মহামূল্যবান্ ।
দিব্যজ্ঞান লভি' প্রেমের সাগরে অবিরত করে স্নান ॥
তাই বলি মন গুরুর চরণ সততই কর ধ্যান ।
মরণের ভয় আর না রহিবে—পাইবে অভয়-স্থান ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত শ্রীপত্রিকার দেয় ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত ভিক্ষা এবং আগামী ৫৬শ বর্ষের ভিক্ষা বর্দ্ধিত (৫০ টাকা) হারে প্রদান করিয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে প্রদান করিতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রকৃত শিষ্য

শ্রীরামানুজাচার্য্যের নাম ছিল লক্ষ্মণ। তিনি পরম বৈষ্ণব কাঞ্চিপূর্ণের উপদেশে শ্রীবরদরাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের কথা শ্রীরঙ্গমে দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্য অবগত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি বরদরাজ দর্শনমানসে কাঞ্চিপুরীতে আগমন করিলে সেখানে লক্ষ্মণকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং বুঝিলেন যে, এই ভক্তটী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক হইবেন। কিছুদিন পরে শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার শিষ্য শ্রীপূর্ণাচার্য্যকে শ্রীরঙ্গম্ হইতে কাঞ্চিপুরী পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য—শ্রীলক্ষ্মণকে স্বীয় মতে আনয়ন করা। পূর্ণাচার্য্য শ্রীবরদরাজের নিকট যামুনাচার্য্য-রচিত স্তোত্ররত্ন পাঠ করিতেছিলেন। সেই স্তোত্ররত্ন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীযামুনাচার্য্যের দর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পূর্ণাচার্য্যের সঙ্গে তিনি শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহারা শ্রবণ করিলেন যে, শ্রীযামুনাচার্য্য অপ্রকট-লীলাবিষ্কার করিয়াছেন। অপ্রকট-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীযামুনাচার্য্যের অপ্রাকৃত কলেবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন শ্রীযামুনাচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলি সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। পরম ধী-শক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী পরম ভাগবত লক্ষ্মণ উহা দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, নিশ্চয়ই যামুনাচার্য্যের তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি উহা অবগত হইয়া তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূরণকল্পে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—

(১) আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে জীবকে পঞ্চসংস্কার করাইব এবং আম্নায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিব।

(২) জগতের মঙ্গলের জন্য আমি বেদান্ত সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব।

(৩) আমি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের অভিধান নির্ম্মাণ করিব।

যখন লক্ষ্মণ এই তিনটী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীযামুনাচার্য্যের তিনটী আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন সমুপস্থিত সকলেই লক্ষ্মণের অলৌকিক প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন যে,—এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষক হইবেন।

যাহা হউক লক্ষ্মণ তথা হইতে কাঞ্চিপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন এবং

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে তাঁহার গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের স্ত্রী জামাম্বা স্মার্ত্ত বিচারপরায়ণা ছিলেন। তিনি ইহাতে বাধ সাধিলেন। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কি আর করিবেন, লক্ষ্মণ মহা অস্বস্তিতে পড়িলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কাঞ্চিপূর্ণকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার সতীর্থ মহাপূর্ণই তাঁহার গুরু হইবার যোগ্য বলিলেন। তাঁহার এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পথিমধ্যেই মহাপূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি মহাপূর্ণ বা পূর্ণাচার্য্যের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সমূহ বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী মহাপূর্ণ পঞ্চসংস্কার করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তিনি সপরিবারে কাঞ্চিপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন মহা বিপত্তি ঘটিল। লক্ষ্মণের স্ত্রী জামাম্বা বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন। পূর্ণাচার্য্যের স্ত্রী ও জামাম্বা উভয়েই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছিলেন। জল তুলিতে গেলে দড়ি ও বালতির প্রয়োজন হয়। জল তুলিবার সময় পূর্ণাচার্য্যের স্ত্রীর দড়ি হইতে কয়েক ফোঁটা জল জামাম্বার কলসীতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি গুরুপত্নীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিলেন। ইহাতে পূর্ণাচার্য্যের স্ত্রী অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পতিকে সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া পূর্ণাচার্য্য আর কাঞ্চিপুরে অবস্থান করা উচিত নয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তৎক্ষণাৎ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ আসিয়া দেখিলেন, গুরুদেব নাই। তিনি পরম্পরাক্রমে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিণী আপন পত্নীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন এবং উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিলে লক্ষ্মণ-পত্নী তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত সেই ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার নিকট পত্নীর দুর্ব্যবহারের কথা জানাইলে লক্ষ্মণ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণটীকে শিখাইয়া দিলেন যে,—"আপনি আমার গৃহে গিয়া আমার স্ত্রীকে বলিবেন,—আমি আপনার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি। আপনার ভাইয়ের বিবাহ। তজ্জন্য আপনাকে লইতে আসিয়াছি।" লক্ষ্মণের শিক্ষামত ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের গৃহে গিয়া তাঁহার পত্নীকে এইরূপ বলিলে জামাম্বা আহ্লাদে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে খুব আদর-যত্ন করিয়া আহারাদি করাইলেন। লক্ষ্মণ গৃহে আসিলে তিনি সেই ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জানাইলেন এবং ভাইয়ের বিবাহোপলক্ষে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি

প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ সানন্দে তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ অনেক মূল্যবান্ স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থাদি প্রদান করিলেন। জামাম্বা ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ ইহা বরদরাজের অশেষ অনুকম্পা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন এবং বরদরাজের অভয় পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক কায়-মন-বাক্য দণ্ডিত করিয়া অনন্ত সরোবরের তটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল 'রামানুজাচার্য্য'। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। তাঁহার ভাগিনেয় দাশরথি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য হইলেন "কুরেশ" (আলওয়ান)। তাঁহার বেদান্ত পঠনের শিক্ষাগুরু যাদবাচার্য্য যিনি অসূয়াবশতঃ তাঁহার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি অনুতপ্ত হইয়া পাপস্খালনের মানসে তাঁহার নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নাম হইল গোবিন্দদাস।

শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের অভীপ্সিত ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। তাঁহার যশ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মহাপূর্ণ তাঁহাকে যাবতীয় শাস্ত্র অর্পণ করিয়া দিলেন, এমন কি তাঁহার নিজপুত্র পুণ্ডরীকাক্ষকে রামানুজের শিষ্য করাইলেন। মহাপূর্ণের নিকট রামানুজাচার্য্য জানিতে পারিলেন যে, গোষ্ঠীপুর-গ্রামে গোষ্ঠীপূর্ণ-নামে শ্রীরামানুজাচার্য্যের একজন শিষ্য আছেন। তিনি মন্ত্ররহস্য অবগত আছেন এবং তত্ত্ববেত্তা। ইহা শুনিয়া তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া মন্ত্ররহস্য প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে প্রথমে গোষ্ঠী-পূর্ণ অসম্মত হন। শত প্রার্থনাসত্ত্বেও তাঁহাকে অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু রামানুজাচার্য্য ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে তাঁহার অশেষ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ভজনচাতুর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাকে মন্ত্ররহস্য প্রদান করিলেন এবং সাবধান করিয়া বলিলেন যে, তিনি যেন কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ না করেন। রামানুজ চিন্তা করিলেন,—প্রভু কেন নিষেধ করিলেন? তবে নিশ্চয়ই এই মন্ত্রের জগন্মঙ্গল করিবার অসামান্য বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ৭৪ জন শিষ্যকে ডাকিয়া সেই মন্ত্র তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন এবং উচ্চৈঃ-স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলকে দীক্ষা দিলেন। এই সংবাদ গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণ-গোচর হইল। তিনি রামানুজাচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামানুজাচার্য্য আসিলে তিনি তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও কেন মন্ত্র প্রকাশ করিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন এবং ইহাতে তাঁহার অবশ্যই নরক গমন হইবে বলিলেন। রামানুজাচার্য্য করযোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন,—"প্রভো! আমি একজন নিতান্ত সাধারণ ঘৃণিত ব্যক্তি।

আপনার প্রদত্ত জগন্মঙ্গলকর মন্ত্ররাজ গ্রহণ করিয়া যদি জগতের উপকার হয় এবং জগতের জীব ভব মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া রক্ষা পায়, তাহা হইলে আমি অনন্তকাল নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছি।" তাঁহার এইকথা শুনিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি রামানুজকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"তুমি ধন্য। তুমি জগতের প্রকৃত বান্ধব এবং জগন্মঙ্গলকারী মহাত্মা। তুমি জয়যুক্ত হও।" গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহার নিজপুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য করাইলেন।

এক সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থদর্শন তথা শ্রীতিরুপতি বালাজী দর্শনোদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পথিমধ্যে অষ্টসহস্র-নামক গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার যজ্ঞেশ ও বরদাচার্য্য-নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন। যজ্ঞেশ ধনী ; কিন্তু বরদাচার্য্য অত্যন্ত গরীব, বহু কষ্টে কোনরকমে দিনাতিপাত করেন। রামানুজাচার্য্য শিষগণসহ সদলবলে বরদাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে-সময় বরদাচার্য্য গৃহে ছিলেন না। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী গুরুদেবকে সশিষ্যে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি যে কি করিবেন, কিভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। স্বামীও গৃহে নাই, আর গৃহেও কিছুই নাই যে গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদিগের সেবার ব্যবস্থা করেন।

লক্ষ্মীদেবী পরমা সুন্দরী ছিলেন। সেইস্থানের এক বণিক তাঁহার প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সতী-সাধ্বী লক্ষ্মীদেবীকে পাওয়ার কোনও আশাই ছিল না। লক্ষ্মীদেবী চিন্তা করিলেন—গুরুসেবার জন্য তাঁহার সতীত্ব যায় যাউক্। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বণিকের নিকট গিয়া সমস্ত বলিলেন এবং গুরু-বৈষ্ণবসেবার সেবোপকরণ দ্রব্যসামগ্রী প্রার্থনা করিলেন। তিনি বণিককে বলিলেন যে,—গুরু-বৈষ্ণবসেবা সমাপন করিয়া নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আসিবেন। বণিক বরদাচার্য্যের গৃহে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন। লক্ষ্মীদেবী চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ খাদ্য রন্ধন করিয়া ভগবান্‌কে ভোগ নিবেদন করিলেন এবং গুরু-বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইলেন। বরদাচার্য্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুসেবার এইপ্রকার বিপুল আয়োজন কি-প্রকারে হইল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পত্নী লক্ষ্মীদেবী অকপটে সমূহ ঘটনা বলিলেন। বরদাচার্য্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী-দেবীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই এবং তিনিও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন বলিলেন।

তিনি পত্নীকে যথাসময়ে সেই বণিকের গৃহে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু বণিক লক্ষ্মীকে 'মাতৃ'-সম্বোধন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। সাধুসঙ্গের ইহাই প্রকৃত ফল। জীবের যদি ক্ষণকালও সাধু-গুরুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহার অনন্তকালের পাপপ্রবৃত্তি সমূলে বিনাশ হইয়া যায় এবং ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়।

যাহা হউক, শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট মায়াবাদী সন্ন্যাসীও পঞ্চসংস্কার গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যজ্ঞমূর্ত্তি-নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও মায়াবাদী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট পঞ্চসংস্কার গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল "দেব মন্নাথ"।

এইভাবে বহু জ্ঞানী-গুণী, রাজা-মহারাজা, দীন-দরিদ্র, আর্ত্ত তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য 'শ্রী'-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ"-নামে পরিচিত।

—**শ্রীহরিদাস রায়**, ভক্তিশাস্ত্রী

স্বতন্ত্রতা

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে যতপ্রকার দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন দানের সঙ্গে কোনটিরই তুলনা হয় না। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম জীবকে স্বতন্ত্রতা দান করিয়া তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জীবে স্বতন্ত্রতা না থাকিলে জীব ও জড়ে কোনই পার্থক্য থাকিত না। স্বতন্ত্রতাই জীবের জীবত্ব, জীবন্ বা অস্তিত্ব।

স্বতন্ত্রতা জীবের জীবন বলিয়াই জীবমাত্রেই স্বতন্ত্রতার প্রার্থী। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীব মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বতন্ত্রতার লোভটি ছাড়িতে পারে নাই। বদ্ধজীবও স্বতন্ত্রতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। স্বতন্ত্রতা লাভের জন্য জীব প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হয় না। অধীনতা-হীনতায় কেহই প্রাণ ধারণ করিতে চাহে না, দাসত্বের শৃঙ্খল কেহই পায়ে পরিতে চাহে না।

বদ্ধজীব প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কতটুকু স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? আর তাহাদের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার ধারণাটাই বা কতটা নির্ম্মল? বদ্ধ-দশায় কি কেহ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? বদ্ধদশার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা কি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরাধীনতা বা রিপুবশবর্শিতা নহে? ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, রিপুর বশীভূত, মায়ার কারাগারে চিরবদ্ধ, ত্রিতাপে তপ্ত, কর্ম্মফলে বাধ্য থাকিয়া কি কেহ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে? চিড়িয়াখানার গাধাকে খুব বিস্তৃত লৌহ-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

বেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। যদি সেই গাধা মনে করে যে, তাহার পিঠে যখন বোঝা চাপান হয় নাই, তাহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সে প্রকৃতই স্বাধীন, মুক্ত।, তাহা যেরূপ গর্দ্দভজাতীয় বুদ্ধি, তদ্রূপ যাহারা বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্যে হরিসেবা করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হয় ও নানা মনোধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়ে, তাহাদের বুদ্ধিও সেইরূপ ভারবাহী পশুরই ন্যায়, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়। তাহাদের হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য বর্ণাশ্রমেও অবস্থিতি সম্ভব হয় না। তাহারা স্ব-স্ব বর্ণাশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত ও ষড়্রিপুর জেলখানার কয়েদী হইয়া পড়ে।

আমরা অনেকেই মঠবাসী হইবার অভিনয় করি ; কিন্তু আমার মতলব সিদ্ধ না হইলেই অর্থাৎ মঠ বা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কিছু আদায় করিতে না পারিলেই মঠ ত্যাগ করিব—স্বাধীনভাবে বিচরণ করিব,—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া পড়ি। "যদি কিছু আদায়ই করিতে না পারিলাম—কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আকারে, তবে মঠে বাস করিয়া কি লাভ? সংসার ছাড়িয়া কি লাভ? বৈষ্ণবের অধীন (?) থাকিয়াই বা কি লাভ?"—আমাদের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই উপস্থিত হয়। আবার কেহ কেহ মনে করি, যখন মঠবাস করিয়া স্বতন্ত্রতার উদয় হয়, তখন গৃহে বাস করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ গৃহব্রত হইয়া যে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার পিপাসা বা স্ত্রী-পুত্রের নিকট আরাম বা সেবা উপভোগের বাসনা—এইগুলি সমস্তই রিপু-বশবর্ত্তিতা। রিপুর অধীন হইয়া পড়িলেই মানব বৈষ্ণবের আনুগত্য অপেক্ষা ভোগ বা ত্যাগ-পিশাচীর, ঘর-পাগলামী ও বাহির পাগলামীর স্বতন্ত্রতাকে বহুমানন করিবার দুর্ব্বুদ্ধির নিকৃষ্ট অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

"সুখের লাগিয়া,　　যে ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।।"

গুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত পরমেশ্বরের প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা-মহারত্নের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণবের যতটা শরণাগত না হইব, যতটা স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিব, আমরা ততটাই অচেতনতা লাভ করিব। মহতের চরণে অপরাধ, আনুগত্যের অভাব, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই অচেতনতা।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী, যাঁহারা সত্য সত্যই অকপটে হরিভজন-পিপাসু, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, যখনই আমরা গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত না হইয়া কোনও না কোনও প্রকারে স্বতন্ত্র থাকিয়া হরিসেবা, হরিকথা-প্রচার, হরিকীর্ত্তন, ভিক্ষা, মঠবাস, গৃহবাস বা যে কোনও কার্য্য করিতে চেষ্টা করি, তখনই

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

মায়াপিশাচী নির্ম্মল স্বতন্ত্রতা-মহারত্নকে আবৃত করিয়া ফেলে, আমাদিগকে নানাপ্রকার অনর্থ ও অন্যাভিলাষের দাস করিয়া ফেলে। ইহা আমরা যে-পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারি, বুঝিতে পারিয়াও তাহা হইতে বিশেষ সতর্ক না হই, সে-পর্য্যন্ত আমাদের দুর্দ্দৈব ও অপরাধ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

অনেক সময় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু-বৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিতে গেলে গুরু-বৈষ্ণবের স্বতন্ত্রতা মানিয়া লইতে হয় ; গুরু-বৈষ্ণব যদি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইতে পারিলেন, তবে আমরা কেন অস্বতন্ত্র বা অধীন তত্ত্ব থাকিব! আমরাও গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সমান হইব। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা আপাত সমর্থিত হইলেও ইহা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়াপরতন্ত্র করিয়া থাকে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সমান পদবীতে আরোহণের চেষ্টা ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষে সাধন ও সাধ্য বলিয়া গণিত হয়। তাহাই অহংগ্রহোপাসনা, তাহাই পাষণ্ডতা, অসুরত্ব। বস্তুতঃ—

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।"

গুরু-বৈষ্ণবের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইল? তাঁহারা পূর্ব্ব-গুরু, আচার্য্য বা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত, প্রপন্ন বলিয়াই তাঁহাদের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত শিষ্য না হইয়াছেন, তিনি কোনও দিন বৈষ্ণব ও গুরু হইতে পারেন না। যিনি তাঁহার সর্ব্ব-স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুরু ও বৈষ্ণব। কাজেই গুরু বা বৈষ্ণব কখনও 'আমি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সুতরাং সকলের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, নিগ্রহ-অনুগ্রহ কর্ত্তা'—এইরূপ দাম্ভিকতাময়ী ভোক্তৃ-অভিমানে কবলিত হইয়া অপরের প্রতি প্রভুত্বকামী হন না। যাহার ঐরূপ বিচার, সে ব্যক্তি মায়ার অধীন, তাহাকে কখনও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র গুরু বা বৈষ্ণবের আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রভু হইতে পারিলে আমাদের যতটা উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কর্ম্ম-তৎপরতা প্রকাশিত হয়, গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেরূপ উৎসাহ হয় না। আনুগত্য করিতে হইবে চিন্তা করিলেই যেন মনমরা হইয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? চেতনের প্রতি বিমুখতা ;—আমরা চেতনতা চাহি না—অচেতনতা বা বহির্ম্মুখতাকেই আদর করি। অন্যাভিলাষ বা কাম চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাদের উৎসাহ হয়, কিন্তু কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। এইগুলি সকলই অনর্থ—দুর্দ্দৈব। গুরু-বৈষ্ণবের চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কপাল কুটিয়া এই সকল দুর্দ্দৈবের কাহিনী নিষ্কপটে জানাইতে

হইবে, শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের মনঃশিক্ষা অন্তরে মিশাইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুধ্যান করিতে করিতে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ঐরূপ অসতী স্বতন্ত্রতার মায়া হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্কল্প পরিত্যাগ, ভজনের যাবতীয় অনুকূল বিষয়সমূহ স্বীকার করিয়া ঐ মায়াটিকে বিতাড়িত করিতে হইবে। হরিভজন করিতে আসিয়া অসতী স্বতন্ত্রতার সঙ্গলিপ্সু যেন না হই। ভাগবত-ধর্ম্মের—হরিভজনের মূল কথা গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য, ইহা যেন এক মুহূর্ত্তে চিন্তায়ও পরিত্যাগ না করি। যখনই দুষ্ট মন আনুগত্যের প্রতি বিপ্লবী হইতে চাহিবে, তখন দুষ্ট মনকে বৈষ্ণবের পাদত্রাণ দিয়া সহস্র সহস্রবার শাসন করিতে হইবে, বহির্ম্মুখগণের স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখের কথা চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্ম্মুখ স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখ ও শরণাগত জীবনের সৌন্দর্য্য জানাইবার জন্য শরণাগতিকে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কত উপদেশ দিয়াছেন।

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে।।"

—শ্রীল ঠাকুরের এই কয়েকটি কথার মধ্যে কিরূপ জীবনসমস্যার বাস্তব (Practical) সমাধান (Solution) রহিয়াছে।

পরমমুক্তপুরুষগণ, মুক্তগণেরও গুরুবর্গ—কেহই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য-রাহিত্য বা স্বতন্ত্রতাকে কামনা করেন না—বৈষ্ণবের আনুগত্য-বিহীন জীবনের ন্যায় দুর্ভাগ্য যেন কাহারও—অতিবড় শত্রুরও উপস্থিত না হয়—স্বতন্ত্র-জীবনের ন্যায় এরূপ অভিশপ্ত জীবন আর কিছুই নাই।

ব্রজবাসিগণ পরমমুক্ত হইয়াও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য অধীনতারই কাঙ্গাল। পরমমুক্ত শ্রীরূপানুগগণও শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মের আনুগত্যই কামনা করেন।

"চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে।।
অঘবক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুঁহু গোকুল কান।।
রক্ষা করবি তুঁহু নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি।। ইত্যাদি (শরণাগতি ২৩)

কেবল মুখে অভিনেতার ন্যায়,—

"সর্ব্বস্ব তোমার,　　চরণে সঁপিয়া,
প'ড়েছি তোমার ঘরে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে।।"

—প্রভৃতি সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া কাজের বেলায় তদ্বিপরীত আচরণ করিলে বা কিছুদিন আনুগত্য করিয়া দেখা গিয়াছে, উহা আর ভাল লাগে না—এখন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করা যাউক্, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির কবলে কবলিত হইলে স্বাধীনতা ত' লাভ হইবেই না, বরং যতটুকু মঙ্গলের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব—মায়ার নিগড়ে অধিকতর বদ্ধ হইয়া পড়িব। শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই, পথ নাই, আশ্রয় নাই, স্থান নাই।

'পুরুষাভিমান' অর্থাৎ অহংমম বুদ্ধিই আনুগত্যহীনতার মূল। গুরু-বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ শাসনে শাসিত না হইলে স্বতন্ত্রজীবনের দুষ্ট-কামনার বীজ বিনষ্ট হয় না। গুরু-বৈষ্ণবের শাসনই তাঁহাদের কৃপা, সেই শাসনকে মঙ্গলময় বলিয়া বরণ ও তদনুযায়ী জীবনকে নিয়মনই সেই কৃপা-বরণ। জড়-পদার্থবৎ হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের শাসনমাত্র শুনিলাম, অথচ তদনুযায়ী জীবনযাপনে মনোযোগী ও তৎপর হইলাম না, তদ্দ্বারা কোনও মঙ্গল হইবে না।

বাস্তব হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে সচেতন থাকিতে হইবে, অচেতন, ভগ্নোৎসাহ, মনমরা, স্বতন্ত্র-বিচারপরায়ণ, আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, গুপ্ত সমালোচক মনে ও কার্য্যে অসৎসঙ্গের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সিদ্ধান্তে আলস্যপরায়ণ হইলে আনুগত্যপূর্ণ জীবনকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক বলিয়া মনে হইবে ও তৎপরিত্যাগের জন্য নানাপ্রকার কপটতার আশ্রয় করিতে হইবে।

স্বতন্ত্রতায় স্থায়ী সুখ নাই, অশোক ও অভয় হইবার কোন আশা নাই। স্বতন্ত্রতা আলেয়ার ন্যায়—মরীচিকার ন্যায়, মায়াবীর ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ দুঃখের সমুদ্রে পাতিত করিয়া জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপক্লেশে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ স্বতন্ত্রতার আপাতমায়ায় মুগ্ধ হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতির একমাত্র রাজকীয় সুনিশ্চিত নিত্যমঙ্গলের পথ যেন পরিত্যাগ না করি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে
শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
[অনুভাষ্য, অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অমৃতানুকণা-ভাষ্য-সহ]

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩১ পৃষ্ঠার পর]

গুরুবর্গের কঠোর বাণী আপাতদর্শনে কর্কশ মনে হলেও কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কোন অপস্বার্থ নাই তাঁর। দুর্ভাগা আমি, হতভাগা আমি, আমিও ঠিকপথে যাতে চলতে পারি, সেইজন্যই তাঁদের স্নেহশাসন কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর। এটা আমাদের বুঝ্‌তে হবে। আমি গুরু হয়ে বসে গেলাম, সবাই আমাকে পূজা করুক, সবাই আমাকে সেবা করুক—এটা নরকে যাবার পথ! প্রত্যেকটী সেবককে আমি যদি আমার গুরুবর্গের মহিমা প্রচারকারী বা তাঁর নিজজন—এই বলে আমি না ভাবতে পারি, চিন্তা করতে না পারি, তাহলে আমার সবটাই পণ্ডশ্রম। এর নাম হল গুরুতত্ত্ব। তাঁর কখনও অহঙ্কার নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যাচ্ছেন, এক ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হয়েছে সারা গায়ে, তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গেল। তখন তিনি বলছেন প্রভু,—তুমি এ কি করলে? এখন আমার অহঙ্কার এসে যাবে। মহাপ্রভু বললেন,—তোমার অহঙ্কার কোনদিন আসেনি, আর আসবে না। কি বললেন তিনি?—

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ।।

এটাই মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন। জড়বদ্ধ জীবের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদ্-আপদ্ যা কিছু আছে, সবটা আমাকে দিয়ে দাও এবং পরিবর্ত্তে তুমি এদের সবাইকে নিজের বলে মনে কর। এদের মুক্তি দাও, ভক্তি দাও। তাহলে সাধু কেমন দয়ালু, কেমন কৃপালু? সবাই ভাবে দু'চার দিন খাবার-দাবার পেলাম ; অসুখ হয়েছে, দু'চার দিন কিছু ওষুধ পেলাম, থাক্‌বার জন্য কিছু ঘর পেলাম, হয়ে গেল কি সব? যারা ভোগের চরমে আছে, তারা কেন বলছে Peace, peace—শান্তি, শান্তি।

গতকাল একজন এই কথাটা বলছিলেন আমার কাছে। আমি তাকে বললাম, আপনি শান্তি চান, আপনার শান্তিটা কিরকম শুনি? আমার শান্তি একরকম, আর পাঁচজনের শান্তি আর একরকম। সংসারে দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদ্-আপদ্ যত আছে, সব দিয়ে দাও ঠাকুর আমাকে। কেন?—তাহলে তোমাকে স্মরণ করতে পারব আমি। আর যদি আমি খুব ভোগবিলাসে থাকি, তাহলে তখন ত' সব ভুলে যাব। সেজন্য প্রকৃত ভক্ত যাঁরা, তাঁরা জাগতিক যে ভোগসুখ, সেটা কখনও চাচ্ছেন না। যে অবস্থায় থাকি না কেন ঠাকুর, আমার কর্ম্মফল যদি খুব খারাপ হয়, তাহলে তোমার কাছে প্রার্থনা,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্ম পাশানুবদ্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।।

আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, তোমার নাম যেন সর্ব্বদা করতে পারি। আমার কর্ম্মফল খারাপের জন্য তোমাকে আমি ডাকি না, তোমাকে ভালবাসি না। আমি তোমাকে বাস্তবে জীবাত্মার যে স্বরূপ—ভগবানকে ভালবাসা, সেইভাবেই তোমাকে ভালবাসতে চাই। জাগতিক বিষয়-আশয় আমি কিছুই চাই না। মুক্তি চাই না। কেন? মুক্তি যদি তুমি দিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে ভুলে যাব। তাতে ত' আমার ক্ষতি হল। যা চাইব, তা ত' তুমি দিয়ে দেবে। আবার যদি কেউ সত্যই শরণাগত, সমর্পিতাত্মা হন, তার জন্য ভগবানের Discretion আছে, বাছাবাছি আছে—সেকথাও শাস্ত্রে বলা আছে।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।

এও ভগবানের পরীক্ষা। আবার পরীক্ষা যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন তিনি বলছেন,—

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।

তাহলে দেখুন, ভগবানের ত' দুটোই আছে। আমরা যে ভগবানের কাছে চাচ্ছি ইহজগতের সবকিছু—কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ আমাদের এখানকার জিনিষ সব চাওয়ার স্বভাব। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত যাঁরা, তাঁরা কখনও ওসব চাচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন,—ঠাকুর, আমার যেন কল্যাণ হয়, আমার মনটা যেন সবসময় তোমার চরণ চিন্তা করে, তুমি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আমি আর কিছু চাই না তোমার কাছে। এটুকু আমার বক্তব্য। আমার সে সামর্থ্য নাই, ক্ষমতা নাই, তুমি দয়া করে দিয়ে দাও, আমি সেইমত চলব। এ সংসারের কোন কিছু চাই না।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরস্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।

দেখুন কি প্রার্থনা। গুরুবর্গের এটাই বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ। বদ্ধজীব আমরা অনেক কষ্ট পাচ্ছি, নানারকম ধরণের অসুবিধায় আছি। তাঁরা বলছেন,—কৃষ্ণের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

চরণ চিন্তা কর, সব অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। বহুদিন ধরে অনেকে ভুগছেন ; কিন্তু ঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বলছেন,—দেখ, যে ভীষণ অসুস্থ—শয্যাশায়ী, বাঁচার আশা কম, সে লোকটার জন্যও ভগবান্ চিন্তা করছেন।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

এই কলির মানুষ যারা, কলির প্রভাবে পড়েছেন যারা, সব শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছে সে, তথাপি একবার কৃষ্ণনাম করতে চায় না; করবে না—এইটাই হল তাদের সবথেকে বড় দোষ, এইটাই হল তাদের সবথেকে বড় দুর্দ্দৈব!

আজ থেকে দামোদর-ব্রত আরম্ভ হচ্ছে। এ ব্রত তিনমাস পূর্ব্বে আরম্ভ হয়েছে। এর নাম হল চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত। আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরাও এই ব্রত করেছেন। স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গিয়েও ভট্ট-গৃহে এই ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। বহু লোকের ধারণা, অত কষ্ট কি করা যায়! চারমাস ধরে ব্রত পালন কি করা সম্ভব? আমরা একমাসই করব। তাঁরা এটা কোথা থেকে বলছেন? চৈতন্যমহাপ্রভু নিজে এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেছেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ তাঁরা এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেছেন। মুনি-ঋষিগণ এই ব্রত পালন করেছেন। সেখানে আমরা কি এমন বড় বাহাদুর যে, তাঁদের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ আমরা অস্বীকার করব, অমান্য করব?

তিন মাস চলে গেছে, আজ পূর্ণিমা, আজ থেকে শুরু হল দামোদর-ব্রত। দামোদর ত' বাচ্চা। তার আবার কি ব্রত করব? সে আবার আমাদের কিছু করে নাকি? হ্যাঁ, সব করে। কিন্তু বাচ্চা হলেও তাঁর শক্তি ছাড়া তিনি নন। তজ্জন্য সেখানে কথাটা এসেছে—যদি দামোদরের আরাধনা করতে চাও, তাহলে রাধার সঙ্গে নিতে হবে তাঁকে। রাধাকে সঙ্গে নিতে হবে? বললেন,—হ্যাঁ। এটা স্বাভাবিক, আমাদের কোন কথা নয়। রাধাদামোদর। আকাশ প্রদীপ দিতে হচ্ছে, সেখানে রাধার সঙ্গে দামোদরের নাম করতে হচ্ছে। তাহলে শক্তিকে ছেড়ে ত' শক্তিমানের পরিচয় নাই। আবার শক্তিমানকে যদি অস্বীকার করি, কেবল শক্তিকে মানি, কথাটা ভুল হয়ে যাবে।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন কৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আর যখন লীলা করতে চাচ্ছেন সেই তত্ত্ববস্তু, তখন রাধা এবং গোবিন্দ দুই পৃথক্ বস্তুতে অবস্থিত। কিন্তু দুইই এক। এসব কথাগুলো তত্ত্বদর্শনে শিখানো আছে, গোস্বামি-গ্রন্থে, শাস্ত্রের সর্ব্বত্র বলা আছে। আমরা ত' বুঝি না এটা। শক্তি ছাড়া শক্তিমান্ নন, আবার শক্তিমান্ ছাড়াও শক্তি নন, শক্তির কোন পরিচয় নাই। ভগবান্ Supreme Authority, কিন্তু তিনি নিজে বলছেন,—দেখ, যারা শুধু আমার নাম করে, আমি তাদের পরে সন্তুষ্ট হই না। কেন? আর একজন আছে আমার, তাঁর নামও সঙ্গে করতে হবে। তা না হলে আমার নাম নেওয়া সম্পূর্ণ হবে না। রাধা সহিত বিনোদবিহারী, রাধা সহিত শ্যামসুন্দর, রাধা সহিত মদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, রাধাগোপীনাথ—কথাগুলো এইরকম আছে। বাবাকে যদি ডাকি, আর মাকে যদি অবহেলা করি, সম্মান না করি, তাহলে স্বভাবতঃই মা রাগ করবেন। শক্তি ত'। আবার উল্টোটা যদি হয়—শুধু মাকে ডাক্‌লাম, বাবাকে ডাক্‌লাম না, অসুবিধা। শিবঠাকুর পরম বৈষ্ণব, তাঁকেই ডাক্‌লাম ; কিন্তু শিবানীকে ডাক্‌লাম না, তাহলে শিবঠাকুর রাগ করবেন, করেন, আইনে আছে। দুজনকেই করতে হবে, দুজনকেই ডাকতে হবে। এ সব তত্ত্বদর্শনগুলো খুব সুন্দরভাবে বুঝানো আছে।

আজ দামোদর-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ হচ্ছে। এই কার্ত্তিক মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন রাধারাণী। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে ত' আমার ভগবানের কৃপা লাভ সম্ভব নয়। তাঁকে ভগবানের সঙ্গেই ডাকতে হবে।

নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্।।

এই ত' প্রণাম করছি আমরা। রাধারাণীকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। তাঁর একান্ত ভক্তকে বাদ দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হন না। তুমি শুধু আমাকে ডাকছ, হবে না ; আমার ভক্তের মাধ্যমে তুমি এস। আমাকে সোজাসুজি ডাকলে আমি অত ভাল পাই না। বিচারের কথা এগুলো, শাস্ত্রে আছে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।

প্রশ্নটা কে করলেন? শিবানী—পার্ব্বতী। কার কাছে? শিবঠাকুরের কাছে। আর উত্তর দিচ্ছেন শিবঠাকুর,—দেখ, তোমার বিচারটা ভুল হয়ে গেল। ভগবান্ হলেন সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব, পরম ভজনীয় বস্তু। কিন্তু তাঁর ভক্তকে বাদ দিয়ে ত' তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। এইসব কথাগুলো আপনারা শুনেছেন কি না জানি না, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে এইসকল শাস্ত্রের সার—Gist, summary সব জানিয়েছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

বহু কথা শুনলে নূতন নূতন মনে হবে ; কিন্তু নূতন কিছুই নয়, সব পুরাতন। 'পুরাণাৎ ইতি পুরাণম্'। বেদান্ত, উপনিষদের আগে পুরাণ তৈরী হয়েছে। একথা শুনলে ত' আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। বর্ত্তমানে সব তত্ত্বদর্শনটাকে একটা গণ্ডীর মধ্যে এনে কষতে চাচ্ছেন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ। জিনিষটা ত' তা নয়। ভাগবত আগে হল, না মহাভারত আগে হল? আপনারা বলবেন, মহাভারত আগে হয়েছে। কিন্তু না, ভাগবতই আগে হয়েছে। এসব কথাগুলোর প্রমাণ আছে? হ্যাঁ, আছে ত'। যত Research scholers আছেন, তাঁরা আসুন, আলোচনা করুন এসব জিনিষ নিয়ে। এসব জিনিষ ত' জানা নাই। আমাদের যে সম্পদ্ রয়েছে Hide treasure—গুপ্তধন, সে নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। সুতরাং ওটা আমাদের কাছে অপরিচিত, অনভ্যাস। এসব কথা আমাদের আলোচনা করা দরকার। গৌড়ীয় মঠ কিছু না পারুক, অন্ততঃ এটুকু কথা তাঁরা বলবেই—গুরুবর্গের কথা, ব্যাখ্যা। চিন্তা করুন, এক-আধজন লোকের দুশ-আড়াইশ গ্রন্থ দেখা সম্ভব জীবনে? সমস্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের সারসঙ্কলন করেছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি এই গারো হিল্‌সে এসেছেন, তাঁর অপ্রাকৃত জীবনীতে আমরা পাচ্ছি। তিনি সরকারী অফিসার ছিলেন। এটা তাঁর বাহ্য ব্যাপার। তাঁর কথাগুলো চিন্তা করুন, এগুলো আমাদেরই চিন্তার বিষয়। সুতরাং আমরা সহজ-সরল অন্তঃকরণ নিয়ে গুরু-বৈষ্ণবের কাছে এগোব। তাঁর আনুগত্যে মহাপ্রভুর কাছে এগোব, নিত্যানন্দপ্রভুর কাছে এগোব। তাঁদের আনুগত্যে আমরা রাধাকৃষ্ণের ভজন করব।

কোথায় যাব আমরা? মায়াদেবীর এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যেখানে থাকি না কেন বদ্ধদশা। সোনার শিকল দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তাহলে বদ্ধদশা। রূপোর শিকল দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তাহলে বদ্ধদশা। তামার শিকল দিয়ে যদি বাঁধা হয়, তাহলেও বদ্ধদশা। লোহার শিকল দিয়ে যদি বাঁধা হয় আমাকে, তাহলেও আমার বদ্ধদশা। কেন এই বদ্ধদশার মধ্যে থাকব? 'বিরজা' মানে তিনটী গুণ যেখানে সাম্যাবস্থা পেয়েছে। সেখান থেকে পেরিয়ে গিয়ে ব্রহ্মলোক, তারপরে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ অর্দ্ধেক হচ্ছে গোলোক-বৃন্দাবন। আমরা ত' সেখানে বাস করতে চাই, সুতরাং কাজটাও সেরকমই করতে হবে—সাধন-ভজন সেরকমই করতে হবে। আমি যদি এমনই করি, আমাকে যদি ভগবান্ পরীক্ষা করেন—তুমি কি চাও? আমি কিছু চাই না, দুধে-ভাতে থাকে যেন আমার সন্তান। বোকার মত কথা!

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে ।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী ।
ত্বরায় আসিল নৌকা বামাস্বর শুনি' ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আসি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত ।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা-নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥"

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শিবতত্ত্ব বলছেন তিনি। তত্ত্বদর্শনটা এইরকম। সবাই ত' মেনে নেবে Universal Truth। এর ভিতরে আমারটা বড়, তোমারটা কমা—এসব বিচারের কথা নাই। তত্ত্বদর্শনে যেটা আসবে সেটা সবাই মেনে নেবে। সেখানে কোন গণ্ডগোল নাই। আমরা ঠিক সেইভাবেই চলব।

তত্ত্বদর্শন যদি আমরা না জানি, আর না জেনে যদি এইরকম থেকে চলে যাই এ জগৎ থেকে, তাহলে আমাদের কিছুই মঙ্গল হল না। একজন মেয়ে তাঁর স্বামীর কাছে তিনি প্রশ্ন করেছেন। স্বামী কে? স্বামী হলেন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি। আর তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন গার্গী। গর্গঋষির মেয়ের নাম গার্গী, আবার যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির স্ত্রী নামও গার্গী। তিনি বলছেন,—গার্গী, তুমি তর্ক কর না। তিনি বৈদিক, বিদুষী মহিলা। বেদের বিচার হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করছেন, কে ব্রাহ্মণ? উত্তরে বললেন,—যাঁরা ভগবানের পরে পূর্ণ নির্ভরশীল, যাঁরা পূর্ণ তত্ত্বদর্শন লাভ করেছেন, তাঁরাই হলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-শব্দের উল্টোটা কি?—কৃপণ। সে কি? বললেন,—হ্যাঁ। যারা এ জগতে এল, আর চলে গেল, ভগবান্‌কে জানল না, সাধন-ভজন করল না, তারা হল কৃপণ।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ।" যিনি এ জগতে এসে আত্মদর্শন জেনে চলে যাচ্ছেন, তিনি হলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আর "য এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব কৃপণঃ।" যিনি এ জগতে এসে আত্মদর্শন না জেনে চলে যাচ্ছেন, তিনি হলেন কৃপণ। সুতরাং এ কথাটা তুমি বুঝবে। সাধন-ভজনের ব্যাপার নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব, নিকৃষ্টত্ব।

সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।।
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়।।

যত আশ্রমী এবং বর্ণী আছেন, এঁদের সকলেরই হরিভজন করা কর্ত্তব্য।

(সংবাদ-প্রসঙ্গ)

শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

বহুরূপিণী মায়ার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মিথ্যা মোহজাল দূরে অপসারিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান প্রদান করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে পৌষী কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে স্বীয় আলোকময় শ্রীপাদপদ্ম প্রকট করেন, সেই নিখিলকল্যাণময়ী তিথিবরাকে আমরা সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি। আমরা অনাদি বহির্ম্মুখ, পতিত, দুর্ব্বল, অন্ধ ও পঙ্গু জীব। গোলোক-রাজ্যের, নিত্যসেবার রাজ্যের কোন সন্ধানই আমরা এখানে পাই না। অত্যন্ত হতভাগ্য আমাদের প্রতি করুণা করিয়া আত্যন্তিক কল্যাণ বিতরণ করিবার জন্য সনাতন শ্রীগুরুপাদপদ্ম গোলোক হইতে ভূলোকে পাত্ররাজরূপে কোনও বিশেষ ভালে করুণাবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন। নিরাশ্রয়, অসহায় আমরা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য আশ্রয় লাভ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় এবং ঈশ-বৈমুখ্যবশতঃ বিপর্য্যয় ও বিস্মৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ পাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবিভাব-তিথি সেইজন্য আমাদের আদরের বস্তু। বর্ষে বর্ষে এই তিথি শুভাগমন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন। ভজনবলদাত্রী এই তিথি আমাদের নিত্যকাল কীর্ত্তনমুখে বরণীয়া, অর্চ্চনীয়া ও স্মরণীয়া।

প্রপঞ্চে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব নিত্য। কিন্তু প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াও তিনি প্রপঞ্চের ক্ষুদ্র স্থান, কালের অন্তর্গত পাত্রবিশেষ নহেন। শ্রীগুরুদেব ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্য গোলোকবাসী, নররূপে প্রকটিত হইয়াও নরোত্তম, অর্থাৎ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সর্ব্ব রসের একমাত্র বিষয় নরলীল শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধানকারিণীর অভিন্ন বিগ্রহ। অব্যর্থদর্শী সূরিগণ নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহার আনুগত্যে আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ পুরুষোত্তম ভগবানের বিলাসপরা-কাষ্ঠা-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণা সেবিকারূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই শ্রীব্যাসগুরুর কার্য্য ; তন্মুখশ্রুত বাণীদ্বারাই গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ব্যাসপূজা। ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কুসিদ্ধান্তবাণীদ্বারা ব্যাসপূজা হয় না। পূজকের পূজারম্ভের পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধির বিচার আছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনেই সেই ভূতশুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

আত্মদানই শ্রীব্যাসপূজার মূল উপায়ন, তাহা সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত গুরুপূজা লোকদেখানো মাত্র। গুরুদেব পূর্ণবস্তু, তিনি চান আমাদের পূর্ণস্বরূপকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে। আত্মদানই অর্থাৎ শরণাপত্তিই ভক্তিবীজ—শ্রদ্ধা।

ভূলোকে ও গোলোকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যুগপৎ স্থিতি নিত্য সিদ্ধ। ভূলোকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহারই স্বাংশ ও বিভিন্নাংশরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বদা বিধি-নিষেধমূলা শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে আচরণের সুযোগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই জয়গান-মুখে আজ আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের আশা পোষণ করিতেছি।

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য তথা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮৩তম শুভাবির্ভাব-তিথি শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র বৈদ্যবাটীস্থ শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে উদ্‌-যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও সকল শাখামঠ হইতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে তদাশ্রিত ও তদ্‌গুণমুগ্ধ শ্রদ্ধালু জনগণ প্রকৃতিদেবীর বিরূপ মনোভাবকে উপেক্ষা করত উক্ত মঠে সমবেত হন।

শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস অর্থাৎ ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৬।১২।২০০৩), মঙ্গলবার বৈকালে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ব্যাণ্ডপার্টি সহ-যোগে এক বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বৈদ্যবাটী শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। উক্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পুরোভাগে হস্তীদ্বয়ের পৃষ্ঠে শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য ও সুসজ্জিত অশ্বযানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলেখ্য বিশেষ শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সভাপতিত্বে 'শ্রীব্যাসতত্ত্ব' ও 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

শ্রীব্যাসপূজা-দিবসে—১লা পৌষ (ইং ১৭।১২।২০০৩), বুধবার প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও একদিকে যথাসময়ে শ্রীল গুরু-মহারাজের ভজন-কুটীরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পর্ব্ব

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

চলিতে থাকে এবং অপরদিকে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ হরিকথার মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ প্রদান করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারী-জীউর মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ 'শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-

তত্ত্ব' এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।

২রা পৌষ (ইং ১৮।১২।২০০৩), বৃহস্পতিবার শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী'জীউর শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ উক্ত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের সকল অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

উক্ত দিবসেই সাতজন মঠবাসী সেবক ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ ও একজন বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ঃ—

পূর্ব্বনাম	বর্ত্তমান-নাম
১। শ্রীশ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শিখী মহারাজ**
২। শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যাচক মহারাজ**
৩। শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ**
৪। শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৃহদ্ব্রতী মহারাজ**
৫। শ্রীনিত্যপদ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নিরীহ মহারাজ**
৬। শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অকিঞ্চন মহারাজ**
৭। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী	**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তপস্বী মহারাজ**
৮। শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী	**শ্রীগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী মহারাজ**

—নামে পরিচিত হইয়াছেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামি-কৃত বৈষ্ণবস্মৃতি 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুযায়ী সন্ন্যাসগ্রহণ-যজ্ঞ-হোমাদি পরিচালনা করেন। পরে তাঁহারা সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষাবিধানে বহির্গত হইয়া শ্রীমুকুন্দ-সেবায় ভিক্ষুকাশ্রমোচিত বৃত্তির মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিষ্টার্ড)
এস. টি. ডি. ঃ ০৩৪৭২ ✆ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ১৪১০ (ইং ১।৩।২০০৪), সোমবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন, ১৪১০ (ইং ৭।৩।২০০৪), রবিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল**। ইতি—৩০শে পৌষ, ১৪১০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য *ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির* ***"সভাপতি-আচার্য্য"*** *অথবা* ***"সাধারণ-সম্পাদক"****-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১০ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।২০০৪), সোমবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।২০০৪), মঙ্গলবার ;—(৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। **আমলকী একাদশীর উপবাস।**

৩। ১৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।২০০৪), বুধবার ;—(৩) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৪) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)। ***দিবা ৯।৩০ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৫৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।***

৪। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।২০০৪), বৃহস্পতিবার ;—(৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্ক্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৫। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।২০০৪), শুক্রবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।২০০৪), শনিবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।**

৭। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।২০০৪), রবিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)। পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৫১ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।**

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। যাত্রীপিছু সাধারণপক্ষে ১৫০৲ (দেড়শত) টাকা দিতে হইবে। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।২০০৪), রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে প্রসাদের জন্য অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হইবে। পরিক্রমা ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।২০০৪), সোমবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা **প্রকাশিত** হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে **শ্রীপত্রিকা** গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৪০·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২২·০০ টাকা ও আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা এবং **বাংলাদেশবাসীপক্ষে** বার্ষিক ৫৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩০·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১,৫০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য। চেক্ অথবা ড্রাফ্ট্ "SHRI GOUDIYA-PATRIKA" নামে প্রদেয়।

৩। যে কোনও সময়ে **শ্রীপত্রিকার** গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার** কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের **মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি **শ্রীপত্রিকায়** প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোন কিছু জানিতে বা গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইলে **কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা **প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ), ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ১০। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১১। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১২। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৯। শ্রীগৌর-কথামালা, ২০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ, ২১। সাংখ্য-বাণী, ২২। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৩। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৪। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২৫। উদ্ধারের পথ, ২৬। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৭। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৮। শ্রীউপদেশামৃতম, ২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ৩০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩১। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ৩২। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ৩৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৪। প্রেম-প্রদীপ, ৩৫। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩৬। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩৭। তত্ত্ববিবেক, ৩৮। ভক্তিতত্ত্ববিবেক, ৩৯। শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, ৪০। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী, ৪১। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৪২। The Bhagavat, ৪৩। Nam-Bhajan, ৪৪। The Vedanta, ৪৫। Vaishnavism, ৪৬। Rai Ramananda, ৪৭। Relative Worlds, ৪৮। A Few Words on Vedanta, ৪৯। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya)।